১৯৪৬ : গান্ধিজী ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।

৫ মে, ১৯৪৬ : কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মৌলানা আজাদের ভাইসরয়-প্রাসাদে এসে পৌঁছানোর মুহূর্ত। বাঁদিক থেকে : মিঃ এ. ভি. আলেকজাণ্ডার, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, মৌলানা আজাদ, লর্ড পেথিক লরেন্স।

৫ মে, ১৯৪৬ : সিমলায় অনুষ্ঠিত ত্রিপাক্ষিক সম্মেলনে মৌলানা আজাদ ও লর্ড পেথিক লরেন্স।
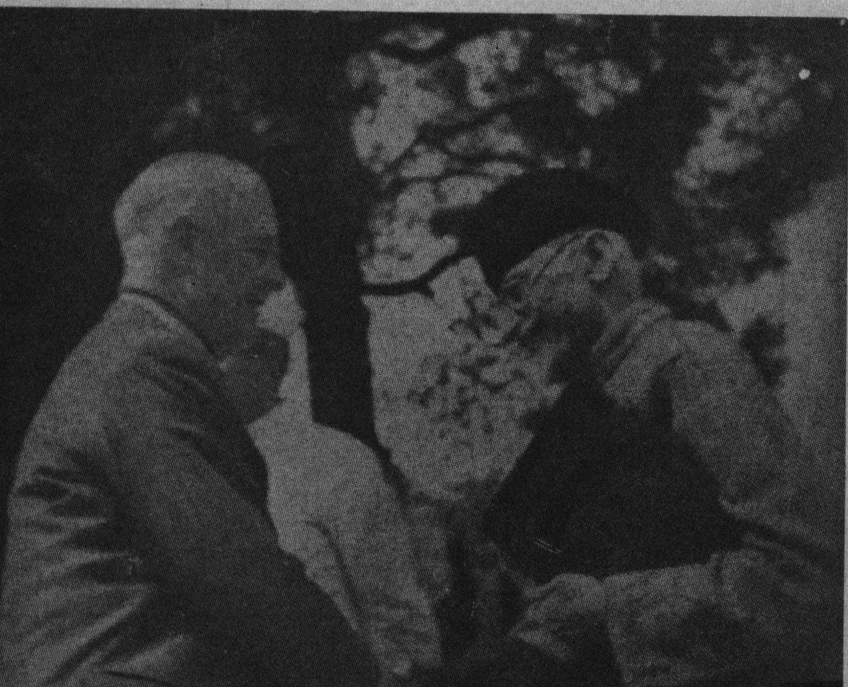
সম্মেলনে
উদ্বোধ
ভারতে
ভাইসর
ইণ্ডিয়া
ন্যাশনা
কংগ্রেসে
সভাপতি
সঙ্গে করম
করছে
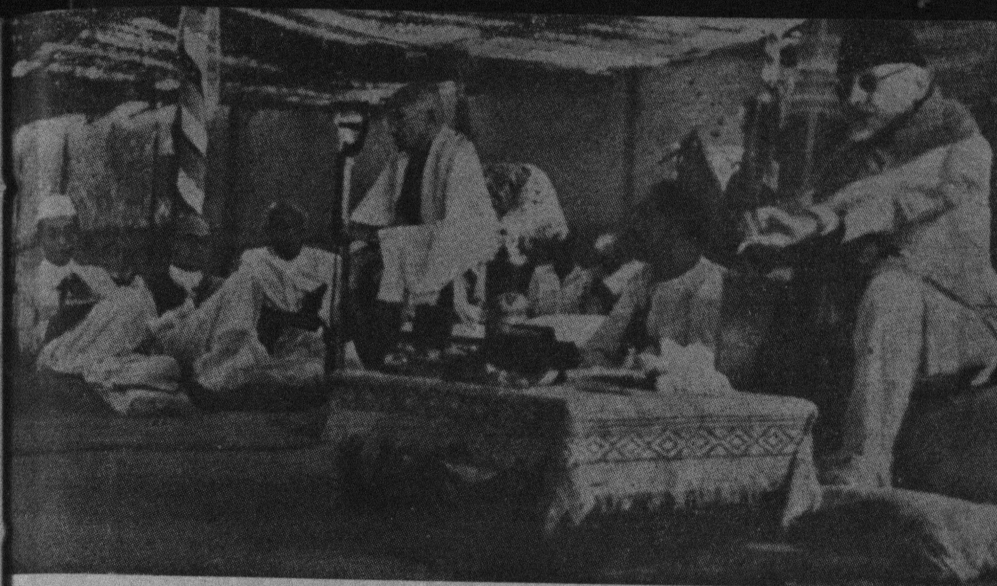
ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ ঃ ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা।

মিরাট কংগ্রেস, ১৯৪৬ ঃ কৃপালনি, প্যাটেল, আজাদ, গফর খাঁ।
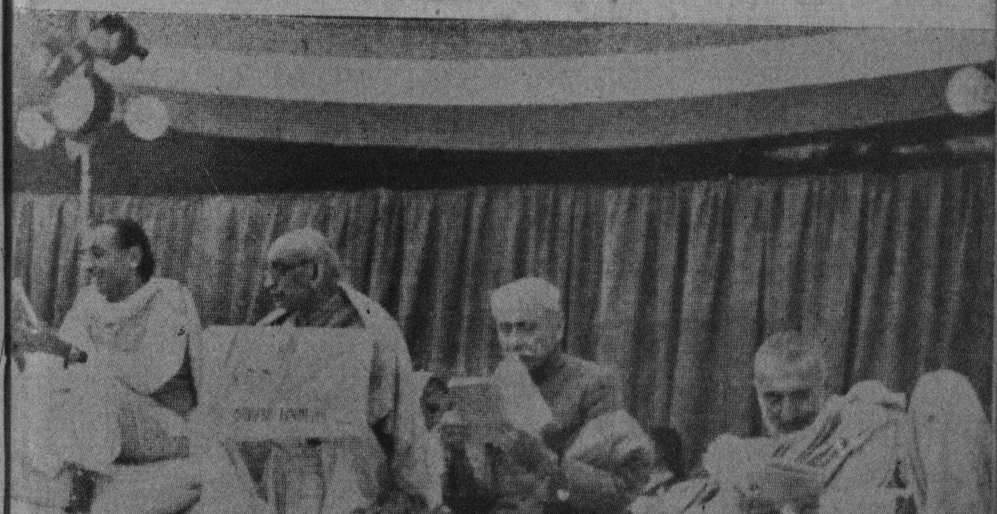
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

India Wins Freedom

পরিবেশক/কথা ও কাহিনী, ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলকাতা-১২

কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ও মিঃ আসফ আলির সঙ্গে কেবিনেট মিশনের সাক্ষাৎকার।
বাঁদিক থেকে ঃ লর্ড পেথিক লরেন্স, মৌলানা আজাদ, মিঃ আসফ আলি,
মিঃ এ. ভি. অ্যালেকজাণ্ডার, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস।

জুলাই, ১৯৪৬ ঃ বম্বেতে অনুষ্ঠিত এ. আই. সি. সি.র সভা।

INDIA WINS FREEDOM

By

Maulana Abul Kalam Azad

প্রথম প্রকাশ / রথযাত্রা ১৩৬৬

পত্রপুট

প্রকাশিকা / সান্ত্বনা দে, ২/৩এ রামকান্ত মিস্ত্রি লেন। কলকাতা-১২

মুদ্রক / বিজয় চক্রবর্তী, মুদ্রণায়ন, ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলকাতা-১২

ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দিল্লীর সেণ্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন মুহূর্তে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও ইউরোপের অন্যান্য দেশসমূহ পরিভ্রমণান্তে পালাম বিমান বন্দরে মৌলানা আজাদ।

সূচীপত্র

১৯৪৭ : দিল্লীর এ. আই. সি. সি. সভায় পণ্ডিত নেহরু, বাদশাহ খাঁ,
সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ ও গান্ধিজী।

মহাত্মা গান্ধীকে দাহ করার মুহূর্তে রাজকুমারী অমৃত কাউর, লর্ড ও লেডি মাউন্টব্যাটেন, প্যামেলা মাউন্টব্যাটেন, মৌলানা আজাদ এবং ভারতে চীনা প্রতিনিধি ডঃ লো চিয়া লুয়েম।

পূর্বাভাষ

বছর দুয়েকের কিছু আগে আমি যখন মৌলানা আজাদের সঙ্গে দেখা করে তাঁর আত্মজীবনী রচনা করতে অনুরোধ করি তখন মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারিনি, আমাকেই এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখার শোকাবহ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে চাইতেন না; তাই প্রথমে তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। আমি তাঁকে বলি, ইংরেজ কর্তৃক ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, সেই ঘটনাবলীকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে, এবং যেহেতু উক্ত ব্যাপারে তিনি একটি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সেইহেতু একমাত্র তিনিই উক্ত ঘটনাবলীকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারেন এবং এর জন্য তাঁর একটা দায়িত্বও আছে। তখন তিনি সময়াভাব এবং শারীরিক অসুস্থতার কথা বলে এ ব্যাপারে তেমন কোনো উৎসাহ দেখান না। তাঁর হয়তো মনে হয়েছিলো, তাঁর ওপরে ন্যস্ত সরকারী দায়িত্ব এবং জনগণের প্রতি তাঁর কর্তব্য পালন করার পর এ কাজের জন্য সময় ব্যয় এবং মস্তিষ্কচালনা তাঁর শরীরে কুলোবে না। কিন্তু আমি যখন তাঁকে কথা দিই, লেখার দায়িত্ব যাতে তাঁর ওপরে না চাপে সেজন্য ও ব্যাপারে আমি তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করবো তখন তিনি আর আপত্তি তোলেননি। এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য, লেখার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করার ফলে বিষয়টার অর্থ এই দাঁড়ায় যে ভারতের জনসাধারণ তাঁর নিজের লেখা আত্মজীবনী পড়বার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। তবে আদৌ কিছু না পাবার পরিবর্তে তাঁর বক্তব্যের ইংরেজী প্রতিরূপ নিশ্চয়ই জনসাধারণের কাম্য হবে।

এবারে গ্রন্থটি কিভাবে রচিত হয়েছিলো সে সম্বন্ধে কিছু বলার দরকার বোধ করছি। গত দু বছর বা তার কাছাকাছি আমি প্রতিদিন সন্ধ্যায় কমপক্ষে এক ঘন্টা মৌলানা আজাদের সঙ্গে কাটিয়েছি। এটি আমার নিয়মিত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। এই নিয়মিত হাজিরার ব্যতিক্রম শুধু সেই ক'দিনই হয়েছে, যে ক'দিন আমি দিল্লীতে উপস্থিত থাকতে পারিনি।

মৌলানা সাহেবের কথা বলার ধারাটা এতোই চমৎকার ছিলো যে নিতান্ত

দুরূহ বিষয়ও তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করতে পারতেন। আমি তাঁর সামনে বসে নোট নিয়েছি এবং মাঝে মাঝে কোনো কোনো বিষয় সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে ব্যাখ্যা চেয়েছি। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে চাইতেন না। তবে জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলো তিনি খোলাখুলিভাবেই বলতেন। এইভাবে একটা পরিচ্ছেদ লেখার মতো উপকরণ যখন আমার হাতে এসেছে তখন আমি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ইংরেজীতে একটা খসড়া তৈরি করে তাঁর হাতে দিয়েছি। প্রতিটি পরিচ্ছেদের খসড়া প্রথমে তিনি নিজে পড়তেন, তারপর আমরা দুজনে মিলে আবার পড়তাম, আলোচনা করতাম। এই সময় (অর্থাৎ পরবর্তী আলোচনার সময়) তিনি অনেক কিছু পরিবর্তন অথবা পরিবর্ধন করেছেন। আবার প্রয়োজনবোধে কোনো কোনো বিষয় একেবারেই বাদ দিয়েছেন। শেষ পরিচ্ছেদের সমাপ্তি পর্যন্ত এইভাবেই আমরা কাজ করেছি, এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রন্থটির পুরো খসড়া-পাণ্ডুলিপি মৌলানা সাহেবের হাতে তুলে দিয়েছি।

পাণ্ডুলিপির খসড়াটি হস্তগত হবার পর মৌলানা সাহেব সিদ্ধান্ত নেন, তা থেকে ত্রিশখানা পৃষ্ঠা (যাতে ব্যক্তিগত বিষয়সমূহ স্থান পেয়েছিলো) বর্তমানে প্রকাশ করা হবে না। তিনি নির্দেশ দেন, পরিত্যক্ত প্রতিটি বিষয়ের একটি করে কপি সীলমোহর করা খামে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে এবং নয়া-দিল্লীর জাতীয় সংগ্রহশালায় সুরক্ষিত থাকবে। তিনি আরো বলেন, উক্ত প্রত্যাহৃত অংশগুলিকে কোনোক্রমেই কোনোভাবে পরিবর্তন করা চলবে না। (অর্থাৎ ঠিক যেভাবে তিনি বিষয়গুলিকে উপস্থাপিত করেছেন এবং প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার কোনোরকম পরিবর্তন করা চলবে না।)

এরপর মৌলানা আজাদের নির্দেশ অনুসারে আমি কিছু কিছু পরিবর্তন এবং সংক্ষেপন করে ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসের শেষদিকে পাণ্ডুলিপির সংশোধিত খসড়াটি তাঁর হাতে তুলে দিতে সক্ষম হই।

এর পরেই আমি কিছুদিনের জন্য অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাই। আমার অনুপস্থিতিকালে মৌলানা সাহেব আর একবার পাণ্ডুলিপিটা পড়েন। এরপর আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে এলে দুজনে মিলে আবার পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে বসি। এই সময় আমরা প্রতিটি পরিচ্ছেদের প্রতিটি লাইন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করি। এবারেও মৌলানা সাহেবের নির্দেশে কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়,

তবে বড়রকমের কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। কোনো কোনো পরিচ্ছেদ তিনবার বা চারবারও সংশোধন করা হয়।

সংশোধনের কাজ শেষ হবার পর প্রজাতন্ত্র দিবসে মৌলানা সাহেব আমাকে বলেন, পাণ্ডুলিপিটা পড়ে তিনি খুশী হয়েছেন। তিনি আরো বলেন, এবার এটিকে ছাপতে দেওয়া যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, গ্রন্থটি যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা হলো তাঁর অনুমোদিত খসড়া-পাণ্ডুলিপিরই মুদ্রিত রূপ। মৌলানা আজাদের ইচ্ছে ছিলো গ্রন্থটি তাঁর সপ্ততিতম জন্মদিনে (অর্থাৎ ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে) প্রকাশ করতে হবে; কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস গ্রন্থটি যখন প্রকাশিত হলো তখন তিনি আর ইহজগতে নেই।

আগেই বলেছি, এ বই লেখার ব্যাপারে মৌলানা সাহেব প্রথম দিকে মোটেই আগ্রহান্বিত ছিলেন না; কিন্তু পরবর্তীকালে রচনার কাজ যতোই এগোতে থাকে ততোই তাঁর আগ্রহ বাড়তে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিগত ছ মাসে তিনি প্রায় প্রতিটি সন্ধ্যাই পাণ্ডুলিপি তৈরীর কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। ব্যক্তিগত ঘটনাবলী প্রকাশ করার ব্যাপারে সংকোচ বোধ করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর জীবনপঞ্জীর প্রথম অংশ লিখতে সম্মত হন। উক্ত প্রথম অংশের একটি সংক্ষিপ্তসারও তিনি তৈরি করেন। তাঁর ইচ্ছানুসারে উক্ত সংক্ষিপ্তসার এই গ্রন্থের প্রারম্ভিক পরিচ্ছেদ হিসেবে দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত আরো একটি কথা বলে রাখা দরকার, আত্মজীবনীর একটি তৃতীয় খণ্ডও তাঁর লেখার ইচ্ছে ছিলো (যাতে ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে পরবর্তীকালের ঘটনাবলী থাকবে), কিন্তু সে খণ্ডটি আর কোনোদিনই লেখা হবে না।

আমার কাছে এই গ্রন্থটি লেখার কাজ ছিলো অত্যন্ত আনন্দদায়ক। আমার এই আনন্দ আরো বর্ধিত হবে যদি আমি বুঝতে পারি মৌলানা সাহেবের প্রকৃত মানসকে আমি যথাযথভাবে উপস্থাপিত করতে পেরেছি। তাঁর এই মানস হলো ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সুষ্ঠু সমঝোতা সৃষ্টি করে এক বিশ্বজনীন সৌভ্রাত্র সৃষ্টির প্রয়াস। তিনি আশা করতেন ভারত এবং পাকিস্তানের অধিবাসীরা পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হবে এবং একে অপরের প্রতি প্রতিবেশীর মতো আচরণ করবে। এই মনোভাবের জন্যই তিনি 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস্' নামক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সবিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তিনি মনে করতেন, উক্ত প্রতিষ্ঠান এই ব্যাপারে উভয় রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে একটি সুস্থ পরিবেশ

করতে সক্ষম হবে। এই মনোভাব নিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে যে ভাষণ দেন (এইটিই তাঁর সর্বশেষ মুদ্রিত ভাষণ) তাতে তিনি উভয় রাষ্ট্রের জনগণকে (যাঁরা মাত্র দশ বছর আগেও একই অবিভক্ত দেশের অধিবাসী ছিলেন) নিজেদের ভেতরের সমস্ত বাদবিসংবাদ এবং বিভেদের কথা ভুলে গিয়ে সৌভ্রাত্রের বন্ধনে আবদ্ধ হতে সনির্বন্ধ আবেদন জানিয়েছিলেন।

আমি তাই মনে করি, ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌভ্রাত্রমূলক সমঝোতা সৃষ্টির জন্য এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থের একটি বড় অংশ উক্ত প্রতিষ্ঠানকে দিলেই সবচেয়ে ভালো কাজ হবে। শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই পাকা হয়। স্থির হয়, এই গ্রন্থের রয়েলটির একটা অংশ পাবেন মৌলানা আজাদের নিকটতম আত্মীয়েরা এবং বাকি অংশ পাবে কাউন্সিল। আরো স্থির হয়, কাউন্সিলের হাতে যে অর্থ আসবে তা ব্যয় করা হবে দুটি বাৎসরিক পুরস্কারের মাধ্যমে। একটি পুরস্কার দেওয়া হবে ইসলামের ওপরে অমুসলমানদের লেখা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের রচয়িতাকে এবং অপর পুরস্কারটি দেওয়া হবে হিন্দুধর্মের ওপরে মুসলমানদের লেখা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের প্রণেতাকে। মৌলানা আজাদ তরুণদের খুব বেশি ভালবাসতেন বলে আরো স্থির হয়, প্রতি বছর বাইশে ফেব্রুয়ারী যাদের বয়স ত্রিশ বছর বা তার নিচে থাকবে, তারাই শুধু এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বক্তব্য শেষ করবার আগে আর একটি বিষয় আমি পরিষ্কার করে দিতে চাই। বিষয়টি হলো, এই গ্রন্থে এমন কিছু কিছু মন্তব্য ও মতামত প্রকাশিত হয়েছে যেগুলোর সঙ্গে আমি একমত নই। অতএব কেউ যেন মনে না করেন, এতে যেসব মতামত ও মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো আমারও মতামত। মৌলানা আজাদ যখন জীবিত ছিলেন তখন আমি তাঁর কাছে অনেক বিষয়ে আমার মতানৈক্যের কথা বলেছি। আমার কথাগুলো তিনি ধীর-ভাবে শুনেছেন এবং তা নিয়ে বিচার-বিবেচনা করে গ্রন্থের কোনো কোনো জায়গায় পরিবর্তন অথবা পরিবর্ধন করেছেন। তাঁর একটি মহৎ গুণ ছিলো পরমতসহিষ্ণুতা। তাছাড়া তাঁর মনটিও ছিলো অত্যন্ত উদার এবং বিচারবুদ্ধি-যুক্ত। এই কারণেই তিনি অপরের মতামতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ করতেন এবং ভালো মনে হলে তা গ্রহণ করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। আবার যেসব ক্ষেত্রে আমার অভিমতকে তিনি মেনে নিতে পারতেন না সেসব ক্ষেত্রেও তিনি কোনোরকম বিরক্তি বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ না করে হাসিমুখে বলতেন, 'আমার নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করবার অধিকার নিশ্চয়ই আমার

আছে।' আজ যখন তিনি আর ইহজগতে নেই তখন তাঁর মন্তব্য এবং অভিমতসমূহ যেভাবে তিনি রেখে গেছেন ঠিক সেইভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। অতএব, এতে আমার মতামতের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

পরিশেষে যে কথাটা আমি বলতে চাই, তা হলো, কোনো ব্যক্তির পক্ষে অপর কোনো ব্যক্তির মনোভাব যথাযথভাবে প্রকাশ করা রীতিমতো কঠিন ব্যাপার। এমন কি, উভয় ব্যক্তি যখন একই ভাষাভাষী হয় তখনো দেখা যায়, সামান্য একটিমাত্র শব্দের পরিবর্তন ঘটালেও সম্পূর্ণ বিষয়টি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। প্রথমত বলা চলে, মৌলানা সাহেব তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতেন উর্দু ভাষায় এবং আমি তাঁর সেই উর্দু কথাগুলোকে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করতাম। উর্দু এবং ইংরেজী ভাষার প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকায় মৌলানা আজাদের চিন্তাধারাকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা আরো কঠিন। উর্দু ভাষা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মতোই সমৃদ্ধ ও বর্ণাঢ্য; অপরপক্ষে ইংরেজী ভাষা মূলত বক্তব্য-সংক্ষেপক ভাষা হওয়ায় (essentially a language of understatement) বক্তার মনোভাব পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারে না। বিশেষ করে বক্তা যেখানে মৌলানা আজাদের মতো একজন উর্দু ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি এবং লেখক তাঁর বক্তব্যের ইংরেজী অনুবাদক, সেখানে যে কিছু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এইসব অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও আমি আমার সাধ্যানুসারে তাঁর বক্তব্যবিষয়কে বিশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছি। এখানে আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার এই, আমার রচনা মৌলানা সাহেবের অনুমোদন লাভ করেছে।

নয়াদিল্লী,
১৫ই মার্চ, ১৯৫৮

হুমায়ুন কবীর

প্রথম খণ্ডের সংক্ষিপ্তসার

আমার পূর্বপুরুষরা হেরাত থেকে ভারতে এসেছিলেন বাবরের আমলে। ভারতে এসে প্রথমে তাঁরা আগ্রায় বসবাস করতে থাকেন, পরে সেখান থেকে দিল্লীতে চলে আসেন। পরিবারটি শিক্ষার দিক থেকে বিশেষ উন্নত ছিল। আকবরের আমলে এই পরিবারের মৌলানা জামালউদ্দিন ধার্মিক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। জামালউদ্দিন সাহেবের পরে এই পরিবার বৈষয়িক উন্নতির দিকে নজর দেন; যার ফলে এই পরিবারের কয়েকজন লোক গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হন। এই ধারা পরবর্তীকালেও চলতে থাকে। শাহজাহানের আমলে এই পরিবারের অন্যতম কৃতী পুরুষ মহম্মদ হাদি আগ্রা দুর্গের অধিনায়ক পদে নিযুক্ত হন।

আমার প্রমাতামহ (অর্থাৎ আমার পিতার মাতামহ) মৌলানা মুনাওয়ারউদ্দিন ছিলেন মোগল আমলের সর্বশেষ রুকন্-উল্ মুদারাসিন। এই পদটি প্রথমে সৃষ্ট হয়েছিলো শাহজাহানের আমলে। সাম্রাজ্যের শিক্ষা এবং শিক্ষা-উন্নয়ন ব্যবস্থাগুলোর তদারকি করবার জন্যই পদটি সৃষ্ট হয়। এই পদে যিনি অধিষ্ঠিত থাকতেন তাঁর নির্দেশেই অনুদানসমূহ প্রদত্ত হতো। অনুদান নানারকমের ছিলো, যেমন নগদ অর্থসাহায্য, ভূ-সম্পত্তি প্রদান এবং বার্ধক্য-বৃত্তি। খ্যাতনামা পণ্ডিত এবং শিক্ষাব্রতীদের এইসব অনুদান দেওয়া হতো। সে আমলের এই পদাধিকারীকে হাল আমলের শিক্ষা অধিকর্তার পদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে মোগল রাজশক্তি বিলুপ্ত হয়ে গেলেও তাঁদের সৃষ্ট অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদ এখনো প্রচলিত রয়েছে।

আমার পিতা মৌলানা খয়েরউদ্দিনের বয়স যখন খুবই অল্প সেই সময় আমার পিতামহের মৃত্যু হয়। পিতৃহীন হবার পর তাঁর প্রতিপালনের ভার নেন তাঁর মাতামহ। সিপাহী বিদ্রোহের দু বছর আগে মৌলানা মুনাওয়ারউদ্দিন ভারতের তৎকালীন অবস্থা দেখে বিরক্ত হয়ে মক্কায় চলে যাবেন বলে স্থির করেন। মক্কার পথে তিনি যখন ভূপালে উপনীত হন তখন ভূপালের নবাব সিকান্দার জাহান বেগম তাঁকে কিছুদিন ওখানে থেকে যেতে বলেন। তিনি ভূপালে থাকাকালেই বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়, যার ফলে দু বছর তিনি স্থানত্যাগ করতে পারেন না। এরপর তিনি বোম্বাইতে যান, কিন্তু মক্কায় যাওয়া তাঁর হয় না, কারণ বোম্বাইতে এসেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আমার পিতার বয়স তখন পঁচিশ বছর। তিনি মক্কায় চলে যান এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। ওখানে তিনি নিজস্ব বাসভবন তৈরি করে শেখ মহম্মদ জাহের ওয়াত্রির কন্যাকে বিবাহ করেন। শেখ মহম্মদ জাহের ছিলেন মদিনার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তখন আরবের সীমা ছাড়িয়ে বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। আমার পিতা কর্তৃক আরবীতে রচিত দশ খণ্ডে বিভক্ত এক বিরাট গ্রন্থ মিশর থেকে প্রকাশিত হবার পর তিনিও ইসলাম-জগতে সুপরিচিত হয়ে পড়েন। তিনি কয়েকবার বোম্বাইতে এবং একবার কলকাতায় এসেছিলেন। উভয় স্থানেই বহু লোক তাঁর গুণগ্রাহী এবং শিষ্য হন। ইরাক, সিরিয়া এবং তুরস্কেও তিনি ব্যাপক-ভাবে পরিভ্রমণ করেন।

মক্কা শহরে তখন পানীয় জলের প্রধান উৎস ছিলো নহর জুবেইদা নামে একটি খাল। এটি খনন করিয়েছিলেন খলিফা হারুণ-অল-রসিদের পত্নী বেগম জুবেইদা। কালক্রমে উক্ত খালটি ভরাট হয়ে যাওয়ায় মক্কা শহরে জলাভাব দেখা দেয়। এই জলাভাব আরো প্রকট হয়ে উঠতো হজের সময়। তীর্থ-যাত্রীরা জলের অভাবে অবর্ণনীয় কষ্টভোগ করতেন। আমার পিতা এই খালটি সংস্কার করেন। ভারত, মিশর, সিরিয়া এবং তুরস্ক থেকে কুড়ি লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে খালটিকে তিনি এমনভাবে উন্নত করেন যার ফলে বেদুইনরা ওটার কোনোরকম ক্ষতি করবার সুযোগ পায় না। এই সময় তুরস্কের সম্রাট ছিলেন সুলতান আবদুল মজিদ। আমার পিতার এই সৎ কাজের কথা জানতে পেরে তিনি তাঁকে তুরস্কের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান-প্রতীক মজিদী পদক দিয়ে সম্মানিত করেন।

এবার আমার কথা বলছি। আমার জন্ম হয় মক্কা শহরে, ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে। আমার জন্মের দু বছর পরে অর্থাৎ ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে আমার বাবা সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন। কিছুদিন আগে জেদ্দায় আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়ে তাঁর পায়ের হাড় ভেঙে গিয়েছিলো। হাড়টাকে সংস্থাপিত করা হলেও সেটা ঠিকমতো সেট না হওয়ায় তাঁকে কলকাতায় থেকে যাবার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। তাঁকে বলা হয়, কলকাতার সার্জনরা তাঁর হাড়কে ঠিকমতো সেট করে দিতে পারবেন। তিনি মনে মনে স্থির করেছিলেন, কলকাতায় তিনি বেশিদিন থাকবেন না। কিন্তু তাঁর শিষ্য আর ভক্তরা তাঁকে ছেড়ে দিতে চান না। আমরা কলকাতায় আসবার এক বছর পরে আমার মায়ের মৃত্যু হয় এবং ওখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

আমার পিতা ছিলেন প্রাচীনপন্থী এবং রক্ষণশীল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-পদ্ধতিকে তিনি সুনজরে দেখতেন না এবং এই কারণে আমাকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করবার কথা তিনি ভাবতেও পারতেন না। তাঁর মতে আধুনিক শিক্ষা ছিলো ধর্মবিশ্বাসের ধ্বংসকারী শিক্ষা। তিনি তাই প্রাচীন ধারাতেই আমার লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন।

এই প্রাচীন শিক্ষাধারা অনুসারে ভারতের মুসলমান ছেলেদের প্রথমে ফার্সী ও পরে আরবী শেখানো হতো। এই দুটি ভাষা আয়ত্ত করবার পরে তাদের আরবীর মাধ্যমে দর্শনশাস্ত্র, জ্যামিতি, পাটিগণিত এবং বীজগণিত শেখানো হতো। এ ছাড়া ঐস্লামিক কৃষ্টি এবং সংস্কৃতিও ছিলো শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। প্রথমদিকে বাবা আমাকে বাড়িতেই পড়াতেন, কারণ আমাকে তিনি কোনো মাদ্রাসায় পাঠানো পছন্দ করতেন না। তখন 'কলিকাতা মাদ্রাসা' সুপ্রতিষ্ঠিত থাকলেও সেই শিক্ষালয় সম্বন্ধে বাবা মোটেই উচ্চধারণা পোষণ করতেন না। প্রথমদিকে তিনি নিজেই আমাকে পড়াতেন। পরে বিভিন্ন বিষয় পড়াবার জন্য তিনি বিভিন্ন শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাকে বিশেষভাবে শিক্ষিত করে তুলতে।

এই চিরাচরিত শিক্ষাব্যবস্থায় যেসব ছেলে লেখাপড়া করতো তাদের পড়াশুনা সাধারণত কুড়ি থেকে পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে সমাপ্ত হতো। তবে শিক্ষা সমাপ্ত করার আগে কিছুদিন তাদের শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করে নবাগত শিক্ষার্থীদের পড়াতে হতো। তারা তাদের অধীত বিষয় কতোটা আয়ত্ত করেছে তা দেখার জন্যই এই ব্যবস্থাটি প্রচলিত ছিলো। আমি ষোলো বছর বয়সেই আমার শিক্ষা সমাপ্ত করতে সক্ষম হই। বাবা তখন জন-পনেরো নতুন ছাত্র এনে আমার কাছে তাদের পড়তে দেন। এইসব ছাত্রকে আমি উচ্চতর দর্শন, গণিত এবং ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলাম।

এই সময় আমি স্যার সৈয়দ আহম্মদের লেখা শিক্ষাবিষয়ক কয়েকটি রচনা পড়ার সুযোগ পাই। ওইসব রচনায় তিনি আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর মতামত আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। আমি বুঝতে পারি, বর্তমান যুগে আধুনিক বিজ্ঞান, দর্শন এবং সাহিত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকলে প্রকৃত শিক্ষালাভ করা যায় না। কিন্তু এসব বিষয় শিখতে হলে ইংরেজী ভাষা জানা দরকার। আমি তাই ইংরেজী শিখবো বলে মনে মনে স্থির করি এবং আমার মনোবাসনার কথা

প্রাচ্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান পরীক্ষক (Chief Examinor of Oriental Course of Studies) মহম্মদ ইউসুফ জাফরীকে বলি। তিনি আমাকে ইংরেজী বর্ণমালা শেখান এবং প্যারীচরণ সরকারের 'ফার্স্ট বুক' পড়তে দেন। ওই বইটি পড়ে ইংরেজী ভাষায় কিছুটা জ্ঞানলাভের পর আমি বাইবেল পড়তে শুরু করি। বাইবেল পড়ার সময় আমি ইংরেজী বাইবেলের সঙ্গে বাইবেলের পার্শী এবং উর্দু অনুবাদও একই সঙ্গে পড়তে থাকি। এইভাবে পড়ার ফলে ইংরেজী বাইবেলের বিষয়বস্তু সহজেই আমি বুঝতে পারি। এরপর আমি অভিধানের সাহায্য নিয়ে ইংরেজী খবরের কাগজ পড়া শুরু করি। এইভাবে পড়ার ফলে ইংরেজী ভাষার ওপর আমার যথেষ্ট দখল জন্মে। আমি তখন ইতিহাস এবং দর্শনশাস্ত্র পড়তে শুরু করি।

মানসিক প্রতিক্রিয়া

এই সময় আমার মনোজগতে এক বিরাট প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যে পরিবারে আমি জন্মগ্রহণ করেছি সে পরিবার সবদিক দিয়ে প্রাচীনপন্থী এবং ধর্মীয় অনুশাসনের বশবর্তী। ওখানে প্রাচীন সংস্কারেরই প্রাধান্য; যা কিছু প্রাচীন তাই ওখানে শ্রেয় বলে বিবেচিত হতো। এবং তা থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতিও এ পরিবার সহ্য করতো না। আমি কিন্তু এই রক্ষণশীলতাকে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারিনি। প্রায়ই আমার মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠতো। নিজ পরিবার এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে যে ভাবধারা এবং শিক্ষা আমি লাভ করেছি তাতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। আমার মনের কোণে তখন বারবার যে কথাটা উঁকি দিতো তা হলো—'সত্য কি এবং সত্যের পথই বা কোন্‌টা?' আমার তখন সব সময়ই মনে হতো, সত্যের সন্ধান আমাকে জানতে হবে এবং নিজেকেই খুঁজে বের করতে হবে সে পথের সন্ধান।

এইরকম মানসিক অবস্থায় পিতৃগৃহের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। আমি তাই পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনভাবে নিজের পথে চলতে থাকি।

এই সময় প্রথমেই যে জিনিসটি আমার মনের ওপর ধাক্কা দেয় তা হলো, বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ। একই ধর্মবিশ্বাসের অনুবর্তী হওয়া সত্বেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর কেন খাড়া হয়েছে আমি তা বুঝতে পারি নে। কেন যে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে হেয়

প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি নে। রক্ষণশীল মুসলমান সমাজের এই গোঁড়ামি আর সংকীর্ণ মনোভাব দেখে ধর্ম সম্বন্ধেও আমার মনে সন্দেহের বীজ উপ্ত হয়। ধর্ম যদি একমাত্র সত্য হয় তাহলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যেই বা এত বিভেদ কেন? কেনই বা প্রত্যেক ধর্ম নিজেকে একমাত্র সত্য এবং অপর ধর্মকে মিথ্যা বলে অভিহিত করে!

দু-তিন বছর পর্যন্ত আমার মনে এই ধরনের অস্থিরতা চলতে থাকে। এই সময়টায় আমি এইসব প্রশ্নের সদুত্তর জানবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়ি। আমি তখন শুরু করি পড়াশুনা আর অনুশীলন। স্তরে স্তরে চলতে থাকে এই অনুশীলন পর্ব। অবশেষে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করবার পর আমার মন থেকে সমস্তরকম সংকীর্ণতা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়ে যায়। পারিবারিক সূত্রে এবং বিভিন্ন শিক্ষকের কাছ থেকে যে শিক্ষা আমি পেয়েছি তার ফলে আমার মনে নানারকম সংস্কার এসে দানা বেঁধেছিলো। আমার মনের ভেতরের সেই-সব সংস্কার হঠাৎ যেন কোথায় পালিয়ে গেলো। এর পর থেকেই আমি 'আজাদ' (স্বাধীন) ছদ্মনাম গ্রহণ করি। এই ছদ্মনাম গ্রহণের অর্থ হলো, সমস্তরকম সংস্কার এবং সংকীর্ণতা থেকে নিজেকে আমি মুক্ত করে নিয়েছি। এই বিষয়টা আমার আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডে আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইলো।

বিপ্লবী দলে যোগদান

আমার রাজনৈতিক ধ্যানধারণাও এই সময় পালটাতে শুরু করে। বাংলার তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার জন্যই এটা হয়েছিলো। ভারতবর্ষের ভাইসরয় তখন লর্ড কার্জন। তাঁর সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভেদনীতির ফলে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা তখন অগ্নিগর্ভ। এই অগ্নিতে তিনি ঘৃতাহুতি দিলেন বঙ্গবিভাগের আদেশ জারি করে। এই ঘোষণাবাণী প্রচারিত হয় ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিলো, বৃহত্তর বঙ্গ-দেশকে বিভক্ত করলে বাঙালী হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে স্থায়ী বিভেদ সৃষ্টি করা যাবে। বঙ্গদেশ কিন্তু লর্ড সাহেবের এই সাধে বাধ সাধলো। সারা বাংলা জুড়ে শুরু হলো প্রচণ্ড বিক্ষোভ। সে বিক্ষোভ শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো না; সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী কর্মতৎপরতাও

শুরু হয়ে গেলো বাংলার বুকে। অরবিন্দ ঘোষ বরোদা থেকে বাংলায় এসে এখানেই তাঁর বিপ্লবী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র স্থাপন করলেন। তাঁর পত্রিকা 'কর্মযোগী' তখন জাতীয় জাগরণের প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করেছে।

এই সময় আমি তৎকালীন বিখ্যাত বিপ্লবী কর্মী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সংস্পর্শে আসি এবং তাঁর মাধ্যমে অন্যান্য বিপ্লবীর সঙ্গে পরিচিত হই। আমার বেশ মনে আছে, অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে এই সময় আমার দুবার কিংবা তিন-বার সাক্ষাৎ হয়। বিপ্লবীদের সঙ্গে এইভাবে মেলামেশার ফলে আমি বিপ্লবী রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। শেষ পর্যন্ত আমি বিপ্লবী দলে যোগদান করি।

সে সময় শুধু মধ্যবিত্ত হিন্দুদের ভেতর থেকেই বিপ্লবী কর্মী সংগ্রহ করা হতো। বিপ্লবী দলে যোগদান করবার পরে আমি দেখতে পাই, সব বিপ্লবী দলই মুসলমানদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। এর পেছনে কিছু কারণও ছিলো। বিপ্লবীরা দেখেছিলেন, ইংরেজ সরকার মুসলমানদের ব্যবহার করতো ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতিকে বন্ধ করার জন্য। মুসল-মানরাও ইংরেজ শাসকদের সেই রাজনীতির খেলার ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করে চলেছিলো। নবগঠিত পূর্ববঙ্গ প্রদেশের (পূর্ববঙ্গ ও আসাম) নবনিযুক্ত লেঃ গভর্নর বমফিল্ড ফুলার তখন প্রায়ই বলতেন, মুসলমানরা হলো ইংরেজ সর-কারের সুয়োরানী। এ ছাড়া আরো একটি ব্যাপারে বিপ্লবীরা মুসলমানদের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা জানতে পেরেছিলেন, উত্তরপ্রদেশ থেকে একদল মুসলমান অফিসার আমদানি করে বাংলার গোয়েন্দা বিভাগের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চকে ঢেলে সাজা হয়েছে এবং সেইসব মুসলমান অফিসারদের বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলা সরকার হিন্দু অফিসারদের ওপরে আস্থা রাখতে পারেনি। সরকার হিন্দু অফিসারদের বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বলে মনে করতো। সরকারের ধারণা হয়েছিলো, হিন্দুরাই যেহেতু ভারতের রাজনৈতিক এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের হোতা, সেইহেতু সরকারের হিন্দু অফিসাররাও হয়তো হিন্দু বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন। এইসব কারণেই নেতৃস্থানীয় হিন্দুরা, বিশেষ করে বিপ্লবীরা মুসলমান-দের ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপন্থী বলে মনে করতেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী যখন আমাকে বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচিত করে দেন এবং তাঁরা যখন জানতে পারেন আমি তাঁদের দলে যোগ দিতে চাই তখন তাঁরা রীতিমতো বিস্মিত হয়ে যান। একজন মুসলমান

যুবক বিপ্লবী দলে যোগ দিতে আসবে, এটা হয়তো তাঁরা ভাবতেই পারেননি। এরপর সত্যি সত্যিই আমি যখন বিপ্লবী দলে যোগ দিলাম তখনো তাঁরা আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেননি। প্রথমদিকে আমাকে তাঁরা পরিহার করেই চলতেন। এমন কি, দলের গোপনীয় সভাগুলোতেও আমাকে তাঁরা স্থান দিতেন না। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝতে পারেন এবং সমস্ত গোপনীয় বিষয়ই আমার সঙ্গে আলোচনা করতে থাকেন। এই সময় আমি তাঁদের বলি, কয়েকজন মুসলমান অফিসারের কাজকর্ম দেখেই তাঁরা যেন সমগ্র মুসলমান সমাজকে বিচার না করেন। আমি তাঁদের আরো বলি, মিশর, ইরান এবং তুরস্কে মুসলমান যুবকরাই বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করছেন। সুতরাং ভারতীয় মুসলমানরাও রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবে, তবে এর জন্য আমাদের মুসলমানদের ভেতরে কাজ করতে হবে এবং বন্ধুভাবে তাদের হৃদয় জয় করতে হবে। আমি তাঁদের এ কথাও বলি, মুসলমানরা শত্রুভাবাপন্ন হয়ে থাকলে অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি বিমুখ হয়ে থাকলে স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা কঠিন হয়ে উঠবে। অতএব মুসলমান সমাজের বন্ধুত্ব এবং সহায়তালাভের জন্য আমাদের সর্বতোভাবে সচেষ্ট হতে হবে।

প্রথমদিকে বিপ্লবী বন্ধুরা আমার অভিমতকে আমল দিতে চাননি। কিন্তু পরবর্তীকালে অনেকেই আমার অভিমত মেনে নেন। আমি ইতিমধ্যেই মুসলমানদের ভেতরে কাজ শুরু করে দিয়েছিলাম। আমি দেখতে পেয়েছিলাম, মুসলমানদের মধ্যে এমন একদল যুবক রয়েছে যারা রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে ব্যগ্র হয়ে আছে।

প্রথমে আমি যখন বিপ্লবী দলে যোগ দিই তখনই আমি দেখতে পাই, বিপ্লবীদের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ বাংলা এবং বিহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিহার তখন বঙ্গদেশেরই একটি অংশ ছিল। আমি তখন আমার বিপ্লবী বন্ধুদের বলি, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও আমাদের আন্দোলনকে প্রসারিত করা দরকার। কিন্তু প্রথমদিকে আমার এই প্রস্তাব তাঁরা মেনে নেন না। তাঁরা বলেন, গুপ্ত ক্রিয়াকলাপকে ব্যাপক করতে গেলে বিপদের সম্ভাবনাও আছে। অন্যান্য প্রদেশে যদি শাখা খোলা হয় মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। মন্ত্রগুপ্তিই বিপ্লবী আন্দোলনের আসল কথা ; সুতরাং একে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমি তাঁদের আমার মতের সপক্ষে আনতে সক্ষম হই। ফলে আমার যোগদানের

পর ছ বছরের মধ্যেই বোম্বাই এবং উত্তর-ভারতের অনেক জায়গায় গুপ্ত-সমিতি স্থাপিত হয়। এ সম্বন্ধে, অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানে গুপ্তসমিতি স্থাপনের এবং বিপ্লবী কর্মী সংগ্রহের ব্যাপারে আরো অনেক চিত্তাকর্ষক কাহিনী বলতে পারি, তবে তার জন্য পাঠকদের আরো কিছুদিন অর্থাৎ আমার আত্ম-জীবনীর প্রথম খণ্ড প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

এই সময় আমি একবার ভারতের বাইরে যাবার সুযোগ পাই। এবং সেই সুযোগে আমি ইরাক মিশর সিরিয়া এবং তুরস্ক পরিভ্রমণ করি। ওইসব দেশে ফরাসী ভাষার প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ দেখে আমিও ফরাসী ভাষা শিখতে চেষ্টা করি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমি বুঝতে পারি, ইংরেজী ভাষা দ্রুতগতিতে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে প্রসারিত হচ্ছে। সুতরাং প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে ইংরেজী ভাষাই আমাকে বেশি সাহায্য করবে।

এই সুযোগে আমি স্বর্গত মহাদেব দেশাইয়ের একটি ভুল মন্তব্যের সংশোধন করার দরকার বোধ করছি। তিনি যখন আমার জীবনচরিত রচনা করছিলেন তখন আমাকে তিনি কতকগুলো প্রশ্ন করে সেগুলোর উত্তর দিতে বলেছিলেন। তাঁর একটি প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছিলাম, আমার বয়স যখন কুড়ি বছর সেই সময় আমি একবার ব্যাপকভাবে মধ্যপ্রাচ্য পরিভ্রমণ করেছিলাম এবং সেই সময় বেশ কিছুদিন মিশরে অবস্থান করেছিলাম। তাঁর আর একটি প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছিলাম, মুসলমান সমাজের চিরা-চরিত শিক্ষাধারাকে আমি সন্তোষজনক বলে মনে করি নে। আমি তাঁকে আরো বলি, শুধু ভারতেই নয়, কায়রোর সুবিখ্যাত আল এজাহার বিশ্ব-বিদ্যালয়েও এই ধরনের অসন্তোষজনক শিক্ষাব্যবস্থাই প্রচলিত আছে। আমার সেই উত্তর শুনে মহাদেব দেশাই হয়তো ধরে নিয়েছিলেন, আমি আল এজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার জন্যই মিশরে গিয়েছিলাম। আসল কথা হলো, আমি আদৌ ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িনি। কিন্তু শ্রীদেশাই হয়তো ধরে নিয়েছিলেন, শিক্ষিত হিসাবে যাঁরা পরিচিত তাঁরা নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ করে থাকেন। তিনি আরো জানতেন, ভারতের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি পড়িনি। এবং এই কারণেই তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, আমি আল এজাহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি লাভ করেছি। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে আমি যখন কায়রোতে গিয়েছিলাম তখন আল এজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি এমনই ত্রুটিপূর্ণ ছিল, তাতে শিক্ষার্থীদের মানসিক উন্নতি তো হতোই না, উপরন্তু প্রাচীন ইসলামীয় বিজ্ঞান এবং দর্শন-

শাস্ত্রও ভালোভাবে শেখানো হতো না। শেখ মহম্মদ আবদুল্লা এই ত্রুটি সংশোধন করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু প্রাচীনপন্থী উলেমাদের বিরোধিতার ফলে তিনি কিছুই করতে পারেননি। তিনি তাই আল এজাহারের উন্নতির আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে 'দারুল-উলম্' নামে একটি নতুন কলেজ স্থাপন করেছিলেন। সেই কলেজটি আজও চলছে। সুতরাং এই যেখানকার অবস্থা সেখানে আমার পড়াশুনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

মিশর থেকে আমি তুরস্কে যাই। সেখান থেকে যাই ফ্রান্সে। লণ্ডনে যাবার ইচ্ছেও আমার ছিলো কিন্তু পারীতে থাকাকালে বাবার অসুখের খবর পেয়ে আমি কলকাতায় ফিরে আসি। এই কারণেই সে যাত্রায় আর লণ্ডনে যাওয়া হয় না। আমি লণ্ডনে গিয়েছিলাম এর বহুদিন পরে।

আগেই বলেছি, কলকাতা থেকে বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে আমার রাজনৈতিক ধ্যানধারণা ছিলো বিপ্লবী রাজনীতির পক্ষে। তাই আমি যখন ইরাকে আসি তখন ওখানকার কয়েকজন বিপ্লবীর সঙ্গে যোগাযোগ করি। মিশরে থাকাকালে মুস্তাফা কামাল পাশার সঙ্গেও আমি আলাপ-আলোচনা করার সুযোগ পাই। এ ছাড়া আরো কয়েকজন তুর্কী বিপ্লবীর সঙ্গেও আমার আলাপ-আলোচনা হয়। ওঁরা কায়রো শহরে একটি বিপ্লবী কেন্দ্র স্থাপন করে সেই কেন্দ্র থেকে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। পরে আমি যখন তুরস্কে যাই তখন আরো কয়েকজন তুর্কী বিপ্লবীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। ওঁরা তখন 'নব্য তুর্কী আন্দোলন' চালাচ্ছিলেন। আমি ভারতে ফিরে আসার পরেও বহুদিন ওঁদের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলাম।

ওইসব বিপ্লবীর সঙ্গে যোগাযোগের ফলে বিপ্লবী রাজনীতির প্রতি আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়। ওই বিপ্লবী বন্ধুরা ভারতের মুসলমানদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে ভারতীয় মুসলমানদের ঔদাসীন্যের কথাও তাঁদের অবিদিত ছিলো না। তাছাড়া ভারতীয় মুসলমানরা যে জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করছিলেন সে কথাও তাঁদের অজানা ছিলো না। তাঁরা তাই বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, ভারতের মুসলমানরা কেন যে ইংরেজদের তাঁবেদারী করছেন তা তাঁরা বুঝতে পারেন না। তাঁরা আরো বলেছিলেন ভারতের মুসলমানদের উচিত জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে সক্রিয়ভাবে যোগদান করে সর্বউপায়ে তার পৃষ্ঠপোষকতা করা। আমিও এই অভিমতই পোষণ করতাম। আমি তাই মনে মনে স্থির করি, ভারতে ফিরে

গিয়েই আমি মুসলমানদের মধ্যে কাজ আরম্ভ করবো। আমার কাজ হবে ইংরেজের প্রতি তাঁদের যে অন্ধবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে তা বিদূরিত করে মুসলমান সমাজকে জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করা। এই সংকল্প নিয়েই আমি ভারতে ফিরে আসি।

আল হিলাল পত্রিকা প্রকাশ

ভারতে ফিরে এসেই আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কী হবে তা নিয়ে কিছুদিন চিন্তা করবার পর আমি এই সিদ্ধান্তে আসি, মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে হলে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা দরকার। সে সময় পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে কয়েকটি দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হতো। কিন্তু সে-সব পত্রিকার বিষয়বস্তু এতোই নিম্নমানের এবং সেগুলোর ছাপা, প্রচ্ছদপট ইত্যাদি এতোই নিম্নস্তরের ছিলো যে জনসাধারণের মধ্যে কোনোরকম প্রভাবই তারা সৃষ্টি করতে পারেনি। তাছাড়া ওইসব পত্রিকা লিথোগ্রাফী পদ্ধতিতে ছাপা হতো বলে আধুনিক যুগের উপযোগী কোনো ফিচার ওগুলোতে স্থান পেতো না। হাফটোন ব্লকও ওইসব পত্রিকায় ছাপা হতো না। আমি তাই স্থির করি, আমার পত্রিকা হবে সবদিক থেকেই উন্নত। পত্রিকাটি ছাপা হবে টাইপে এবং আধুনিক সংবাদপত্রের সবকিছুই তাতে থাকবে। পত্রিকার নাম স্থির করতেও দেরি হয় না। নাম সাব্যস্ত করি 'আল হিলাল'। একই নামে একটি ছাপাখানাও আমি স্থাপন করি কিছুদিনের মধ্যেই। সেই ছাপাখানা থেকেই অবশেষে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে 'আল হিলাল' আত্মপ্রকাশ করে।

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পত্রিকাটি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। প্রকৃতপক্ষে উর্দু সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে 'আল হিলাল' এক নতুন পথের সন্ধান দেয়। পত্রিকার চাহিদাও বাড়তে থাকে প্রচণ্ডভাবে। শুধু ভালো ছাপা আর ভালো প্রচ্ছদপটের জন্যই নয়, আসলে এর জাতীয়তাবাদী বক্তব্যের জন্যই জনসাধারণ এর দিকে অতোটা আকৃষ্ট হয়। পত্রিকার চাহিদা এতো বেড়ে যায় যে প্রথম তিন মাসের যাবতীয় সংখ্যা আবার নতুন করে ছাপতে হয়। নতুন গ্রাহকরা প্রথম সংখ্যা থেকে সমস্ত সংখ্যা চাইবার ফলেই পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলো ছাপতে হয়েছিলো।

মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব সে সময় আলিগড় দলের হাতে ছিলো। ওই

দলের লোকেরা মনে করতেন, তাঁরাই ছিলেন স্যার সৈয়দ আহম্মদের রাজনীতির ধারক ও বাহক। তাঁরা যে রাজনীতি প্রচার করতেন তার মূল-কথা ছিল রাজভক্তি। তাঁরা বলতেন, মুসলমান সমাজ সব সময় ইংরেজদের বশংবদ হয়ে থাকবে এবং স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখবে। কিন্তু 'আল হিলাল' যখন জোরালো বক্তব্য উপস্থিত করে মুসলমান সমাজকে জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হবার জন্য আহ্বান জানালো এবং মুসলমান সমাজও সে আহ্বানে সাড়া দিলো তখন আলিগড় দলের প্রতিক্রিয়াপন্থী নেতারা 'আল হিলাল'-এর বিরুদ্ধতা করতে শুরু করলেন। কিন্তু বিরোধিতা যতোই বাড়তে লাগলো, 'আল হিলাল'ও ততোই জনপ্রিয় হতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত এর প্রচারসংখ্যা ছাব্বিশ হাজারে পৌঁছে গেলো—উর্দু সংবাদপত্রের ইতিহাসে এটা তখন অভাবনীয় ছিলো।

এদিকে 'আল হিলাল'-এর জাতীয়তাবাদী মতবাদে ইংরেজ শাসকশ্রেণী তখন রীতিমতো বিচলিত হয়ে উঠেছেন। তাঁরা তখন 'আল হিলাল'কে (এবং তার সম্পাদককে, অর্থাৎ আমাকে) তার মতবাদ থেকে বিচ্যুত করবার উদ্দেশ্যে তাঁদের চিরাচরিত পন্থায় প্রেস আইনের আশ্রয় গ্রহণ করে দু হাজার টাকা জামানত দাবি করলেন। জামানতের টাকা যথারীতি দাখিল করা হলো; কিন্তু 'আল হিলাল' তার মতবাদ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হলো না। আমি অকুতোভয়ে আমার বক্তব্য প্রচার করে চললাম। ফলে জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করে সরকার নতুনভাবে দশ হাজার টাকা জামানত দাবি করলো। সে টাকাও জমা দেওয়া হলো এবং যথারীতি বাজেয়াপ্ত হলো। কিন্তু জামানত জব্দ করেও সরকার 'আল হিলাল'কে জব্দ করতে পারলো না।

ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। যুদ্ধ শুরু হয়েছে ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে। এর এক বছর পরে, অর্থাৎ ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে সরকার 'আল হিলাল' প্রেসটি বাজেয়াপ্ত করে নিলো। কিন্তু প্রেস বাজেয়াপ্ত হলেও আমি দমে গেলাম না। আমি তখন 'আল বালাঘ' নামে আর একটি প্রেস স্থাপন করে সেই নামেই নতুন পত্রিকা বের করলাম। আমার কাজকর্ম দেখে ইংরেজ শাসকরা বুঝে নিলেন, প্রেস আইনের দ্বারা আমার ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করা যাবে না। তাঁরা তখন ভারতরক্ষা আইনের বলে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে আমার ওপরে এক বহিষ্কারের আদেশ জারি করে অবিলম্বে আমাকে কলিকাতা পরিত্যাগ করতে বললেন। ওদিকে পাঞ্জাব, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ এবং বোম্বাই সরকারও অনুরূপ আদেশ জারি করে আমাকে সেইসব অঞ্চলে প্রবেশ নিষিদ্ধ

করলেন। আমার পক্ষে তখন একমাত্র স্থান ছিলো বিহার। আমি তাই বাধ্য হয়ে রাঁচিতে চলে গেলাম। কিন্তু সেখানে গিয়েও আমি স্বাধীনভাবে থাকতে পারলাম না। মাস ছয়েক যেতে না যেতেই আমাকে নজরবন্দী করা হলো।

দীর্ঘ চার বছর নজরবন্দী অবস্থায় থাকার পরে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি আমাকে মুক্তি দেওয়া হলো। যুদ্ধশেষে বন্দীমুক্তির জন্য রাজকীয় আদেশ জারি হবার ফলেই আমি মুক্তিলাভ করি। আমার মতো আরো অনেক বন্দী উক্ত আদেশের বলে একই দিনে মুক্তিলাভ করে।

গান্ধীজীর পরিকল্পনা

ইতিমধ্যে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে গান্ধীজী আত্মপ্রকাশ করেছেন। আমি যখন রাঁচিতে বন্দীজীবন যাপন করছিলাম সেই সময় তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে বিহার সরকারের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে-ছিলেন। কিন্তু সরকার তাঁকে অনুমতি দেননি। ফলে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন না। তাঁর সঙ্গে প্রথমে আমার দেখা হয় আমার মুক্তির পরে। এ সাক্ষাৎকার ঘটে দিল্লীতে, ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। সে সময় তুরস্কের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভারতের মুসলমান সমাজ রীতিমতো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। এবং সেই দুশ্চিন্তার জন্য মুসলমান সমাজের নেতারা 'খিলাফত আন্দোলন' নামে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করার কথা চিন্তা করছিলেন। গান্ধীজী তাঁদের সেই প্রস্তাবিত আন্দো-লনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। মুক্তির পরে আমি যখন দিল্লীতে অবস্থান করছিলাম সেই সময় খিলাফত এবং তুরস্কের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভারতের মুসলমান সমাজের মনোভাব ভাইসরয়কে জানিয়ে দেবার জন্য একটি ডেপুটেশন পাঠাবার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। যে আলোচনা সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হয় সেখানে গান্ধীজীও উপস্থিত ছিলেন এবং উক্ত প্রস্তাবের প্রতি তাঁর সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছিলেন। মুসলিম নেতাদের তিনি আরো বলেন, এই ব্যাপারে তিনি সব সময় তাঁদের সঙ্গে আছেন ও থাকবেন। এর পর ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি দিল্লীতে একটি সভা হয়। উক্ত সভায় গান্ধীজী, লোকমান্য তিলক এবং আরো অনেক কংগ্রেসী নেতা খিলাফতের প্রশ্নে ভারতের মুসলমানদের দাবিকে সর্বতোভাবে সমর্থন করেন।

ডেপুটেশন ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করে। আমি স্মারকপত্রে সাক্ষর

করলেও ডেপুটেশনের সঙ্গে যাইনি, কারণ আমার মতে বিষয়টা তখন স্মারক-লিপি অথবা ডেপুটেশন স্তরের বাইরে চলে গেছে। ডেপুটেশন ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করলে প্রতিনিধিদের তিনি বলেন, তাঁরা যদি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে মুসলমানদের মনোভাব জানাবার জন্য একটি ডেপুটেশন পাঠাতে চান তাহলে সরকার তাঁদের লণ্ডনে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধে দিতে সম্মত আছে। তিনি নিজে এ ব্যাপারে কিছু করতে পারবেন না বলে প্রতি-নিধিদের জানিয়ে দেন।

এর পরেই শুরু হলো দ্বিতীয় পর্ব। কয়েকদিন পরে একটি সভা অনুষ্ঠিত হলো। সে সভায় মিঃ মহম্মদ আলী, মিঃ শৌকত আলী, হাকিম আজমল খাঁ এবং লক্ষ্ণৌয়ের ফিরিঙ্গিমহলের মৌলবী আবদুল বারি উপস্থিত ছিলেন। গান্ধীজী সেই সভায় অসহযোগ আন্দোলনের পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন, ডেপুটেশন এবং স্মারকপত্র প্রেরণের স্তর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এখন আমাদের সর্বতোভাবে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করতে হবে এবং শুধু এই পথেই সরকারকে নতি স্বীকার করাতে পারা যাবে। তিনি প্রস্তাব করেন, সবরকম সরকারী খেতাব বর্জন করতে হবে এবং আদালত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সমূহকে বয়কট করতে হবে। ভারতীয়রা সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দেবেন এবং নবগঠিত আইনসভায় অংশগ্রহণ করবেন না।

গান্ধীজী তাঁর এই প্রস্তাব উত্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেলো, অনেক বছর আগেই টলস্টয় এ কথা বলেছিলেন। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে জনৈক সন্ত্রাসবাদী যুবক যখন ইতালির রাজাকে আক্রমণ করেছিলো সেই সময় সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশে একটি খোলা চিঠিতে টলস্টয় বলেছিলেন, 'সন্ত্রাসের পথ আদৌ সঠিক পথ নয়, কারণ ক্ষুদ্র একটি আক্রমণের ফলে বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। একজন ব্যক্তিকে হত্যা করলে আর একজন তার স্থান অধিকার করবে। গ্রীক পুরাণে উল্লেখিত আছে, একজন মৃত সৈনিকের রক্ত থেকে ৯৯৯জন সৈনিক জন্মগ্রহণ করে। রাজনৈতিক হত্যা-কাণ্ড ড্রাগনের দাঁতকে আরো জোরদার করে। সুতরাং এ পথ পথই নয়। কোনো প্রতিক্রিয়াশীল সরকারকে যদি নতি স্বীকার করাতে হয় তাহলে সর্বোত্তম পন্থা হলো কর দেওয়া বন্ধ করা, সবরকম সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দেওয়া এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বয়কট করা। এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করলে সহজেই সরকারকে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করা যায়।'

আমার আরো মনে আছে, 'আল হিলাল' পত্রিকার কোনো একটি

সংখ্যাতেও এই ধরনের কথা আমি লিখেছিলাম। সুতরাং গান্ধীজীর এই পরিকল্পনাটা তাঁর নিজস্ব মৌলিক পরিকল্পনা নয়। কিন্তু এটা তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা না হলেও এই পথই যে সর্বোত্তম পথ তাতে আমার মনে কোনো সন্দেহই ছিলো না।

এদিকে গান্ধীজী যখন এই পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করলেন, তখন সভায় উপস্থিত নেতারা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। হাকিম আজমল খাঁ বললেন, পরিকল্পনাটা ভালোভাবে বিচার-বিবেচনা করে দেখার জন্য তিনি কিছুদিন সময় চান। তিনি আরো বললেন, যতোদিন তিনি এই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে না পারছেন ততোদিন তিনি তাঁর অনুগামীদের এ ব্যাপারে কিছু বলবেন না। মৌলবী আবদুল বারি আবার আরো এককাঠি ওপরে উঠলেন। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে তিনি ধ্যানযোগে আল্লার নির্দেশ জানতে চাইবেন। এবং যতোদিন তিনি তা না জানতে পারছেন ততোদিন এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারবেন না। আবদুল বারি সাহেব যে এইরকম একটা কিছু বলবেন এ কথা আগেই বুঝতে পারা গিয়েছিলো। ব্যাপার দেখে গান্ধীজী আমার দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁকে জানিয়ে দিলাম, এই পরিকল্পনা আমি সর্বতোভাবে সমর্থন করি। আমরা যদি তুরস্ককে সাহায্য করতে চাই তাহলে এই পথেই আমাদের চলতে হবে।

এই সভার কয়েক সপ্তাহ পরে মীরাট শহরে খিলাফত সম্মেলন নামে বড় রকমের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনেও গান্ধীজী উপস্থিত ছিলেন। ওখানেই তিনি তাঁর প্রস্তাবিত অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ব্যাখ্যা করে বিস্তৃত পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। ওখানেও আমি তাঁর বক্তব্যকে পুরোপুরি সমর্থন করি। এরপর গান্ধীজী তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের পরিকল্পনা নিয়ে কংগ্রেসের উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করেন। সেই আলোচনায় স্থির হয়, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে (অর্থাৎ ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে) কলকাতায় কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হবে সেই অধিবেশনে গান্ধীজীর পরিকল্পনাটি বিবেচনা করা হবে।

যথা সময়েই কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে গান্ধীজী বলেন, আমরা যদি স্বরাজ আশা করি তাহলে তা আদায় করে নেবার জন্য অসহযোগ আন্দোলনই হবে সর্বোত্তম পন্থা। তিনি আরো বলেন, খিলাফত সমস্যারও এতে সুষ্ঠু সমাধান হবে।

উক্ত অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন লালা লাজপত রায় এবং প্রধান বক্তা

ছিলেন মিঃ সি. আর. দাশ। ওঁরা দুজনেই গান্ধীজীর সঙ্গে একমত হতে পারেননি। বিপিনচন্দ্র পালও গান্ধীজীর প্রস্তাব পুরোপুরি মেনে নিতে চান না। তিনি বলেন, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হলো বিলাতী পণ্য বয়কট করা। কিন্তু তাঁদের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অসহযোগের প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়।

গান্ধীজী তখন আসন্ন আন্দোলন সম্পর্কে দেশবাসীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য এবং তাঁদের কাছে অসহযোগ আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সফর করতে শুরু করেন। তাঁর সেই সফরের সময় আমি প্রায়ই তাঁর সঙ্গে থাকতাম। মহম্মদ আলী এবং শৌকত আলীও মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে থাকতেন।

ডিসেম্বর মাসে নাগপুর শহরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়। ইতিমধ্যে দেশবাসীর মনোভাব অসহযোগের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। মিঃ সি. আর. দাশও তখন প্রস্তাবিত আন্দোলনকে প্রকাশ্যেই সমর্থন করলেন। লালা লাজপত রায় প্রথমদিকে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হলেও পাঞ্জাবের প্রতিনিধিদের মনোভাব দেখে শেষ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষেই তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার, নাগপুরের এই অধিবেশনের সময়েই মহম্মদ আলী জিন্না কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যান।

নাগপুর অধিবেশনের পরেই শুরু হয়ে যায় সরকারী চণ্ডনীতির প্রয়োগ। সারা ভারতের কংগ্রেস নেতাদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা হয়। বাংলায় মিঃ সি. আর. দাশ এবং আমি সর্বাগ্রে গ্রেপ্তার হই। গ্রেপ্তার করার পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় আলিপুর সেনট্রাল জেলে। কয়েকদিন পরে সুভাষচন্দ্র বসু এবং বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকেও নিয়ে আসা হয় জেলখানায়। আমাদের থাকতে দেওয়া হয় ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডে, ফলে উক্ত ওয়ার্ডটি হয়ে ওঠে রাজনৈতিক আলোচনার একটি বিশেষ কেন্দ্র।

কিছুদিন বিচারাধীন অবস্থায় থাকার পর মিঃ সি. আর. দাশ ছ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আমার বিচার হয় বেশ কিছুদিন পরে। কি কারণে জানি না, আমাকে অনেকদিন বিচারাধীন বন্দী হিসেবে রেখে অবশেষে এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। আমি প্রকৃতপক্ষে ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারির আগে মুক্তি পাইনি। মিঃ সি. আর. দাশ আগেই মুক্তি পান এবং কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। গয়া অধিবেশনের সময়

কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। সি. আর. দাশ, মতিলাল নেহরু এবং হাকিম আজমল খাঁ স্বরাজ্য দল গঠন করে আইনসভায় প্রবেশ করার পক্ষে অভিমত জ্ঞাপন করেন। পক্ষান্তরে গান্ধীজীর অনুগামী রক্ষণশীল নেতারা তাঁদের বিরোধিতা করেন। ফলে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সংস্কারবাদী (pro-changers) এবং রক্ষণশীল (no-changers) এই উভয় শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। আমি জেল থেকে মুক্তি পাবার পরে উভয় দলের মধ্যে একটা সমঝোতা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হই। আমার এই প্রচেষ্টার ফলে ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে বিবদমান দল দুটির মধ্যে একটা আপস হয়ে যায়। স্থির হয়, উভয় দলই কংগ্রেসের মধ্যে থাকবে এবং কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই যে যার পথে চলতে পারবে। কংগ্রেসের সেই বিশেষ অধিবেশনে আমাকেই সভাপতি করা হয়। আমার বয়স তখন মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর। এত কম বয়সে আমার আগে আর কেউ কংগ্রেসের সভাপতি হননি।

১৯২৩ সনের পরে কংগ্রেসের ক্রিয়াকলাপ প্রধানত স্বরাজ্য দলের হাতেই কেন্দ্রীভূত হয়। এই দল প্রায় সব প্রদেশের আইনসভায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে পার্লামেন্টারী পথে সংগ্রাম শুরু করে। স্বারাজ্য দলের বাইরে যাঁরা ছিলেন তাঁরা তখন গঠনমূলক কাজ শুরু করেন, কিন্তু স্বরাজ্য দলের মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন না। এই সময় এমন সব ঘটনা ঘটতে থাকে যার ফলে ভারতের রাজনীতিতে বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, কিন্তু সেসব কথা এখানে আলোচনা করা হচ্ছে না। ওসব বিষয় জানতে হলে পাঠকদের আরো কিছুদিন, অর্থাৎ আমার আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ড প্রকাশ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলছি।

১৯২৮ সনে সাইমন কমিশনের নিযুক্তি এবং সেই কমিশনের ভারত ভ্রমণের ব্যাপারে দেশের রাজনৈতিক উত্তেজনা ভীষণভাবে বেড়ে যায়। ১৯২৯ সনে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে এক নোটিস দিয়ে জানিয়ে দেয়, এক বছরের মধ্যে জাতীয় দাবি মেনে না নিলে কংগ্রেস সারা ভারত জুড়ে এক গণআন্দোলন শুরু করবে। ইংরেজরা আমাদের সে দাবিকে কোনোরকম আমলই দেয় না। কংগ্রেস তখন ১৯৩০ সনে লবণ আইন অমান্যের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হবার মুখে অনেকেই এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন, কিন্তু সত্যাগ্রহের পরবর্তী চেহারা এবং ব্যাপকতা দেখে সরকার ও দেশের জনসাধারণ রীতি-

মতো বিস্মিত হয়ে পড়ে। সত্যাগ্রহের ব্যাপকতা দেখে সরকার কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করে। তারা তখন কংগ্রেসকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করে এবং কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সহ ওয়ার্কিং কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে গ্রেপ্তার করার আদেশ দেয়। সরকার যে এইরকম একটা কিছু করবে তা আমরা আগেই অনুমান করেছিলাম। সুতরাং নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের ফলে কংগ্রেসের কাজকর্ম যাতে বন্ধ না হয় তার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে স্থির করেছিলাম, একজন প্রেসিডেন্ট গ্রেপ্তার হবার সঙ্গে সঙ্গে আর একজন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং নতুন প্রেসিডেন্ট তাঁর ওয়ার্কিং কমিটিও নতুন করে গঠন করবেন। আরো স্থির হয়, নতুন সভাপতি কার্যভার গ্রহণ করেই তাঁর পরবর্তী সভাপতি মনোনীত করে রাখবেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে আমি যখন সভাপতি হই তখন আমি আমার ইচ্ছামতো সদস্য নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করি এবং পরবর্তী সভাপতি হিসেবে ডাঃ আনসারীকে মনোনীত করি। ডাঃ আনসারী প্রথমে আন্দোলনে যোগদান করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু আমি তাঁর মত পরিবর্তন করতে সক্ষম হই। এইভাবেই আমরা সরকারী চণ্ডনীতির মোকাবিলা করে আন্দোলনকে চালু রাখি।

মীরাটের এক জনসভায় আমি যে বক্তৃতা করি তার ফলে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পরে আমাকে প্রায় দেড় বছর মীরাট জেলে বন্দী করে রাখা হয়।

এক বছরেরও বেশি এইভাবে আন্দোলন চলবার পর তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড আরউইন গান্ধীজীকে এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তি দেন। বলা বাহুল্য, আমিও সেই সময় মুক্তিলাভ করি। মুক্তিলাভের পর প্রথমে আমরা এলাহাবাদে এবং তারপর দিল্লীতে মিলিত হই। এই সময় গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে সব কংগ্রেসকর্মীকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস অংশগ্রহণ করবে বলে স্থির হয়। কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে গান্ধীজীকে বিলাতে পাঠানো হয়। কিন্তু গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা ফলপ্রসূ হয় না এবং গান্ধীজী খালি হাতে ফিরে আসেন। লণ্ডন থেকে ফিরে আসার পরেই গান্ধীজীকে আবার গ্রেপ্তার করা হয় এবং নতুন করে দমননীতি চালানো হতে থাকে। নতুন ভাইসরয় লর্ড উইলিংডন কংগ্রেস এবং তার যাবতীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। আমি তখন দিল্লীতে ছিলাম বলে আমাকে দিল্লী জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। এক বছরেরও বেশি আমি

দিল্লী জেলে বন্দীজীবন যাপন করি। এই সময় এমন সব ঘটনা ঘটে যেগুলো ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষভাবে চিহ্নিত হবার মতো। তবে এখানে আমি সেসব ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা করছি না। এ বিষয়েও পাঠকদের প্রথম খণ্ডের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

১৯৩৫ সনে ভারত শাসন আইন (Government of India Act) বিধিবদ্ধ হয়। উক্ত আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং কেন্দ্রে একটি ফেডারেল সরকার গঠনের ব্যবস্থা হয়। এখান থেকেই আমার এই কাহিনীর সূত্রপাত, অর্থাৎ বর্তমান গ্রন্থে এখান থেকেই আলোচনা শুরু হবে।

ক্ষমতার আসনে কংগ্রেস

১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইন অনুসারে সর্বপ্রথম যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কংগ্রেস তাতে বিরাটভাবে জয়লাভ করে। পাঁচটি বৃহদায়তন প্রদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং চারটি প্রদেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে কংগ্রেসদল সারা ভারতে প্রাধান্যলাভ করে। কেবলমাত্র সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশে এরা পুরোপুরি সাফল্যলাভ করতে পারেনি।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার, প্রথমদিকে কংগ্রেস নির্বাচনে দাঁড়াবে না বলে স্থির করেছিল। ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিলেও মলমের ওপরে মাছির মতো একটি অনভিপ্রেত জিনিস রেখে দিয়েছিলো। এই অনভিপ্রেত জিনিসটি হলো প্রাদেশিক গভর্নরদের বিশেষ ক্ষমতা। এই বিশেষ ক্ষমতাবলে তারা যে-কোনো সময় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারতো। যে-কোনো গভর্নর এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে সাংবিধানিক অধিকার বাতিল করে সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নিতে পারতো। এর অর্থ হলো, প্রাদেশিক গভর্নর যতোদিন ইচ্ছা করবে ততোদিনই শুধু প্রদেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বজায় থাকবে; অর্থাৎ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকে সম্পূর্ণরূপে গভর্নরের মর্জির ওপরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো। কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থা আরো খারাপ। সেখানে আবার স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করা হয়েছিলো। প্রদেশসমূহে এই ব্যবস্থা ধিকৃকৃত হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রে এই ব্যবস্থাই বজায় রাখা হয়েছিলো। এইরকম একটা অনভিপ্রেত ব্যবস্থার ফলে প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় সরকার শুধু যে একটি দুর্বল ফেডারেশনে পরিণত হয়েছিলো তাই নয়,

উপরন্তু দেশীয় রাজন্যবৃন্দ এবং কায়েমীস্বার্থের অধিকারীদের অহেতুকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিলো। দেশের স্বার্থকে উপেক্ষা করে এরা ইংরেজ শাসকদের তাঁবেদার হয়ে থাকবে এই উদ্দেশ্যেই এটি করা হয়েছিলো।

কংগ্রেস দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম করে এসেছে। সুতরাং তার পক্ষে এই ব্যবস্থা মেনে নেওয়া প্রায় অসম্ভব বলে বিবেচিত হয়েছিলো। কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য প্রস্তাবিত ফেডারেশনকে কংগ্রেস সরাসরি বাতিল করে দেয়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি দীর্ঘদিন যাবৎ প্রাদেশিক পরিকল্পনারও বিরোধী ছিলো। কংগ্রেসের একটি বড় অংশ নির্বাচনে অংশগ্রহণেরও বিরোধী ছিলো। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার অভিমত ছিলো সম্পূর্ণ আলাদা। আমি যে অভিমত পোষণ করতাম তা হলো, নির্বাচন পরিহার করলে মহা ভুল করা হবে। কংগ্রেস যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে তাহলে অনভিপ্রেত দলগুলি এগিয়ে এসে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলো দখল করে নিজেদের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি বলে জাহির করে ভারতীয় জনগণের নামে নিজেদের কথা বলতে থাকবে। এ ছাড়া নির্বাচন একটি বড় রকমের সুযোগও এনে দিয়েছিলো আমাদের সামনে। নির্বাচনী প্রচারের সময় আমরা জনসাধারণের কাছে ভারতীয় রাজনীতির মৌলিক বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করবার সুযোগ পাবো। অবশেষে আমার অভিমতই মেনে নেওয়া হয় এবং কংগ্রেস নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ফলাফল কি হয়েছিলো সে কথা আগেই বলেছি।

এর পরেই দেখা দিলো আর এক সমস্যা। তা হলো কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে মতভেদ। নির্বাচনে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে এক অংশ কংগ্রেসের মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বারা মন্ত্রিসভা গঠনের বিরোধিতা করতে থাকেন। এঁদের বক্তব্য হলো, আসল ক্ষমতা গভর্নরদের হাতে থাকায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। মন্ত্রীরা ততোদিনই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারবে যতোদিন গভর্নররা দয়া করে তাঁদের থাকতে দেবে। কংগ্রেস যদি তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলো কার্যকর করতে সচেষ্ট হয় তাহলে গভর্নরদের সঙ্গে তার সংঘর্ষ অপরিহার্য হয়ে উঠবে। এঁরা তাই অভিমত প্রকাশ করেন, এ অবস্থায় কংগ্রেসের উচিত হবে আইনসভার ভেতরে থেকে ইংরেজ শাসকদের রচিত সংবিধানকে আঘাতের পর আঘাত হেনে ধ্বংস করে দেওয়া। এই ব্যাপারেও আমি ভিন্ন অভিমত পোষণ করি। আমি বলি, প্রাদেশিক সরকারগুলোকে যেটুকু ক্ষমতাই দেওয়া হোক না কেন, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে। গভর্নরদের সঙ্গে যদি বিরোধ উপস্থিত হয়

তাহলে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। ক্ষমতা হাতে না নিলে কংগ্রেস তার পরিকল্পনাকে রূপ দিতে সক্ষম হবে না। অপরপক্ষে, কোনো জনপ্রিয় বিষয়কে রূপ দিতে গিয়ে মন্ত্রিসভাকে যদি বিদায় নিতে হয়, তাতে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা আরো বাড়বে।

গভর্নররা কিন্তু কংগ্রেসের এইসব আলোচনা এবং তার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করলেন না। তাঁরা যখন দেখতে পেলেন, মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে কংগ্রেস দ্বিধাগ্রস্থ মনোভাব গ্রহণ করেছে তখন তাঁরা আইনসভার দ্বিতীয় বৃহত্তর দলগুলোকে আহ্বান জানালেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই, এরকম দলকেও আহ্বান করা হলো। এর ফলে বিভিন্ন প্রদেশে অন্তর্বর্তী-কালীন অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হলো। কোনো কোনো প্রদেশে কংগ্রেসের ঘোরতর বিরোধী দলও মন্ত্রিত্বের গদিতে আসীন হলো। মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে কংগ্রেসের দ্বিধাগ্রস্থ নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলো। শুধু তাই নয়, এর ফলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ লাভ করলো। তারা এই সুযোগে নির্বাচনে পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াবার জন্য সচেষ্ট হলো।

কংগ্রেস কর্তৃক মন্ত্রিসভা গঠন

এদিকে ভাইসরয়ের সঙ্গে তখন সুদীর্ঘ আলোচনা চলছে কংগ্রেস নেতাদের। এই আলোচনার সময় ভাইসরয়ের কাছ থেকে এই মর্মে একটি আশ্বাস নেবার চেষ্টা চলছিলো, গভর্নররা মন্ত্রিসভার কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। ভাইসরয় যখন বিষয়টা সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করলেন তখন ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্য তাঁদের পূর্ব অভিমত পরিবর্তন করে ক্ষমতাগ্রহণের পক্ষে, অর্থাৎ মন্ত্রিসভা গঠনের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করলেন। কিন্তু ইতিপূর্বে কংগ্রেস যেভাবে জোরালো ভাষায় ভারত শাসন আইনের বিরুদ্ধে তার মতামত ব্যক্ত করেছিলো, তার ফলে, পলিসি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলেও কোনো নেতাই তাঁর অভিমত জোরের সঙ্গে ব্যক্ত করতে সাহস পাচ্ছিলেন না। জওহরলাল তখন কংগ্রেসের সভাপতি। পূর্বে তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরুদ্ধে এমন সব উক্তি করেছিলেন যার ফলে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পক্ষে কোনোকিছু বলা অথবা সে ব্যাপারে কোনোরকম প্রস্তাব উত্থাপন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিলো না। এর কিছুদিন পরে ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির সভা

বসে। আমি তখন একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করি, কোনো সদস্যই বাস্তব ঘটনাবলীর মুখোমুখি দাঁড়াতে চাইছেন না। সদস্যদের এই ধরনের মনোভাব দেখে আমিই প্রথমে ক্ষমতাগ্রহণের পক্ষে সুস্পষ্ট ভাষায় অভিমত জ্ঞাপন করি। আমি এই অভিমত জ্ঞাপন করবার পর এ ব্যাপারে কিছুক্ষণ আলোচনা চলে। আলোচনার সময় গান্ধীজী আমার অভিমতটাই মেনে নেন। এর ফলে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে আর কোনো বাধাই রইলো না। কংগ্রেস তখন প্রাদেশিক স্তরে মন্ত্রিসভা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। এটা একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত, কারণ এতোদিন পর্যন্ত কংগ্রেস শুধু নেতিবাচক পন্থাই গ্রহণ করে এসেছে এবং ক্ষমতাগ্রহণের বিরুদ্ধেই অভিমত প্রকাশ করে এসেছে। এই প্রথম কংগ্রেস ইতিবাচক পন্থা গ্রহণ করলো এবং সরকারের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিতে স্বীকৃত হলো।

এই সময় এমন একটি ঘটনা ঘটে যার ফলে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলোর অভিমত সম্পর্কে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস একটি অখণ্ড জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবেই গড়ে উঠেছে এবং জাতিধর্মনির্বিশেষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের নেতৃত্ব করার সুযোগ দিয়ে এসেছে। বোম্বাইয়ে তখন প্রদেশ কমিটির স্বীকৃত নেতা ছিলেন মিঃ নরিম্যান। সুতরাং প্রচলিত ব্যবস্থা অনুসারে বোম্বাইয়ে মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব তাঁর ওপরেই দেবার কথা। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তা হলো না। সর্দার প্যাটেল এবং তাঁর অনুগামীরা মিঃ নরিম্যানকে পছন্দ করতেন না। তাঁরা তাই মিঃ বি. জি. খেরকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে পরামর্শ দিলেন এবং তাঁকেই মুখ্যমন্ত্রী হতে বললেন। ফলে মিঃ বি. জি. খেরই হলেন বোম্বাইয়ের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী। মিঃ নরিম্যান পার্শী এবং মিঃ খের হিন্দু। এর ফলে জনসাধারণের মনে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হলো, মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়েই মিঃ নরিম্যানকে নস্যাৎ করা হয়েছে। এটা যদি সত্যি নাও হয় তবুও এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করা কঠিন।

এই সিদ্ধান্তের ফলে স্বাভাবিক কারণেই মিঃ নরিম্যান মুষড়ে পড়েন। তিনি এই বিষয়টি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে উপস্থাপিত করেন। তখনো জওহরলালই কংগ্রেসের সভাপতি। তাই অনেকেই আশা করেছিলেন, এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চয়ই এই অবিচারের প্রতিকার করবেন। জওহরলাল সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে ছিলেন বলেই তাঁরা এইরকম আশা করেছিলেন।

দুঃখের বিষয়, এটা হলো না। সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে জওহরলালের বহু বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও এই ব্যাপারে তিনি প্যাটেলের বিরোধিতা করলেন না। সর্দার প্যাটেল যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে এ কাজ করেছেন সে কথা তিনি মেনে নিলেন না। এ ব্যাপারে তিনি কিছুটা অবিবেচকের মতোই নরিম্যানের আপীলকে নস্যাৎ করে দিলেন।

জওহরলালের মনোভাব দেখে নরিম্যান রীতিমতো বিস্মিত হন। তিনি তখন গান্ধীজীর স্মরণাপন্ন হয়ে তাঁর কাছে সুবিচার প্রার্থনা করেন। গান্ধীজী ধীরভাবে তাঁর বক্তব্য শুনে নির্দেশ দেন, সর্দার প্যাটেলের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি কোনো একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির দ্বারা তদন্ত করাতে হবে।

সর্দার প্যাটেল এবং তাঁর বন্ধুরা এই ব্যাপারেও তাঁদের অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, মিঃ নরিম্যান যেহেতু পার্শী সম্প্রদায়ভুক্ত সেইহেতু তাঁর অভিযোগের তদন্তভার একজন পার্শীর ওপরেই ন্যস্ত করা হোক। তাঁরা তাঁদের পরিকল্পনা আগে থেকেই এমনভাবে তৈরি করে রেখেছিলেন এবং মামলার সাক্ষ্যপ্রমাণ এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছিলেন যাতে তদন্তের সময় সমস্ত বিষয়টাই ধোঁয়াটে বলে প্রতিপন্ন হয়। উপরন্তু তাঁরা বিভিন্নদিকে এমন-ভাবে তাঁদের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে তদন্ত শুরু হবার আগেই বেচারা নরিম্যানের মামলা ভণ্ডুল হয়ে যায়। যে-কোনো ভাবেই হোক, পার্শী বলেই যে মিঃ নরিম্যানের দাবি উপেক্ষিত হয়েছিলো, এটা প্রমাণ করা খুবই কঠিন ব্যাপার ছিলো। অতএব শেষ পর্যন্ত এটাই সাব্যস্ত হলো, সর্দার প্যাটেলের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কোনো প্রমাণ নেই। বেচারা নরিম্যান এই ব্যাপারে প্রচণ্ডভাবে মানসিক আঘাত পান। তাঁর রাজনৈতিক জীবনেরও এখানেই ইতি হয়ে যায়।

মিঃ নরিম্যানের প্রতি যেরকম ব্যবহার করা হয়েছিলো সে কথা বলতে গিয়ে আজ আমার মিঃ সি. আর. দাশের কথা মনে পড়ছে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি যেরকম বিস্ময়কর এবং শক্তিশালী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সে কথা কোনোদিনই ভোলবার নয়। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে তিনি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। প্রতিটি বিষয়েই তাঁর ছিলো প্রখর দূরদৃষ্টি ও কল্পনার প্রসারতা। উপরন্তু তাঁর মনটা ছিলো সবদিক থেকেই বাস্তবধর্মী। এই বাস্তবধর্মী মানসিকতার জন্যই প্রতিটি বিষয় তিনি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করতেন। যে বিষয়কে তিনি ন্যায় ও সত্য বলে মনে করতেন তার জন্য তিনি অকুতোভয়ে নিজের মত প্রকাশ করতেন। ১৯২০

সনে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজী যখন তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের পরিকল্পনা দেশবাসীর সামনে উপস্থিত করেন তখন মিঃ দাশ তাঁর বিরোধিতা করেন। এর এক বছর বাদে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনের পরে যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় তখন তিনি সেই আন্দোলনে যোগ দেন। কলকাতা হাইকোর্টে মিঃ দাশ ছিলেন প্রথম সারির ব্যবহারজীবী। বিলাসিতার জন্যও তাঁর নাম তখন সর্বত্র পরিচিত ছিলো। কিন্তু সেই ভোগবিলাস এবং বিরাট আয়ের আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করে তিনি দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দামী পোশাক ছেড়ে খদ্দরের মোটা কাপড়-জামা পরে তিনি জনগণের পাশে এসে দাঁড়ান। তাঁর সেই অনন্যসাধারণ ত্যাগের ফলে আমি বিশেষভাবে তাঁর অনুরক্ত হয়ে পড়ি।

আগেই বলেছি, মিঃ দাশের মনটা ছিলো বাস্তবানুগ এবং নমনীয়। রাজনীতি-সম্পর্কিত যে-কোনো প্রশ্ন তিনি তার সম্ভাব্য ফলাফল এবং প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে বিচার করতেন। তিনি বলতেন, আমাদের যদি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয় তাহলে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে স্তরে স্তরে অগ্রগতির জন্য। স্বাধীনতা কখনো হঠাৎ এসে উপস্থিত হয় না; আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এগোতে থাকলে বিলম্ব অবশ্যম্ভাবী। তিনি আরো বলতেন, আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম ধাপ হবে প্রাদেশিক স্তরে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অর্জন করা। সামান্যতম রাজনৈতিক অধিকারও যদি আমরা পাই, তাহলেও তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে, কারণ সামান্য রাজনৈতিক ক্ষমতাই পরবর্তীকালে বৃহত্তর ক্ষমতা অর্জনের পথ পরিষ্কার করে দেবে।

মিঃ দাশের এই রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি যে কত প্রখর ছিলো তা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। তিনি তখন যে কথা বলে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৩৫ সনে ভারত শাসন আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায়। এই আইন বিধিবদ্ধ হয় তাঁর মৃত্যুর দশ বছর পরে।

ইংলণ্ডের যুবরাজকে বয়কট

১৯২১ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডের তৎকালীন যুবরাজ (Prince of Wales) ভারত ভ্রমণে আসেন। তিনি এসেছিলেন মন্টেগু-চেমসফোর্ড পরিকল্পনাকে রূপদান করবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু কংগ্রেস তাঁকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয়। যুবরাজকে

স্বাগত জানাবার যাবতীয় পরিকল্পনাও কংগ্রেস বয়কট করবে বলে স্থির করে। কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের ফলে ভারত সরকার রীতিমতো বিব্রত হয়ে পড়ে। ভারতের ভাইসরয় ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, যুবরাজ ভারতে এলে ভারতের জনসাধারণ তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করবে। কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের ফলে তিনি তাই বিশেষভাবে বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি তখন কংগ্রেসের বয়কট ব্যবস্থাকে বানচাল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন কিন্তু তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টাই বিফল হয়ে যায়। যুবরাজ যেখানেই যান, সেখানেই তিনি জনগণের বিরূপ মনোভাব দেখতে পান। অবশেষে তিনি আসেন কলকাতায়। সে সময় কলকাতাই ছিলো ভারতের সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ শহর। রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হলেও বড়দিনের সময় ভাইসরয় এখানেই অবস্থান করতেন। সরকারী কর্তৃপক্ষ স্থির করেন, যুবরাজ কলকাতায় এসে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল উদ্বোধন করবেন। অনুষ্ঠানের এক বিরাট প্রস্তুতিও নেওয়া হয় এই উদ্দেশে। আসলে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে সরকারী কর্তৃপক্ষ চেষ্টার কোনো ত্রুটিই করেননি।

আমরা সবাই তখন আলিপুর সেনট্রাল জেলে বন্দীজীবন যাপন করছি। আমাদের অনুপস্থিতিতে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কংগ্রেস এবং সরকারের মধ্যে একটা সমঝোতার জন্য চেষ্টা করছিলেন। এই ব্যাপারে ভাইসরয়ের সঙ্গেও তিনি আলোচনা করেন। ভাইসরয়ের কথা শুনে তাঁর মনে হয়, আমরা যদি কলকাতায় যুবরাজকে বয়কট না করি তাহলে সরকার কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট করে নিতে প্রস্তুত আছে। তিনি তখন জেলখানায় এসে মিঃ দাশ এবং আমার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। ভাইসরয়ের বক্তব্যও তিনি আমাদের কাছে প্রকাশ করেন। ভাইসরয় তাঁকে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তা হলো, ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য একটা গোলটেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা করা হবে। মালব্যজীর মুখ থেকে এই কথা শোনবার পর আমরা তাঁকে বলি, এ ব্যাপারে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়। এর জন্য আমাদের নিজেদের মধ্যে আগে আলোচনা করা দরকার। এই কথা বলে আমরা তাঁকে পরের দিন আবার আমাদের কাছে আসতে বলি। মিঃ দাশ এবং আমি এই সিদ্ধান্তে আসি যে যুবরাজকে বয়কট করার ফলেই সরকার এখন মিটমাটের কথা বলতে বাধ্য হচ্ছে। আমরা তাই গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবো বলেই স্থির করি। ভালো করেই জানতাম, প্রস্তাবিত বৈঠক হলেও আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাবো না। কিন্তু এটাও বুঝে

নিয়েছিলাম, এতে আমাদের আন্দোলন অনেকখানি এগিয়ে যাবে।

সে সময় একমাত্র গান্ধীজী ছাড়া কংগ্রেসের সব নেতাই জেলে আবদ্ধ ছিলেন। আমরা তখন স্থির করি, ভাইসরয়ের প্রস্তাব আমরা মেনে নেবো তবে এ প্রস্তাব মেনে নেবার প্রথম শর্ত, গোলটেবিল বৈঠকের আগেই কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দিতে হবে।

পরদিন পণ্ডিত মালব্য আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলে আমরা তাঁকে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিই। তাঁকে আরো বলি, তিনি যেন গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা তাঁকে জানিয়ে দেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর অভিমতটা জেনে নেন। পণ্ডিত মালব্য তখন ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করে আমাদের বক্তব্য তাঁকে জানান এবং দুদিন পরে আবার আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি আমাদের বলেন, আলোচনায় যেসব কংগ্রেস নেতা যোগদান করবেন তাঁদের সবাইকেই ভাইসরয় মুক্তি দেবেন। অর্থাৎ আলী ভ্রাতৃদ্বয় এবং আরো অনেক নেতাকে মুক্তি দেওয়া হবে বলে স্থির হয়। আমরা তখন আমাদের সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করে একটি বিবৃতি লিখে সেটিকে মালব্যজীর হাতে দিয়ে বলি, তিনি যেন আমাদের ওই লেখা বিবৃতিটি গান্ধীজীকে দেখান।

আমাদের কথামতো মালব্যজী গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে আমাদের লেখা বিবৃতিটি তাঁকে দেখতে দেন। গান্ধীজী কিন্তু আমাদের প্রস্তাব মেনে নেন না। তিনি বলেন, সব কংগ্রেস নেতাকে, বিশেষ করে আলী ভ্রাতৃদ্বয়কে সর্বাগ্রে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে হবে। তিনি আরো বলেন, নেতারা মুক্তি পাবার পরে আমরা গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে বিবেচনা করতে পারি। গান্ধীজীর এই বক্তব্য শুনে মিঃ দাশ এবং আমি মনে করি, তাঁর দাবিটা সঠিক নয়; সরকার যখন গোলটেবিল বৈঠকের আগেই নেতাদের মুক্তি দিতে সম্মত হয়েছে তখন এই ধরনের শর্ত আরোপ করার কোনো মানে হয় না। আমাদের অভিমত জেনে নেবার পর মালব্যজী আবার গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু এবারেও গান্ধীজী আমাদের প্রস্তাব মেনে নিতে সম্মত হন না। এর ফলে ভাইসরয় এ ব্যাপারে আর কোনোরকম উচ্চবাচ্য করেন না। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো যুবরাজের কলকাতা সফর বয়কটকে পরিহার করা, কিন্তু গান্ধীজীর টালবাহনার ফলে এ ব্যাপারে কোনোরকম মিটমাট না হওয়ায় বয়কট ব্যবস্থা সম্বন্ধে কংগ্রেস কোনোরকম সিদ্ধান্তই নিতে পারে না। ফলে বয়কট পুরোপুরিভাবেই সাফল্যমণ্ডিত হয়। এইভাবেই আমরা একটা সুবর্ণ

সুযোগ হারাই। মিঃ দাশ তখন রীতিমতো হতাশ হয়ে গান্ধীজীকেই এর জন্য দায়ী করেন।

এদিকে গান্ধীজী ভাইসরয়ের দিক থেকে আর কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে নিজে থেকেই আবার এই বিষয়টা উত্থাপন করবার জন্য সচেষ্ট হলেন। তিনি মিঃ শঙ্করণ নায়ারকে সভাপতি করে বোম্বাইতে একটি সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন। উক্ত সম্মেলনে গান্ধীজী নিজেই একটি গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাঁর সেই প্রস্তাবের সঙ্গে মালব্যজীর প্রস্তাবের বিশেষ কোনো প্রভেদ ছিলো না। কিন্তু ইতিমধ্যে যুবরাজ ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ায় সরকারের তরফ থেকে এ বিষয়ে আর কোনো আগ্রহ দেখা গেলো না। ভাইসরয় তাই গান্ধীজীর প্রস্তাবকে আমলই দিলেন না। এই ব্যাপারে মিঃ দাশ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে মন্তব্য করেন, গান্ধীজী একটা বিরাট ভুল করেছেন; তাঁর এই সিদ্ধান্তকে আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না।

এরপর চৌরি চৌরায় সংঘটিত একটি ঘটনার জন্য গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। তাঁর এই কাজের জন্য সারা দেশজুড়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। দেশবাসীর মনোবলও এর ফলে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। সরকার এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। তারা গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে আদালতে বিচারের জন্য নিয়ে আসে। আদালতের বিচারে তিনি ছ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। গান্ধীজীর কারাদণ্ডের পর অসহযোগ আন্দোলন একেবারেই স্তব্ধ হয়ে যায়।

মিঃ দাশ তখন প্রায় প্রতিদিনই আমার সঙ্গে তৎকালীন পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। আলোচনার সময় তিনি একদিন বলেন, আন্দোলন বন্ধ করে দিয়ে গান্ধীজী একটা বিরাট ভুল করেছেন। তাঁর এই কাজের ফলে জনসাধারণের মনোবল এমনভাবে ভেঙে পড়েছে, পুনরায় তাদের আন্দোলনের সামিল করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। এই ক্ষত নিরাময় হতে অনেক বছর লাগবে। মিঃ দাশ আরো বলেন, গান্ধীজীর প্রত্যক্ষ সংগ্রাম পুরোপুরি বানচাল হয়ে গেছে।

এরপর মিঃ দাশ জনসাধারণের মনোবলকে কিভাবে পুনরুজ্জীবন করা যায় সেই সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করতে শুরু করেন। কবে পরিস্থিতির উন্নতি হবে তার জন্য তিনি চুপচাপ বসে থাকতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি একটি বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইছিলেন। তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করে রাজনৈতিক সংগ্রামকে

আইনসভার ভেতর নিয়ে যেতে হবে। গান্ধীজীর পরামর্শে কংগ্রেস ১৯২১ সনের নির্বাচন বয়কট করেছিলো। মিঃ দাশ বলেন, ১৯২৪-এর নির্বাচনে কংগ্রেসকে আইনসভা দখল করতে হবে এবং আইনসভার ভেতরেই আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামকে রূপ দিতে হবে। তিনি মনে করতেন, কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারাও তাঁর অভিমত মেনে নিয়ে তাঁর সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবেন। আমার কিন্তু মনে হয়, এ ব্যাপারে তিনি একটু বেশি আশা পোষণ করছেন। কিন্তু আমার মনের কথাটা তাঁর কাছে আমি প্রকাশ করিনি এবং তাঁর বিরোধিতাও করিনি। আমি শুধু তাঁকে এই কথাটাই বলেছিলাম, মুক্তি পাবার পর তিনি যেন তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন।

কংগ্রেসের মধ্যে মতবিরোধ

গয়া কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্বে মিঃ দাশ মুক্তিলাভ করেন। এবং মুক্তি-লাভের সঙ্গে সঙ্গেই অভ্যর্থনা সমিতি তাঁকে সভাপতির পদে বরণ করে। মিঃ দাশ মনে করেন, এই সুযোগে তিনি তাঁর পরিকল্পনাটা দেশবাসীর সামনে ব্যাখ্যা করে তাদের স্বমতে আনতে পারবেন। তিনি তখন হাকিম আজমল খাঁ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এবং বিঠলভাই প্যাটেলের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। ওঁরা তিনজনেই মিঃ দাশের পরিকল্পনা সমর্থন করবেন বলে কথা দেন। ওঁদের সমর্থন লাভ করে মিঃ দাশ আশা করেন, পূর্ণ অধিবেশনের সময় তিনি তাঁর প্রস্তাবটি পাস করিয়ে নিতে পারবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে দাঁড়ায়। গান্ধীজী তখন কারাগারে আবদ্ধ থাকায় তাঁর অনুগামী নেতারা তীব্রভাবে তাঁর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। যে সব নেতা তাঁর বিরোধিতা করেন তাঁদের মধ্যে রাজাগোপালাচারির নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেসের একটি বড় অংশ মিঃ দাশের বিরোধিতা করেন। তাঁরা বলেন, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম পরিহার করার অর্থ হবে গান্ধীজীর নেতৃত্ব অস্বীকার করা।

শ্রীরাজাগোপালাচারি এবং তাঁর অনুগামীদের এই ব্যাখ্যাকে আমি সঠিক বলে মেনে নিতে পারিনি। আমি মনে করি, মিঃ দাশ সরকারের সঙ্গে কোনোরকম মিটমাট করতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন, রাজনৈতিক সংগ্রামকে ভিন্ন পথে চালিত করতে। কিন্তু আমি তখন জেলে আবদ্ধ থাকায় এ ব্যাপারে কিছু বলবার সুযোগ আমার ছিলো না।

মিঃ দাশ তাঁর প্রস্তাবের সমর্থনে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপিত করলেও তিনি কংগ্রেসের সর্বস্তরের কর্মীদের স্বমতে আনতে পারেননি। শ্রীরাজা-গোপালাচারি, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং আরো কয়েকজন নেতার বিরোধিতার ফলে তাঁর প্রস্তাবটি গৃহীত হয় না। এর ফলে কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। মিঃ দাশ তখন সভাপতির পদে ইস্তফা দিয়ে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, হাকিম আজমল খাঁ এবং বিঠলভাই প্যাটেলও কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে মিঃ দাশের সঙ্গে যোগ দেন। এরপর কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতি উপরোক্ত দুই দলের বাদানুবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই দল দুটিকে বলা হয় 'নো-চেঞ্জার' (রক্ষণশীল) এবং 'প্রো-চেঞ্জার' (সংস্কারবাদী)।

উপরোক্ত ঘটনার ছ মাস পরে আমি জেল থেকে মুক্তিলাভ করি। বাইরে বেরিয়ে এসেই আমি দেখতে পাই, কংগ্রেস এক বিরাট বাধার সম্মুখীন হয়েছে। ইংরেজের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামের পথ পরিহার করে কংগ্রেস কর্মীরা তাঁদের মতবিরোধের ব্যাপারটাকেই প্রাধান্য দিয়ে চলেছেন। মিঃ দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এবং হাকিম আজমল খাঁ সংস্কারবাদী শিবিরের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং তাঁদের বিরোধিতা করছেন রাজাজী, সর্দার প্যাটেল এবং ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ। আমি বেরিয়ে এলে উভয় দলই আমাকে তাদের স্বমতে আনতে সচেষ্ট হয়। আমি কিন্তু কোনো দলেই যোগ দিই না। আমি মনে করি, কংগ্রেসের এই আভ্যন্তরীণ বিরোধ গোটা প্রতিষ্ঠানকেই দুর্বল করে ফেলছে। আমার আরো মনে হয়, এই বিরোধের অবসান না হলে কংগ্রেসের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। আমি তাই উভয় দলের বাইরে থেকে আমাদের সংগ্রামকে পুনরায় রাজনৈতিক খাতে নিয়ে আসার জন্য সচেষ্ট হই। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে এ ব্যাপারে আমি পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করেছিলাম। এর কিছুদিন পরেই দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে উভয় দলই আমাকে সভাপতির পদে নির্বাচিত করে।

দিল্লী কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে আমি বলি, আমাদের আসল উদ্দেশ্য হলো দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা। ১৯১৯ সন থেকে আমরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পন্থা অনুসরণ করে এসেছি যার ফলে বেশ কিছুটা সাফল্যও আমরা অর্জন করেছি, কিন্তু এখন যদি আমাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন, রাজনৈতিক সংগ্রামকে আইনসভার ভেতরে নিয়ে যাওয়া দরকার, সেক্ষেত্রে আমাদের আগের পথ আঁকড়ে ধরে বসে থাকার কোনো অর্থ হয় না। আমাদের আসল উদ্দেশ্যের মধ্যে যখন কোনোরকম বিরোধিতা

নেই, এ অবস্থায় প্রত্যেক দলই যাতে তাদের নিজস্ব পন্থায় কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। আমার মনে হয়, বর্তমান অবস্থায় এটিই হবে সর্বোত্তম পন্থা।

আমার বক্তব্যের অনুকূলেই কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্থির হয়, সংস্কারবাদী দল এবং রক্ষণশীল দল নিজ নিজ পন্থা অনুসরণ করে চলবে। এরপর ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্রীরাজাগোপালাচারি এবং তাঁদের সহকর্মীরা গঠনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অন্যদিকে মিঃ দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু তখন স্বরাজ দল গঠন করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন বলে স্থির করেন। তাঁদের পরিকল্পনার ফলে দেশবাসীর মনে পুনরায় উৎসাহের সঞ্চার হয়, ফলে সমগ্র দেশ তাঁদের পেছনে এসে দাঁড়ায়। নির্বাচন পর্ব শেষ হলে দেখা যায়, স্বরাজ দল কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে বিরাটভাবে সাফল্য অর্জন করেছে।

রক্ষণশীল দলের একটি প্রধান আপত্তি ছিলো, কাউন্সিলে প্রবেশ করলে গান্ধীজীর নেতৃত্বকে দুর্বল করা হবে; কিন্তু ঘটনাচক্রের ফলে প্রমাণিত হয়, তাদের সেই অভিমত সঠিক ছিলো না। কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজ দল এক প্রস্তাব উত্থাপন করে, গান্ধীজীকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। এরপর দেখা যায়, প্রস্তাব পাস হবার আগেই সরকার গান্ধীজীকে মুক্তি দিয়েছে।

আগেই বলেছি, স্বরাজ দল কেন্দ্রীয় আইনসভায় এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলোতে বিপুল সংখ্যক আসন অধিকার করে। এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলোতেও এই দল প্রার্থী দিয়েছিলো এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্বরাজ দলের প্রার্থীরা জয়লাভ করেছিলো। এটা সম্ভব হয়েছিলো মিঃ দাশের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার জন্য। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে। এর মানে হলো, মুসলিম ভোটারদের ভোটেই মুসলিম প্রার্থীরা নির্বাচিত হবেন। মুসলিম এবং আরো কয়েকটি সাম্প্রদায়িক দল তাই নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য মুসলমানদের মনে নানাভাবে ভীতির সঞ্চার করতে থাকে। এরা মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করে কিছুটা সাফল্যও লাভ করে। তাদের প্রচারের ফলে তাদের মনোনীত কিছুসংখ্যক প্রার্থী নির্বাচনে জয়লাভ করে। কিন্তু বাংলায় এরা মোটেই পাত্তা পায় না। মিঃ দাশ বাংলার মুসলমানদের মন জয় করতে সক্ষম হন এবং বাংলার মুসলমানরা তাঁকেই একমাত্র নেতা বলে মেনে নেন। তিনি সেদিন যেভাবে বাংলার সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করেছিলেন, আজও তাঁর অনুসৃত সেই পথকেই সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের

একমাত্র পথ বলে আমি মনে করি।

বাংলায় মুসলমানরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু নানা কারণে তাঁরা শিক্ষা ও রাজনীতি ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ ছিলেন। জনসংখ্যার শতকরা পঞ্চান্ন ভাগেরও বেশি হওয়া সত্ত্বেও সরকারী চাকরিতে শতকরা ত্রিশভাগের বেশি মুসলমান কর্মচারী ছিলেন না। মিঃ দাশ তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির ফলে বুঝতে পেরেছিলেন, এটা একটা অর্থনৈতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি আরো বুঝতে পেরেছিলেন, মুসলমানদের যদি আর্থনীতিক ব্যাপারে সাহায্য না করা হয় তাহলে তাঁরা খোলা মন নিয়ে কংগ্রেসে যোগদান করবেন না। তিনি তাই ঘোষণা করেন, কংগ্রেস যদি বাংলায় শাসনক্ষমতা লাভ করে তাহলে সরকারী চাকরির শতকরা ষাটটি পদে মুসলমানদের নিয়োগ করা হবে এবং যতোদিন পর্যন্ত জনসংখ্যার অনুপাতে সরকারী চাকরিতে তাঁরা না আসেন, ততোদিন এই ব্যবস্থাই চলতে থাকবে। মিঃ দাশের সেই ঘোষণা শুধু যে বাংলার মুসলমানদেরই অনুপ্রাণিত করেছিলো তাই নয়, সারা ভারতের মুসলমানসমাজ তাঁর সেই ঘোষণাবাণীকে স্বাগত জানিয়েছিলো। মিঃ দাশ এখানেই ক্ষান্ত হননি; তিনি স্থির করেন, কলকাতা কর্পোরেশনে নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা আশীভাগ চাকরি মুসলমানদের দেওয়া হবে। তিনি বলেন, মুসলমানরা যতোদিন জনজীবনে এবং চাকরির ক্ষেত্রে যথোপযুক্তভাবে অংশগ্রহণ করতে না পারবেন ততোদিন বাংলায় প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না। মুসলমানরা যখন সর্বক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হবেন, তারপর আর তাঁদের জন্য বিশেষ রক্ষাকবচের প্রয়োজন থাকবে না। তাঁরা তখন অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে একই নিয়মে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন।

মিঃ দাশের এই সাহসিক ঘোষণার ফলে বাংলার কংগ্রেসে এক বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কংগ্রেসের অনেক নেতা প্রবলভাবে তাঁর বিরোধিতা করতে শুরু করেন। তাঁরা মিঃ দাশের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে জোরালো প্রচার চালাতে থাকেন। মিঃ দাশকে তাঁরা সুবিধাবাদী এবং মুসলিম তোষণকারী বলে অভিহিত করেন। কিন্তু শত বিরোধিতাও মিঃ দাশকে টলাতে পারে না। পর্বতের মতো অটল হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি সমস্তরকম বাধাবিঘ্নের মোকাবিলা করতে থাকেন। তিনি তখন সারা বাংলা পরিভ্রমণ করে জনগণের সামনে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন। মিঃ দাশের বক্তব্য বাংলার এবং বাংলার বাইরের মুসলমানদের মনে এক বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করে। আমি বলতে চাই, তিনি যদি অকালে কালগ্রাসে পতিত না হতেন তাহলে সারা দেশে তিনি

এক নতুন প্রাণবন্যার সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কয়েকজন সহকর্মী তাঁর সেই যুগান্তকারী ঘোষণাকে নস্যাৎ করে দেন। এর ফলে বাংলার মুসলমানরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যান এবং এইভাবেই দেশবিভাগের প্রথম বীজ রোপিত হয়।

এবার আমি আর একবার মিঃ নরিম্যানের প্রসঙ্গে ফিরে আসছি। আমি সুস্পষ্টভাবে বলছি, বোম্বাইয়ের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি মিঃ নরিম্যানের নেতৃত্ব মেনে না নিয়ে ঠিক কাজ করেনি। ওয়ার্কিং কমিটিও এই অন্যায়ের প্রতিবিধান না করে ভুল করেছিলো। তবে শুধু এই ব্যাপারটা ছাড়া আর সব ক্ষেত্রেই কংগ্রেস তার কর্মসূচীকে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছিলো। মন্ত্রিসভা গঠনের পরে সংখ্যালঘুদের প্রতি ন্যায়বিচারের জন্যও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিলো।

শাসনক্ষমতা হাতে নেবার পর কংগ্রেস এক বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এটা ছিলো একটা গুরুতর মামলার মতো ব্যাপার। জনসাধারণ তখন সব সময় কংগ্রেসের কাজকর্ম লক্ষ্য করে চলেছিলো। কংগ্রেস তার জাতীয় চরিত্রকে (National character) বজায় রাখতে পারে কি না, এর দিকে জনসাধারণ বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখছিলো। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের প্রধান অভিযোগ ছিলো এই, কংগ্রেস শুধু নামেই 'জাতীয়', আসলে ওটা হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান। লীগের প্রধান প্রচারও ছিলো এটাই। কিন্তু এই প্রচারে বিশেষ কিছু সুবিধে করতে না পেরে মুসলিম লীগ কংগ্রেসকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য নতুন এক প্রচার শুরু করে। তারা তখন বলতে শুরু করে, কংগ্রেসী মন্ত্রীরা সংখ্যালঘুদের ওপরে অত্যাচার আর অবিচার চালাচ্ছে। লীগ এই ব্যাপারে একটি কমিটিও নিয়োগ করে। কমিটি একটি রিপোর্টও দাখিল করে। রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়, কংগ্রেস মুসলমানদের এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি নানাভাবে অবিচার করে চলেছে। কিন্তু আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ওইসব অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন ছিলো। ভারতের ভাইসরয় এবং প্রাদেশিক গভর্নররাও একই অভিমত পোষণ করতেন। ফলে মুসলিম লীগের ওই রিপোর্ট সচেতন জনসাধারণের মনে আদৌ কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারেনি।

কংগ্রেস যখন শাসনক্ষমতা গ্রহণ করে তখন মন্ত্রীদের কাজকর্ম লক্ষ্য করবার জন্য এবং কংগ্রেসের পলিসি সম্বন্ধে মন্ত্রীদের ওয়াকিবহাল রাখবার জন্য একটি পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করা হয়। উক্ত বোর্ডে সদস্য হিসেবে

যাঁদের নেওয়া হয় তাঁরা হলেন সর্দার প্যাটেল, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং আমি। পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্য হিসেবে আমি বাংলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং সীমান্ত প্রদেশের পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার তদারক করতে থাকি। এই সময় সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়ই আমার সামনে উপস্থাপিত হতে থাকে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়েই বলছি, মিঃ জিন্না এবং মুসলিম লীগ যেসব অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন সেগুলো ছিলো একেবারেই মিথ্যা। ওইসব অভিযোগের মধ্যে যদি সামান্যতম সত্যতাও থাকতো তাহলে আমি তা নিশ্চয়ই দেখতাম এবং সেগুলোর যথোপযুক্ত প্রতিবিধানও করতাম। সত্যিই যদি ওই ধরনের কোনো অত্যাচার বা অবিচার হতো তাহলে আমি আমার কাজে ইস্তফা দিতেও প্রস্তুত ছিলাম।

প্রায় দু বছর কংগ্রেসী মন্ত্রীরা দেশ শাসন করেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করেন। এগুলোর মধ্যে জমিদারি এবং ভূ-সম্পত্তি বিরোধ আইন, কৃষিঋণ মকুব, বয়স্কদের শিক্ষা এবং শিশুশিক্ষার ব্যাপক পরিকল্পনা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ এবং কৃষিঋণ মকুবের ব্যাপারটা খুব সহজে করা যায়নি। কায়েমী স্বার্থবাদীরা এই আইন দুটির তীব্র বিরোধিতা করে। কায়েমী স্বার্থবাদীরা তখন প্রতি পদক্ষেপে কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই করে চলেছিলো। বিহারে ভূমিসংস্কারের ব্যাপারেও প্রবলভাবে এরা বিরোধিতা করে। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়, আমাকে ওই ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হয়। আমি জমিদারদের সঙ্গে আলোচনা করে অবশেষে একটা সমাধানের পথ বের করতে সক্ষম হই। আমার সেই সমাধানে জমিদার এবং কৃষক উভয় শ্রেণীই খুশী হয়।

আমার পক্ষে ওইসব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়েছিলো, কারণ আমি কংগ্রেসের মধ্যে কোনো দল বা উপদলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিনি। সংস্কারবাদী এবং রক্ষণশীল দলের মতবিরোধের সমস্যা আমি কিভাবে সমাধান করেছিলাম সে কথা আগেই বলা হয়েছে। ১৯২০ সনের সেই মতবিরোধের অবসান হলেও ত্রিশের দশকে কংগ্রেস আবার দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়।

দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী

এবারে কংগ্রেসের মধ্যে দুরকম মতবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। একটিকে বলা হয় দক্ষিণপন্থী মতবাদ এবং অপরটিকে বলা হয় বামপন্থী মতবাদ। দক্ষিণপন্থীরা ছিলো কায়েমী স্বার্থের পক্ষে আর বামপন্থীরা ছিলো বৈপ্লবিক সংস্কারের পক্ষে। দক্ষিণপন্থীদের মানসিক ভীতিকে আমি যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিলেও বামপন্থীদের প্রতি আমার বেশি সহানুভূতি ছিলো। সংস্কারের ব্যাপারে তাঁরা যে মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন তাকেই আমি সঠিক বলে মনে করি। যাই হোক, আমি তখন কংগ্রেসের এই বিবদবান গোষ্ঠীদ্বয়ের মধ্যে একটা সমঝোতা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হই এবং দুই দলের সঙ্গে আলোচনা করে একটা সমাধানের পথ বের করতে সক্ষম হই। সমাধানটি হলো, কংগ্রেস তার পরিকল্পনাগুলোকে যথোপযুক্তভাবে কার্যকর করবে এবং সে ব্যাপারে কোনোরকম বিরোধিতা করা হবে না।

কিন্তু ১৯৩৯ সনে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অবনতির জন্য কংগ্রেস তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলোর রূপদানের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।

ইয়োরোপে যুদ্ধানল

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যেসব ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকেই বুঝতে পারা গেছে, ইয়োরোপে যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠেছে। এই সময় ইয়োরোপে আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে, ফলে স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে, ইয়োরোপ দ্রুতগতিতে যুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলেছে। অস্ট্রিয়াকে জার্মান রাইখের অন্তর্ভুক্ত করবার পর জার্মান কর্তৃপক্ষ সুদেতেন-ল্যাণ্ডের ওপরেও দাবি তুলেছে।

যুদ্ধ যে প্রত্যাসন্ন সে কথাটা আরো স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে মিঃ চেম্বারলেন কর্তৃক নাটকীয়ভাবে মিউনিক গমনের ব্যাপারটা লক্ষ্য করে। ওখানে জার্মানী এবং ব্রিটেনের মধ্যে একটা জোড়াতালি দেওয়া সমঝোতা হয় এবং চেকোস্লোভাকিয়ার একটা অংশ বিনাযুদ্ধেই জার্মানীর অধিকারে আসে। এর ফলে যুদ্ধকে ঠেকানো গেছে বলে সাময়িকভাবে একটা ধারণার সৃষ্টি হলেও পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে বুঝতে পারা যায় মিউনিক চুক্তি

শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে তো পারেইনি, বরং যুদ্ধকে আরো নিকটবর্তী করেছে। গ্রেটব্রিটেন তখন বাধ্য হয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

ইয়োরোপীয় পরিস্থিতির এইরকম অবনতি দেখে কংগ্রেস মোটেই খুশী হতে পারেনি। ১৯৩৯ সনে ত্রিপুরীতে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে কংগ্রেস তাই নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাস করে:

> কংগ্রেস এতদ্দ্বারা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বৈদেশিক নীতিসঞ্জাত মিউনিক চুক্তি, ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তি এবং স্পেনের বিদ্রোহীদের স্বীকৃতিদানকে ধিক্কার জানাচ্ছে। তাদের এই নীতি গণতন্ত্রের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা, বার বার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, যৌথভাবে নিরাপত্তামূলক কাজকে নস্যাৎ করা এবং গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিসমূহের সঙ্গে আঁতাত করে গণতন্ত্রকে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করা ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের এই ধরনের নীতিহীন নীতির ফলে সমগ্র পৃথিবী আজ এমন এক আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে যে পশুশক্তির বিজয়াভিযান বিনা বাধায় অগ্রসর হয়ে জাতিসমূহের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে এবং শক্তির নামে এক ভয়াবহ যুদ্ধের জন্য বিরাটভাবে প্রস্তুতি চালাচ্ছে। মধ্য এবং দক্ষিণপূর্ব ইয়োরোপের আন্তর্জাতিক সদিচ্ছার এমনই অধঃপতন ঘটেছে, বিশ্ববাসী আজ সভয়ে লক্ষ্য করছে, নাৎসী সরকার ইহুদী জাতির বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে অমানুষিক নির্যাতন চালাচ্ছে এবং বিদ্রোহীরা বিভিন্ন শহরের অসামরিক জনসাধারণ ও সহায়সম্বলহীন বাস্তুত্যাগীদের ওপরে নির্মমভাবে আকাশ থেকে বোমা-বর্ষণ করে চলেছে।
>
> কংগ্রেস তাই ইংরেজদের এই বৈদেশিক নীতির আওতা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছে, কারণ ইংরেজদের এই নীতি ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলোকেই মদত দিচ্ছে এবং গণতান্ত্রিক দেশসমূহকে ধ্বংসের ব্যাপারে তাদের সাহায্য করছে। সাম্রাজ্যবাদের মতো ফ্যাসিবাদেরও কংগ্রেস বিরোধিতা করে। কংগ্রেস আরো মনে করে, বিশ্বের শক্তি ও সমৃদ্ধির জন্য এই দুটি ইজ্‌ম্‌-এরই শেষ হওয়া দরকার। কংগ্রেসের মতে ভারতের এখন স্বাধীন জাতি হিসেবে তার নিজস্ব বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এবং এই কারণে সাম্রাজ্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদ এই দুই থেকেই তাকে দূরে থাকতে হবে এবং শান্তি ও স্বাধীনতার পথে পদক্ষেপ করতে হবে।

আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে ঝটিকা বিস্তৃত হবার ফলে গান্ধীজীর মনের ওপরেও মেঘের কালো ছায়া ঘনীভূত হয়। বস্তুতপক্ষে এই সময়টায় তিনি প্রচণ্ডভাবে মানসিক অস্থিরতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর এই অস্থিরতা আরো বেড়ে যায় যখন ইয়োরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি তাঁর কাছে যুদ্ধ থামাবার উদ্দেশ্যে কিছু একটা করার জন্য একের পর এক অনুরোধ এবং আবেদন করতে থাকে। সারা পৃথিবীর শান্তিবাদী মানুষ গান্ধীজীকে তাঁদের স্বাভাবিক নেতা বলে মনে করতেন। এই কারণেই গান্ধীজীর দিকে তাঁরা তাকিয়েছিলেন।

যুদ্ধপ্রচেষ্টায় অসহযোগিতা

গান্ধীজী এই প্রশ্নটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিকে উপদেশ দেন, বর্তমান আন্তর্জাতিক অনিশ্চয়তার ফলে ভারতকে এমন অবস্থায়ই তার কর্মপন্থা ঘোষণা করতে হবে। গান্ধীজী বলেন, ভারত কখনো যুদ্ধে অংশ নেবে না, অথবা যুদ্ধপ্রচেষ্টায় কোনোরকম সাহায্য করবে না। এমন কি, এতে যদি ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সুযোগ আসে, তবুও না।

এ ব্যাপারে গান্ধীজীর সঙ্গে আমার মতভেদ ছিলো। আমি মনে করতাম, ইয়োরোপ সুস্পষ্টভাবে দুটি বিপরীতমুখী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একটি শিবির নাৎসীবাদ এবং ফ্যাসিবাদের পক্ষে, অপরটি গণতন্ত্রের। ভারতবর্ষকে অবশ্যই গণতান্ত্রিক শিবিরের পক্ষ অবলম্বন করতে হবে। এর জন্য প্রথমেই দরকার স্বাধীনতা। কিন্তু ইংরেজ সরকার যদি ভারতকে স্বাধীনতা দিতে না চায় তাহলে ভারতীয়রা অপরের স্বাধীনতার জন্য কিভাবে যুদ্ধ করবে? নিজেরই যেখানে স্বাধীনতা নেই সেখানে অপরের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করার কোনো অর্থই হয় না। অতএব এ অবস্থায় ভারতের কর্তব্য হবে যুদ্ধের ব্যাপারে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করা।

অন্যান্য বারের মতো এবারেও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। কোনো কোনো সদস্য তাঁদের মতামত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতেই পারেননি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই ব্যাপারে সাধারণভাবে আমার সঙ্গে একমত হলেও কোনো কোনো সদস্য গান্ধীজীর অভিমতকেই আঁকড়ে ধরে রইলেন। তাঁদের বক্তব্য হলো, গান্ধীজীর অভিমতই সঠিক,

সুতরাং তাঁর পাশে দাঁড়ানোই হবে উচিত কাজ। তাঁরা হয়তো ভেবেছিলেন, গান্ধীজীকে অনুসরণ করলেই ঈপ্সিত ফললাভ করা যাবে। ওয়ার্কিং কমিটিতে এই ধরনের মতবিরোধের ফলে কমিটি কোনো সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে পারে না।

কংগ্রেস যখন এইভাবে দ্বিধাগ্রস্থ মনোভাব গ্রহণ করেছে ঠিক সেই সময়ই ইয়োরোপে যুদ্ধ ঘোষিত হয়। এবং যুদ্ধ ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষে এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হয়। যুক্তরাজ্য জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ১৯৩৯ সনের ৩রা সেপ্টেম্বর। সঙ্গে সঙ্গে কমনওয়েলথের সদস্যভুক্ত দেশ-গুলোকেও যুদ্ধ ঘোষণা করতে বলে। যুক্তরাজ্যের এই নির্দেশের অব্যবহিত পরেই বিভিন্ন ডোমিনিয়নের পার্লামেন্টের অধিবেশন বসে এবং তারা সবাই যুদ্ধ ঘোষণা করে। ভারতের ক্ষেত্রে কিন্তু ভাইসরয় নিজেই জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এবং এই কাজটি করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভার মতামত নেবার দরকারও তিনি বোধ করেন না। ভাইসরয়ের এই কাজের ফলে আর একবার নতুন করে প্রমাণিত হয়, ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষকে তাদের হাতের পুতুল বলে মনে করে। আরো প্রমাণিত হয়, ভারতবাসীর মতা-মতের কোনোরকম তোয়াক্কাই তারা করে না। এমন কি যুদ্ধের মতো একটা গুরুতর ব্যাপারেও তারা ভারতবাসীর মতামতকে আমল দিতে রাজী নয়।

ভারতবর্ষকে যখন এইভাবে স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে ফেলা হলো তখন গান্ধীজীর মানসিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। তিনি কিছুতেই ভারতবর্ষকে যুদ্ধরত দেশ হিসেবে মেনে নিতে পারছিলেন না। কিন্তু গান্ধীজী যাই ভাবুন না কেন, ভাইসরয় তাঁর মতামতের তোয়াক্কা না করেই ভারতবর্ষকে যুদ্ধের ভেতরে টেনে আনলেন।

কংগ্রেসের প্রস্তাব

এই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। প্রস্তাবটি গৃহীত হয় ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায়। ১৯৩৯ সনের ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অধিবেশন চলে। অধিবেশন শেষ হবার মুখে কংগ্রেস তার এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করে। প্রস্তাবে যুদ্ধ সম্পর্কে কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গির এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের ভূমিকার

কথা সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করে। পাঠকদের অবগতির জন্য প্রস্তাবটির পূর্ণ বয়ান নিচে দেওয়া হলো :

যুদ্ধ ঘোষিত হবার পরে ইয়োরোপে যে গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়টি ওয়ার্কিং কমিটি বিশেষ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেছে। এক মাস আগেও এ ব্যাপারে ওয়ার্কিং কমিটি তার বক্তব্য ঘোষণা করেছিলো। কমিটি তখন ভারতের ইংরেজ সরকার কর্তৃক ভারতবাসীর মতামতকে উপেক্ষা করায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলো। কমিটি তখন আইনসভার কংগ্রেসী সদস্যদের নির্দেশ দিয়েছিলো, তাঁরা যেন আইনসভার পরবর্তী অধিবেশনে অংশগ্রহণ না করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষকে যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করে। তারা অর্ডিন্যান্স জারি করে ভারত শাসন আইনকে সংশোধন করে এবং আরো এমনসব কার্যক্রম গ্রহণ করে যার ফলে ভারতীয়দের মনে গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয়, ভারত সরকারের এই ধরনের অবাঞ্ছিত নীতির ফলে প্রাদেশিক সরকারসমূহের ক্ষমতাও সীমিত করে। এবং এসবই করা হয় ভারতের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। ইংরেজ সরকারের এই ধরনের কার্যাবলী ওয়ার্কিং কমিটি কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

কংগ্রেস বহুবার নাৎসীবাদ এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তার বক্তব্য উপস্থাপিত করেছে। নাৎসী আর ফ্যাসিস্টরা জনসাধারণকে তাদের পদতলে দলিত করার এবং সর্ববিধ উপায়ে তাদের দমিত করে রাখবার উদ্দেশ্যে যেভাবে যুদ্ধকে প্রাধান্য দিয়েছে তার বিরুদ্ধেও কংগ্রেস তার মতামত ব্যক্ত করেছে এবং ওদের আগামী কার্যকলাপ ও জনগণের স্বাধীন সত্তাকে অবদমিত করে রাখার মনোবৃত্তিকে ধিক্কৃত করেছে। নাৎসীবাদ এবং ফ্যাসিবাদের মধ্যে কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবেরই চরম অভিব্যক্তির প্রকাশ দেখতে পেয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের জনসাধারণ বহু বৎসর যাবৎ সংগ্রাম করছে। ওয়ার্কিং কমিটি তাই পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে নাৎসী সরকারের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাচ্ছে এবং আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যারা দণ্ডায়মান হয়েছে তাদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করছে।

কংগ্রেস আজ পুনরায় তার বক্তব্য প্রকাশ করে বলছে, ভারতের নীতি, তা সে যুদ্ধই হোক বা শান্তিই হোক, সে নিজেই স্থির করবে ; বহিরাগত কোনো শক্তি এটা তার ওপরে চাপিয়ে দিতে পারবে না। ভারতের

সম্পদরাশিও সাম্রাজ্যবাদীদের সুবিধের জন্য ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। ভারতবাসীর ওপরে চাপিয়ে দেওয়া যে-কোনো সিদ্ধান্তকে এবং ভারতের সম্পদকে ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহার করার যে-কোনো প্রচেষ্টাকে ভারতের জনসাধারণ সর্বউপায়ে বাধা দেবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সবসময় মনে রাখতে হবে, জোরজবরদস্তি দ্বারা সহযোগিতা পাওয়া যায় না। কমিটি তাই সুস্পষ্টভাবে এ সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য রাখছে, এ ব্যাপারে বাইরের কোনো কর্তৃপক্ষের কোনো নির্দেশ ভারতের জনগণ কখনো মেনে নেবে না। সহযোগিতা সমানে সমানেই সম্ভব এবং তা পেতে হলে সংশ্লিষ্ট উভয়পক্ষকে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়ায় আসতে হবে এবং সেই বোঝাপড়া হবে কেবলমাত্র সৎকাজের ক্ষেত্রে। কিছুদিন আগেও ভারতের জনসাধারণ এ ব্যাপারে এক বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিলো এবং স্বাধীনতালাভের তথা ভারতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় অনেক দাবি ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছিলো। এখানে উল্লেখ-যোগ্য, ভারতবাসী চিরদিনই গণতন্ত্রের পক্ষে এবং এখনো তাদের সহানু-ভূতি গণতন্ত্রের পক্ষেই রয়েছে। অতএব ভারত কখনো এমন এক যুদ্ধের সরিক হতে পারে না, যে যুদ্ধের প্রবক্তারা গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার কথা বললেও ভারতের ক্ষেত্রে সে নীতিকে অস্বীকার করছেন। শুধু তাই নয়, ইতিপূর্বে যে সামান্যতম স্বাধীনতা ভারতবাসীকে দেওয়া হয়েছিলো সেটুকুও তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

কমিটি ভালোভাবেই জ্ঞাত আছে, ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের সরকার এই বলে ঘোষণা করেছেন, তাঁরা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য এবং আগ্রাসনকে বন্ধ করবার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু নিকট অতীতের ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, তাঁদের ঘোষিত নীতি-অনুসৃত কার্যক্রমের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে। ১৯১৪-১৮ সনের যুদ্ধের সময়ও ঘোষিত নীতি ছিলো গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা রক্ষা এবং ক্ষুদ্র জাতিসমূহকে স্বাধীনতা দান। কিন্তু যেসব সরকার উপরোক্ত ঘোষণাবাণী জারি করেছিলেন, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে, সেইসব সরকারই গোপনে গোপনে চুক্তি করে তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন-ব্যবস্থাকে কায়েম রাখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, অপর কোনো দেশের কোনো অঞ্চল অধিকার করবার অভিপ্রায় তাঁদের নেই; কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলে দেখা যায়, বিজয়ী শক্তিসমূহ তাঁদের উপনিবেশ-গুলোকে বহুলাংশে বর্ধিত করেছেন। বর্তমান যুদ্ধের দ্বারাই প্রমাণিত

হয়েছে, ভার্সাই সন্ধির কোনো মূল্যই দেওয়া হয়নি। উক্ত সন্ধিপত্র যাঁরা রচনা করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁরাই সন্ধির শর্তাবলী উপেক্ষা করে পরাজিত শক্তিসমূহের শক্তির নামে সাম্রাজ্যবাদী জোয়াল চাপিয়ে দিয়েছিলেন। আদর্শ সংস্থা হিসেবে বহুলভাবে ঘোষিত 'লীগ অব নেশনস'-এর আদর্শকেও তাঁরা কার্যকর করতে দেননি এবং শেষ পর্যন্ত উক্ত সংস্থাকে তাঁরাই গলা টিপে হত্যা করেছিলেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, কিভাবে তাঁরা তাঁদের ঘোষিত নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে তা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। মাঞ্চুরিয়ায় ইংরেজ সরকার আগ্রাসনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়; আবিসিনিয়াতেও তারা একই অসদুপায় অবলম্বন করে। এ ছাড়া চেকোস্লোভাকিয়ায় জার্মানদের অন্যায় কার্যকলাপ এবং স্পেনে বিদ্রোহীদের কার্যকলাপও তারা সমর্থন করে। এবং এইভাবে সমবায়মূলক প্রতিরক্ষার ঘোষিত নীতিকে তারা পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করে। শুধু ইংরেজ নয়, অন্যান্য শক্তিও একই পন্থা অবলম্বন করেছিলো।

এবারেও 'গণতন্ত্র বিপন্ন' বলে ধুয়া তুলে এইসব রাষ্ট্র গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার কথা বলছে। তাদের এই ঘোষণা যদি সত্যিই আন্তরিক হয় তাহলে তার প্রতি কমিটির পূর্ণ সমর্থন আছে। কমিটি বিশ্বাস করে, পশ্চিমের জনসাধারণ এই আদর্শ অনুসরণ করে সর্ববিধ ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু যারা এইভাবে ত্যাগ স্বীকার করেছে তাদের ইচ্ছাকে বার বার পদদলিত করা হয়েছে।

এই যুদ্ধ যদি সাম্রাজ্যবাদীদের শক্তি প্রদর্শনের শোভাযাত্রায় পরিণত হয় এবং ঔপনিবেশিক স্বার্থ এবং কায়েমী স্বার্থের স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখার জন্য হয় তাহলে এ ব্যাপারে ভারতের কিছু করণীয় নেই; কিন্তু যুদ্ধটা যদি গণতন্ত্র রক্ষা এবং গণতান্ত্রিক পথে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে হয় তাহলে ভারতের এতে অবশ্যই সমর্থন আছে। কমিটি বিশ্বাস করে, ভারতের গণতন্ত্রের সঙ্গে ইংরেজের তথা পৃথিবীর যে-কোনো দেশের গণতন্ত্রের কোনো বিরোধ নেই। ভারতের গণতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদের ঘোরতর বিরোধী; সুতরাং গ্রেটব্রিটেন যদি সত্যিই গণতন্ত্র রক্ষার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে থাকে তাকে নিজ অধিকারভুক্ত অঞ্চলসমূহে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটাতে হবে এবং ভারতে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার ভারতবাসীর হাতেই ছেড়ে দিতে হবে, যাতে তারা বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই একটি

কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেমব্লি গঠন করে তাদের নিজস্ব নীতি গ্রহণ করতে পারে। স্বাধীন এবং গণতান্ত্রিক ভারত তখন আনন্দের সঙ্গে অন্যান্য স্বাধীন জাতির পাশে দাঁড়িয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে। গণতন্ত্রের ভিত্তিতে নতুন পৃথিবী গঠনের যে সংকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছে সে কাজেও ভারত এগিয়ে আসবে, পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার এবং সম্পদের সঙ্গে নিজেদের জ্ঞান ও সম্পদকে যুক্ত করে মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণের জন্য সকলের সঙ্গে একযোগে কাজ করবে।

ইয়োরোপে যে দুর্যোগের ঝড় বইছে তা শুধু ইয়োরোপখণ্ডেই সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র মানবজাতিই আজ এই দুর্যোগের মধ্যে পড়েছে। সাধারণ ধরনের দুর্যোগ বা যুদ্ধ সহজে নিবার্য হলেও বর্তমান মহাদুর্যোগকে পৃথিবীর বর্তমান কাঠামোকে অক্ষত রেখে নিবারণ করা যাবে না। এই যুদ্ধের ফলে বিশ্বের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং আর্থনীতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন হবে। বিগত মহাযুদ্ধের পর থেকেই এর সূচনা হয়েছে এবং তখন থেকেই সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিরোধ ক্রমবর্ধমান অবস্থায় এগিয়ে এসে বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এবং যতোদিন পর্যন্ত নূতন কোনো ভারসাম্যের সৃষ্টি না হয় ততোদিন এ সমস্যার সমাধান হবে না। এই ভারসাম্য আসতে পারে ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের এবং এক দেশ কর্তৃক অপর দেশকে শোষণের অবসান ঘটিয়ে এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে সকলের ভালোর জন্য অর্থনৈতিক সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে। এই সমস্যার ব্যাপারে ভারতের স্থান সকলের পুরোভাগে, কারণ সেখানেই সৃষ্ট হয়েছে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের উদাহরণ; সুতরাং ভারতের সমস্যা সমাধান না করে বিশ্বকে পুনর্গঠন করা যাবে না। ভারত তার প্রভূত সম্পদ নিয়ে পৃথিবীর এই পুনর্গঠনের কাজে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এটা সে করতে পারে একমাত্র স্বাধীন দেশ হিসাবে। আধুনিক-কালে স্বাধীনতা অবিভাজ্য; অতএব পৃথিবীর যে-কোনো অংশে যদি সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থা বজায় থাকে তাহলে নতুন বিপদ দেখা দেবে।

ওয়ার্কিং কমিটি লক্ষ্য করেছে, ভারতের অনেক নৃপতি ইয়োরোপে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এই যুদ্ধে ইংরেজকে ধনসম্পদ এবং জনবল দিয়ে সাহায্য করেছেন। অপর দেশের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যাঁরা এতোটা উদ্‌গ্রীব, তাঁদের প্রাথমিক কর্তব্য হলো নিজের দেশে

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসা, কারণ তাঁদের নিজের দেশে আজ নির্ভেজাল স্বৈরতন্ত্র চালু রয়েছে। এই স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার জন্য অবশ্য ইংরেজ সরকারই বেশী দায়ী। দেশীয় নৃপতিদের চেয়েও যে তারা বেশী দায়ী একথা পূর্ববর্তী বৎসরগুলোয় আরো ভালোভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ইংরেজদের এই নীতি হলো গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করার নীতি।

ওয়ার্কিং কমিটি ইয়োরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়ায় সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা এবং বিশেষ করে ভারতে সংঘটিত অতীত এবং বর্তমান ঘটনাবলী গভীরভাবে লক্ষ্য করেও এমন কিছু দেখতে পায়নি যা থেকে বুঝতে পারা যায়, যুদ্ধের ফলে ভারতে গণতন্ত্র এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ আসছে। গণতন্ত্রের মূল কথা হলো সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ এবং সর্বপ্রকার আগ্রাসনের অবসান এবং একমাত্র এই পথেই নতুন পৃথিবী গঠন করা সম্ভব। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী পন্থায় পরিচালিত হচ্ছে বলে ওয়ার্কিং কমিটি এই যুদ্ধের মধ্যে নিজেকে টেনে আনতে রাজী নয় এবং এতে কোনোরকম সহযোগিতা করতেও তারা রাজী নয়, কারণ এই যুদ্ধের ফলে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থাই কায়েম হবে।

পরিস্থিতির গুরুত্ব এবং বিগত কয়েকদিনের ঘটনাবলী এমন দ্রুতগতিতে আবর্তিত হচ্ছে যার সঙ্গে মানুষের মন যথাযথভাবে তাল রাখতে পারছে না। এবং এই কারণেই কমিটি কোনোরকম সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না। যতক্ষণ এই যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য এবং এতাবৎ ঘোষিত বিষয়সমূহের পূর্ণ ব্যাখ্যা না জানা যায় ততোক্ষণ ভারত এই যুদ্ধের সামিল হতে পারে না। এই ব্যাখ্যা এবং উদ্দেশ্যের কথা জানাতে দেরি করা চলবে না, কারণ যতো দিন যাচ্ছে ততোই ভারতকে যুদ্ধের আবর্তের মধ্যে টেনে আনা হচ্ছে। ইংরেজের এই নীতিকে ভারতবাসী অনুমোদন না করা সত্ত্বেও তাঁরা স্বেচ্ছাচারী মনোভাব নিয়ে তাঁদের সিদ্ধান্ত ভারতের ওপরে চাপিয়ে দিচ্ছেন।

ওয়ার্কিং কমিটি তাই ইংরেজ সরকারকে অনুরোধ করছে তারা, যেন গণতন্ত্র সম্পর্কে তাদের অভিমত এবং নতুন বিশ্বগঠনে তাদের আসল পরিকল্পনা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করে। সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিয়ে ভারতকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে তারা প্রস্তুত আছে কিনা সে কথাও তাদের ঘোষণা করতে হবে। এই সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট ঘোষণা পৃথিবীর প্রতিটি স্বাধীন এবং গণতান্ত্রিক দেশই অনুমোদন করবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য, ঘোষিত বিষয়কে কার্যকর করার আসল পরীক্ষা হলো তার বর্তমান প্রয়োগপদ্ধতি, কারণ বর্তমানই হলো ভবিষ্যতের নিয়ামক।

ইয়োরোপে যে ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়েছে তার ফল কী দাঁড়াবে তা আগে থেকেই বলা যায় না; কিন্তু সাম্প্রতিককালে দেখতে পাওয়া গেছে, আবিসিনিয়ায়, স্পেনে এবং চীনদেশে অরক্ষিত শহরগুলোর ওপরে নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করে নারী শিশু এবং বৃদ্ধসহ অসংখ্য অসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই, এইসব ধ্বংসমূলক পরিকল্পনা ঠাণ্ডা মাথায় গ্রহণ করা হয়েছে। এইরকম ভয়াবহ অবস্থা এখনো চলছে এবং সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসমূলক ভীতিপ্রদর্শন পৃথিবীর মানুষদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেছে। এটাকে যদি বন্ধ করা না যায় তাহলে অতীতের সমস্ত ঐতিহ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। ইয়োরোপে এবং চীনে এই ভয়াবহ ব্যাপারের অবসান ঘটাতে হবে। কমিটির মতে, ফ্যাসিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত এ ব্যবস্থাকে পুরোপুরি কার্যকর করা যাবে না। ওয়ার্কিং কমিটি তাই এ বিষয়ে সাহায্য করতে সব সময় প্রস্তুত আছে।

পরিশেষে ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করতে চায় ভারতের জনগণের সঙ্গে জার্মানীর জনসাধারণের কোনো বিরোধ নেই। ভারতের যা কিছু বিরোধ তা হলো সেই পদ্ধতির বিরুদ্ধে, যে পদ্ধতি স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে এবং যে পদ্ধতি সন্ত্রাস ও আগ্রাসনের ওপরে নির্ভরশীল। এক দেশ কর্তৃক অপর দেশকে পদানত করে রাখা অথবা কোনো দেশ কর্তৃক অপর দেশের শান্তিরক্ষার নামে অধিকার কায়েম রাখার পদ্ধতিতে ভারতবাসী বিশ্বাসী নয়। তারা বিশ্বাস করে গণতন্ত্রের প্রকৃত জয়কে, যা সকল দেশের সকল মানুষকে সর্বপ্রকার সন্ত্রাস থেকে মুক্ত করে এক নতুন বিশ্ব গঠনে সাহায্য করবে।

পরিশেষে কমিটি ভারতের জনগণের কাছে বিশেষ আবেদন জানিয়ে বলছে, তারা যেন সমস্ত বাদবিসংবাদ অবসানের জন্য একজাতি একপ্রাণ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এবং দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বৃহত্তর স্বাধীন বিশ্বের মধ্যে স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে আসেন।

আমি কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট হলাম

ইয়োরোপে যুদ্ধ শুরু হয় ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর। এরপর এক মাস পার হবার আগেই পোল্যাণ্ডকে কুক্ষিগত করে নেয় জার্মান সমর নায়করা। ওদিকে গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো আর এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় পোল্যাণ্ডের অধিবাসীরা। সোভিয়েট ইউনিয়ন হঠাৎ তেড়ে এসে পোল্যাণ্ডের পূর্বদিকের অর্ধেক অংশ দখল করে নেয়। পোল্যাণ্ডের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়বার পর সারা ইয়োরোপে এক অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। জার্মান এবং ফরাসীরা নিজ নিজ সীমান্তের দুর্গপ্রাকারের সামনে এসে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়। তবে বড়রকমের কোনো সংঘর্ষ হয় না। সবারই মনে তখন ভীতি-মিশ্রিত অনিশ্চয়তার ভাব।

ভারতেও দেখা দেয় ভীতি ও অনিশ্চয়তার মনোভাব। এই অনিশ্চিত এবং বিপজ্জনক সময়ে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের পদটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পূর্ববর্তী বৎসর আমাকে যখন প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ জানানো হয় তখন আমি নানা কারণে তা প্রত্যাখ্যান করি; কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার মনোভাবের পরিবর্তন হয়। আমার মনে হয়, আমি যদি দায়িত্ব পরিহার করতে চাই তাহলে দেশের ও দশের প্রতি আমি ঠিকমতো আমার কর্তব্য পালন করতে পারবো না। ভারতের এই যুদ্ধে শরিক হওয়ার ব্যাপারে গান্ধীজীর সঙ্গে আমার মতবিরোধের কথা আগেই বলা হয়েছে। মনে হয়, এবার যখন সত্যি সত্যিই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, তখন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। ভারতকে অবশ্যই এবার গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে এবং এ ব্যাপারে আমাদের মনে কোনোরকম দ্বিধা বা সংশয় থাকা উচিত হবে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ভারত যেখানে নিজেই পরাধীন, সে অবস্থায় সে অপরের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে কেমন করে? ইংরেজ সরকার যদি অগৌণে ভারতকে স্বাধীনতা দেবার কথা ঘোষণা করেন তাহলে ভারতবাসীর কর্তব্য হবে সর্বস্ব ত্যাগ করার সংকল্প গ্রহণ করা। আমার তাই ধারণা, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার পক্ষে দায়িত্ব পরিহার করা উচিত হবে না। এরপর গান্ধীজী যখন আমাকে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট হতে অনুরোধ করলেন, তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার সম্মতি জানালাম।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তেমন কোনো বাধার সৃষ্টি হলো না। মিঃ এম. এন. রায় আমার বিরুদ্ধে প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ালেও বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। সেবার কংগ্রেসের অধিবেশন হয় রামগড়ে। সেখানে প্রেসিডেন্টের ভাষণে আমি যে অভিমত প্রকাশ করি সেই অভিমত অনুসারেই কংগ্রেস তার প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবটি এইরকম :

ইয়োরোপে যুদ্ধজনিত গুরুতর পরিস্থিতি এবং তৎসম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের অনুসৃত নীতি সম্বন্ধে গভীরভাবে বিবেচনা করে কংগ্রেস এ. আই. সি. সি. এবং ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবকে অনুমোদন করছে। কংগ্রেস মনে করে, ভারতের ইংরেজ সরকার যেভাবে ভারতবাসীর মতামত না নিয়ে ভারতকে যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করেছেন এবং ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতের সম্পদকে যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করছেন, কোনো আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন ভারতবাসীই তা মেনে নিতে পারে না। ইংরেজ সরকারের ঘোষণা থেকে জানা যাচ্ছে, বর্তমান যুদ্ধকে তাঁরা তাঁদের সাম্রাজ্য রক্ষা এবং তার আয়তন বর্ধিত করার উদ্দেশ্যেই চালিত করবেন বলে স্থির করেছেন। আরো বুঝতে পারা যাচ্ছে, ভারত তথা এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোকে শোষণ করাই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই অবস্থায় কংগ্রেস কিছুতেই এই যুদ্ধের সামিল হতে পারে না, কারণ এর দ্বারা উক্ত শোষণ ব্যবস্থাকেই সমর্থন করা হবে। অতএব এই কংগ্রেস দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভারতীয় সেনাবাহিনীকে গ্রেট ব্রিটেনের স্বার্থে নিয়োজিত করার এবং ভারত থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং জনশক্তিকে যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছে। ভারত থেকে যেভাবে সেনাবাহিনীতে লোক সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে সে ব্যবস্থাকে কখনো ভারতবাসীর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ব্যবস্থা বলে মেনে নেওয়া চলে না। কংগ্রেসকর্মী এবং কংগ্রেসী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা ভারতের ধন, জন এবং অর্থকে যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করার ব্যাপারে কোনোক্রমেই সহযোগিতা করতে পারে না।

কংগ্রেস এতদ্দ্বারা পুনরায় ঘোষণা করছে, ভারতের জনগণ পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত অপর কোনো ব্যবস্থা মেনে নিতে রাজী নয়। এ সম্পর্কে আরো বলা হচ্ছে, ভারতের স্বাধীনতাকে কোনোক্রমেই ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী অথবা ঔপনিবেশিক কাঠামোর অভ্যন্তরে রাখা চলবে না। অর্থাৎ একটা বিরাট জাতির মর্যাদা এবং সম্মানকে উপেক্ষা করে ভারতকে ইংরেজের

রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর ভেতরে টেনে আনা কিছুতেই চলবে না। ভারতের শাসনব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা ভারতবাসীরা নিজেরাই স্থির করবে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক কী হবে তাও তারা নিজেরাই নিরূপণ করবে। এবং এটা করা হবে প্রাপ্তবয়স্কের ভোট দ্বারা নির্বাচিত একটি 'কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেমব্লি'র মাধ্যমে। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমতা এবং সমঝোতা সৃষ্টি করতে না পারলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা যাবে না; কংগ্রেস মনে করে, কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেমব্লি এ ব্যাপারেও একটা সুষ্ঠু সমাধান করতে পারবে। কারণ উক্ত অ্যাসেমব্লিতে সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু প্রতিটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিই থাকবেন এবং এই প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে এবং প্রয়োজনবোধে সালিসী ব্যবস্থা গ্রহণ করে এ ব্যাপারে একটা মতৈক্যে আসবেন। এ ব্যাপারে অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হবে না। ভারতের সংবিধান অবশ্যই স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে রচিত হবে। কংগ্রেস তাই দেশবিভাগ অথবা জাতির অখণ্ডতা ব্যাহত করার যে-কোনো পরিকল্পনা এবং মতামতকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে। কংগ্রেস সব সময়ই বলে এসেছে এবং এখনো বলছে, ভারতে এমন এক সংবিধান রচিত হবে যাতে কোনো সম্প্রদায়, দল অথবা উপজাতির প্রতি কোনোরকম অবিচার হবে না, অর্থাৎ রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারতের যে-কোনো সম্প্রদায়ের যে-কোনো ব্যক্তি সমান অধিকার লাভ করবে।

ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের কাছ থেকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার বুঝে নেবার পর আমার প্রথম কাজই হয় ওয়ার্কিং কমিটি পুনর্গঠন করা। পূর্ববর্তী কমিটির দশজন সভ্যকে নবগঠিত কমিটিতে রাখা হয়। এঁরা হলেন:

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, শেঠ যমুনালাল বাজাজ (কোষাধ্যক্ষ), শ্রী জে. বি. কৃপালনী (সাধারণ সম্পাদক), খান আবদুল গফ্ফর খান, শ্রীভুলাভাই দেশাই, শ্রীশঙ্কররাও দেও, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং আমি নিজে।

ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের ওয়ার্কিং কমিটিতে জওহরলাল নেহরু ছিলেন না। সুভাষচন্দ্র বসু এবং গান্ধীজীর মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেওয়ায় শ্রীবসু যখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের পদে ইস্তফা দেন, তখন থেকেই জওহরলাল নিজেকে

আলাদা করে রাখেন। আমি জওহরলালকে ফিরিয়ে আনি। তাছাড়া শ্রীরাজাগোপালাচারী, ডঃ সৈয়দ মামুদ এবং মিঃ আসফ আলিকেও আমি ওয়ার্কিং কমিটিতে গ্রহণ করি। পঞ্চদশ সভ্যের নাম অঘোষিত রাখা হয়। আমি স্থির করি, এই নামটি পরে ঘোষণা করা হবে। কিন্তু তা আর সম্ভব হয় না, কারণ কংগ্রেস অধিবেশনের অব্যবহিত পরেই আমাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করা হয়। অতএব পঞ্চদশ সভ্যের স্থানটি শূন্যই থেকে যায়।

কংগ্রেস শিবিরে মতভেদ

কংগ্রেসের ইতিহাসে এই সময়টা ছিলো বিশেষ সমস্যাসঙ্কুল সময়। বিশ্ব-আলোড়নকারী ঘটনাবলীর সংঘাতে আমাদের মন সব সময় উদ্বিগ্ন ছিলো। আরো একটি বাধা এই সময় দেখা দেয়। এটি হলো আমাদের মধ্যে মত-বিরোধ। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি চাইছিলাম, একমাত্র স্বাধীন ভারতই বিশ্বের গণতান্ত্রিক শিবিরে অংশগ্রহণ করতে পারে। ভারতের মতামত সর্বদাই গণতন্ত্রের পক্ষে। কিন্তু এ ব্যাপারে একমাত্র বাধা ছিলো ভারতের পরাধীনতা। গান্ধীজী কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁর মতে মূল বিষয়টা ছিলো সমস্যাকে চাপা দেবার প্রবৃত্তি, ভারতের স্বাধীনতা নয়। আমি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলাম, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কখনো সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে চায় না, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো স্বাধীনতা অর্জন। অতএব, আমার মতে গান্ধীজীর অভিমত ছিলো অবাস্তব।

গান্ধীজী কিন্তু তাঁর অভিমত পরিবর্তন করতে রাজী ছিলেন না। তাঁর অভিমত ছিলো, কোনো অবস্থাতেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ভারতের পক্ষে উচিত নয়। ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁকেও তিনি এই কথাই জানিয়ে দেন। তিনি ইংরেজ সরকারের কাছে একখানা খোলা চিঠি লিখে তাতে মত প্রকাশ করেন, হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে ইংরেজদের উচিত আধ্যাত্মিক দিক থেকে তাঁর বিরোধিতা করা। গান্ধীজীর এই আবেদন ইংরেজদের মনে এতোটুকুও সাড়া জাগাতে পারে না। কারণ ইতিমধ্যেই ফ্রান্সের পতন হয়েছে এবং জার্মানশক্তি সদম্ভে আস্ফালন করে চলেছে।

গান্ধীজীর পক্ষে এই সময়টা ছিলো অত্যন্ত কঠিন সময়। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, যুদ্ধ পৃথিবীকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে চলেছে, অথচ এর প্রতিকারে তিনি কিছুই করতে পারছিলেন না। তাঁর মানসিক অবস্থার এতোই অবনতি

ঘটেছিলো, কয়েকবার তিনি আত্মহত্যার কথাও বলেছিলেন। 'আমাকে বলেও ছিলেন, তাঁর যদি জনগণের দুঃখদুর্দশা মোচন করার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে তিনি নীরব দর্শক হয়ে থাকার চাইতে জীবন বিসর্জন দেওয়াটাই শ্রেয় মনে করেন। আমাকে তিনি বার বার তাঁর অভিমত গ্রহণ করবার জন্য চাপ দেন। আমি তাঁর অভিমত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করি, কিন্তু কিছুতেই তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারি না। আমার মতে, অহিংসা আমাদের পথ হলেও একমাত্র এবং অবশ্যপালনীয় নীতি নয়। আমি যে মত পোষণ করতাম তা হলো, অন্য কোনো পন্থার সুবিধে না হলে অস্ত্রধারণের অধিকার ভারতের অবশ্যই আছে। তবে, শান্তিপূর্ণ পথে স্বাধীনতা অর্জন করাটাই সর্বোত্তম পথ,—এবং এই ব্যাপারে গান্ধীজীর অভিমতই সঠিক ছিলো।

এই বিষয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতেও মতবিভেদ দেখা দেয়। প্রথম দিকে জওহরলাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল, শ্রীরাজাগোপালাচারী এবং খান আবদুল গফ্ফর খান আমার দিকে ছিলেন। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, আচার্য কৃপালনী এবং শ্রীশঙ্কররাও দেও সর্বান্তঃকরণে গান্ধীজীর সমর্থক ছিলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে একমত হয়ে তাঁরা বলতেন, একবার যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় স্বাধীন ভারত যুদ্ধের সামিল হতে পারবে তাহলে অহিংস পন্থায় আন্দোলনের মূল কথাটাই অকেজো হয়ে যাবে। আমি কিন্তু তা মনে করতাম না। আমার মতে স্বাধীনতার জন্য আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম এবং আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাইরের সংগ্রাম মূলত আলাদা। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা এক জিনিস, এবং স্বাধীনতা পাবার পর যুদ্ধ করা অন্য জিনিস। আমার মতে এ দুটো জিনিসকে একাকার করা ঠিক নয়।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে মতবিরোধ

পরিস্থিতি রীতিমতো জটিল হয়ে ওঠে ওয়ার্কিং কমিটির এবং ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে পুনায় অনুষ্ঠিত এ. আই. সি. সি.র সভায়। রামগড় অধিবেশনের পরে এইটিই ছিলো নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রথম সভা। উক্ত সভায় প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি আমার বক্তব্য পেশ করি। ঘটনাবলীকে আমি যেভাবে বিচার করেছিলাম, সেই কথাই আমি কমিটির সামনে বলি। কমিটি আমার বক্তব্য মেনে নেন। এরপর দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথম প্রস্তাবে বলা হয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অহিংসাই প্রকৃত পথ, সুতরাং কংগ্রেস

এ পথ থেকে বিচ্যুত হবে না ; দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয়, নাৎসীবাদ এবং গণতন্ত্রের মধ্যে যুদ্ধে ভারত অবশ্যই গণতান্ত্রিক শিবিরে থাকবে ; তবে যতো-দিন পর্যন্ত সে নিজে স্বাধীন না হতে পারছে ততোদিন যুদ্ধের ব্যাপারে সে নিজেকে জড়িত করবে না। এই প্রস্তাব দুটি আমার তৈরি খসড়া অনুসারেই রচিত এবং শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়।

অহিংস সংগ্রামকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত পথ হিসেবে ঘোষণা করে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় গান্ধীজী খুবই খুশী হন। তিনি তখন আমার কাছে ধন্যবাদজ্ঞাপক একখানা টেলিগ্রাম করে জানান আভ্যন্তরীণ সংগ্রামে অহিংসার পথকে আমি যেভাবে সমর্থন করেছি তাতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন। তিনি মনে করতেন, দেশের তৎকালীন মানসিকতায় এ. আই. সি. সি. সহজেই আমার প্রস্তাবটি মেনে নিতেন, ভারতের স্বাধীনতা স্বীকৃত হলে সে যুদ্ধে যোগদান করবে। তাঁর মনে তাই সন্দেহ ছিলো, আভ্যন্তরীণ সংগ্রামের ব্যাপারে কমিটি কর্তৃক অহিংসার পথকে একমাত্র পথ বলে স্বীকার করিয়ে নিতে আমি হয়তো পারবো না।

ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যরা কিন্তু যুদ্ধের ব্যাপারে ঐকামত হতে পারেন না। একথা তাঁরা ভুলতে পারেননি যে যুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে গান্ধীজী পুরো-পুরিভাবে বিরুদ্ধ মত পোষণ করছিলেন। এও তাঁরা ভুলতে পারছিলেন না যে গান্ধীজীর নেতৃত্বেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন বর্তমান পর্যায়ে আসতে পেরেছে। এই প্রথম তাঁরা একটি মূল প্রশ্নে গান্ধীজীর সঙ্গে একমত হতে পারছেন না, যার ফলে তিনি একেবারেই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন। এই চিন্তা-ধারার ফলে এবং বিশেষ করে অহিংসার প্রতি গান্ধীজীর পূর্ণ বিশ্বাসের কথা বিবেচনা করে তাঁদের বিচারবোধ প্রভাবিত হতে শুরু করে। এর ফলে পুনা সম্মেলনের এক মাস পরেই সর্দার প্যাটেল তাঁর মত পরিবর্তন করে গান্ধীজীর মতকে সমর্থন করেন। অন্যান্য সভ্যেরাও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং আরো কয়েকজন সভ্য আমাকে এক পত্র লিখে জানান, যুদ্ধের ব্যাপারে গান্ধীজী যে অভিমত পোষণ করছেন তাঁরা তা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন এবং গান্ধীজীর পন্থাই কংগ্রেসের একমাত্র পন্থা হওয়া উচিত এই মতও ব্যক্ত করেন। তাঁরা আরো বলেন, আমি যেহেতু ভিন্ন মত পোষণ করি এবং আমার সেই ভিন্ন মত এ. আই. সি. সি.র পুনা সম্মেলনে সমর্থিত হয়েছে, সেইহেতু তাঁদের পক্ষে ওয়ার্কিং কমিটিতে থাকা সঙ্গত কিনা সে বিষয়ে তাঁদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। প্রেসিডেন্টকে

সাহায্য করবার জন্যই তাঁদের ওয়ার্কিং কমিটিতে মনোনীত করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু প্রেসিডেন্টের মতামতের সঙ্গে তাঁদের মতামতের মৌলিক বিরোধ রয়েছে, সে অবস্থায় তাঁদের সভ্যপদ পরিত্যাগ করা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তাঁরা বলেছেন, আমাকে অসুবিধেয় ফেলবার উদ্দেশ্য তাঁদের নেই; তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত হলো, কার্যক্ষেত্রে নীতি প্রয়োগের বেলায় যতোদিন তাঁদের এই মতানৈক্য বাধা হয়ে না দাঁড়াবে ততোদিন তাঁরা ওয়ার্কিং কমিটিতে থাকতে রাজী আছেন। তবে ইংরেজ সরকার যদি আমার দাবি মেনে নেন এবং আমাদের পক্ষে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বার অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহলে তাঁদের সরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। সর্বশেষে তাঁরা বলেন, আমি যদি তাঁদের এই অভিমত মেনে নিই তাহলে তাঁরা ওয়ার্কিং কমিটিতে থাকতে রাজী আছেন, অন্যথায় তাঁদের পত্রকে ইস্তফাপত্র হিসেবে গণ্য করতে হবে।

এই চিঠি পেয়ে আমি খুবই দুঃখিত হই। চিঠিতে জওহরলাল, রাজাগোপালাচারী, আসফ আলি এবং সৈয়দ মামুদ ছাড়া আর সকলেই সই করেছিলেন। এমন কি, খান আবদুল গফ্‌ফর খান, যিনি কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমার দৃঢ় সমর্থক ছিলেন, তিনিও তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন দেখতে পাই। আমি আমার সহকর্মীদের কাছ থেকে এই ধরনের চিঠি পাবো বলে ভাবতেও পারিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের চিঠির উত্তরও দিই। উত্তরে লিখি, তাঁদের মনোভাব আমি বুঝতে পেরেছি এবং তাঁদের বক্তব্য মেনে নিচ্ছি। বর্তমানে ইংরেজ সরকারের যে মনোভাব দেখা যাচ্ছে তাতে তাঁরা যে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেবেন এমন কোনো আশা আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং ইংরেজের এই মনোভাব যতোদিন পরিবর্তিত না হচ্ছে ততোদিন যুদ্ধে যোগদানের বিষয়টি একটি কেতাবি আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে; অতএব, আমি তাঁদের অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন ওয়ার্কিং কমিটিতে থেকে যান।

১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে ভাইসরয় আমাকে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। আমন্ত্রণপত্রে তিনি আলোচ্য বিষয়ের যে আভাস দেন তা হলো, কংগ্রেস যদি যুদ্ধের ব্যাপারে সহযোগিতা করে তাহলে তিনি তাঁর একজিকিউটিভ কাউন্সিলের আয়তন বাড়াতে এবং সেই কাউন্সিলের হাতে অনেক বেশী ক্ষমতা দিতে রাজী আছেন। আমি এই আমন্ত্রণ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করি। এমন কি প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে আমার সহকর্মীদের

সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজনও বোধ করি না। আমার মতে কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবি এবং ভাইসরয়ের বর্ধিতায়তন একজিকিউটিভ কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাবের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। এমতাবস্থায় তাঁর সঙ্গে দেখা করবার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। কিন্তু দেখতে পাই, কংগ্রেসের অনেক কর্মী আমার এই সিদ্ধান্তকে খোলা মনে মেনে নিতে পারছেন না। তাঁদের বক্তব্য হলো ভাইসরয়ের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করাটা উচিত হয়নি। ভাইসরয়ের সঙ্গে আমার দেখা করা উচিত ছিলো। কিন্তু আজও আমি মনে করি যে ওই ব্যাপারে আমি সঠিক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছিলাম।

এই ব্যাপারে গান্ধীজীর মতামত কিন্তু বেশির ভাগ কংগ্রেস কর্মীর মতামতের বিপক্ষে ছিলো। তিনি আমাকে একখানা চিঠি লিখে আমার কাজকে সর্বতোভাবে সমর্থন করেন। তাঁর মতে ভাইসরয়ের সঙ্গে আমার দেখা না করাটা ভগবানের আশীর্বাদের প্রতীক। ভারত যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ুক এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়; তাঁর মতে আমি যে ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করিনি তার প্রকৃত কারণ এইটিই। ঘটনাটির এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে। তবে গান্ধীজীর মনে এ সন্দেহ থেকেই যায়, আমি যদি পরবর্তীকালে ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করি তাহলে হয়তো তাঁর সঙ্গে একটা আপস করে নিয়ে ভারতকে যুদ্ধের ভেতরে টেনে আনবো।

এর কিছুদিন পরেই গান্ধীজী এক কাণ্ড করে বসলেন। ইংরেজদের উদ্দেশ্যে এক খোলা চিঠি লিখে তিনি তাঁদের কাছে আবেদন জানালেন, হিটলারের মোকাবিলা করতে হলে অস্ত্র পরিত্যাগ করে আধ্যাত্মিক পন্থা গ্রহণ করা দরকার। এখানেই তিনি থামলেন না। এরপর তিনি লর্ড লিনলিথগোর সঙ্গে দেখা করে এই অভিনব পন্থাটি গ্রহণ করবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলেন, এবং বললেন যে তিনি যেন তাঁর (গান্ধীজীর) প্রস্তাবটি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে জানিয়ে দেন।

গান্ধীজীর প্রস্তাবে লর্ড লিনলিথগো এতোই বিস্মিত হলেন যে তাঁর মুখ থেকে কোন কথাই বের হলো না। এর আগে গান্ধীজী যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করে আলাপ-আলোচনা করেছেন, তখন আলোচনা-শেষে তিনি ঘন্টা বাজিয়ে একজন এডিকংকে ডেকে এনে গান্ধীজীকে তাঁর গাড়ি অবধি এগিয়ে দিতে বলতেন। এবারে কিন্তু তিনি ঘন্টাও বাজালেন না অথবা কোনো এডিকংকেও ডাকলেন না। গান্ধীজী তাই নিজেই তাঁর গাড়ির কাছে ফিরে এলেন। এরপর আমার সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হয়, তখন ভাইসরয়ের এই

ত্রুটির কথাটা তিনি আমাকে জানান। সব কথা শুনে আমি তাঁকে বলি, আপনার প্রস্তাবের অভিনবত্ব ভাইসরয়কে এতোই বিস্মিত করে ফেলেছিলো যে সাধারণ শিষ্টাচারের কথাও তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। আমার কথায় গান্ধীজী হো হো করে হেসে ওঠেন।

এদিকে কংগ্রেসের মধ্যে তখনো অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছে। গান্ধীজীর মতে কংগ্রেস কোনোক্রমেই যুদ্ধে জড়িত হবে না। পক্ষান্তরে আমরা ছিলাম ভিন্ন মতের পরিপোষক। আমাদের অভিমত ছিলো বর্তমান অবস্থায় ভারত কখনোই যুদ্ধের ব্যাপারে কোনোরকম সাহায্য করবে না। প্রকৃতপক্ষে আমার নীতি এবং গান্ধীজীর অভিমতের ভেতরে যে পার্থক্য তাকে বলা চলে তত্ত্বগত পার্থক্য। আসলে ইংরেজদের মতিগতি দেখে আমরা আমাদের মধ্যে তত্ত্বগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একতাবদ্ধ হতে পেরেছিলাম।

এরপর প্রশ্ন উঠলো, বর্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের কি করা উচিত। রাজনৈতিক সংস্থা হিসেবে সে কিছুতেই নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। বিশেষ করে সারা পৃথিবী যখন ঘটনার আবর্তে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে তখন কংগ্রেসের পক্ষে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা কোনোক্রমেই উচিত হবে না। গান্ধীজী কিন্তু প্রথম দিকে আন্দোলন করার বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে আন্দোলন মানেই স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন; কিন্তু ভারত যদি স্বাধীনতা পেয়ে যায় তাহলে সে নিশ্চয়ই যুদ্ধের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়বে। কিন্তু দিল্লী এবং পুনায় সম্মেলনের পরেও ইংরেজরা যখন কংগ্রেসের সহযোগিতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন তখন তিনি সীমাবদ্ধ-ভাবে আইন অমান্য আন্দোলনের কথা চিন্তা করতে থাকেন। তিনি প্রস্তাব দেন, ভারতকে যুদ্ধের ভেতরে টেনে আনার বিরুদ্ধে ভারতের নরনারীরা ব্যক্তিগতভাবে তাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করবে। তারা প্রকাশ্যে এই ব্যাপারে প্রতিবাদ জানাবে এবং এর জন্য গ্রেপ্তার বরণ করবে। আমি এই সীমাবদ্ধ আন্দোলনের বিরোধী ছিলাম। আমার মতে যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনকে আরো ব্যাপক এবং আরো জোরদার করার প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু গান্ধীজী এতে সম্মত হন না। গান্ধীজী যখন কিছুতেই আর বেশী এগোতে চাইলেন না তখন আমিও অবশেষে তাঁর প্রস্তাবিত সেই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পক্ষে মত দিলাম।

প্রথম ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহী হিসেবে বিনোবা ভাবেকে নির্বাচিত করা হয়। ভাবের পরে পণ্ডিত নেহরু সত্যাগ্রহ করতে চান এবং গান্ধীজী তাঁর প্রস্তাবে

সম্মত হন। এরপর আরো অনেকে এগিয়ে আসেন এ ব্যাপারে। ফলে সারা দেশ জুড়ে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ শুরু হয়ে যায়। আন্দোলন শেষ পর্যন্ত এমন এক পর্যায়ে এসে যায় যে অহিংসার তত্ত্বে গান্ধীজীর সঙ্গে আমার প্রচণ্ড মত-বিরোধ থাকা সত্ত্বেও আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার ব্যাপারে আমরা দুজনেই একমত হই।

এই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের একটা প্রহসনের দিকও ছিলো। সম্পূরণ সিং নামে একজন পাঞ্জাবী গান্ধীজীর অথবা ওয়ার্কিং কমিটির মত না নিয়েই সত্যাগ্রহ করতে এগিয়ে আসে। এরপর তাকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখন সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে সে এমন সব বাতচিত ঝাড়তে থাকে যার সঙ্গে কংগ্রেসের পরিকল্পনার আদৌ কোনো মিল ছিলো না। বিচারকারী ম্যাজিস্ট্রেট তাকে এক আনা জরিমানা করেন। সে তখন পকেট থেকে এক আনা পয়সা বের করে জরিমানা দিয়ে বেরিয়ে আসে। সম্পূরণ সিংয়ের এই অপকর্মের ফলে পাঞ্জাবের আন্দোলন এমনই হাস্যকর হয়ে ওঠে যে এর প্রতিবিধানের জন্য শেষ পর্যন্ত আমাকে সেখানে গিয়ে আন্দোলনকে সঠিক পথে আনতে হয়। পাঞ্জাব থেকে ফেরবার পথে এলাহাবাদে আমি গ্রেপ্তার হই। আমার এই গ্রেপ্তারটাও বেশ কিছুটা হাস্যকর ছিলো। আমি যখন সকালবেলা চা পানের জন্য রিফ্রেসমেন্টরুমের দিকে যাচ্ছি সেই সময় পুলিস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আমার সামনে এগিয়ে এসে সবিনয়ে আমার গ্রেপ্তারী পরোয়ানাটা দেখান। ভদ্র-লোকের বিনীত ভাব দেখে আমি গম্ভীরভাবে বলি :

> আপনি যেভাবে আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন তাতে আমি সম্মানিত বোধ করছি। আমাকে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করবার সুযোগ না দিয়েই আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করলেন।

আমি দু বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে নৈনী জেলে স্থানলাভ করি। কিছুদিন পরে ডঃ কাটজুও সেখানে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হন। আমাদের কিন্তু পুরো মেয়াদটা জেলে থাকতে হয় না, কারণ বিশ্ব-আলোড়নকারী দুটি ঘটনার ফলে যুদ্ধের চেহারা তখন আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে। প্রথম ঘটনাটা হলো ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে জুন মাসে জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ এবং দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো জাপান কর্তৃক আমেরিকা অধিকৃত পার্ল হারবার আক্রমণ। এই আক্রমণ অনুষ্ঠিত হয় জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণের ছ মাসের মধ্যেই।

জার্মানী এবং জাপান কর্তৃক যথাক্রমে সোভিয়েট রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আক্রান্ত হবার ফলে যুদ্ধের পরিধি সারা বিশ্বে বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধটা বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়। জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়া আক্রান্ত হবার আগে যুদ্ধটা পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। কিন্তু রাশিয়া আক্রান্ত হবার পরে যুদ্ধটা বিশাল ভূখণ্ডে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে এবং যেবস অঞ্চল যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে ছিলো সেগুলোও যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতোদিন ইংলণ্ডকে বিশেষভাবে সাহায্য করলেও সে ছিলো যুদ্ধের ধরাছোঁয়ার বাইরে; কিন্তু জাপান কর্তৃক পার্ল-হারবার আক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেও যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ে, যার ফলে যুদ্ধটা প্রকৃত-পক্ষে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়।

প্রাথমিক স্তরে জাপানের অভাবিত সাফল্যের ফলে যুদ্ধটা ভারতের একেবারে দোরগোড়ায় এসে হাজির হয়। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই জাপান মালয় এবং সিঙ্গাপুর অধিকার করে নেয়। এরপর ব্রহ্মদেশও তারা অধিকার করে ফেলে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের আগে পর্যন্ত ব্রহ্মদেশ ভারতেরই অংশ ছিলো। পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থায় এসে দাঁড়ায়, ভারত আক্রান্ত হবার আশঙ্কাও দেখা দেয়। জাপানের যুদ্ধজাহাজগুলো বঙ্গোপসাগরে এসে উপস্থিত হয় এবং কিছুদিনের মধ্যেই জাপানী নৌবহর আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নেয়।

জাপান যুদ্ধে জড়িত হবার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সরাসরি যুদ্ধের ভেতরে এসে যায়। ইতিপূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংরেজদের ভারতের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে বলেছিলো। এবারে তারা এ ব্যাপারে রীতিমতো চাপ দিতে শুরু করে। তাদের বক্তব্য হলো, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে অগৌণে ভারতের সঙ্গে একটা মীমাংসা করে ভারতবাসীর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতা লাভ করা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পরে জানা যায়, জাপান কর্তৃক পার্ল হারবার আক্রান্ত হবার অব্যবহিত পরেই প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করেছিলেন, ভারতের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করা দরকার। ব্রিটিশ সরকার তাঁর এই অনুরোধ এড়াতে পারেন না এবং এর ফলে তাঁরা তাঁদের নীতি কিছুটা পরিবর্তন করবেন বলে স্থির করেন।

১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভাইসরয় স্থির করেন জওহরলালকে এবং আমাকে মুক্তি দেওয়া হবে। এটা করা হয় কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য

করবার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ পরিবর্তিত অবস্থায় কংগ্রেস কী মনোভাব গ্রহণ করেছে বা করবে তা বোঝবার জন্যই ভাইসরয় আমাদের দুজনকে মুক্তি দেবার সিদ্ধান্ত নেন। গভর্নমেন্টের আরো উদ্দেশ্য ছিলো, আমাদের দুজনের চাল-চলন লক্ষ্য করবার পর অন্যান্য নেতাদের মুক্তি দেবার কথা তাঁরা বিবেচনা করবেন। যে-কোনো কারণেই হোক, আমাকে মুক্তি দেওয়াটা গভর্নমেন্টের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। আমার অনুপস্থিতিতে ওয়ার্কিং কমিটির কোনো মিটিং হতে পারে না, সেইজন্যই আমাকে মুক্তি দেওয়াটা দরকার হয়ে পড়েছিলো।

মুক্তির হুকুমনামা যখন আমার কাছে পৌঁছয় তখন আমার মানসিক অবস্থার অবনতি ঘটে। প্রকৃতপক্ষে মুক্তিলাভের পরে আমি রীতিমতো অস্বস্তিবোধ করি। আগে যখন জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়েছি, সে মুক্তিকে তখন আংশিক সাফল্য বলেই মনে করেছি, কিন্তু এবারে মুক্তি পেয়ে আমার মনে হয়, দু বছর যাবৎ যুদ্ধ চলা সত্ত্বেও ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমরা বিশেষ কিছুই করতে পারিনি। আমরা যেন এতোদিন শুধু অবস্থার দাস হয়ে দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছি।

মুক্তিলাভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বারদৌলীতে ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা আহ্বান করি। গান্ধীজীও তখন ওখানেই ছিলেন এবং তাঁর ইচ্ছানুসারেই বারদৌলীতে সভার স্থান নির্ধারণ করা হয়। আমি যখন গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করি তখন দেখি যে তিনি আরো সরে গেছেন। আগে আমাদের মধ্যে শুধুমাত্র নীতিগত প্রশ্নেই মতানৈক্য ছিলো, কিন্তু এখন দেখা গেলো, ঘটনাবলী বিশ্লেষণের ব্যাপারেও তাঁর আর আমার মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। গান্ধীজীর মত হলো, ভারত যদি যুদ্ধের ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা করতে সম্মত হয় তাহলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেবে। তিনি আরো বলেন, যদিও ব্রিটিশ সরকার এখন রক্ষণশীল দলের দ্বারা গঠিত এবং সেই গভর্নমেন্টের প্রধানমন্ত্রী হলেন মিঃ চার্চিল, তবুও যুদ্ধ-পরিস্থিতি এমন ঘোরালো হয়ে পড়েছে যে ভারতের সহযোগিতা পাবার জন্য তাকে স্বাধীনতা দেওয়া ছাড়া ব্রিটিশ সরকারের অন্য কোনো পথ নেই। আমার বিশ্লেষণ কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা ছিলো। আমি মনে করতাম, ব্রিটিশ গভর্ন-মেন্ট আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য উদগ্রীব হলেও ভারতকে তখনই স্বাধীনতা দিতে তাঁরা প্রস্তুত নন। আমার দৃঢ় ধারণা, যুদ্ধ চলাকালে তাঁরা বড়-জোর একটা নতুন একজিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন করে কংগ্রেসের হাতে

যথেষ্ট ক্ষমতা দিতে পারেন। এই বিষয়টি নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়, কিন্তু আমি তাঁকে আমার মতে আনতে সক্ষম হই না।

এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা বলে রাখা দরকার, মুক্তিলাভের কয়েকদিন পরেই আমি কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করি। এই সম্মেলনে কোনো কোনো সাংবাদিক আমাকে যখন জিজ্ঞেস করেন, যুদ্ধের ব্যাপারে কংগ্রেস তার নীতি পরিবর্তন করতে সম্মত আছে কিনা, তখন বলি, এটা সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মতিগতির ওপরে নির্ভর করছে; গভর্নমেণ্ট যদি তার মতিগতি পরিবর্তন করেন তাহলে কংগ্রেস তা করবে। আমি পরিষ্কারভাবে তাঁদের বলি, যুদ্ধের প্রতি কংগ্রেস যে মনোভাব গ্রহণ করেছে তা অপরিবর্তনীয় মতান্ধতা কখনোই নয়। এরপর আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, জাপান যদি ভারত আক্রমণ করে তাহলে ভারত কি করবে? এর উত্তরে মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করেও আমি বলি, ভারতবাসী তার নিজের দেশকে রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করতে দ্বিধা করবে না; তবে এ কথাও বলি, এ কাজ আমরা তখনই করতে পারি, যখন আমাদের হাত-পা থেকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে দেওয়া হবে। পরাধীনতার শৃঙ্খলে যাদের হাত-পা বাঁধা তারা কী করে যুদ্ধ করতে পারে?

এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে লণ্ডনের 'টাইমস' এবং 'ডেলী নিউজ' পত্রিকা মন্তব্য প্রকাশ করে। তারা বলে, আমার এই বক্তব্য থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে গান্ধীজীর সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্বের মতবৈষম্য ঘটেছে। গান্ধীজী যুদ্ধসম্বন্ধে এমন এক অপরিবর্তনীয় নীতি পোষণ করেন যাতে পরবর্তী আলাপ-আলোচনার কোনো পথই আর খোলা থাকে না; কিন্তু কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের বক্তব্য থেকে জানা যায়, আপসের পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে যায়নি।

ওয়ার্কিং কমিটির সভায় গান্ধীজী বিলাতী পত্রিকায় এই মন্তব্যের কথা উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, এই মন্তব্য থেকে তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারছেন, কংগ্রেস যদি যুদ্ধের কাজে সহজে সহযোগিতা করতে সম্মত হয় তাহলে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টও তার মতিগতি পরিবর্তন করবে। অতঃপর কংগ্রেসের কর্তব্য ও করণীয় নিয়ে পুরো দুদিন আলোচনা চলে; কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো মতৈক্য হয় না। গান্ধীজী তাঁর অহিংসার নীতিকে আঁকড়ে ধরে থাকেন এবং বলেন, কোনো অবস্থাতেই এ নীতিকে পরিত্যাগ করা চলবে না এবং এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ভারতের যুদ্ধে লিপ্ত হবার বিরুদ্ধে তিনি তাঁর ঘোর আপত্তির কথা জানান। আমি তখন আমার আগের অভিমতের পুনরাবৃত্তি

করে বলি, অহিংসাকে আঁকড়ে ধরে থাকার চেয়ে ভারতের স্বাধীনতাই আমাদের বেশি কাম্য।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে কোনো-না-কোনো সমাধানের পথ বের করতে পারাটা গান্ধী-চরিত্রের একটি আশ্চর্যরকম বিশেষত্ব ছিলো; তাই এবারেও তিনি উভয়পক্ষের গ্রহণীয় একটি সমাধানের পথ বের করতে সক্ষম হন। এছাড়া বিরোধীপক্ষের মতামত সুষ্ঠুভাবে অনুধাবন করবার একটি বিস্ময়কর ক্ষমতাও তাঁর ছিলো। তাই তিনি যখন যুদ্ধের ব্যাপারে আমার দৃঢ় মনোভাবের কথা বুঝতে পারলেন তখন তিনি আমার মত পরিবর্তনের জন্য আর কোনোরকম চাপের সৃষ্টি করলেন না। অধিকন্তু ওয়ার্কিং কমিটির সামনে তিনি এমন এক খসড়া প্রস্তাব উপস্থাপিত করলেন, যে প্রস্তাবে আমার অভিমতই প্রতিফলিত হয়।

এর কিছুদিন পরেই ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দেয়। যুদ্ধের প্রথম থেকেই সুভাষচন্দ্র বসু যুদ্ধের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ করে আন্দোলন চালাতে থাকেন। এবং তাঁর এই কার্যক্রমের ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁকে বন্দী হতে হয়। কিন্তু বন্দী অবস্থায় তিনি যখন অনশন শুরু করেন তখন তাঁকে মুক্তি দিয়ে স্বগৃহে অন্তরীণ অবস্থায় রাখা হয়। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি জানতে পারা যায় তিনি ভারত থেকে পালিয়ে গেছেন। এরপর দু বছর বা তারও কিছু বেশী সময় তাঁর কোনো খবরই পাওয়া যায় না। তিনি জীবিত না মৃত সে কথা দেশবাসী জানতে পারে না। কিন্তু ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে সকল সন্দেহের নিরসন করে তিনি বার্লিন বেতারকেন্দ্র থেকে এক বক্তৃতা দেন। এ থেকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়, তিনি জার্মানীতে গিয়ে সেখানে একটা ইংরেজ-বিরোধী ফ্রন্ট গঠন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। ইতিমধ্যে ইংরেজ কর্তৃক ভারত অধিকার করে রাখার বিরুদ্ধে জাপানী প্রচারও যথেষ্ট সরব হয়ে ওঠে। জার্মানী এবং জাপান থেকে যুগপৎ এই ধরনের প্রচারে ভারতীয় জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশ রীতিমতো প্রভাবিত হয়ে পড়ে। অনেকেই এটা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে জাপান ভারতের স্বাধীনতা এবং এশিয়ার আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যই যুদ্ধ করছে। তাদের আরো ধারণা যে জাপানী আক্রমণ ইংরেজের শক্তিকে খর্ব করছে বলে প্রকারান্তরে এটা আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সহায় হয়েছে; সুতরাং এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করা আমাদের উচিত। এইরকম মনোভাবের ফলে ভারতের জনগণের একটা অংশ জাপানীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে পড়ে।

আরো একটি ব্যাপারে গান্ধীজীর সঙ্গে আমার মতবিরোধ ঘটে। গান্ধীজীর মনে ক্রমশ এই বিশ্বাস বেশি করে দানা বাঁধতে থাকে যে মিত্রপক্ষ জয়লাভ করতে পারবে না। তাঁর আশঙ্কা হয়, শেষ পর্যন্ত হয়তো জার্মানী এবং জাপানই জয়লাভ করবে, অথবা এমনও হতে পারে, মিত্রপক্ষ সখাত-সলিলে ডুবে মরবে।

গান্ধীজী অবশ্য প্রকাশ্যে এইরকম কোনো মতামত কখনো ব্যক্ত করেননি, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আমি বুঝতে পারি, মিত্রপক্ষের জয় সম্বন্ধে তিনি রীতিমতো সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। আমি দেখতে পাই, সুভাষ বসুর জার্মানীতে উপস্থিত হওয়াটা তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। আগে তিনি সুভাষ বসুর অনেক কাজেরই বিরোধিতা করেছেন, কিন্তু এখন এ ব্যাপারে একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করি। আলোচনার সময় তিনি এমন সব মন্তব্য করেন যাতে বুঝতে পারা যায়, সুভাষ বসুর সাহস এবং কর্মধারাকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখছেন। এখানে আরো একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সুভাষ বসুর প্রতি তাঁর এই শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাবের ফলে যুদ্ধের প্রতি তাঁর যে মনোভাব ছিলো সে মনোভাব তাঁর অজ্ঞাতসারেই বেশ কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

পরবর্তীকালে ক্রিপস মিশনের প্রতি তিনি যে মনোভাব প্রদর্শন করে-ছিলেন সেটাও সুভাষ বসুর প্রতি তাঁর অনুকূল মনোভাবের কথা বুঝতে পারা যায়। ক্রিপসের প্রস্তাবটা কী ছিলো এবং আমরা সে প্রস্তাব কেন প্রত্যাখ্যান করেছিলাম সে কথা আমি পরবর্তী কোনো অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করবো ; এখানে শুধু সে সময়কার একটি রিপোর্ট সম্বন্ধে কিছু বলা হচ্ছে। সে সময় (অর্থাৎ ক্রিপস যখন ভারতে এসেছিলেন) হঠাৎ সংবাদ-পত্রে একটা খবর বের হয়, সুভাষ বসু বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। সংবাদটা প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতে এক মহা আলোড়নের সৃষ্টি হয়। আর সকলের মতো গান্ধীজীও এ সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি তখন সুভাষ বসুর মায়ের কাছে একটা তারবার্তা প্রেরণ করেন। সেই তারবার্তায় তিনি সুভাষ বসুর দেশপ্রেমের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। পরবর্তীকালে জানা যায়, খবরটির কোনো ভিত্তি নেই।

সেই সময় ক্রিপস আমাকে বলেন, অহিংসার পূজারীর মনোভাব তাঁকে বিস্মিত করেছে। যে সুভাষ বসু অক্ষশক্তির পক্ষে যোগ দিয়েছেন এবং মিত্র-পক্ষের পরাজয়ের জন্য প্রচণ্ডভাবে প্রচার শুরু করেছেন তাঁর প্রতি গান্ধীজীর

এইরকম শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব দেখে তিনি রীতিমতো বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছেন। এটা তিনি মোটেই আশা করেননি।

অন্তবর্তী নাট্যে চৈনিক ভূমিকা

যুদ্ধে ভারতবর্ষের অংশগ্রহণ সম্বন্ধে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের অভিমতের কথা আমি আগেই বলেছি। চীনের রাষ্ট্রনায়ক জেনারেলিসিমো চিয়াং কাই-শেকও একই অভিমত পোষণ করতেন। তিনি তাঁর অভিমত বহুবার ব্যক্ত করেছেন। যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকেই তিনি জোরের সঙ্গে একটা মিটমাট করে নেবার জন্য ইংরেজদের পরামর্শ দিচ্ছিলেন। পরবর্তীকালে জাপান যখন পার্ল হারবার আক্রমণ করে তখন তিনি আরো জোরের সঙ্গে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতে থাকেন। জাপানের অগ্রগতি এবং যুদ্ধে তার বিস্ময়কর সাফল্যের জন্য স্বাভাবিক কারণেই জেনারেলিসিমো এবং চীন সরকারের গুরুত্ব বিশেষভাবে বেড়ে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মতো চীনকেও তখন বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শক্তিরূপে গণ্য করা হতে থাকে। চিয়াং কাই-শেক প্রথম থেকেই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেবার জন্য চাপ দিয়ে এসেছেন। তিনি এই অভিমত পোষণ করতেন, ভারতবর্ষ স্বেচ্ছায় যুদ্ধের ব্যাপারে সহযোগিতা না করলে তার কাছ থেকে যথোপযুক্ত সাহায্য পাওয়া যাবে না।

যুদ্ধ শুরু হবার কিছুদিন আগে জওহরলাল নেহরু দক্ষিণ চীন পরিভ্রমণ করে এসেছিলেন। সে সময় তিনি ছিলেন চিয়াং কাই-শেকের সম্মানিত অতিথি। ফলে তাঁর সঙ্গে জওহরলালের একটা নিকট-সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিলো। চিয়াং কাই-শেকও সেই সময়ই ভারতের রাজনৈতিক অবস্থাটা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। এখানে আরো একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার, জওহরলালের চীনভ্রমণের ফলেই জেনারেলিসিমো ভারতে একটি মিশন প্রেরণ করেছিলেন এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে আমার কাছে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর সেই চিঠিতে তিনি ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করে ভারতের প্রতি তাঁর সদিচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। এখন তিনি স্থির করেন তিনি নিজেই ভারতে আসবেন এবং ভাইসরয় ও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে উভয়পক্ষের মধ্যে একটা আপস করানো যায় কিনা সে

বিষয়ে তিনি চেষ্টা করবেন। তিনি আশা করেন, এর ফলে ভারতবর্ষের জাতীয় নেতৃবৃন্দ যুদ্ধে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসবে।

আমি যখন দিল্লীতে মিঃ আসফ আলীর গৃহে অবস্থান করছিলাম, সেই সময়ই আমি খবর পাই, চিয়াং কাই-শেক ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে ভারতভ্রমণে আসছেন। এই সময় মাদাম চিয়াং কাই-শেকের কাছ থেকেও আমি একখানা চিঠি পাই। চিঠিতে তিনি আমাকে জানিয়ে দেন, জেনারেলিসিমোর সঙ্গে তিনিও ভারতে আসছেন। আরো কয়েকদিন পরে একটা সরকারী ঘোষণা প্রচারিত হয়। তা থেকে জানা যায়, জেনারেলিসিমো চিয়াং কাই-শেক এবং মাদাম চিয়াং কাই-শেক সরকারী অতিথি হিসেবে দিল্লীতে আসছেন।

জেনারেলিসিমো এবং মাদাম চিয়াং কাই-শেক ১৯৪২ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারি দিল্লীতে পদার্পণ করেন। এর দুদিন পরে জওহরলাল এবং আমি জেনারেলিসিমোর সঙ্গে দেখা করি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে আমরা বেশ কিছুটা অসুবিধের সম্মুখীন হই। এর কারণ হলো তিনি কোনো বিদেশী ভাষা জানতেন না। কথাবার্তা তাই দোভাষীর মাধ্যমে চলতে থাকে। এর ফলে আলোচনা বিলম্বিত হয় এবং খোলাখুলিভাবে সে ব্যাপারেও অসুবিধার সৃষ্টি হয়। দোভাষীর উপস্থিতির জন্য আলোচনা চলে আনুষ্ঠানিক ধরনে। জেনারেলিসিমো প্রথমেই এক দীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-লাভের জন্য দুটি মাত্র পথ আছে। একটি হলো সশস্ত্র বিপ্লবের পথ এবং অপরটি হলো আলাপ-আলোচনার পথ। সশস্ত্র বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে দেশ দখলকারী বিদেশী শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে দেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করতে হয়। কিন্তু আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে প্রথমেই পূর্ণ স্বাধীনতার আশা করা যায় না। এই পদ্ধতিতে ধাপে ধাপে এগোতে হয়। অর্থাৎ, ধাপে ধাপে স্বায়ত্তশাসনের পথে এগোতে এগোতে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা যায়। এই ব্যাপারে তিনি চীনের স্বাধীনতালাভের উদাহরণ দেন। তিনি বলেন, চীনদেশে স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয় ১৯১১ সনে এবং তারপর অনেকগুলো স্তর অতিক্রম করে অবশেষে সে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করে। তিনি বলেন, ভারতেরও এই পন্থা অনুসরণ করা উচিত বলেই তিনি মনে করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ কথাও বলেন, ভারত এ ব্যাপারে কোন্ পন্থা অবলম্বন করবে তা ভারতীয়রাই স্থির করবে। তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের পথ পরিহার করা হলে আলাপ-

আলোচনার পথই হলো একমাত্র বিকল্প উপায়। এরপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে তিনি সব সময় এ ব্যাপারে মত-বিনিময় করে চলেছেন। শুধু তাই নয়, তাদের কাছে এ ব্যাপারে একটা বিস্তৃত বিবরণও দাখিল করেছেন এবং তাদের উত্তরও তিনি পেয়েছেন। এই-ভাবে মত-বিনিময়ের ফলে তিনি স্থিরনিশ্চয় হয়েছেন যে ভারতীয়রা যদি যুদ্ধের সুযোগটা সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারে তাহলে ভারতের স্বাধীনতা আর দূরের বস্তু হয়ে থাকবে না।

এরপর তিনি সরাসরি আমাকে একটি প্রশ্ন করেন। ভারত কোন্ শিবিরের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করে,—নাৎসী শিবিরের প্রতি, না, গণতান্ত্রিক শিবিরের প্রতি ?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি, আমাদের সামনের বাধা যদি অপসারিত হয় তাহলে আমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারি, ভারত যাতে গণতান্ত্রিক শিবিরে যোগদান করে তার জন্য আমি সর্বতোভাবে চেষ্টা করবো।

এরপর জেনারেলিসিমো আমাদের কাছে আর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, বর্তমান যুদ্ধটা যেহেতু গণতন্ত্র রক্ষার জন্য এবং বিশ্বের পরাধীন মানবগোষ্ঠীর দাসত্ব মোচনের জন্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে তখন শর্তহীনভাবে ইংলণ্ড এবং চীনের পক্ষে যোগদান করাটাই কি আপনাদের উচিত নয় ?

এর উত্তরে আমি বলি, গণতান্ত্রিক শিবিরে যোগ দেবার জন্য আমরা সব সময়ই আগ্রহান্বিত ; তবে যতোদিন পরাধীনতার শিকলে আমাদের হাত-পা বাঁধা থাকবে ততোদিন আমরা কিভাবে আমাদের ইচ্ছামতো কাজ করি ?

জেনারেলিসিমো এরপর বলেন, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যে বিশেষ কিছু ব্যবধান আছে বলে তিনি মনে করেন না ; সুতরাং ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যখন ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে চাইছেন তখন তা গ্রহণ করাটাই ভারতের পক্ষে উচিত হবে। তিনি আরও বলেন, এ বিষয়ে জওহরলাল তাঁর সঙ্গে একমত নন ; তিনি চান পূর্ণ স্বাধীনতা। এই কথাটা উল্লেখ করবার পর তিনি বলেন, 'ভারতের এক-জন শুভানুধ্যায়ী হিসেবে আমি বলতে চাই, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাটা মোটেই উচিত কাজ হবে না।'

এই সময় জওহরলাল উর্দু ভাষায় আমাকে বলেন, কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসেবে এ কথার উত্তর আমারই দেওয়া উচিত। আমি তখন জেনারেলি-সিমোকে বলি, যুদ্ধ চলাকালে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যদি ভারতকে ঔপনিবেশিক

স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দেয় এবং শাসনকার্যে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় প্রতিনিধিদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয় তাহলে কংগ্রেস অবশ্যই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রস্তাব মেনে নেবে।

এই সময় মাদাম চিয়াং কাই-শেক এসে আমাদের চা পানের আমন্ত্রণ জানান এবং এর পর থেকে তিনি নিজেও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। মাদাম চিয়াং যোগ দেবার ফলে আলোচনাটা সহজ হয়ে আসে। তিনি ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্তা এবং ইংরেজী ভাষার ওপরে তাঁর চমৎকার দখল থাকার জন্যই আলোচনাটা সহজ হয়ে ওঠে।

এবারের আলোচনার সময় জেনারেলিসিমো বলেন, যুদ্ধের দায়িত্ব যখন প্রধানতঃ ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকেই বহে করতে হচ্ছে এবং হবে, সে অবস্থায় তাঁরা শতকরা একশো ভাগ দায়িত্ব ভারতীয়দের হাতে ছেড়ে দেবেন বলে মনে হয় না।

এর উত্তরে আমি বলি, তাহলে এমন কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে যা কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ সরকার উভয়ের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য হয়। আমি আরো বলি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যদি যুদ্ধের পরে ভারতকে স্বাধীনতা দেবার কথা স্বীকার করে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে সর্বব্যাপারে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছি।

এই সময় মাদাম চিয়াং কাই-শেক আমার কাছ থেকে জানতে চান, এই আলোচনার কথা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে জানাতে আমার কোনো আপত্তি আছে কিনা। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি, কংগ্রেস যেহেতু তার মতামত প্রকাশ্যভাবেই ঘোষণা করেছে এবং বর্তমান আলোচনাতেও সে কোনোরকম গোপনীয়তার আশ্রয় নেয়নি, সে অবস্থায় আলোচনার বিষয়বস্তু যে-কোনো ব্যক্তিকেই জানানো যেতে পারে।

জেনারেলিসিমোর ভারত ভ্রমণের সময় ভারত সরকার বেশ কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়েছিল। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশাটা ভারত সরকার সুনজরে দেখতে পারছিলো না। সরকার হয়তো মনে করেছিলো, এর ফলে সারা পৃথিবীতে এমন একটি ধারণার সৃষ্টি হবে যে জেনারেলিসিমো কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যই ভারতে এসেছেন। সরকারের এই অস্বস্তির কথা তারা জেনারেলিসিমোকে জানিয়ে দিয়েছিলো কিনা তা আমার জানা নেই, তবে জেনারেলিসিমো যে তাঁর ভারত সফরের

উদ্দেশ্যের কথা সুস্পষ্টভাবে ভারত সরকারকে জানিয়ে দিয়েছিলেন সে কথা কারোরই অজ্ঞাত নেই। তিনি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি শুধু ভাইসরয় এবং কমাণ্ডার-ইন-চীফ-এর সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যই ভারতে আসেননি ; ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করাও তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য। তাঁর এই সুস্পষ্ট বক্তব্যের পরে ভারত সরকার আমাদের সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে আর কোনো বাধা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় না।

এরপর জেনারেলিসিমো তাজমহল দেখার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার তাঁর সফরসূচী তৈরি করেন। সেই সফরসূচীতে কেবলমাত্র সরকারের অনুমোদিত ব্যক্তিদেরই জেনারেলিসিমোর সঙ্গী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু মাদাম চিয়াং কাই-শেক যখন বলেন, তাজমহল যাবার সময় জওহরলাল নেহরু তাঁদের সঙ্গে থাকবেন তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও সরকার তা মেনে নিতে বাধ্য হয়।

দিল্লী সফর শেষ করে জেনারেলিসিমো কলকাতায় যাবেন বলে স্থির করেন। বাংলা সরকারকে একথা জানানো হলে তারা ব্যারাকপুরের পুরনো লাটপ্রাসাদে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে। জেনারেলিসিমো তখন তাঁর কলকাতার সফরসূচী জওহরলালকে জানিয়ে দিয়ে তাঁকেও কলকাতায় যাবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। জেনারেলিসিমোর অনুরোধে জওহরলাল কলকাতায় যান এবং তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করেন।

গান্ধীজীর সঙ্গে জেনারেলিসিমোর সাক্ষাৎকার

গান্ধীজী এই সময় কলকাতার বিড়লা পার্কে অবস্থান করছিলেন। জেনারেলিসিমো সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। প্রায় দু ঘণ্টা আলাপ-আলোচনা চলে তাঁদের মধ্যে। আলোচনার সময় জেনারেলিসিমো গান্ধীজীর কাছ থেকে তাঁর সত্যাগ্রহ ও অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাখ্যা জানতে চান। গান্ধীজী বলেন, সত্যাগ্রহ আন্দোলন তিনি সর্বপ্রথম শুরু করেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখানে আন্দোলনের কোনো নিয়মকানুন ছিলো না। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে তিনি যখন সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন তখন তা ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ নেয়। এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনেরই পরিণত চেহারা হলো অহিংস অসহযোগ আন্দোলন।

জেনারেলিসিমো যখন গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করেন আমি তখন কলকাতায় ছিলাম না। গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু আমি জওহরলালের কাছ থেকে পরে শুনতে পাই। জওহরলাল আমাকে বলেন, ওঁদের মধ্যে আলোচনা এমনই নিষ্প্রাণ ছিলো যে জেনারেলিসিমোর মনে তা কোনোরকম রেখাপাত করতে পারেনি। আমার কিন্তু মনে হয়, জেনারেলিসিমো গান্ধীজীর বক্তব্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। যাঁর প্রবল ব্যক্তিত্ব এবং ক্ষুরধার বক্তব্যের জন্য বিদেশীরা চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হন সেই গান্ধীজী জেনারেলিসিমোকে প্রভাবিত করতে না পারার আর কি কারণ থাকতে পারে? যাই হোক, এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করা আমার পক্ষে সহজ হবে বলে মনে হয় না।

ভারত পরিত্যাগের পূর্বে জেনারেলিসিমো ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কাছে আর একবার আন্তরিকভাবে আবেদন করেন। উক্ত আবেদনে তিনি যতো শীগগির সম্ভব ভারতীয়দের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর করবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু সুস্পষ্টভাবেই বুঝতে পারা যায়, ভারতীয়দের হাতে অগৌণে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি ভাইসরয় অথবা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে আদৌ প্রভাবিত করতে পারেননি।

ক্রিপস দৌত্য

যুদ্ধ যতোই বিস্তৃত হতে লাগলো ভারতের জনগণও ততোই আশা করতে লাগলো, এবার হয়তো ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবে। জনগণের সেই আশাই অবশেষে রূপ পরিগ্রহ করলো। ১৯৪২ সনে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের একটি প্রস্তাব নিয়ে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ভারতে এসে হাজির হলেন। (ইতিহাসে এটাকেই বলা হয় ক্রিপস মিশন বা ক্রিপস দৌত্য—অনুবাদক।) তবে ক্রিপস দৌত্য সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করার আগে কিছু পূর্বকথা আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছি।

যুদ্ধ শুরু হবার কিছুদিন পরে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস আরো একবার ভারতে এসেছিলেন। সে সময় আমার সঙ্গে তিনি অনেকবার আলোচনা করেন। তখন ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হয়। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসও তখন ওয়ার্ধায়। ওখানেও আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়। সে আলোচনায় ভারতের যুদ্ধে যোগদানের কথাই

প্রাধান্য লাভ করে।

আলোচনার সময় স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস একাধিকবার গান্ধীজীর মতামত সম্পর্কে মন্তব্য করেন। গান্ধীজীর যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাবের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যুদ্ধের বিরুদ্ধে গান্ধীজী যেরকম দৃঢ় মনোভাব পোষণ করছেন তাতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে ভারতের কোনোরকম আপসই সম্ভব নয়। তবে ও ব্যাপারে আমি যে অভিমত ব্যক্ত করি তাতে পরবর্তী আলোচনার দরজা সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ হয় না। স্যার ক্রিপস তখন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যদি ভারতবাসীর স্বাধীনতার দাবি মেনে নেয় তাহলে ভারতের জনসাধারণ আমার কথা মেনে নেবে কিনা। এর উত্তরে আমি বলি, গান্ধীজীকে আমরা যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি এবং তাঁর মতামতকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিই, তবে এই বিশেষ ব্যাপারটিতে কংগ্রেসের বেশীর ভাগ লোক তথা সারা দেশই আমার পিছনে দাঁড়াবে। আমি তাঁকে আরো বলি, ভারত যদি স্বাধীনতা লাভ করে তাহলে ভারতের জনসাধারণ সামগ্রিকভাবে যুদ্ধের ব্যাপারে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসবে।

আমার কথায় খুশী হয়ে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস তখন আরো একটি প্রশ্ন করেন। প্রশ্নটি ছিলো, ভারত থেকে বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্য সংগ্রহ করা যাবে কিনা।

এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি, যুদ্ধের ব্যাপারে আমরা সর্বতোভাবেই সহায়তা করবো এবং ভারতের সহযোগিতা যাতে সর্বাত্মক হয় তা আমরা দেখবো।

স্যার স্ট্যাফোর্ড তখন তাঁর রচিত একটি খসড়া প্রস্তাব আমাকে দেখতে দেন। এই প্রস্তাবে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এবং ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে কিভাবে একটা আপস হতে পারে তার একটা পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিলো। প্রস্তাবে তিনি বলেছিলেন, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট অবিলম্বে এক ঘোষণাবাণীর মাধ্যমে জানিয়ে দেবে যে যুদ্ধ শেষ হলেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষিত হবে। উক্ত ঘোষণাবাণীতে আরো উল্লিখিত থাকবে যে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ভেতরে থাকবে কিনা তা সে নিজেই স্থির করবে। অবিলম্বে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তা হলো, যুদ্ধ চলাকালে ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিল নতুন করে গঠন করা হবে এবং কাউন্সিলের সদস্যরা মন্ত্রীদের মতোই কাজ করবেন। ভাইসরয় থাকবেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে। এতে আইনসম্মতভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত না

হলেও প্রকৃতপক্ষে একে ক্ষমতা হস্তান্তরই বলা চলে। আইনসঙ্গত ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে যুদ্ধ শেষ হবার পরে।

স্যার স্ট্যাফোর্ড তাঁর এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার মতামত জানতে চান। আমি তাঁকে বলি, এইরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হঠাৎ কোনোরকম মন্তব্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আমি তাঁকে জানিয়ে দিই, ভারতের জনসাধারণ যদি বুঝতে পারে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সত্যি সত্যিই ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিচ্ছে তাহলে আমাদের ভেতরের সবরকম মতবিরোধের অবসান ঘটাবার পথ আমরা নিশ্চয়ই বের করবো।

ভারত থেকে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস বে-সরকারী পরিদর্শক (non-official visitor) হিসেবে রাশিয়ায় যান। এর অব্যবহিত পরেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাঁকে রাশিয়ায় ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের দূত হিসেবে নিযুক্ত করে। স্যার স্ট্যাফোর্ডের তখন বৃহস্পতির দশা চলছে। ভারতে তাঁর দৌত্যকার্যের সাফল্য সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এমন সব কথা প্রচারিত হতে থাকে যে অচিরেই তাঁর খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি রাশিয়ায় ব্রিটিশ দূত নিযুক্ত হবার পরেও এমন সব খবর প্রচার হতে থাকে, যেন তাঁর দৌত্যের ফলেই রাশিয়া মিত্রপক্ষের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়েছে। হিটলার আর স্তালিনের মধ্যে যে বৈরীভাব সৃষ্ট হয়েছিলো তার পেছনেও স্যার স্ট্যাফোর্ডের কৃতিত্ব ছিলো বলে জোরালো প্রচার চলে। এইসব প্রচারের ফলে বিশ্ববাসী তাঁকে প্রথম শ্রেণীর কূটনীতিবিশারদ বলে মনে করতে থাকে। কিন্তু সংবাদপত্রে তাঁর সম্বন্ধে বড় বড় কথা প্রচারিত হলেও রাশিয়ায় গিয়ে সোভিয়েট নীতিকে তিনি সত্যিই প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত মতামত যাই হোক না কেন, তাঁর খ্যাতি যে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিলো তাতে কোনোই ভুল নেই। এরপর তিনি যখন ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন তখন ইংলণ্ডের জনসাধারণ এমন কথাও মনে করতে থাকে যে মিঃ চার্চিলের পরে তিনিই হবেন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী।

ইতিপূর্বে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সম্বন্ধে আলোচনার সময় আমি বলেছি, ভারতের সঙ্গে একটা মিটমাট করে নেবার জন্য তিনি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে চাপ দিয়েছিলেন। এরপর জাপান যখন পার্ল হারবার আক্রমণ করলো তখন যুদ্ধের ব্যাপারে ভারতের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য লাভের জন্য মার্কিন জনমত রীতিমতো সোচ্চার হয়ে ওঠে। এমন কি, মিঃ চার্চিলও একসময় মনে করেন, এ ব্যাপারে অবিলম্বেই কিছু করা দরকার। তিনি তাই ভারত সম্বন্ধে এক

নতুন নীতি গ্রহণ করেন এবং তাঁর সেই নীতিকে ভারতীয় নেতাদের কাছে ব্যাখ্যা করার জন্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে মনোনীত করেন।

আগেই বলেছি, স্যার স্ট্যাফোর্ড রাশিয়া থেকে ইংলণ্ডে ফেরবার পরে ইংলণ্ডের জনসাধারণ তাঁর সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতে থাকে। তাদের মনে এইরকম একটা ধারণার সৃষ্টি হয় স্যার স্ট্যাফোর্ডের দৌত্যের ফলেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তথা মিত্রপক্ষ মস্কোতে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছে। এ ছাড়া ভারতের সমস্যা সমাধানের জন্যও তিনি অনেকদিন থেকেই আগ্রহ প্রকাশ করে আসছিলেন। আমার মনে হয় ওয়ার্ধায় থাকাকালে তিনি যে বিবৃতিটি রচনা করেছিলেন তা তিনি মিঃ চার্চিলকে দেখিয়েছিলেন। আমার আরো মনে হয়, মিঃ চার্চিল তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, মিঃ ক্রিপসের মনে এইরকম একটা ধারণা বদ্ধমূল হয় যে চার্চিল তাঁর পরিকল্পনা মেনে নেবেন। এবং এই কারণেই মিঃ চার্চিল যখন তাঁকে একটি রাজনৈতিক মিশনের প্রধান হিসেবে ভারতে যাবার জন্য অনুরোধ করেন, তিনি তখন সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ চার্চিলের অনুরোধ রক্ষা করতে স্বীকৃত হয়ে ভারতে আসতে সম্মত হন। তাঁর হয়তো মনে হয়েছিলো আগের বার আমার সঙ্গে তাঁর যেসব আলোচনা হয়েছিলো তার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বর্তমান প্রস্তাবটি কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হবে।

এর কয়েকদিন পরে ক্রিপস মিশন সম্বন্ধে বি. বি. সি. কর্তৃক একটি ঘোষণা প্রচারিত হয়। বি. বি. সি. কর্তৃক প্রচারিত উক্ত ঘোষণাটি ভারতে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সেই ঘোষণার বিষয়বস্তু নিয়ে ভারতের জনগণের মধ্যে নানারকম ধারণার সৃষ্টি হয়, কিন্তু বৃটিশ গভর্নমেন্ট কী প্রস্তাবসহ ক্রিপস মিশনকে ভারতে পাঠাচ্ছেন তা জানতে না পারায় সমগ্র বিষয়টা একটা আন্দাজের মধ্যেই থেকে যায়। বি. বি. সি.র সেই ঘোষণাটি ভারতে শুনতে পাওয়া যায় ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ১১ই মার্চ রাত ৮টায়। এই ঘোষণা প্রচারিত হবার এক ঘণ্টার মধ্যেই সাংবাদিকরা আমার সঙ্গে দেখা করে এ সম্বন্ধে আমার মতামত জানতে চান। আমি তাঁদের বলি :

> স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস কি প্রস্তাব নিয়ে আসছেন তা না জানা পর্যন্ত এবং প্রস্তাবটি পরীক্ষা করে না দেখা পর্যন্ত এ বিষয়ে আমি কোনো মতামত দিতে পারি না। তবে একটা কথা আপনারা জেনে নিতে পারেন, স্যার স্ট্যাফোর্ডকে আমি আমার পুরনো বন্ধু হিসেবে স্বাগত জানাবো এবং তাঁর মতামত গ্রহণ করতে চেষ্টা করবো।

এর পরেও সাংবাদিকরা আমার মতামত জানবার জন্য বিশেষভাবে চাপ দিতে থাকেন, কিন্তু তাঁদের চাপ সত্ত্বেও আমি ও ব্যাপারে আর কিছু বলতে সম্মত হইনি।

আমি যখন ওয়ার্ধায় ছিলাম সেই সময় ভাইসরয় আমার কাছে একটি টেলিগ্রাম করে তাতে জানিয়ে দেন ইংলণ্ডের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে একটি মিশনসহ ভারতে পাঠাবেন বলে স্থির করেছেন। ভারতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি যে প্রস্তাব নিয়ে আসছেন সে সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য আমার দিল্লীতে আসা দরকার। ভাইসরয়ের আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করি এবং সে কথা তাঁকে জানিয়ে দিই।

ভারতে আসবার আগে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ভাইসরয়কে একটি চিঠি লিখে জানিয়ে দেন, ভারতের সব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পার্টির নেতাদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করতে চান। কোন্ কোন্ নেতার সঙ্গে তিনি দেখা করবেন তার একটি তালিকা ভারত সরকার আগে থেকেই তৈরি করে রেখেছিলেন। উক্ত তালিকায় যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছিলো তাঁদের সবাইকে দিল্লীতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ছাড়া মুসলিম লীগ এবং হিন্দুমহাসভার নেতাদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ ছাড়া দেশীয় রাজন্যবৃন্দ এবং পাঞ্জাবের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খান বাহাদুর আল্লা বক্সকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। খান বাহাদুর আল্লা বক্স কয়েক মাস আগে দিল্লীতে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের এক সম্মেলনে নেতৃত্ব করেছিলেন বলে রাজনীতিক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছিলেন। আমি ওই সম্মেলনে অংশগ্রহণ না করলেও সম্মেলনের সাফল্যের জন্য উদ্যোক্তাদের নানাভাবে সাহায্য করেছিলাম। সারা ভারত থেকে ১৪০০ প্রতিনিধি উক্ত সম্মেলনে যোগদান করার জন্য দিল্লীতে এসেছিলেন। বিরাট উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্যে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের চেহারা দেখে ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্রগুলোও জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের বক্তব্য এবং ভারতের রাজনীতিতে তাদের ভূমিকাকে ছোট করে দেখাতে সাহস পায়নি। তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয় ভারতের রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং সে ভূমিকা কোনোক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়।

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ দিল্লীতে পদার্পণ করার অব্যবহিত পরেই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আমাদের মধ্যে প্রায় সাক্ষাৎকার হয় ১৯৪২ সনের

২৯শে মার্চ বিকেল তিনটেয়। তখনই স্যার স্ট্যাফোর্ড তাঁর প্রস্তাব সংবলিত একটি বিবৃতির খসড়া আমাকে দেখতে দেন। তিনি বলেন, বিবৃতিতে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে সেসব সম্বন্ধে আলোচনা করতে এবং দরকার হলে ব্যাখ্যা করতে তিনি প্রস্তুত আছেন। (পাঠকদের অবগতির জন্য স্যার স্ট্যাফোর্ডের সেই বিবৃতিটি এই গ্রন্থেও পরিশিষ্ট অংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।)

বিবৃতিটি পড়বার পরে আমি দেখতে পাই তাতে একটি নতুন একজিকিউ-টিভ কাউন্সিল গঠনের কথা বলা হয়েছে। নতুন কাউন্সিল সম্বন্ধে বলা হয়েছে, পূর্ববর্তী কাউন্সিলের সদস্যরা তাঁদের সদস্যপদ পরিত্যাগ করবেন এবং তাঁদের জায়গায় কংগ্রেস ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিমূলক রাজনৈতিক দলগুলোকে নতুন কাউন্সিলের জন্য তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে অনুরোধ করা হবে। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, নতুন কাউন্সিল যুদ্ধের স্থায়িত্বকাল পর্যন্ত কাজ করবে। আরো বলা হয়, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট একটি ঘোষণাবাণীর মাধ্যমে জানিয়ে দেবে যে যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের স্বাধীনতার বিষয়টি বিবেচিত হবে। অর্থাৎ, স্যার স্ট্যাফোর্ডের প্রস্তাবের মোদ্দা কথাটা হলো, ইংরেজ সংখ্যাগরিষ্ঠ একজিকিউটিভ কাউন্সিলের পরিবর্তে ভারতীয় সদস্য নিয়ে কাউন্সিল গঠিত হবে এবং পূর্ববর্তী ইংরেজ সদস্যরা সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করবেন। গভর্নমেন্ট যেমন আছে তেমনই থাকবে।

প্রস্তাবিত ভারতীয় একজিকিউটিভ কাউন্সিল

স্যার স্ট্যাফোর্ডকে আমি জিজ্ঞেস করি, এই কাউন্সিলে ভাইসরয়ের অবস্থানটা কিরকম হবে? আমার প্রশ্নের উত্তরে স্যার স্ট্যাফোর্ড বলেন, ভাইসরয় ওখানে ইংলণ্ডের রাজার মতো নিয়মতান্ত্রিক প্রধানরূপে অবস্থান করবেন। বিষয়টাকে পরিষ্কার করে নেবার উদ্দেশ্যে আমি জানতে চাই, ভাইসরয় কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন কি না। এর উত্তরে স্যার স্ট্যাফোর্ড বলেন, এইরকমই তিনি মনে করেন। এরপর আমি জানতে চাই, আসল ক্ষমতা কার হাতে থাকবে,—কাউন্সিলের হাতে, না, ভাইসরয়ের হাতে? স্যার স্ট্যাফোর্ড বলেন, ক্ষমতা কাউন্সিলের হাতেই থাকবে, কারণ কাউন্সিল এখানে অনেকটা ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের মতো কাজ করবে। এরপর আমি 'ইণ্ডিয়া অফিসে'র প্রশ্ন তুলি। ইণ্ডিয়া অফিসের কী হবে সে সম্বন্ধে আমি

তাঁর ব্যাখ্যা দাবি করি। আমার প্রশ্নের উত্তরে স্যার স্ট্যাফোর্ড প্রথমে বলেন, এ বিষয়টা নিয়ে তিনি এখনো কিছু চিন্তা করেননি। পরে তিনি একটু চিন্তা করে বলেন, ইণ্ডিয়া অফিস যেমন আছে তেমনই থাকবে এবং ভারতসচিবও থাকবেন। তবে ভারতসচিবের কাজ হবে ডোমিনিয়ন সেক্রেটারীর মতো। অন্যান্য ডোমিনিয়নের ক্ষেত্রে ডোমিনিয়ন সেক্রেটারী যেভাবে কাজ করেন ভারতের ক্ষেত্রে ভারতসচিব সেইভাবেই কাজ করবেন।

আমি তখন বিস্তারিতভাবে আমাদের পূর্ববর্তী প্রস্তাবসমূহের উল্লেখ করে তাঁকে বলি, যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকেই ভারত বারবার বলে এসেছে যে তাকে যদি স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাহলে সে নিশ্চয়ই যুদ্ধে অংশহণ করবে, কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতের প্রস্তাবে কর্ণপাত করেনি; সুতরাং যুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণ না করার ব্যাপারে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টই দায়ী। স্যার স্ট্যাফোর্ড তখন বারবার এজন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, আগে যা হবার হয়ে গেছে, কিন্তু এবার তিনি স্থিরনিশ্চয় হয়েছেন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বর্তমান প্রস্তাবটি গৃহীত হলে সমস্ত রকম মতবিরোধেরই অবসান হবে। (…he felt convinced that all this would now end and if the offer he had brought on behalf of the British Cabinet was accepted.)

এইভাবেই মতবিনিময়ের ভেতর দিয়ে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎকার সমাপ্ত হয়।

এই সাক্ষাৎকারের অব্যবহিত পরেই ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহ্বান করা হয়। সভার অধিবেশন ২৯শে মার্চ থেকে ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত চলে। এরকম দীর্ঘস্থায়ী অধিবেশন এর আগে আর হয়নি। যেরকম আশা করা গিয়েছিলো, সভায় ঠিক সেইরকমই দেখা গেলো। স্যার স্ট্যাফোর্ডের প্রস্তাবটিকে সদস্যরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিবেচনা করতে শুরু করলেন।

গান্ধীজী প্রথম দিন থেকেই প্রস্তাবটির বিরুদ্ধতা করছিলেন। তাঁর যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাবটাই এ ব্যাপারে প্রাধান্য পেয়েছিলো। এবং এই মনোভাবের জন্যই প্রস্তাবের অন্যান্য দিক সম্বন্ধে তিনি চিন্তা করেননি। ভারতবর্ষ যুদ্ধে জড়িত হবে এটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। এবং সেইজন্যই তিনি প্রস্তাবটির প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করছিলেন। তাছাড়া প্রস্তাবের শেষদিকের বক্তব্যকেও তিনি সুনজরে দেখতে পারেননি। ওখানে বলা হয়েছিলো, যুদ্ধের শেষে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগকে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য একটি সুযোগ দেওয়া হবে।

গান্ধীজী যখন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সঙ্গে প্রথমবার দেখা করেন তখনো মিঃ ক্রিপস তাঁকে তাঁর (ক্রিপসের) প্রাথমিক বিবৃতির কথা মনে করিয়ে দেন। ক্রিপস বলেন, উক্ত বিবৃতিটি গান্ধীজী এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেই তিনি রচনা করেছিলেন। এর মর্মকথা হলো, যুদ্ধ চলাকালে একজিকিউটিভ কাউন্সিলকে পুরোপুরিভাবে ভারতীয় করা হবে এবং যুদ্ধ শেষ হলে ভারতকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করা হবে। বর্তমানে তিনি যে প্রস্তাবটি নিয়ে এসেছেন সেটি মূলত তাঁর সেই পূর্ববর্তী বিবৃতিরই অনুরূপ।

গান্ধীজী বলেন, ওরকম কোনো বিবৃতির কথা তিনি স্মরণ করতে পারছেন না। তাঁর শুধু এই কথাটাই মনে আছে, সে সময় মিঃ ক্রিপসের সঙ্গে শুধু নিরামিষ ভোজন সম্বন্ধে কথা হয়েছিল। এর উত্তরে ক্রিপস বলেন, এটা তাঁর নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে গান্ধীজী শুধু খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনার কথাটাই মনে রেখেছেন, কিন্তু তিনি যে গান্ধীজীর সঙ্গে পরামর্শ করেই বিবৃতিটি রচনা করে-ছিলেন সেকথা তিনি আদৌ স্মরণ করতে পারছেন না।

আলোচনার সময় গান্ধীজী এবং ক্রিপসের মধ্যে নানা বিষয়ে মতবিনিময় হয়েছিলো এবং তাঁদের সে আলোচনা বেশ সরস ও হৃদয়গ্রাহীও হয়েছিলো, তবে সেই বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার মধ্যেও উভয়ের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিয়েছিলো। গান্ধীজী বলেছিলেন, প্রস্তাবগুলো এমনভাবে কাটাই করে এবং শুকিয়ে নিয়ে,তৈরি হয়েছে যে তা নিয়ে বিচার-বিবেচনা করবার আর কোনো সুযোগই দেখা যাচ্ছে না। তিনি হাসতে হাসতে ক্রিপসকে সাবধান করে দিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, আমি তাঁকে এমন একটা সুদীর্ঘ রজ্জু দিয়েছি যার সম্বন্ধে তাঁর সচেতন থাকা দরকার। স্যার ক্রিপসও তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ হাস্যরসাত্মক বাক্যে এর উত্তর দেন। তিনি বলেন, আমার সেই দীর্ঘ রজ্জুটা যে তাঁকে ফাঁসীতে ঝোলাতে পারে সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত আছেন।

এশিয়া এবং ইয়োরোপের তৎকালীন অবস্থা এবং ঘটনাবলীর প্রসার দেখে জওহরলাল গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বিশেষভাবে মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর স্বাভাবিক সহানুভূতি ছিলো গণতান্ত্রিক শিবিরের পক্ষে এবং সেইজন্য তিনি গণতান্ত্রিক শিবিরকে যতোটা সম্ভব সাহায্য করবার জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন, এবং এই কারণেই তিনি প্রস্তাবটা সুবিবেচনার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ভারতের জনমত তখন এতো বেশি ইংরেজবিরোধী ছিলো যে তিনি

জোরের সঙ্গে কিছু বলতে পারছিলেন না। আমি তাঁর সেই অব্যক্ত মনোভাব বুঝতে পারি এবং তাঁর মতামতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে পড়ি।

ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে বেশির ভাগেরই যুদ্ধ সম্বন্ধে কোনোরকম সুস্পষ্ট অভিমত ছিলো না। এঁরা সবাই তাকিয়ে ছিলেন গান্ধীজীর দিকে। এ ব্যাপারে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন শ্রীরাজাগোপালাচারী। তিনি প্রস্তাবটি গ্রহণের পক্ষেই তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য সদস্যরা তাঁর মতামতকে কোনোরকম গুরুত্ব না দিয়ে তাঁকে নরমপন্থী বলে মনে করছেন। এটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।

ওয়ার্কিং কমিটি দুদিন ধরে প্রস্তাবটা নিয়ে বিচার-বিবেচনা করলেও কোনোরকম সিদ্ধান্তে আসতে পারেন না। অবস্থা দেখে আমার মনে হয়, প্রস্তাব সম্পর্কে আরো ব্যাখ্যা এবং কোনো কোনো বিষয়ে আরো বিস্তৃত বিবরণ স্যার স্ট্যাফোর্ডের কাছ থেকে সংগ্রহ করা দরকার। যে মৌলিক প্রশ্নে স্যার স্ট্যাফোর্ডের কাছ থেকে ব্যাখ্যা চাওয়া হয় তা হলো একজিকিউটিভ কাউন্সিলের ক্ষমতা। স্যার স্ট্যাফোর্ড বলেছিলেন, কাউন্সিল আগের মতোই থাকবে। তবে তা গঠিত হবে বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বারা। তিনি আমাকে মৌলিকভাবে এমন আশ্বাসও দিয়েছিলেন যে ভাইসরয় শুধু নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হয়ে থাকবেন। ওয়ার্কিং কমিটি বলেন এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রস্তাবের মধ্যে উল্লিখিত থাকা দরকার। ওয়ার্কিং কমিটির এই দাবি অনুসারে আমি ১লা এপ্রিল (১৯৪২) আর একবার ক্রিপসের সঙ্গে দেখা করি।

স্যার স্ট্যাফোর্ডের অসঙ্গতিপূর্ণ উত্তর

স্যার স্ট্যাফোর্ডের সঙ্গে এবারের সাক্ষাৎকারটা হয় রীতিমতো বস্তুনিষ্ঠভাবে। প্রায় তিন ঘণ্টা আমাদের মধ্যে আলোচনা চলে। এই সময় আমি লক্ষ্য করি, অবস্থাটা ইতিমধ্যে সম্পূর্ণভাবে পালটে গেছে। তাঁর এবারের কথাগুলোর মেজাজ পূর্ববর্তী কথাগুলোর চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। আমি যখন তাঁর কাছে একজিকিউটিভ কাউন্সিলের ব্যাখ্যা দাবি করি তখন তিনি বলেন, যুদ্ধের সময়ও কাউন্সিল মন্ত্রিসভার মতো কাজ করবে বলেই তিনি আশা করেন। আমি তখন জানতে চাই, এর অর্থ কি এই—কাউন্সিলের বেশির ভাগ সদস্য যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে সেই সিদ্ধান্তই হবে শেষ এবং অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত?

ক্রিপস তখন এক অসঙ্গতিপূর্ণ উত্তর দেন। শেষ সিদ্ধান্ত যে ভাইসরয়ের ওপরেই ন্যস্ত থাকবে সেকথা তিনি স্পষ্ট করে না বললেও তিনি যা বলেন তার মর্মকথা হলো, শেষ এবং অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা কাউন্সিলের থাকবে না। বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করবার জন্য তিনি যা বলতে চেষ্টা করেন তা হলো, ভাইসরয় বর্তমানে যে অবস্থায় রয়েছেন, আইনগত দিক থেকে সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। তবে তিনি বারবার একটা কথার ওপর জোর দেন, আইনগত দিক থেকে ভাইসরয়ের অবস্থা যাই হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবেই কাজ করবেন।

আমি স্যার স্ট্যাফোর্ডকে স্মরণ করিয়ে দিই পূর্ববর্তী সাক্ষাৎকারের সময় তিনি আরো বেশি বস্তুনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি তখন সওয়াল করে আমাকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেন, মৌলিক অবস্থার কোনোই পরিবর্তন হয়নি। আগে তিনি যে কথা বলেছিলেন এখনও সেই কথাই বলছেন। আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিই আগের বার আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন কাউন্সিল ঠিক মন্ত্রিসভার মতোই কাজ করবে কিন্তু আজ তিনি বলছেন আইনগত অবস্থাটা অপরিবর্তিত থাকবে। এবং এবার তিনি আমাকে শুধু মৌলিকভাবে আশ্বাস দিতে চাইছেন কাউন্সিল মন্ত্রিসভার মতো কাজ করবে বলেই তিনি আশা করেন। প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় যে কথা আমাকে বলা হয়েছিলো এবং তার ফলে যেরকম ধারণা নিয়ে গিয়েছিলাম তা ঠিক এবারের মতো নয়। আমি তখন ইণ্ডিয়া অফিস এবং ভারতসচিবের (Secretary of State for India) কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি তখন বলেছিলেন, ভারতসচিব কমনওয়েলথ সেক্রেটারীর মতো কাজ করবেন। কিন্তু এখন তিনি বলছেন, ইণ্ডিয়া অফিস এবং ভারতসচিবের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাতে হলে পার্লামেন্টে নতুন করে আইন পাস করাতে হবে। এর উত্তরে ক্রিপস বলেন, তিনি আশা করেন ইণ্ডিয়া অফিস পরিবর্তিত অবস্থাটা উপলব্ধি করে নতুন পরিস্থিতি অনুসারে কাজ করবে, তবে ভারতসচিবের অবস্থানকে কমনওয়েলথ সেক্রেটারীর পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য আইন প্রণয়ন করতে নানারকম অসুবিধে আছে।

এরপর আমি যুদ্ধশেষে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে বলে যে কথাটা বলা হয়েছে সেই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করি। ক্রিপস বলেন, ভারতের সমস্যাবলীকে যুদ্ধের পরে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা হবে এবং তার ফলে ভারত তার নিজের ভাগ্য নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তিনি তাই বন্ধুভাবে

আমাদের পরামর্শ দিচ্ছেন আমরা যেন আর কোনো বাধার সৃষ্টি না করে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের প্রস্তাবটা যেভাবে এসেছে ঠিক সেইভাবেই গ্রহণ করি। তিনি আরো বলেন, ভারত যদি যুদ্ধ চলাকালে ব্রিটেনের সঙ্গে সর্ববিষয়ে সহযোগিতা করে চলে তাহলে যুদ্ধশেষে তার স্বাধীনতা প্রাপ্তিও সুনিশ্চিত।

স্যার স্ট্যাফোর্ডের এই মত পরিবর্তন নিয়ে ভারতে এবং ভারতের বাইরেও নানারকম সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় তিনি যেসব অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, দ্বিতীয় পর্যায়ে কেন তিনি তা থেকে সরে এসে অন্যরকম কথা বললেন তা নিয়ে নানারকমের জল্পনাকল্পনা শুরু হয়। নানারকমের ব্যাখ্যাও চলতে থাকে বিষয়টা নিয়ে। একটি ব্যাখ্যা হলো, স্যার স্ট্যাফোর্ড হয়তো আশা করেছিলেন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের প্রস্তাবে মৌলিক পরিবর্তনের কথা না থাকলেও তিনি জোরালো সওয়ালের সাহায্যে এবং বিশেষ করে তাঁর চিত্তাকর্ষক চালচলনের দ্বারা কংগ্রেস কর্তৃক প্রস্তাবটা গ্রহণ করাতে সক্ষম হবেন। এবং এই কারণেই তিনি প্রথমদিকে কংগ্রেস নেতাদের সামনে আশার একটি আলোকবর্তিকা তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কংগ্রেস নেতারা যখন প্রস্তাবটাকে নানাদিক থেকে বিচার-বিবেচনা করে নতুন করে ব্যাখ্যা দাবি করেন এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁকে জেরা করতে শুরু করেন তখন তিনি কথা বলবার সময় রীতিমতো সাবধান হয়ে যান। তিনি তখন এমন কোনো কথা বলেন না যা ভবিষ্যতে রক্ষিত হবে না। এ ব্যাপারে আর একটি বিকল্প ব্যাখ্যাও করা হয়। এটি হলো, কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে প্রথম এবং দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের অন্তর্বর্তী সময়ে ভারত সরকার তাঁকে সাবধান হতে পরামর্শ দেন। তিনি সব সময় ভাইসরয় এবং তাঁর বশংবদ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। সুতরাং এটা মনে করা অসঙ্গত হবে না যে স্যার স্ট্যাফোর্ডের পরবর্তী কথাবার্তায় তাঁদের অভিমতই প্রতিধ্বনিত হয়েছিলো। এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি ছাড়া আরো একটি ব্যাখ্যা সে সময় চালু ছিলো। এই তৃতীয় ব্যাখ্যাটি হলো, অন্তর্বর্তী সময়ে দিল্লী এবং লণ্ডনের মধ্যে মতবিনিময় হয়েছে এবং ইংলণ্ডের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা তাঁকে নতুন কোনো নির্দেশ দিয়েছেন এবং সেই নির্দেশের ফলেই তিনি তাঁর পূর্ববর্তী অভিমত থেকে দূরে সরে গেছেন।

তাঁর এই মত পরিবর্তনের পেছনে আসলে কী ঘটেছিল সে কথা আমার জানা নেই। তবে মনে হয়, উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যাগুলিতে যেসব কথা বলা হয়েছে তার এক বা একাধিক কারণে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেছিলেন।

ক্রিপস আসলে একজন অ্যাড্‌ভোকেট। সুতরাং আইনজীবীর মতোই তিনি প্রথমদিকে নানা বর্ণে রঞ্জিত করে প্রতিপক্ষের সামনে তুলে ধরে তাদের মন জয় করতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া সমস্ত বিষয়টাকে তিনি তাঁর নিজস্ব দৃষ্টি-ভঙ্গিতেই প্রথমদিকে বিচার করেছিলেন এবং নিজে যা মনে করেছিলেন সেই কথাই ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা যখন তাঁর কাছে বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা দাবি করি তখন তিনি বিপদ দেখে পশ্চাদপসরণ করেন। পরে আমি জানতে পারি মস্কোতেও তিনি ঠিক একই কায়দায় তাঁকে দেওয়া নির্দেশসমূহকে অন্যভাবে চিত্রিত করেছিলেন। এ ব্যাপারে একটি বোধগম্য ব্যাখ্যা দেওয়া চলে। একজন ইংরেজ হিসেবে তিনি লিখিত স্বীকৃতি অপেক্ষা প্রচলিত ধারা অনুসারে কাজ করার ওপরেই বেশি গুরুত্ব দিতেন। তিনি হয়তো মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন একবার যদি তাঁর প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তাহলে প্রচলিত ধারা অনুসারে তাঁর প্রথমের কথা অনুসারেই সমস্ত বিষয় চলতে থাকবে। সুতরাং সঙ্গতভাবেই তিনি কোনোরকম লিখিত আশ্বাস দিতে সম্মত হতে পারেননি। এবং এই কারণেই আমরা যখন তাঁর কাছে ব্যাখ্যা দাবি করি তখন তিনি তাঁর পূর্ববর্তী অভিমত থেকে পিছিয়ে গিয়েছিলেন।

এবারের সাক্ষাৎকারে তাঁর কাছ থেকে আমি যা জানতে পারি তাতে এক নতুন চিত্র ফুটে ওঠে। আমার তখন প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো ওয়ার্কিং কমিটির কাছে স্যার স্ট্যাফোর্ডের এই পশ্চাদপসরণকে সঠিকভাবে তুলে ধরা। আমি ওয়ার্কিং কমিটির কাছে ক্রিপসের সঙ্গে আমার দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ পেশ করি তার পরিপ্রেক্ষিতে ২রা এপ্রিল সকালে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন শুরু হয়।

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সঙ্গে আমার এই দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকারের বিবরণ আমি ২রা এপ্রিল সকালে ওয়ার্কিং কমিটির কাছে পেশ করি। অবস্থাটা আমি নিম্নবর্ণিতভাবে উপস্থাপিত করেছিলাম :

অবস্থাটা আমি যেভাবে বিশ্লেষণ করি

১। এবার আমি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি, ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা যুদ্ধ চলাকালে ভারতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে প্রস্তুত নন। ইংরেজরা মনে করছে যে এতে একটা বিরাট ঝুঁকি নেওয়া হবে। এবং সেই ঝুঁকি নিতে তারা প্রস্তুত নয়।

২। যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি এবং বিশেষ করে আমেরিকার চাপের ফলে ইংরেজদের মতিগতি সামান্য কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। চার্চিল সরকারও এখন মনে করছে যে যুদ্ধের ব্যাপারে ভারতের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাহায্য পাবার জন্য একটা কিছু করা দরকার। এইজন্যই তারা ভারতীয় সদস্যদের দ্বারা একজিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন করে সেই কাউন্সিলের হাতে কিছু বেশি ক্ষমতা দিতে চাইছে। আইনের চোখে কাউন্সিল শুধু কাউন্সিল হিসেবেই থাকবে, মন্ত্রিসভার মতো ক্ষমতা এরা পাবে না।

৩। বাস্তবক্ষেত্রে ভাইসরয় হয়তো কাউন্সিলের প্রতি কিছুটা সদয় মনোভাবই পোষণ করবেন এবং সাধারণভাবে কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন। তবে কাউন্সিল সব সময়ই তাঁর অধীনস্থ থাকবে এবং কোনো ব্যাপারে শেষ সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা তাঁর হাতেই থাকবে, কাউন্সিলের হাতে নয়।

৪। অতএব ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন, অর্থাৎ শেষ সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা কার হাতে থাকবে, তার উত্তরে বলা যায়, এটা ভাইসরয়ের হাতেই থাকবে।

৫। ক্রিপস যে বক্তব্য রেখেছেন সেই অনুসারে ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা হয়তো ভবিষ্যতে ভারতীয় সমস্যাটা একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করবেন, কিন্তু যুদ্ধের পরে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে কিনা তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

৬। যুদ্ধের পরে রক্ষণশীল সরকারের পরিবর্তে আবার কোনো নতুন সরকার গঠিত হবার বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে। এমনও হতে পারে, সেই নতুন সরকার ভারতের প্রশ্নটি সহানুভূতির সঙ্গেই বিচার করবে। কিন্তু এই ধরনের কোনো সম্ভাবনা বর্তমান প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

৭। এর ফলশ্রুতি হলো, কংগ্রেস যদি ক্রিপস প্রস্তাব গ্রহণ করে, তা করা হবে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে মেনে নিয়েই, অর্থাৎ যুদ্ধের পরে ভারতের ভবিষ্যৎ কী হবে সে সম্বন্ধে কোনোরকম নিশ্চয়তা না পেয়েই তা করা হবে।

ক্রিপস মিশন সম্পর্কে বি. বি. সি. যে ঘোষণা প্রচার করেছিলো সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে বিচার-বিবেচনা করি। উক্ত ঘোষণায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছিলো যে ভারত এবার তার নিজের ভাগ্য নিজেই নিয়ন্ত্রণ করবার সুযোগ পাবে। ক্রিপসের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় তিনিও এইরকম কথাই বলেছিলেন, আলোচনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববর্তী রঙীন চিত্রও ফিকে হয়ে আসতে থাকে।

অন্যান্য কারণেও আলোচনার-গতি ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়েছিলো। আমি আগেই বলেছি, স্যার স্ট্যাফোর্ড ভারতে আসবার সময় কিছু-সংখ্যক রাজনৈতিক নেতাকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য ভাইসরয়কে বলেছিলেন। এই নেতাদের মধ্যে পরলোকগত মিঃ আল্লা বক্সও ছিলেন। কিন্তু ভারতে এসে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী অভিমতের কিছুটা পরিবর্তন করেন। মনে হয়, ভাইসরয়ের প্রভাবের ফলেই এটা হয়েছিলো। আল্লা বক্স ভাইসরয়ের নিমন্ত্রণপত্র পেয়েই দিল্লীতে এসে স্যার স্ট্যাফোর্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, কিন্তু সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ স্থির হলো না। ব্যাপারটা একটা বিশ্রী অবস্থায় দাঁড়াচ্ছে দেখে আমি স্যার স্ট্যাফোর্ডের কাছে বিষয়টা উল্লেখ করি। তিনি তখন বলেন, শীগগিরই তিনি আল্লা বক্সের সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু ও কথা বলা সত্ত্বেও আল্লা বক্সের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কোনো ব্যবস্থাই হলো না। এর ফলে আল্লা বক্স রীতিমতো বিরক্ত হয়ে দিল্লী পরিত্যাগ করবেন বলে স্থির করেন। আমি যখন ব্যাপারটা জানতে পারি তখন আমি আর একবার স্যার স্ট্যাফোর্ডের কাছে বিষয়টা উত্থাপন করি। এবার আমি বেশ একটু দৃঢ়-ভাবেই তাঁকে বলি, আল্লা বক্সের সঙ্গে এরকম ব্যবহার করাটা তাঁর পক্ষে মোটেই উচিত হচ্ছে না। এতে যে শুধু আল্লা বক্সকেই অপমান করা হচ্ছে তাই নয়, মুসলমান সমাজের একটা বিরাট অংশকেও এর দ্বারা অপমান করা হচ্ছে। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সঙ্গে দেখা করবার অনিচ্ছা থাকলে সেটা আগেই স্থির করা উচিত ছিলো ; নিমন্ত্রণ করে এনে তাকে দিল্লীতে বসিয়ে রাখাটা মোটেই উচিত হচ্ছে না।

আমার হস্তক্ষেপের ফলে পরদিনই স্যার স্ট্যাফোর্ড আল্লা বক্সের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু সে সাক্ষাৎকার হয় নিতান্তই প্রহসনের মতো। মাত্র এক ঘন্টা তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। এবং সমগ্র আলোচনাটাই মামুলী ধরনের কথাবার্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আমার মতে ক্রিপস এ ব্যাপারে রাজনীতিকের মতো ব্যবহার করেননি।

আরো একটি ঘটনার ফলে আমার মনটা বিরূপ হয়ে ওঠে। ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার প্রস্তাবের বিষয়বস্তু প্রচারিত হবার পর সারা ভারতের বেশির ভাগ দৈনিক পত্রিকা তাঁর সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলোর ভাষা হয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং তীব্র। ওইসব সমালোচনা পড়ে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন চলাকালেই স্যার স্ট্যাফোর্ড আমার কাছে একখানা চিঠি লিখে তাতে মন্তব্য করেন, হিন্দু পত্রিকাগুলো

তাঁর প্রস্তাবকে সুনজরে না দেখলেও তিনি আশা করেন আমি তাঁর প্রস্তাবটি উদার দৃষ্টিতে দেখবো। তাঁর ওই 'হিন্দু পত্রিকা' কথাটা আমার মোটেই ভালো লাগেনি। আমার মনে হয়, আমি মুসলমান বলেই তিনি 'হিন্দু পত্রিকা' কথাটার ওপর জোর দিয়েছিলেন। কোনো পত্রিকার সমালোচনা অথবা মন্তব্য তাঁর মনঃপূত না হলে তিনি সংশ্লিষ্ট পত্রিকা অথবা পত্রিকা-গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা করতে পারতেন। যাই হোক, তাঁর সেই চিঠির উত্তরে আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জানিয়ে দিই, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বিষয়টাকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন না; পত্রিকার সমালোচনা যাই হোক না কেন, ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত তার দ্বারা প্রভাবিত হবে না।

ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন

ওয়ার্কিং কমিটির এবারের অধিবেশন ২৯শে মার্চ থেকে ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত চলে। এই সময় আমি সারাদিন কমিটির সভায় উপস্থিত থাকতাম এবং ২রা এপ্রিলের পর থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় স্যার স্ট্যাফোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করতাম। এই সময় জওহরলালও প্রায়ই আমার সঙ্গে থাকতেন। একমাত্র জওহরলাল ছাড়া ওয়ার্কিং কমিটির আর কোনো সদস্য তাঁর সঙ্গে দেখা করেননি, আমিই তাঁদের নিষেধ করেছিলাম। স্যার স্ট্যাফোর্ডের ভারতে আসবার কথা প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের স্যার স্ট্যাফোর্ডের সঙ্গে আলাদাভাবে দেখা করতে নিষেধ করে এক সারকুলার লেটার প্রেরণ করি। এরকম নিষেধাজ্ঞা জারি করবার কারণ হলো, আলাদা আলাদা ভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে সময় সময় এমন সব কথাও আলোচিত হতে পারতো যার ফলে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হওয়াও অসম্ভব ছিলো না। সারকুলার লেটারে আমি আরো বলি, পূর্ব-পরিচয়ের সূত্রে অথবা অন্য কোনো বিশেষ কারণে যদি কারো স্যার স্টাফোর্ডের সঙ্গে দেখা করার দরকার হয় তাহলে সে কথা তিনি যেন আগে আমাকে জানিয়ে তারপর দেখা করেন।

ক্রিপস আমার কাছে অভিযোগ জানান, আগেরবারে তিনি যখন ভারতে এসেছিলেন সে-সময় ওয়ার্কিং কমিটির অনেক সদস্যই তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন কিন্তু এবার আমি নিষেধাজ্ঞা জারি করায় কোনো সদস্যই তাঁর সঙ্গে

দেখা করছেন না। কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের আপত্তির জন্য তাঁরা সামাজিক অনুষ্ঠানেও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না।

স্যার স্ট্যাফোর্ডের এই অভিযোগের উত্তরে আমি বলি, একটি দায়িত্বশীল সংগঠন যখন গভর্নমেন্টের সঙ্গে আলোচনায় ব্রতী হয়েছে তখন সে আলোচনাটা তাদের মুখ্য প্রতিনিধির মারফত হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় এবং এই কারণেই ওয়ার্কিং কমিটি স্থির করেছেন, গভর্নমেন্টের সঙ্গে যা কিছু আলোচনা হবে তার সবই হবে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে। অন্যান্য সদস্যদের পক্ষে আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করাটা মোটেই ঠিক হবে না। তবে ক্রিপস যদি নিজে থেকে কোনো সদস্যের সঙ্গে দেখা করতে চান আমি তাতে আনন্দের সঙ্গেই সম্মতি দেবো।

ক্রিপস তখন বলেন তিনি ভুলাভাই দেশাইয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত। আগের বারে ভুলাভাইয়ের বাড়িতেই তিনি ছিলেন। নিজের পরনের খাদি স্যুটটি দেখিয়ে স্যার স্ট্যাফোর্ড বলেন, আজ যে পোশাক আমি পরে আছি, এটাও ভুলাভাই দেশাইয়েরই উপহার।

ক্রিপসের কাছ থেকে এই কথা শোনবার পর আমি ভুলাভাই দেশাইকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলি এবং তিনিও দেখা করেন।

এদিকে প্রস্তাব সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটিতে আলোচনা চলতেই থাকে। গান্ধীজী প্রথম থেকেই উক্ত প্রস্তাব গ্রহণের বিরুদ্ধে ছিলেন। তবে জওহরলাল ছিলেন প্রস্তাবটা গ্রহণের পক্ষে। আমি কিন্তু তাঁদের উভয়ের মতামতেরই বিরুদ্ধে ছিলাম। গান্ধীজী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ছিলেন, কারণ তাঁর অভিমত আগাগোড়াই যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিলো। অন্যদিকে জওহরলাল প্রস্তাবটা গ্রহণের পক্ষে ছিলেন গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠার জন্য। এ ছাড়া ভারতের জনগণের কাছে মার্শাল চিয়াং কাই-শেক যে আবেদন জানিয়েছিলেন সেই আবেদনটাও তাঁর মনকে প্রভাবিত করেছিলো। জওহরলাল যে অভিমত পোষণ করতেন তা হলো, কংগ্রেসের সম্মানকে কোনোরকম ক্ষুণ্ণ না করে প্রস্তাবটি গ্রহণ করা যেতে পারে।

আমার মতে প্রস্তাবটি গ্রহণ অথবা বর্জন সম্বন্ধে একটিমাত্র প্রশ্ন ছিলো। সেটা হলো, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের এই প্রস্তাবে ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে আদৌ কোনো অগ্রগতি হয়েছে কিনা। তা যদি হয় তাহলে আমরা প্রস্তাবটা গ্রহণ করবো; কিন্তু যদি তা না হয় তাহলে আমরা প্রস্তাবটাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করবো অর্থাৎ প্রস্তাবটা গ্রহণ বা বর্জনের ব্যাপারে আমার

কাছে ভারতের স্বাধীনতাই ছিলো মুখ্য বিষয়।

আলোচনার শুরু থেকেই আমার প্রচেষ্টা ছিলো ক্রিপস প্রস্তাবকে এমন এক অবস্থায় আনা যাতে আমরা প্রস্তাবটা গ্রহণ করতে পারি। আমি চেয়েছিলাম, একজিকিউটিভ কাউন্সিল প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রিসভার মতো কাজ করবে এবং ভাইসরয় শুধু নিয়মতান্ত্রিক প্রধানরূপে থাকবেন। এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারলে যুদ্ধের সময়েই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে বলে আমরা জোর করবো না।

আগেই বলেছি, আলোচনাটা চলেছিলো দীর্ঘ দু সপ্তাহ ধরে। দিনের বেলায় ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসতো এবং সন্ধ্যার সময় আমি ক্রিপসের সঙ্গে দেখা করে তাঁর সঙ্গে নতুন করে আলোচনা করতাম এবং পরদিন সকালে আমাদের সেই আলোচনার বিষয়বস্তু ওয়ার্কিং কমিটিকে জানিয়ে দিতাম। এখানে আর একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ওয়ার্কিং কমিটির সভা চলাকালে ক্রিপস ভাইসরয়ের সঙ্গেও আলোচনা করেন। পরবর্তীকালে আমি আরো জানতে পারি, এই সময় ক্রিপস অন্তত বার তিনেক চার্চিলের সঙ্গেও আলোচনা করেছিলেন। এ ছাড়া মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গেও হয়তো তিনি আলোচনা করে থাকবেন।

ক্রিপস সব সময় একটা কথার ওপরে জোর দিতেন, যুদ্ধ চলাকালে যে বিষয়টাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে তা হলো, সুষ্ঠুভাবে যুদ্ধটা চালিয়ে যাওয়া। এদিকে যুদ্ধ তখন এমন এক স্তরে পৌঁছে গেছে যে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থার ওপরেও ভীষণভাবে চাপ পড়েছে। এই রকমপরিস্থিতির ফলে একজিকিউটিভ কাউন্সিলের পক্ষে যুদ্ধের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা কোনোমতেই সম্ভব নয় বলে আমি মনে করি। আমি তাই বলি, ভারতীয় একজিকিউটিভ কাউন্সিলের এ ব্যাপারে মতামত প্রকাশের অধিকার থাকা উচিত এবং ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভারও কাউন্সিলের ওপরে পূর্ণ আস্থা রাখা উচিত।

স্যার স্ট্যাফোর্ড তখন সওয়াল করে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে কাউন্সিলের ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যাপারে জোর দেওয়াটা ঠিক হবে না এবং এমন কথাও বলা উচিত হবে না যে শাসন ব্যাপারে শেষ ক্ষমতা কাউন্সিলের হাতেই থাকবে। তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তা হলো, ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই কাউন্সিলের হাতে ক্রমশ বেশী ক্ষমতা আপনা থেকেই এসে যাবে।

সে সময় ভারতের কমাণ্ডার-ইন-চীফ্ ছিলেন লর্ড ওয়াভেল। ক্রিপস তাঁর

সঙ্গেও একাধিকবার আলোচনা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনার ফলে ক্রিপসের মনে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিলো যে আমি যদি লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে দেখা করি এবং তাঁর কাছ থেকে যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থাটা জানতে পারি তাহলে হয়তো আমরা তাঁর প্রস্তাবটা সহজেই মেনে নেবো। তিনি তাই আমার কাছে একটি চিঠি লিখে আমাকে লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করেন। আমি সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হই। আমার সম্মতি পাবার পর তিনি অবিলম্বে আমার সঙ্গে লর্ড ওয়াভেলের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন।

লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

ক্রিপস নিজেই জওহরলালকে এবং আমাকে সঙ্গে করে ওয়াভেলের কাছে নিয়ে যান। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েই তিনি বিদায় নেন। আমরা তখন এক ঘন্টারও বেশী লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে আলোচনা করি। তবে সে আলোচনায় এমন কোনো নূতনত্ব আমরা পাইনি যাতে মৌল বিষয়ে, অর্থাৎ প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষে নতুন করে আমরা কিছু চিন্তা করতে পারি। এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বিশেষভাকে উল্লেখ-যোগ্য, আলোচনার সময় লর্ড ওয়াভেল সৈনিকের মতো কথাবার্তা না বলে একজন ঝানু রাজনীতিকের মতোই আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে-ছিলেন। তিনিও বলেছিলেন, যুদ্ধ চলাকালে সুষ্ঠুভাবে যুদ্ধটাকে চালিয়ে যাবার ব্যাপারটাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমিও এটা অস্বীকার করি-নি। তবে আমাদের মূল প্রশ্নটাও তাঁকে জানিয়ে দিতে ভুল করিনি। আমি তাঁর কাছ থেকে সুস্পষ্টভাবে জানতে চাই, শাসন ব্যাপারের আসল ক্ষমতা কার হাতে থাকবে,—কাউন্সিলের হাতে, না ভাইসরয়ের হাতে? এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর তিনি দিতে পারেননি।

লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে আমাদের আলোচনার পরে ক্রিপস আমাদের কাছে এক নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে বলা হয়: একজিকিউ-টিভ কাউন্সিলের একজন সদস্যের ওপরে যুদ্ধসম্পর্কিত বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হবে। এই প্রস্তাব উত্থাপন করে ক্রিপস আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করেন যে এই ব্যবস্থার ফলে যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারেও ভারতীয় সদস্যের হাতে দায়িত্ব দেওয়া হবে।

কিন্তু উক্ত সদস্যের সঙ্গে কমাণ্ডার-ইন-চীফের সম্পর্কটা ঠিক কি রকম হবে তা তিনি স্পষ্ট করে বলতে পারেননি। এই ব্যাপারে তিনি আর একবার আমার সঙ্গে লর্ড ওয়াভেলের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। এবারে আমি লর্ড ওয়াভেলের কাছে জানতে চাই, ভারতীয় কাউন্সিলের ভূমিকা মন্ত্রিসভার মতো হবে কিনা? এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর তিনি দিতে পারেননি। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে এবারে আমি যা বুঝতে পারি তা হলো, কোনো ভারতীয় সদস্যের ওপরে যুদ্ধসম্পর্কিত দায়িত্ব দেওয়া হলেও কোনোরকম ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হবে না। তিনি শুধু ক্যান্টিন, যানবাহন এবং কমিশারিয়েট প্রভৃতি সাধারণ বিষয়গুলোই দেখাশুনা করবেন, যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর ব্যাপারে তাঁর কোনো কর্তৃত্বই থাকবে না।

এর ফলে অবস্থাটা যা দাঁড়ায় তা সংক্ষেপে এইরকম : ক্রিপসের প্রস্তাবে দেখা যায়, যুদ্ধের পর ভারতের স্বাধীনতা স্বীকৃত হবে। যুদ্ধের সময় শাসন-ব্যাপারে যেটুকু পরিবর্তন করা হবে তা হলো, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে প্রতিনিধি নিয়ে তাদের দ্বারা একজিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানকল্পে ক্রিপসের অভিমত হলো, যুদ্ধের শেষে প্রদেশগুলো ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেবে কিনা তা তারা নিজেরাই স্থির করবে।

ক্রিপস প্রস্তাবের যে অংশে বলা হয়েছে যুদ্ধের পরে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া হবে, সে অংশের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো বক্তব্য ছিলো না। প্রস্তাবিত কাউন্সিল সম্বন্ধে আমার অভিমত এই ছিলো, কাউন্সিলকে যদি কোনোরকম ক্ষমতা না দেওয়া হয় তাহলে এই পরিবর্তনের কোনো অর্থই হবে না। ক্রিপসের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় তিনি বলেছিলেন, কাউন্সিল প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রিসভার মতোই কাজ করবে; কিন্তু পরবর্তী আলোচনায় আমরা জানতে পারি, ও কথাটা তিনি কবিত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে বেশ কিছুটা বাড়িয়ে বলেছিলেন। তাঁর আসল প্রস্তাবটা সম্পূর্ণ আলাদা।

ক্রিপসের আর একটি কুপ্রস্তাব হলো, প্রদেশগুলোকে তাদের ইচ্ছামত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকার অধিকার দেওয়া। এই প্রস্তাব এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে ক্রিপসের অন্যান্য প্রস্তাবে গান্ধীজী রীতিমতো বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং এর বিরুদ্ধে তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানান। ক্রিপসের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের পরে আমি যখন গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে প্রস্তাবের বিষয়বস্তু তাঁকে জানিয়ে দিই তখনই তিনি বলেছিলেন,

প্রস্তাবটি কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এর দ্বারা সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের পথে রীতিমতো জটিলতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

এই ব্যাপারটা নিয়ে ক্রিপসের সঙ্গে আমি বিশেষভাবে আলোচনা করি। এ সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অভিপ্রায় কি, তা আমি তাঁর কাছ থেকে সুস্পষ্টভাবে জানতে চাই। ক্রিপস তখন আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, সাম্প্রদায়িক সমস্যার একটি সুষ্ঠু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তিনি আরো বলেন, দু রকমে এর সমাধান করা যায়। একটি হলো, এখনই এ সমস্যার সমাধান করা এবং অপরটি হলো, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটাকে মুলতুবি রাখা। তাঁর মতে এখনই এ সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা করাটা ঠিক হবে না; এতে আরো জটিলতার সৃষ্টি হবে। তবে তিনি এ কথাও আমাকে জানিয়ে দেন, হিন্দুরা এবং মুসলমানরা যদি তাঁদের সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারেন তাহলে এখনই এর সমাধান হতে পারে।

আমি তখন ক্রিপসকে বলি, প্রদেশগুলোকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকার অধিকার দেবার অর্থ হলো ভারত বিভাগের দরজা খোলা রাখা। ক্রিপস আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, প্রদেশগুলোকে এই অধিকার সাধারণভাবে দেওয়া হবে, কোনো সম্প্রদায়বিশেষকে তা দেওয়া হবে না। তাঁর মতে প্রদেশগুলোকে এই অধিকার দেওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রদেশই এ অধিকার প্রয়োগ করতে চাইবে না, কারণ এর দ্বারা শুধু সন্দেহ আর অবিশ্বাসেরই সৃষ্টি হবে। প্রদেশগুলো যখন বুঝবে যে বাইরে থাকা বা না থাকা তাদের ইচ্ছাধীন তখন তারা এটাকে কেবলমাত্র বস্তুগত দিক থেকেই বিবেচনা করবে।

আমাদের মধ্যে যখন এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে সেই সময় ক্রিপস আমাকে একদিন টেলিফোনে জানিয়ে দেন, পরদিন স্যার সিকান্দার হায়াৎ খান তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। ক্রিপসের ধারণা, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে স্যার সিকান্দার আমাদের সাহায্য করতে পারবেন। পাঞ্জাব যেহেতু মুসলমানপ্রধান প্রদেশ সেইহেতু পাঞ্জাব যদি ভারতের সঙ্গে থাকে তাহলে অন্যান্য মুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলোও পাঞ্জাবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে। আমি বলি, স্যার সিকান্দার এ ব্যাপারে আদৌ কোনো সাহায্য করতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কিন্তু যেহেতু তিনি এই ব্যাপারে আলোচনার জন্য দিল্লীতে আসছেন,

আমি তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করবো।

পরদিনই স্যার সিকান্দার দিল্লীতে আসেন এবং ক্রিপসের সঙ্গে দেখা করার পরেই আমার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বলেন, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ক্রিপস যে প্রস্তাব দিয়েছেন সেইটিই হবে সর্বোত্তম পন্থা। তিনি আরো বলেন, বিষয়টি যদি পাঞ্জাবের আইনসভার সামনে ভোটের জন্য উপস্থাপিত করা হয় তাহলে আইনসভা অবশ্যই ভারতের সঙ্গে থাকার পক্ষেই অভিমত দেবে। এর উত্তরে আমি বলি, বিষয়টি যদি এখনই আইনসভার সামনে উত্থাপন করা হয় তাহলে হয়তো তাঁর অনুমান সঠিক হবে, কিন্তু যুদ্ধের পরে কি অবস্থা হবে তা তিনি বা আমি কেউই বলতে পারি না। তাছাড়া তখনো যে তাঁর জনপ্রিয়তা আজকের মতোই থাকবে তা নাও হতে পারে।

ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলোর ব্যাপারেও ক্রিপস-প্রস্তাবে রাজন্যবৃন্দকে তাঁদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিলো। প্রদেশগুলোর মতো তাদেরও ভারতের সঙ্গে থাকার বা না থাকার অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিলো। ক্রিপসের প্রতি বিশ্বাস রেখেও আমি বলবো, রাজন্যবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার সময় তিনি তাঁদের কাছে একটা সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। কাশ্মীরের মহারাজাকে তিনি বলেছিলেন তাঁর রাজ্যের ভবিষ্যৎ ভারতের সঙ্গেই ন্যস্ত থাকবে। কোনো দেশীয় রাজাই যেন এ কথা মুহূর্তের জন্যও মনে না করেন তিনি যদি আলাদা হয়ে থাকতে চান তাহলে ইংলণ্ডের রাজা তাঁর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবেন। অতএব রাজন্যবৃন্দ যেন তাঁদের ভবিষ্যতের জন্য ইংলণ্ডের রাজমুকুটের দিকে না তাকিয়ে ভারত-সরকারের সঙ্গেই আলোচনা করেন। আমার মনে আছে, বেশির ভাগ নৃপতিই ক্রিপসের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে বেশ কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন।

ক্রিপস-প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ওয়ার্কিং কমিটি একটি খসড়া প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এই প্রস্তাবটি ২রা এপ্রিল তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলেও আলোচনা ফেঁসে না যাওয়া পর্যন্ত এটাকে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দেওয়া হয়নি। ক্ষমতা হস্তান্তরের সাধারণ খুঁটিনাটি বিষয় ছাড়াও একটা বড় রকমের অসুবিধা দেখা দেয় কমাণ্ডার-ইন-চীফ এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের ভার-প্রাপ্ত সদস্যের ক্ষমতার ব্যাখ্যা নিয়ে। ক্রিপস বলেছিলেন, ভারতীয় সদস্য প্রধানত জনসংযোগ, ডি-মবিলাইজেশন, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন এবং সেনাবাহিনীর সভ্যদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধে দেবার বিষয়গুলোই দেখাশুনা করবেন।

কংগ্রেস এগুলোকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলে অভিহিত করে এক বিকল্প প্রস্তাব দেয়। এই প্রস্তাবে বলা হয়, কমাণ্ডার-ইন্-চীফের বিশেষ এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়গুলো ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ই থাকবে প্রতিরক্ষা সদস্যের অধীনে। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রিপস আরো কিছু পাল্টা প্রস্তাব দেন। কিন্তু সেইসব পাল্টা প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত নয়, কারণ তিনি চেয়েছিলেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সবই থাকবে কমাণ্ডার-ইন-চীফের এক্তিয়ারে।

ব্রিটিশ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়

৯ই এপ্রিল সন্ধ্যার পরে আমি আবার ক্রিপসের সঙ্গে আলোচনায় বসি এবং ১০ই এপ্রিল সকালে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ওয়ার্কিং কমিটিকে জানিয়ে দিই। এই সময় আমরা দুঃখের সঙ্গে এই সিদ্ধান্তে আসি, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রস্তাবটি যে অবস্থায় আছে তা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪২-এর ১০ই এপ্রিল আমি ক্রিপসকে একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দিই, খসড়া ঘোষণাপত্রে (in the Draft Declaration) ভারতীয় সমস্যাকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তা শুধু বেঠিকই নয় উপরন্তু এতে ভবিষ্যতে বিরাট জটিলতার সৃষ্টি হবে। ক্রিপস আমার চিঠির উত্তর দেন ১১ই এপ্রিল। তাঁর সেই উত্তরে তিনি সওয়াল করে বুঝিয়ে দিতে চান যে ভারতীয় সমস্যার সমাধানে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থাই তাঁর প্রস্তাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, সুতরাং তা থেকে বিচ্যুত হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। চিঠিতে তিনি কংগ্রেসের ওপরে দোষারোপ করেন এবং তাঁর চিঠিখানা প্রকাশ করতে চান। সেইদিনই আমি তাঁর চিঠির উত্তর দিই। সেই চিঠিতে আমি তাঁর বক্তব্যকে অগ্রাহ্য করে এই অভিমত প্রকাশ করি, চিঠিপত্রগুলো প্রকাশিত হলে যে-কোনো নিরপেক্ষ বিচারকের দৃষ্টিতে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে মিশনের অকৃতকার্যতার জন্য তিনিই একমাত্র দায়ী, কংগ্রেস কোনোক্রমেই দায়ী নয়। পাঠকদের অবগতির জন্য আমার সেই চিঠির প্রধান বক্তব্যগুলো উল্লেখ করা হলো। তবে অনুসন্ধিৎসু পাঠকবৃন্দ যাতে পুরোপুরিভাবে সমস্ত বিষয় জানতে পারেন তার জন্য আমার চিঠি, ক্রিপসের উত্তর এবং তার উত্তরে আমার পরবর্তী চিঠি এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে আমি ১০ই এবং ১১ই এপ্রিল যে চিঠি দুটি লিখেছিলাম তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরকম :

খসড়া ঘোষণাপত্রে বর্তমানের পরিবর্তে ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্বন্ধেই বেশী করে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অথচ কংগ্রেসের দাবি হলো বর্তমান পদ্ধতির পরিবর্তন। প্রস্তাবিত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় কোনো কোনো বিষয়ে আপত্তি থাকলেও জাতীয় প্রতিরক্ষার ব্যাপারে কংগ্রেস এখনো একটা আপসে আসতে চায়। জনগণের মনে উৎসাহ সৃষ্টির জন্য এবং আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে জনসাধারণের মানসিকতাকে সংহত করবার জন্য একটি জাতীয় সরকার গঠনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। জনসাধারণকে এটা বুঝতে দিতে হবে যে তাঁরা তাঁদের নিজের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য স্বাধীনভাবে দেশের প্রতিরক্ষায় অংশ-গ্রহণ করছেন।

আমার চিঠিতে আরো লিখিত হয়েছিল, যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে কংগ্রেস কোনোরকম বাধাই সৃষ্টি করতে চায়নি। শুধু তাই নয়, যুদ্ধ চলাকালে কংগ্রেস প্রতিরক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্যের ক্ষমতা খর্ব করতেও সম্মত ছিলো; কিন্তু একথা আমরা ভুলতে পারিনি, দেশের প্রতিরক্ষার দাবিই সর্বাগ্রে স্থান পাবে। যুদ্ধের সময় অসামরিক শাসনব্যবস্থা স্বভাবতই প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা অপেক্ষা গৌণস্থান লাভ করে: সুতরাং প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভাইসরয় অথবা কমাণ্ডার-ইন-চীফের ওপরে থাকার অর্থ এই দাঁড়ায় যে সর্বক্ষমতা তাঁদের হাতেই ন্যস্ত থাকবে, এমন কি কাউন্সিলের সদস্যদের ওপরে যে সীমিত ক্ষমতা দেওয়া হবে তার ওপরেও তাঁরা খবরদারি করবেন।

আর একটি বিষয়ের ওপরেও আমি জোর দিই। তা হলো সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কংগ্রেস সব সময় সজাগ আছে। আমরা স্বীকার করি, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে হলে কোনো-না-কোনো স্তরে সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রশ্ন উঠবেই। অতএব এ সমস্যার সমাধান করা অবশ্যই প্রয়োজন। আমি তাঁকে জানিয়ে দিই, ভারতের প্রধান রাজনৈতিক সমস্যার একটা সুসমাধান হয়ে যাবার পর সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব আমরাই গ্রহণ করবো। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধান আমরা নিশ্চয়ই করতে পারবো।

এরপর আমি যে বিষয়ের উল্লেখ করি, তা হলো, আমার প্রথম সাক্ষাৎ-কারের সময় ক্রিপস কর্তৃক আমার সামনে প্রস্তাবের যে চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছিল, পরবর্তীকালে আমরা প্রস্তাব সম্বন্ধে যতোই ব্যাখ্যা দাবি করতে থাকি ততোই সে চিত্রের উজ্জ্বলতা ফিকে হতে থাকে। এরপর আমি যখন

৯ই এপ্রিল তাঁর সঙ্গে শেষবার সাক্ষাৎ করি তখন চিত্রটি সম্পূর্ণভাবে বদলে গেছে দেখতে পাই, যার ফলে আপসের সম্ভাবনাই প্রায় তিরোহিত হয়ে যায়।

স্যার স্ট্যাফোর্ড এরপর যখন তাঁর চিঠিখানা প্রকাশ করবার কথা বলেন, তখন আমি তাঁকে লিখিতভাবে জানিয়ে দিই, আমরাও তাহলে এ সম্পর্কে যতো চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হয়েছে, এবং আমরা যে প্রস্তাব পাস করেছি সেগুলো সবই প্রকাশ করলে তিনি নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না। এর উত্তরে ক্রিপস আমাকে লেখেন, এতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। ক্রিপসের চিঠি পাবার পর ১১ই এপ্রিল এ সম্পর্কে যাবতীয় বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দেওয়া হয়।

প্রস্তাব এবং যাবতীয় চিঠিপত্র প্রকাশ করা হলো

ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবটা এইরকম ছিলো :

ওয়ার্কিং কমিটি ইংলণ্ডের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার ভারত-সম্পর্কিত প্রস্তাব এবং সেই সম্পর্কে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের পরবর্তী ব্যাখ্যাগুলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে বিচার-বিবেচনা করেছে। ঘটনাবলীর চাপে পড়ে প্রয়োজনের অনেক পরে প্রস্তাবটি এলেও ভারতের স্বাধীনতা এবং বিশেষ করে যুদ্ধজনিত বর্তমান গুরুতর পরিস্থিতির কথা মনে রেখেই কমিটি এই প্রস্তাবটি বিবেচনা করেছে।

১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন থেকেই কংগ্রেস বারবার বলে আসছে যে ভারতের জনসাধারণ কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে গণ-তান্ত্রিক শক্তিজোটের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে সম্মত আছে। যেসব শর্তের কথা বলা হলো সেগুলোর মধ্যে প্রধানতম শর্তটি হলো—ভারতের স্বাধীনতা। কারণ, ভারতের কোটি কোটি মানুষ যখন জানতে পারবে তারা স্বাধীনভাবে তাদের দেশরক্ষার কাজে অংশ-গ্রহণ করছে তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের হৃদয় উৎসাহ ও উদ্দীপনায় পূর্ণ হবে এবং তারা কায়মনোবাক্যে দেশরক্ষার ব্যাপারে সর্ববিধ উপায়ে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসবে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর নিখিল ভারত কংগ্রেস

কমিটির যে সর্বশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, সেই অধিবেশনে বলা হয়েছিলো, একমাত্র স্বাধীন ভারতই জাতীয় ভিত্তিতে দেশের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

ইংলণ্ডের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার নতুন প্রস্তাবে যুদ্ধের পরে কি হবে প্রধানত সেই কথাই বলা হয়েছে। উক্ত প্রস্তাবে যুদ্ধ শেষ হবার পর ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নীতিগতভাবে স্বীকৃত হলেও কমিটি গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছে, প্রস্তাবে এমন সব শর্ত আরোপ করা হয়েছে যার ফলে সম্মিলিত এবং ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে স্বাধীন এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের পথে নানারকম বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। এমন কি কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেমব্লি গঠনের ব্যাপারেও এমন সব ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে এবং উক্ত সংস্থায় জনগণের প্রতিনিধিদের যেভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে তার ফলে জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছে।

ভারতের জনসাধারণ সামগ্রিকভাবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করেছে এবং কংগ্রেসও বারবার ঘোষণা করেছে যে সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা ছাড়া অপর কিছু গ্রহণযোগ্য নয়। কমিটি লক্ষ্য করেছে, ইংরেজ সরকারের প্রস্তাবে ভবিষ্যতে স্বাধীনতা দেওয়া হবে বলে উল্লেখ করা হলেও ওতে এমন সব বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে যার ফলে স্বাধীনতা একটি আকাশকুসুমে পরিণত হয়েছে।

ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলোর ন কোটি অধিবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকারকে যেভাবে নস্যাৎ করা হয়েছে এবং যেভাবে শাসকশ্রেণী কর্তৃক তাদের পণ্য-দ্রব্যের মতো ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে তাতে গণতন্ত্র এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে পুরোপুরিভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। সংবিধান রচনাকারী সংস্থায় দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হলেও প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাপারে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের কোনোরকম অধিকারই দেওয়া হয়নি। এমন কি তাদের সঙ্গে কোনো-রকম আলোচনা করার কথাও বলা হয়নি। এইসব রাজ্য স্বাধীন ভারতের অগ্রগতিতেও নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। যেসব জায়গায় এখনো বৈদেশিক প্রভুত্ব বজায় রয়েছে এবং যেসব জায়গায় বৈদেশিক সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন রাখার সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে সে-সব ভূখণ্ডের অধিবাসীদের কোনোরকম স্বাধীন সত্তা তো থাকবেই না, উপরন্তু

ভারতের বাকি অংশের ওপরেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে।

প্রদেশগুলোকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকবার অধিকার দেওয়াটাও আর একটি প্রতিক্রিয়াশীল প্রস্তাব। এর দ্বারা ভারতের ঐক্য এবং সংহতির ওপরে এক বিরাট আঘাত হানা হয়েছে। এই প্রস্তাব দ্বারা প্রদেশগুলোকে ভারত রাষ্ট্রের অধীনস্থ না হবার কথাই প্রকারান্তরে বলা হয়েছে।

কংগ্রেস সব সময় অখণ্ড এবং ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বাধীনতার কথাই বলে থাকে। বর্তমান বিশ্বে যখন বৃহত্তর সংহতির কথা চিন্তা করা হচ্ছে সেই সময় ভারতের ঐক্য এবং সংহতি বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোনো প্রস্তাব গ্রহণের কথা কংগ্রেস চিন্তাও করতে পারে না। কমিটি তাই মনে করে, ভারতে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে সারা ভারতের জনসাধারণ এক জাতি এক প্রাণ হয়ে অখণ্ড জাতি গঠনে আগ্রহান্বিত হবে।

কমিটি যে মনোভাব নিয়ে ক্রিপস-প্রস্তাবের মৌল অংশ মেনে নিতে স্বীকৃত হয় তা হলো, কেন্দ্রীয় সরকার তথা যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটানো হবে না। পরিবর্তন ঘটালে তার অর্থ এই হবে, রাষ্ট্রের ভেতরে অন্যান্য দলের উদ্ভব হয়ে নতুন জটিলতার সৃষ্টি হবে। ওয়ার্কিং কমিটি যে ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অনুমোদন করে তাতে প্রতিটি আঞ্চলিক ইউনিট যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে থেকেই যথাসম্ভব স্বায়ত্তশাসনাধিকার ভোগ করবে এবং সবগুলো ইউনিটের ওপরে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃত্ব করবে। কিন্তু ইংরেজ সরকার যে প্রস্তাব পাঠিয়েছে তাতে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিভেদের মনোভাব দেখা দেবে, যার ফলে ঐক্যের পরিবর্তে সৃষ্টি হবে অবিশ্বাস এবং শত্রুতার মনোভাব। কমিটি মনে করে, সাম্প্রদায়িক দাবি মেটাবার জন্যই এইরকম ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে সমস্যা আরো গভীর হবে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারকম প্রতিক্রিয়াশীল উপদলের সৃষ্টি হয়ে জটিলতা বৃদ্ধি করবে এবং নতুন বিপদের পথ উন্মুক্ত করবে এবং জনগণের দৃষ্টিকে মূল বিষয় হতে সরিয়ে অন্য দিকে নিয়ে যাবে।

ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে-কোনো প্রস্তাব অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে বিচার-বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু বর্তমানে যেরকম গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে ভবিষ্যতের কথা বিবেচনার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানের

কথাও বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে, অর্থাৎ বর্তমান ব্যবস্থার ওপরেও বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। ভবিষ্যৎ ব্যবস্থার সঙ্গে বর্তমান ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ; সুতরাং কমিটি সঙ্গতভাবেই বর্তমান ব্যবস্থার প্রতি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। জনগণের মনোভাব এবং ইচ্ছার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ ব্যাপারে কমিটি তার মতামত ব্যক্ত করেছে।

ইংলণ্ডের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা বর্তমান ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করেছেন তা অসম্পূর্ণ এবং অর্থহীন। প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে বর্তমান শাসন-ব্যবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন করা হবে না। ওতে আরো বলা হয়েছে, ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইংরেজদের অধীনেই থাকবে। দেশ শাসনের ব্যাপারে দেশের প্রতিরক্ষা সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকে। যুদ্ধের সময় এর গুরুত্ব এতোই বৃদ্ধি পায় যে সমগ্র শাসন-ব্যবস্থাই প্রতিরক্ষার অধীনস্থ হয়ে পড়ে। সুতরাং প্রতিরক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ইংরেজদের হাতে রাখায় ভারতীয়দের হাতে দায়িত্ব অর্পণ একটা প্রহসনে পরিণত হবে। এর অর্থ এই দাঁড়াবে, ভারতীয় প্রতিনিধিদের কোনো-রকম স্বাধীনতাই থাকবে না, অর্থাৎ যতোদিন যুদ্ধ চলবে ততোদিন তাদের ভাইসরয়ের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে হবে। এই বিষয়টি বিবেচনা করে কমিটি আর একবার এই অভিমত ব্যক্ত করছে, ভারতের জনগণকে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে দিতে হবে তারা সবরকম অধীনতা-পাশ থেকে মুক্ত তাদের নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করছে। কমিটির মতে জনগণের মনে এইরকম বিশ্বাস উৎপন্ন করে তাদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করাই বর্তমানে সবচেয়ে দরকারী জিনিস। কিন্তু প্রতিরক্ষার দায়িত্ব তাদের হাতে ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত এটা হতে পারে না। কমিটি মনে করে, এখনো উপরোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে জনগণকে উদ্দীপিত করা যায়। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার প্রাদেশিক এজেন্সিসমূহ বাস্তববুদ্ধিহীন এবং ভারতের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ। একমাত্র ভারতের জনগণই তাদের বিশ্বাসভাজন প্রতি-নিধিদের মারফত এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে ; কিন্তু এর জন্য তাদের ওপর পূর্ণ দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হবে।

ইংরেজ সরকার এটা মেনে নিতে অস্বীকৃত হওয়ায় ওয়ার্কিং কমিটি অনন্যোপায় হয়ে তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছে।

সাংবাদিক সম্মেলন

১৯৪২ সনের ১১ই এপ্রিল আমি এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করি। বহুসংখ্যক সাংবাদিক উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। আমি তাঁদের কাছে ক্রিপস-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের কারণগুলো ব্যাখ্যা করি। তাঁদের কাছে আমি যে কারণগুলো ব্যাখ্যা করেছিলাম সেগুলো সবই ওয়ার্কিং কমিটির উপরোক্ত প্রস্তাবে এবং ক্রিপস ও আমার মধ্যে যেসব চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হয়েছে তাতে উল্লিখিত হয়েছে বলে এখানে আর তার পুনরাবৃত্তি করা হলো না। এখানে শুধু সাংবাদিকদের কাছে আমি বিশেষভাবে যে কথাগুলো বলেছিলাম সেই সম্বন্ধেই বলা হচ্ছে। প্রথম দিকে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস তাঁর প্রস্তাবের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমাদের সামনে যেরকম উজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরেছিলেন, পরবর্তী আলোচনার সময় তা ক্রমশ ফিকে হতে থাকে। লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকারের পরে দেখতে পাওয়া যায়, ক্রিপস প্রস্তাবের উজ্জ্বলতা একেবারেই নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। আলোচনার সময় স্যার স্ট্যাফোর্ড বারবার এই কথা ব্যক্ত করেছিলেন, ভারতীয় সদস্যদের হাতে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ছেড়ে দেবার ব্যাপারে নানারকম অসুবিধে আছে। তিনি আরো বলেন, আমরা যদি লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে দেখা করি তাহলে তিনি (অর্থাৎ লর্ড ওয়াভেল) এইসব অসুবিধের কথা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে পারবেন। তাঁর কথামতো আমরা লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে দেখা করি। লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে আলোচনার সময় সামরিক বিভাগের কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসার উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই, লর্ড ওয়াভেল কোনোরকম অসুবিধের কথাই আমাদের বলেন না। আলোচনাটা পুরোপুরিভাবে রাজনৈতিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকে। উক্ত আলোচনার সময় আমার একবারও মনে হয়নি আমরা একজন সামরিক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলছি। লর্ড ওয়াভেল আমাদের সঙ্গে একজন ঝানু রাজনীতিকের মতো কথা বলছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে আমি আরো একটা বিষয় পরিষ্কার করে দিতে চাই। কোনো কোনো সংবাদপত্রে মহাত্মা গান্ধীর মতামত সম্বন্ধে নানারকম উল্টো-পাল্টা কথা প্রকাশিত হয়েছিলো। এই বিষয়টি পরিষ্কার করে দেবার জন্য আমি তাঁদের বলি, গান্ধীজী যুদ্ধের বিরোধী হলেও ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে

তাঁর মতবিরোধ হয়নি অথবা ওয়ার্কিং কমিটিকে তিনি কোনোভাবে প্রভাবিত করতেও চাননি। গান্ধীজী ওয়ার্কিং কমিটিকে যা বলেছিলেন তা হলো, ব্রিটিশ প্রস্তাবের গুণাগুণ বিবেচনা করে আমরা স্বাধীনভাবে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। প্রথম দিকে তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সভায় উপস্থিত থাকতেই চাননি; কিন্তু আমার বিশেষ অনুরোধেই কয়েকদিন এখানে থেকে যেতে সম্মত হন। কিন্তু পরে তিনি মনে করেন ওখানে থাকার তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। আমি বিশেষ চেষ্টা করেও তাঁকে রাখতে পারিনি। সাংবাদিকদের আমি আরো বলি, ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত সর্বাংশে সর্বসম্মত ছিলো।

অবশেষে আমি তাঁদের বলি, আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারিনি। তবে একটি বিষয় অনস্বীকার্য, আলোচনা সব সময়ই বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশেই হয়েছে। যদিও কোনো কোনো সময় ক্রিপস এবং আমাদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছে এবং আলোচনা রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, তবুও স্যার স্ট্যাফোর্ড এবং আমরা কোনো-রকম উত্তেজিত হইনি এবং ধীরস্থিরভাবেই সমস্ত বিষয় আলোচনা করেছি।

এইভাবেই কংগ্রেস ক্রিপস-প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু এ বিষয়ে জওহরলাল এবং রাজাগোপালাচারী কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করেন। অতএব পরবর্তী অধ্যায়ে আসবার আগে তাঁদের মতামত এবং প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার বোধ করছি।

আন্তর্জাতিক জওহরলাল

স্যার স্ট্যাফোর্ড ভারত থেকে চলে যাবার অব্যবহিত পরে জওহরলাল 'নিউজ ক্রনিক্যাল' পত্রিকার প্রতিনিধিকে তাঁর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার মঞ্জুর করেন। এই সাক্ষাৎকারের সময় জওহরলাল যে মতামত ব্যক্ত করেন তাতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে কংগ্রেসের মতানৈক্যকে অনেকটা হালকা করে দেখানো হয়। তিনি বলেন, কংগ্রেস ক্রিপস-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও যুদ্ধের ব্যাপারে ভারত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে।

আমি আরো জানতে পারি, জওহরলাল অল ইণ্ডিয়া রেডিও মারফত একটি বিবৃতি দেবেন বলে স্থির করেছেন। এই খবরটা জানবার পর আমার আশঙ্কা হয়, জওহরলালের বেতার ভাষণের ফলে জনসাধারণের মনে এক বিরূপ

প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। জওহরলাল তখন এলাহাবাদে চলে গেছেন। আমিও কলকাতায় ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। আমি তাই স্থির করি, কলকাতা যাবার পথে আমি জওহরলালের সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবো। মনে মনে এইরকম স্থির করে আমি এলাহাবাদে গিয়ে জওহরলালের সঙ্গে দেখা করি। আমি তাঁকে বলি, ওয়ার্কিং কমিটি যখন একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাস করেছে সে অবস্থায় কোনো কিছু বলা সম্বন্ধে তাঁকে বিশেষভাবে সাবধান হতে হবে। তিনি যদি এমন কিছু বলেন যাতে জনসাধারণের মনে হয় যুদ্ধের ব্যাপারে কংগ্রেস কোনো-রকম বিরোধিতা করবে না, তাহলে কংগ্রেসের প্রস্তাবটিই হাস্যকর হয়ে পড়বে। কংগ্রেস যে প্রস্তাব পাস করেছে, তা হলো, একমাত্র স্বাধীন দেশ হিসেবেই যুদ্ধের ব্যাপারে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে। আমি ভালোভাবেই জানতাম, জওহরলালও এই অভিমতই পোষণ করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানতাম, আন্তর্জাতিক অবস্থার কথাও তাঁর মনে সব সময় জাগরূক থাকে। আমি আরো জানতাম বর্তমান যুদ্ধে তাঁর সহানুভূতি সব সময় গণতান্ত্রিক শিবিরের পক্ষেই রয়েছে। সুতরাং এই মনোভাবের ফলে তিনি যদি এমন কিছু বলে ফেলেন, যুদ্ধের ব্যাপারে কংগ্রেস মিত্রপক্ষকে তথা ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে তাহলে কংগ্রেসের প্রস্তাবটাই অকেজো বলে প্রতিপন্ন হবে। আমি তাই জওহরলালকে বিশেষভাবে অনুরোধ করি, তিনি যেন কোনো বিবৃতি না দেন।

আমার কথা শুনে প্রথমে তিনি আমার সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু পরবর্তী আলোচনায় তিনি আমার অভিমতই মেনে নেন। তিনি আমাকে কথা দেন, তিনি কোনো বিবৃতি দেবেন না এবং প্রস্তাবিত বেতার-ভাষণও বাতিল করে দেবেন।

আমি এখানে সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, জওহরলালের মনে যে ভিন্ন অভিমত দেখা দিয়েছিলো সেটা হয়েছিলো আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে। তাঁর ফ্যাসীবিরোধী মনোভাবও এর অন্যতম কারণ। এ ছাড়া তাঁর সাম্প্রতিক চীন ভ্রমণ এবং মার্শাল চিয়াং কাই-সেকের সঙ্গে আলোচনাও তাঁর মানসিক অবস্থাকে প্রভাবিত করেছিল। জাপানের বিরুদ্ধে চীনের সংগ্রামের কথা বিবেচনা করেও তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, গণতন্ত্রকে যে-কোনো উপায়ে রক্ষা করতেই হবে। এইরকম

আন্তর্জাতিক মনোভাবই তাঁর মতামতের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে আমি আরো একটি কথা বলতে চাই, আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে জওহরলাল যতোটা চিন্তা করতেন, জাতীয় ব্যাপারে ততোটা চিন্তা করতেন না। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে আমিও তাঁর সঙ্গে একমত ছিলাম কিন্তু আমার কাছে ভারতের স্বাধীনতাই ছিলো মুখ্য বিষয়। ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শিবিরের বিরোধিতা সম্বন্ধে আমিও কোনোরকম বিরূপ মনোভাব পোষণ করতাম না, কিন্তু আমার মতে যতো-দিন ভারতের পক্ষে সেই গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রযুক্ত না হচ্ছে ততোদিন গণতন্ত্র সম্বন্ধে ইংরেজরা যাই কিছু বলুক না কেন তা ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছু নয়। এই ব্যাপারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কথাটাও আমার মনে পড়ছে। সেবারও ইংরেজ সরকার ঘোষণা করেছিলো, ক্ষুদ্রতর জাতিসমূহের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্যই তারা জার্মান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রেসিডেন্ট উইলসনও তাঁর চোদ্দ দফা সনদে পৃথিবীর সমস্ত জাতির স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের পরে ভারতের স্বাধীনতার কথা মোটেই বিবেচনা করা হয়নি ; এমন কি প্রেসিডেন্ট উইলসনের সেই চোদ্দ দফার সনদও ভারতের ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছিলো। আমি তাই মনে করি, এবারেও যদি ভারতের বিষয় গুরুত্বসহকারে বিবেচিত না হয় তাহলে গণতান্ত্রিক শিবিরের সব কথাই অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে। কলকাতা অভিমুখে রওনা হবার আগে 'নিউজ ক্রনিক্যাল'-এর প্রতিনিধির কাছেও আমি এই অভিমতই ব্যক্ত করেছিলাম।

এই সময় জওহরলাল একটি গুরুতর মানসিক অশান্তির ভেতর দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। আগেই বলেছি, তিনি সম্প্রতি চীনদেশ ভ্রমণ করে এসেছেন। সেখানে গিয়ে তিনি জেনারেলিসিমো এবং মাদাম চিয়াং কাই-সেকের সঙ্গে যে সব আলোচনা করেছিলেন তাতে তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে-ছিলেন। তিনি মনে করতেন, চীন-জাপান যুদ্ধে চীনকে সাহায্য করা ভারতের কর্তব্য। ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন যখন চলছিলো সেই সময় একদিন সন্ধ্যার পরে জওহরলাল আমার সঙ্গে দেখা করেন। তখন তাঁর সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয় তাতে আমি বুঝতে পারি, ইংরেজ সরকার আমাদের দাবি মেনে না নিলেও তিনি ক্রিপস-প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি আমার সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হয়ে বুঝিয়ে দিতে চান, ক্রিপস যেভাবে তাঁর

প্রস্তাব ব্যাখ্যা করেছেন তাতে আমাদের কোনোরকম সন্দেহ প্রকাশ করা উচিত হবে না। যদিও ঠিক এই কথাই তিনি বলেননি; তবুও তাঁর কথাবার্তা শুনে এইরকমই আমার মনে হয়েছিলো।

জওহরলালের সঙ্গে আলোচনার সময় আমি এতোই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম যে রাত দুটো পর্যন্ত আমি সেদিন ঘুমোতে পারিনি। পরদিন ঘুম থেকে উঠেই আমি শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহরুর বাসভবনে উপস্থিত হই। জওহরলাল তখন সেই বাড়িতেই ছিলেন। আমি জওহরলালের সঙ্গে এক ঘন্টারও বেশী সময় বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করি। আমি তাঁকে এ কথাও বলি, তাঁর চিন্তাধারা আমাদের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতবাসীর হাতে আসল ক্ষমতা না দিয়ে একটি লোক-দেখানো একজিকিউটিভ কাউন্সিল গঠনের কোনো অর্থই হয় না। আমরা যদি এই ক্ষমতাহীন একজিকিউটিভ কাউন্সিল গঠনের কথা মেনে নিই তাহলে আমরা শুধু ভবিষ্যতের জন্য একটি সদিচ্ছার কথা ছাড়া ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে আর কিছু পাবো না। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ধরনের সদিচ্ছার কোনো অর্থই হয় না। যুদ্ধের পরে অবস্থা কী দাঁড়াবে এবং প্রকৃতপক্ষে তখন কী হবে সে-কথা কেউ বলতে পারে না। আমরা চেয়েছিলাম স্বাধীন জাতি হিসেবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে, কিন্তু সে ব্যাপারে ক্রিপস-প্রস্তাবে আমরা কিছুই পাইনি। যুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তও আমাদের দ্বারা গৃহীত হয়নি; এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভাইসরয়। ক্রিপস আমাদের ভাইসরয়ের সেই সিদ্ধান্তকেই মেনে নিতে বলছেন এবং এ বিষয়ে আমাদের কোনোরকম বিচার-বিবেচনা করবার সুযোগ দিতেও তিনি সম্মত হননি। আমি তাঁকে আরো বলি, আমরা যদি ক্রিপসের এই প্রস্তাব মেনে নিই তাহলে আজ পর্যন্ত যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি সেগুলো সবই ভ্রান্ত বলে গণ্য হবে। যুদ্ধের পরে পৃথিবীতে বিরাট পরিবর্তন আসতে বাধ্য; সুতরাং বিশ্ব-রাজনীতির খবরাখবর যাঁরা রাখেন তাঁরা এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই পোষণ করেন না, যুদ্ধের পরে ভারত অবশ্যই স্বাধীন হবে। কিন্তু আমরা যদি ক্রিপস-প্রস্তাব মেনে নিই তাহলে যুদ্ধের পরে এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে থেকে যাবো। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যদি তাঁদের কথা না রাখেন তাহলে নতুন করে কোনোরকম আলোচনা শুরু করবার পথও আমাদের সামনে থাকবে না। বর্তমান যুদ্ধ ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথে এক বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে। সুতরাং ইংরেজের কথার ওপরে নির্ভর করে এ সুযোগ আমরা নষ্ট হতে দিতে পারি না।

আমার মুখ থেকে এইসব কথা শুনে জওহরলাল বিশেষভাবে হতোদ্যম হয়ে পড়েন। আমি বেশ বুঝতে পারি, তিনি তাঁর নিজের অবস্থা সম্বন্ধেও সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। তাঁর মনের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁর মানসিক অবস্থাকে রীতিমতো বিচলিত করে ফেলে। কিছুক্ষণ তিনি কোনো কথাই বলতে পারেন না। অবশেষে তিনি বলেন: 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমি আমার ব্যক্তিগত মতামতের ওপরে কোনোরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো না। আমার সিদ্ধান্ত যাতে আমার সহকর্মীদের সিদ্ধান্তের অনুরূপ হয় আমি তা অবশ্যই দেখবো।'

জওহরলাল যেসব বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতেন, অথবা যেসব বিষয় তাঁর মনের ওপরে গভীরভাবে রেখাপাত করতো, সেগুলো সম্বন্ধে ঘুমের মধ্যে তিনি কথা বলতেন। আমার সঙ্গে উপরোক্ত আলোচনাও তাঁর মনে এমনভাবে রেখাপাত করেছিলো যে সে রাত্রে তিনি অনেকবার ঘুমের ঘোরে ওই বিষয় সম্বন্ধে কথা বলেছিলেন। এটা আমি জানতে পারি শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহরুর কাছে। আমি যখন পরদিন তাঁর বাড়িতে যাই, সেই সময় তিনি আমাকে বলেন, গতরাত্রে শ্রীনেহরু ঘুমের ঘোরে কার সঙ্গে যেন তর্ক করেছেন। তিনি আরো বলেন, জওহরলাল কখনো কখনো মৃদুস্বরে এবং কখনো বা বেশ জোরে জোরে কথা বলেছেন। এই সময় তিনি কয়েকবার ক্রিপসের নাম উল্লেখ করেছেন। গান্ধীজীর নাম এবং আমার নামও উচ্চারিত হয়েছে কয়েকবার।

শ্রীমতী নেহরুর কাছ থেকে এই কথা শুনে আমি বুঝতে পারি, গতকাল আমার সঙ্গে তাঁর যে আলোচনা হয়েছিলো সেই আলোচনার বিষয়বস্তু তাঁর মনকে বিশেষভাবে বিচলিত করে ফেলেছিলো।

রাজাগোপালাচারীর প্রতিক্রিয়া

ক্রিপস-প্রস্তাব এবং সেই সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা শ্রীরাজাগোপালাচারীর মনেও গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিলো। সাম্প্রদায়িক অবস্থার অবনতি দেখে কিছুদিন যাবৎ তিনি বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার ব্যাপারে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে মতভেদের ফলেই ভারতের স্বাধীনতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে। আমি যেভাবে ঘটনাবলীকে বিশ্লেষণ করেছিলাম তাতে আমার মনে হয়েছিলো, যুদ্ধের

সময় ইংরেজ সরকার কোনোরকম ঝুঁকি নিতে সম্মত ছিলেন না। সুতরাং ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক সমস্যা মোটেই অন্তরায় ছিলো না। ইংরেজরা এটাকে একটি সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছিলো এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়েরভেতরের মতানৈক্যকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করেছিলো। আমার এই বিশ্লেষণ রাজাগোপালাচারী মেনে নিতে পারেননি। তিনি তাই ক্রিপস-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হবার পরে প্রকাশ্যেই বলতে থাকেন, যদি মুসলিম লীগের দাবি মেনে নিতো কংগ্রেস তাহলে ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে যে বাধা উপস্থিত হয়েছে তা থাকতো না। রাজাগোপালাচারী এইরকম মতামত ব্যক্ত করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি মাদ্রাজ বিধানসভার কংগ্রেস সদস্যদের দ্বারা এই ব্যাপারে একটি প্রস্তাব পাস করিয়ে নিয়েছিলেন। প্রস্তাবটি এইরকম :

> মাদ্রাজ বিধানসভার কংগ্রেস পার্টি গভীর দুঃখের সঙ্গে এই মত প্রকাশ করছে, ভারতের বর্তমান গুরুতর পরিস্থিতিতে কেন্দ্রে একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার সুযোগ নষ্ট হয়ে গেছে এবং এর ফলে জাতীয়তাবাদী ভারত এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। ভারত যখন শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হবার মুখে এসে পড়েছে সেই সময় নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা কোনোক্রমেই উচিত নয়। আবার সরকারী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সংস্রবহীন থেকে ভারতের পক্ষে নিজস্ব কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। বর্তমান বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য কংগ্রেসের উচিত ছিলো জাতীয় সরকার গঠনের ব্যাপারে যাবতীয় বাধা-বিপত্তিকে যে-কোনো উপায়ে অপসারিত করে বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলা করা। এই ব্যাপারে মুসলিম লীগের দাবি যথাসম্ভব স্বীকার করে নেওয়া উচিত বলে এই পার্টি মনে করে। মুসলিম লীগের দাবি হলো, ভারতের কোনো কোনো অংশ সেইসব অংশের অধিবাসীদের ইচ্ছা অনুসারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অবস্থান করা। এই পার্টি তাই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কাছে অনুরোধ জ্ঞাপন করছে, তারা যেন বর্তমান গুরুতর পরিস্থিতির সময় জাতীয়তাবাদের বিতর্কমূলক প্রশ্নকে পরিহার করে অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক পন্থা গ্রহণ করুন এবং মুসলিম লীগের ভারত বিভাগের দাবিকে মেনে নেন। ভারতের সামনে যখন তার নিজস্ব সংবিধান রচনা করবার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে তখন সেটাকে নষ্ট না করে কংগ্রেসের

উচিত এ ব্যাপারে মুসলিম লীগকে সম্মত করার জন্য তার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যার সমাধানে আসা। এই পার্টি মনে করে, এই পথেই জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করা যাবে।

এই প্রস্তাব উত্থাপন এবং গ্রহণ করবার আগে রাজাগোপালাচারী আমার সঙ্গে আদৌ কোনো আলোচনা করেননি। আমার বিশ্বাস, ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যের সঙ্গেও তিনি এ ব্যাপারে কোনোরকম আলোচনা করেননি। মাদ্রাজ বিধানসভার এই প্রস্তাবটি যখন আমি সংবাদপত্রে দেখতে পাই তখন আমি রীতিমতো মর্মাহত হয়ে পড়ি। আমি মনে করি, ওয়ার্কিং কমিটির কোনো সদস্য যদি এইভাবে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন তাহলে কংগ্রেসের শৃঙ্খলার ওপরে এক বিরাট আঘাত হানা হবে। শুধু তাই নয়, এর ফলে জনসাধারণের মনেও ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হবে এবং এর দ্বারা শুধু সাম্রাজ্যবাদীদের হাতই জোরদার করা হবে। আমি তাই মনে করি, এই ঘটনাটি অবিলম্বে ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হওয়া দরকার।

আমি তাই রাজাগোপালাচারীকে বলি, মাদ্রাজ বিধানসভার কংগ্রেস পার্টি কর্তৃক গৃহীত এই প্রস্তাব কংগ্রেসের ঘোষিত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ওয়ার্কিং কমিটির একজন দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে শ্রীরাজাগোপালাচারীর উচিত ছিলো এই প্রস্তাবের সঙ্গে কোনোরকম সংস্রব না রাখা। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি তিনি মনে করতেন এই প্রস্তাব উত্থাপন এবং পাস না করলে তাঁর পক্ষে কর্তব্য পথ পরিহার করার সামিল হবে তাহলে তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদে ইস্তফা দিয়ে নিজের ইচ্ছায় কাজ করতে পারতেন।

রাজাগোপালাচারী স্বীকার করেন, প্রস্তাবটি বিধানসভায় উত্থাপনের আগে ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করা উচিত ছিলো। কিন্তু প্রস্তাব যখন পাস হয়ে গেছে এবং তাতে তাঁর মতামত প্রতিফলিত হয়েছে সে অবস্থায় এখন আর ওই প্রস্তাব প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়। তিনি এ সম্পর্কে আমার কাছে একটি চিঠি লিখে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, এই-রকম একটি বিতর্কমূলক বিষয় কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে পূর্বাহ্ণে আলোচনা না করে প্রকাশ্যভাবে প্রচার করা উচিত হয়নি। পাঠকদের অবগতির জন্য শ্রীরাজাগোপালাচারীর পত্রটি আমি নিচে উদ্ধৃত করছি :

১৯, এডমস্টন রোড,

এলাহাবাদ

এপ্রিল ৩০, ১৯৪২

প্রিয় মৌলানা সাহেব,

আমার দ্বারা উত্থাপিত এবং মাদ্রাজ বিধানসভার কংগ্রেস পরিষদীয় দল কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে আপনার অভিমত স্বীকার করিয়া বলিতেছি যে উক্ত প্রস্তাবটি উত্থাপনের পূর্বে আপনার সঙ্গে এবং ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সহকর্মীর সঙ্গে আলোচনা করা আমার উচিত ছিলো। বিশেষ করিয়া আমি যখন্ তাঁহাদের দ্বারা গৃহীত প্রস্তাবের বিষয় পরিজ্ঞাত ছিলাম। আমি এই পত্রে এ জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।

আমি আমার দৃঢ় বিশ্বাসের কথাও আপনার নিকট ব্যক্ত করিয়াছি। আমি মনে করি, আমি যদি আমার সুচিন্তিত মতামতকে জনগণের বিচারের জন্য তাঁহাদের সম্মুখে তুলিয়া না ধরিতাম তাহা হইলে আমি আমার কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হইতাম। আমি মনে করি, জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে মিঃ সান্তানমের দ্বারা প্রস্তাব উত্থাপন এবং তাহা যথাযথভাবে পাস করিয়া আমি আমার কর্তব্যই পালন করিয়াছি। আমি তাই আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদে ইস্তফা দিতে আপনি আমাকে অনুমতি দিবেন।

আমি যে সুদীর্ঘ বৎসরসমূহ ওয়ার্কিং কমিটিতে থাকিয়া দেশের সেবা করিয়াছি সেই সময় আপনি এবং আমার সহকর্মীগণ আমার প্রতি যেরূপ বিশ্বাস এবং প্রীতি পোষণ করিয়াছেন তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞতার সহিত আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আপনার চিরবিশ্বস্ত

সি. রাজাগোপালাচারী

অন্তর্বর্তীকালীন উত্তেজনা

ক্রিপস-দৌত্য বিফল হবার পরে (অর্থাৎ ক্রিপসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হবার পরে) সারা ভারত জুড়ে এক হতাশা ও ক্রোধের সঞ্চার হয়। দেশবাসীদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন, আমেরিকা এবং চীনের চাপের ফলেই চার্চিল এক লোক-দেখানো প্রস্তাবসহ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে পাঠিয়েছিলেন। আসলে ভারতকে স্বাধীনতা দেবার কোনোরকম ইচ্ছাই তাঁর ছিলো না। ভারতের বহুসংখ্যক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনা করে ইংরেজরা বিশ্ববাসীকে বোঝাতে চেয়েছিলো কংগ্রেসই ভারতীয় জনগণের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান নয়। তারা আরো বোঝাতে চেয়েছিলো ভারতীয়দের মধ্যে একতার অভাবের জন্যই তারা ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারেনি। তাদের এই ধরনের প্রচারের ফলে কিছুসংখ্যক কংগ্রেস কর্মীর মনেও এইরকম একটা সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিলো। তাঁদের এই সন্দেহ নিরসন করবার জন্যে আমি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক সভা আহ্বান করি। এই সভা ২৯শে এপ্রিল থেকে ২রা মে পর্যন্ত চলে। ২৭শে এপ্রিল থেকে ১লা মে পর্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটির সভাও চলে।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা উদ্বোধন করতে উঠে আমি যে উদ্বোধনী ভাষণ দিই তার সারমর্ম হলো: দেড় মাস আগে আমরা যখন ওয়ার্ধায় মিলিত হয়েছিলাম সেই সময় মনে হয়েছিলো, ইংরেজ সরকার ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে নতুন করে চেষ্টা করছে। ইংরেজ সরকার ঘোষণা করেছিলো যে ইংলণ্ডের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক মিশন সরকারের কাছ থেকে এক নতুন প্রস্তাব নিয়ে ভারত অভিমুখে রওনা হচ্ছে। ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় তখন স্থির হয়, কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে আমি কংগ্রেসের তরফ থেকে স্যার স্ট্যাফোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করবো। ওয়ার্কিং কমিটির এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আমি স্যার স্ট্যাফোর্ডের সঙ্গে তাঁর প্রস্তাব সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করি। আলোচনার সময় আমি তাঁকে বলি, তিনি যে ঘোষণাবাণীর খসড়াটি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তা নিতান্তই হতাশাব্যঞ্জক। ওতে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের একটা কাল্পনিক চিত্র দেওয়া ছাড়া বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা হয়নি। বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে

প্রস্তাবে যা বলা হয়েছে তার কোনো অর্থই হয় না। ভারতীয়দের দ্বারা শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা সম্বন্ধে কোনো কথাই ওতে বলা হয়নি। ওতে যা বলা হয়েছে তা হলো, ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ইংরেজ সরকারের হাতেই থাকবে। এর ফলে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথাটা একেবারেই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়, কারণ যুদ্ধের সময় অসামরিক শাসন ব্যবস্থা সর্ববিষয়ে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অধীনে চলতে বাধ্য।

এরপর সভার সামনে আমি আমার সহকর্মীদের পূর্ণ সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে বলি, আমাদের প্রতিটি সিদ্ধান্তই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিলো। আমি আরো বলি, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আমাদের একটা বিশেষ চিন্তাধারা থাকলেও ক্রিপস-প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনার সময় সেই চিন্তাধারা কোনোক্রমেই আমাদের প্রভাবিত করতে পারেনি। প্রস্তাবের দোষ গুণ বিবেচনার জন্য আমরা শুধু একটি মাত্র পন্থাই গ্রহণ করেছিলাম। তা হলো, ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে প্রস্তাবে কী বলা হয়েছে, অর্থাৎ ইংরেজরা সত্যি সত্যিই ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত আছে কিনা। আমার মনে কোনো সন্দেহই নেই, রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি যদি সুষ্ঠুভাবে স্থিরীকৃত হতো তাহলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান আমরা সহজেই করতে পারতাম। কিন্তু ইংরেজ সরকারের প্রস্তাবে আমরা যা দেখতে পাই তাতে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারি, যুদ্ধের সময় প্রতিরক্ষার ব্যাপারে ভারতীয়দের কোনো বক্তব্যই তারা শুনতে প্রস্তুত নয়।

এরপর আমি আমাদের দু-একজন সহকর্মীর ভিন্নতর মতামতের কথা উল্লেখ করি। তাঁরা বলেছেন, ক্রিপস মিশন ভারতীয় সমস্যার কোনো সমাধান করতে না পারলেও একটি বিষয়ে মিশন সাফল্যলাভ করেছে। তাঁদের মতে, এই বিষয়টা হলো, যুদ্ধের প্রতি ভারতীয়দের মনোভাবের পরিবর্তন। তাঁদের এই অভিমতকে আমি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলে মনে করি। আমার মতে, ক্রিপস মিশন ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক অপূরণীয় ক্ষতি ছাড়া আর কিছু করতে পারেনি ; অর্থাৎ, ক্রিপস মিশন ভারতবাসীদের সম্পূর্ণভাবে হতাশ করেছে। মিশনের বক্তব্য হলো, প্রতিরক্ষার ব্যাপারে পরাধীন ভারতের কিছুই করণীয় নেই। কিন্তু আমার অভিমত হলো, একমাত্র স্বাধীন ভারতই তার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এখন বলতে শুরু করেছেন, ভারতীয় সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব এখন আর ইংরেজ সরকারের নয়, এ দায়িত্ব এখন পুরোপুরি ভারতীয় নেতাদের নিতে হবে।

এর উত্তরে আমি বলেছি, কংগ্রেস যথাসাধ্য চেষ্টা করেও ইংরেজ সরকারের মতিগতির পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি, সুতরাং কংগ্রেসের পক্ষে নতুন করে কিছু করা আর সম্ভব নয়।

এরপর আমি জাপান কর্তৃক ভারত আক্রমণের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করি। আমি বলি, যাঁরা মনে করেছেন জাপান আমাদের স্বাধীনতা দেবে, তাঁদের এই মনোভাবের সঙ্গে আমার তীব্র বিরোধ রয়েছে। আমার মতে, প্রভু পরিবর্তনের কথাটা চিন্তা করাও জাতীয় মর্যাদার পক্ষে হানিকর। ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের যতোই মতবিরোধ থাকুক না কেন,তবুও জাপানকে আমরা স্বাগত জানাতে পারি না। আমরা সর্ববিধ উপায়ে জাপানীদের প্রতি-রোধ করতে কৃতসঙ্কল্প। সুতরাং সক্রিয়ভাবেই হোক, অথবা নিষ্ক্রিয়ভাবেই হোক, আমরা এমন কিছু করবো না যাতে জাপানীরা মনে করতে পারে যে ভারতীয়রা তাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। আমরা যদি স্বাধীন হতাম তাহলে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অন্যত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হতাম। কিন্তু আমাদের হাতে অস্ত্র না থাকায় সশস্ত্র প্রতিরোধের ক্ষমতা আমাদের নেই। কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্র না থাকলেও অহিংসার অস্ত্র আমাদের হাতে আছে। এ অস্ত্র আমাদের হাত থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারে না।

আমার বক্তব্য শোনবার পর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবকে পুরোপুরিভাবে অনুমোদন করে। কমিটি আরো সিদ্ধান্ত নেয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সঠিক পথে চালিত করবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি যে-কোনো পন্থা গ্রহণ করতে পারবে।

এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় ফিরে এসে আমি জনগণের মনোভাব দেখে রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। আমি দেখতে পাই, কলকাতার বেশির ভাগ লোকই মনে করছে ইংরেজরা এ যুদ্ধে পরাজিত হবে। ইংরেজের বিরুদ্ধে জনমত এতোই প্রবল হয়ে উঠেছে যে জাপান কর্তৃক ভারত আক্রমণের সম্ভাব্য বিপদের কথাও তারা বিবেচনা করছে না। শুধু তাই নয়, জাপানের প্রতি সহানুভূতির মনোভাবও লক্ষ্য করি অনেকের মধ্যে।

ক্রিপস ভারত থেকে চলে যাবার পর গান্ধীজীর মনোভাবের বেশ কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করি। আগেই বলেছি, গান্ধীজী যুদ্ধের সময় কোনোরকম আন্দোলন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলতেন, অহিংসার পথ থেকে আমরা কোনোক্রমেই বিচ্যুত হবো না। তাঁর মতে, এ সময় কোনো গণ-

আন্দোলন শুরু হলে জনসাধারণ অহিংস থাকবে না। এই অভিমত তিনি এতো দৃঢ়ভাবে পোষণ করতেন যে আমি বহুবার চেষ্টা করেও আন্দোলন শুরু করার ব্যাপারে তাঁকে সম্মত করতে পারিনি। এমন কি, ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহেও তিনি সম্মতি দেননি।

কিন্তু বর্তমানে গান্ধীজী তাঁর পূর্ব-অভিমত থেকে অনেকটা সরে এসেছেন। এবার তিনি গণ-আন্দোলনের কথা চিন্তা করছেন। তাঁর মনোভাবের এই পরিবর্তন হয়তো কিছুদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছিলো। তবে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের ভারত ত্যাগের পরে। ১৯৪২-এর জুন মাসে আমি যখন ওয়ার্ধায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি তখন আমি বুঝতে পারি, যুদ্ধের প্রথমদিকে তিনি যে অভিমত পোষণ করতেন তা থেকে এখন অনেকটা সরে এসেছেন।

জাপানকে প্রতিরোধ করার পরিকল্পনা

এই সময় নানা সূত্র থেকে আমি যেসব খবর পেতে থাকি তাতে আমার মনে হয়, জাপানীরা ভারত আক্রমণ করবে বলে সরকার মনে করছে। সরকার হয়তো মনে করছে, জাপানীরা সারা ভারতে আক্রমণ না চালালেও বাংলা অধিকার করবার চেষ্টা করবে। তারা মনে করছে, জাপানীরা সমুদ্রপথে আক্রমণ চালিয়ে ডায়মণ্ড হারবার থেকে কলকাতা অভিমুখে অগ্রসর হবে। আমি আরো জানতে পারি, এই অবস্থার সৃষ্টি হলে সরকার কলকাতা থেকে পশ্চাদপসরণ করবে। সরকার এক গোপনীয় সারকুলার মারফত তাদের এই গোপন পরিকল্পনার কথা নির্দিষ্ট-সংখ্যক অফিসারকে জানিয়ে দিয়েছে এবং কিভাবে এবং কোন্ পথে পর্যায়ক্রমে কলকাতা, হাওড়া এবং ২৪ পরগণা থেকে পশ্চাদপসরণ করা হবে সে সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছে। তারা কিছু কিছু প্রতিরোধ ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে। প্রতিরোধের ব্যাপারে তারা একটি পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছিলো। এতে পশ্চাদপসরণের সময় কোন্ কোন্ জায়গায় প্রতিরোধ করা হবে এবং কিভাবে পশ্চাদপসরণ করা হবে সে সম্বন্ধে একটা সাময়িক নির্দেশও জারি করেছিল। এই ব্যাপারে তারা স্থির করেছিলো, প্রথম প্রতিরোধ লাইন হবে পদ্মানদীর তীর বরাবর, দ্বিতীয় লাইন হবে আসানসোল ও রাঁচির মধ্যবর্তী অঞ্চল এবং সর্বশেষ লাইন হবে এলাহাবাদের কাছে। সরকার আরো স্থির করে, পশ্চাদপসরণের সময় তারা পোড়ামাটি

নীতি গ্রহণ করবে এবং যাবার পথে গুরুত্বপূর্ণ সেতুগুলোকে এবং বড় বড় কল-কারখানাগুলোকে ধ্বংস করে যাবে। জামসেদপুরের লোহার কারখানাটাও তারা ধ্বংস করবে বলে স্থির করে। তাদের এই মতলবের কথাটা কোনো সূত্রে ফাঁস হয়ে যাওয়ায় সমগ্র এলাকায় একটা নিদারুণ দুশ্চিন্তা এবং চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিলো।

উপরোক্ত সব কথাই আমি গান্ধীজীকে জানিয়ে দিই। আমি তাঁকে আরো বলি, জাপানীরা যদি ভারতভূমিতে পদার্পণ করে তাহলে আমাদের পবিত্র কর্তব্য হবে, যে-কোনো উপায়ে তাদের প্রতিরোধ করা। আমার মতে পুরনো প্রভুর বদলে নতুন প্রভুকে স্থান দেবার কথা চিন্তা করা বাতুলতা। নতুন বিজেতা যদি পুরনো সরকারকে উচ্ছেদ করতে পারে তাহলে আমাদের বিপদ আরো বাড়বে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জাপানীদের মতো একটি নতুন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে হঠানো আরো কঠিন হয়ে পড়বে।

জাপানের সম্ভাব্য আক্রমণের কথা চিন্তা করে আমি প্রতিরোধের ব্যাপারেও কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করি। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমি নির্দেশ দিই, তারা যেন জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে। কলকাতা শহরকে আমি কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করি এবং স্বেচ্ছা-সৈনিক সংগ্রহ করে আঞ্চলিক প্রতিরোধবাহিনী গঠন করি। স্বেচ্ছা-সৈনিকদের আমি নির্দেশ দিই তারা যেন সর্ব উপায়ে জাপানীদের অগ্রগতিতে বাধার সৃষ্টি করে। আমি যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলাম, তা হলো, জাপানীরা যখনই বাংলায় উপস্থিত হবে এবং ইংরেজবাহিনী বিহার অভিমুখে পশ্চাদপসরণ করবে, তখনই কংগ্রেস এগিয়ে এসে দেশের নিয়ন্ত্রণভার নিজের হাতে তুলে নেবে। আমাদের স্বেচ্ছা-সৈনিকদের সাহায্যে জাপানীরা প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই ক্ষমতা দখল করে নেবো এবং এইভাবেই আমরা নতুন শত্রুর মোকাবিলা করে স্বাধীনতা অর্জন করবো। প্রকৃতপক্ষে মে এবং জুন মাসের বেশির ভাগ সময় আমি এই নতুন পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্য ব্যয় করি।

আমি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি, গান্ধীজী এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত হতে পারেন না। তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে আমাকে বলেন, জাপানীরা যদি সত্যি সত্যিই ভারতভূমিতে পদার্পণ করে তাহলেও তারা ভারতবাসীর শত্রু হিসেবে আসবে না, তারা আসবে ইংরেজের শত্রু হিসেবে। তিনি বলেন, ইংরেজরা যদি অবিলম্বে ভারত পরিত্যাগ করে তাহলে জাপানীরা ভারত আক্রমণ করবে না। গান্ধীজীর এই অভিমতকে মেনে নিতে না পেরে

আমি এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করি। কিন্তু তিনি তাঁর অভিমতে অটল থাকেন, শত চেষ্টা করেও আমি তাঁর মত পরিবর্তন করতে সক্ষম হই না। এই সময় আমি আরো দেখতে পাই, সর্দার প্যাটেলও গান্ধীজীর মতো একই অভিমত পোষণ করছেন। আমার তাই মনে হয়, সর্দার প্যাটেলই হয়তো গান্ধীজীকে এ ব্যাপারে প্রভাবিত করেছেন। অবশেষে গান্ধীজীর সঙ্গে মতানৈক্য নিয়েই আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিই।

ভারত ছাড়ো প্রস্তাব

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা হয়।

ওই সভায় যোগ দেবার জন্য আমি ৫ই জুলাই ওয়ার্ধায় উপস্থিত হই। সেই সময় গান্ধীজী আমার কাছে সর্বপ্রথমে তাঁর প্রস্তাবিত 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের কথা বলেন। তাঁর এই নতুন পরিকল্পনা আমি সহজভাবে গ্রহণ করতে পারিনি। আমার মনে হয়েছিলো আমরা একটা অসাধারণ অবস্থার সম্মুখীন হতে চলেছি। আমাদের সহানুভূতি সব সময়ই মিত্রপক্ষের দিকে ছিলো কিন্তু ইংরেজ সরকারের মিত্রপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিলো না। একমাত্র স্বাধীন জাতি হিসেবেই আমরা মিত্রপক্ষের পাশে দাঁড়াতে পারতাম, কিন্তু ইংরেজরা আমাদের সে সুযোগ দেয়নি। তারা সব সময় আমাদের পদানত করে রাখতে চায়।

এদিকে জাপানীরা তখন ব্রহ্মদেশ অধিকার করে আসাম অভিমুখে এগিয়ে আসছে। আমি তাই মনে করি, এ সময় আমাদের এমন কিছু করা বা বলা উচিত হবে না যাতে জাপানীরা ভাবতে পারে, আমরা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। আমার মনে হয়, এই সময় আমাদের উচিত হবে ঘটনাবলীর দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির দিকে নজর রাখা। গান্ধীজী কিন্তু এতেও সম্মত নন। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন, এখন আমাদের সামনে যে সুযোগ উপস্থিত হয়েছে কংগ্রেস সেই সুযোগ গ্রহণ করে ইংরেজদের অবিলম্বে ভারত ত্যাগ করতে বলবে। ইংরেজরা যদি আমাদের এই দাবি মেনে নেয় তাহলে আমরা জাপানীদের আর বেশী অগ্রসর হতে নিষেধ করবো। তা সত্ত্বেও তারা যদি এগিয়ে আসতে থাকে তাহলেই শুধু মনে করা হবে, ভারত আক্রমণ করাই তাদের উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, এরকম অবস্থার সৃষ্টি হলে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে জাপানীদের প্রতিরোধ করবো।

আমি আগেই বলেছি, যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকেই আমি ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করতে চেয়েছিলাম। সে সময় গান্ধীজী আমার কথায় কান দেননি। এখন তাঁর মতের পরিবর্তন দেখে আমি রীতিমতো বিস্মিত হই। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনি, ইংরেজবাহিনী ভারতে মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও তারা আমাদের দাবি মেনে নেবে এবং আমাদের আন্দোলন সহ্য করবে। গান্ধীজী কিন্তু এইরকমই বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন, কংগ্রেসের আন্দোলনে ইংরেজরা কোনোরকম বাধা দেবে না বলেই তিনি মনে করেন। আমি যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করি, 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন বলতে তিনি কী বোঝাতে চান, তার কোনো সদুত্তরই তিনি দিতে পারেননি। তিনি শুধু এই কথাই বলেন, এবারের আন্দোলনে কেউ বিনা বাধায় গ্রেপ্তার বরণ করবে না।

আমি কিন্তু জাপানীদের মতিগতি সম্বন্ধে ভিন্ন ধারণা পোষণ করতাম। তাদের কোনো কথাই আমি বিশ্বাস করতাম না। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিলো, ইংরেজরা পশ্চাদপসরণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই জাপানীরা ভারত আক্রমণ করবে, সুতরাং গান্ধীজী যে কথা বলেছিলেন আমি তা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিলাম না। আমার মতে, এর ফলে জাপানীরা ভারত আক্রমণ করতে আরো বেশী অনুপ্রাণিত হবে এবং ইংরেজের পশ্চাদপসরণের সুযোগে তারা ভারতবর্ষ অধিকার করে নেবে।

গান্ধীজী বলতে চান, তাঁর প্রস্তাবিত আন্দোলনের বিরুদ্ধে ইংরেজরা কোনোরকম ব্যবস্থা অবলম্বন করবে না। এবং এর ফলে তিনি আন্দোলনকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে যথেষ্ট সময় পাবেন এবং আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাও স্থির করতে পারবেন। আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস, এটা কখনো সম্ভব হবে না। কংগ্রেস যদি এই ধরনের কোনো প্রস্তাব পাস করে তাহলে সরকার কিছুতেই নীরব দর্শক হয়ে থাকবে না; তারা তখন গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তার করে কারাগারে বন্দী করে রাখবে। আর, তা যদি হয়, তাহলে নেতৃত্বের অভাবে সারা দেশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় এসে যাবে এবং সেই অবস্থার সুযোগ নিয়ে জাপানীরা ভারত আক্রমণ করলে নেতৃত্বহীন দেশবাসী তাদের বিরুদ্ধে কোনোরকম ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে পারবে না। জনসাধারণ কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দেয়, তার কারণ হলো, গান্ধীজীর ওপরে তাদের অখণ্ড বিশ্বাস রয়েছে। কিন্তু তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা যদি কারাগারে বন্দী হয়ে থাকেন তাহলে

জনসাধারণ তাদের করণীয় কী হবে তা বুঝতেই পারবে না।

এইসব কথা চিন্তা করে অবশেষে আমি স্থির করি, জনসাধারণের উৎসাহ এবং উদ্দীপনা যাতে স্তিমিত না হয় তার জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে। সরকার যদি গান্ধীজীকে তাঁর আন্দোলন চালিয়ে যেতে বাধা না দেয় তাহলে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সে আন্দোলন অহিংস পদ্ধতিতেই চালিত হবে। কিন্তু আমরা সবাই যদি কারাগারে আবদ্ধ থাকি তাহলে আন্দোলন পরিচালনা করবার এবং জনসাধারণকে সঠিকভাবে চালিত করবার মতো কোনো নেতৃত্বই থাকবে না। এবং সে অবস্থায় জনসাধারণ হিংসা ও অহিংসার প্রশ্ন নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে নিজেদের খেয়ালখুশিমতো আন্দোলন চালাতে থাকবে।

ওয়ার্কিং কমিটির সভায় এই বিষয়টি আমি পরিষ্কারভাবে সদস্যদের সামনে তুলে ধরি। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে একমাত্র জওহরলাল ছাড়া আর কেউ আমাকে সমর্থন করলেন না; তবে তিনিও আমাকে পুরোপুরি সমর্থন করলেন না। অন্যান্য সদস্যরা ব্যাপারটাকে ভালোভাবে অনুধাবন না করেই গান্ধীজীর অভিমতকে সমর্থন করলেন। এটা অবশ্য আমার কাছে নতুন কিছু নয়। আগেও লক্ষ্য করেছি, একমাত্র জওহরলাল ছাড়া আর সবাই অন্ধভাবে গান্ধীজীর কথামত চলেন। সর্দার প্যাটেল, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং আচার্য কৃপালনীর যুদ্ধ সম্বন্ধে কোনোরকম সুস্পষ্ট ধারণাই ছিলো না। তাঁরা তাই নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুসারে ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ না করে গান্ধীজীর কথাতেই সায় দিতেন। আমার তাই মনে হয় ওঁদের সঙ্গে আলোচনা করে কোনো লাভ নেই। ওঁদের কথা হলো, 'গান্ধীজীর ওপরে আমাদের বিশ্বাস রাখতেই হবে।' ওঁরা মনে করতেন, গান্ধীজী একটা না একটা পথ অবশ্যই বের করবেন। এই প্রসঙ্গে ওঁরা ১৯৩০ সালের লবণ সত্যাগ্রহের কথা উল্লেখ করেন। লবণ সত্যাগ্রহ যখন শুরু হয় তখন অনেকেই জানতেন না ভবিষ্যতে সে আন্দোলন কিরকম রূপ নেবে। এমন কি সরকারও প্রথম দিকে লবণ সত্যাগ্রহকে একটি তামাশার ব্যাপার বলে মনে করেছিলো। কিন্তু পরবর্তী-কালে আন্দোলন যখন ব্যাপকভাবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে সরকার তখন বাধ্য হয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে একটি আপসে আসে। সর্দার প্যাটেল এবং তাঁর অনুগামী বন্ধুরা তাই মনে করেছিলেন এবারেও গান্ধীজী ঠিক সেইভাবেই সাফল্য অর্জন করবেন। আমার কিন্তু মোটেই তা মনে হয়নি।

গান্ধীজীর অভিমত হলো, যুদ্ধটা যেহেতু ভারতের দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির

হয়েছে সেইহেতু আন্দোলন শুরু করার এইটেই হলো প্রকৃষ্ট সময়। তাঁর মতে, কংগ্রেস যদি এই সময় গণআন্দোলন শুরু করে তাহলে ইংরেজরা অবশ্যই কংগ্রেসের সঙ্গে আপসরফা করতে চেষ্টা করবে। আর এটা যদি তারা নাও করে তাহলেও তারা কোনোরকম গুরুতর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না। এবং এর ফলে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নির্ধারণ করবার মতো যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। আমার বিশ্লেষণ কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা ছিলো। আমি মনে করতাম, যুদ্ধের পরিস্থিতি যখন জটিল হতে জটিলতর পর্যায়ে এসে গেছে তখন সরকার কিছুতেই কংগ্রেসকে গণ-আন্দোলন চালিয়ে যেতে দেবে না। সরকার তথা ইংরেজের পক্ষে এটা একটা বিপজ্জনক সময় এবং যুদ্ধটা তাদের মরণবাঁচন সমস্যায় এসে পৌঁছেছে; সুতরাং এ সময়ে ভারতে যদি গণ-আন্দোলন শুরু হয় তাহলে তারা সে আন্দোলনকে দমন করবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। আমি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারি, আমরা গণ-আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেবার সঙ্গে সঙ্গেই সরকার কংগ্রেসের প্রত্যেক নেতাকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করবে। এবং তারপর কী হবে সে কথা কেউই বলতে পারে না।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম, তৎকালীন পরিস্থিতিতে কোনো গণ-আন্দোলন অহিংসভাবে চালানো সম্ভব ছিলো না। গণ-আন্দোলন ততক্ষণই অহিংস থাকে যতক্ষণ নেতারা উপস্থিত থেকে আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারেন। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, আন্দোলন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই নেতারা বন্দী হবেন। আমার আরো মনে হচ্ছিলো, কংগ্রেস যদি অহিংসার ওপর জোর না দেয় তাহলে নেতাদের অনুপস্থিতিতেও আন্দোলন চলবার সম্ভাবনা আছে। নেতৃত্ব যদি নাও থাকে তাহলেও জনগণ নিজে থেকেই আন্দোলন চালিয়ে যাবে। তারা যদি নিজেদের ইচ্ছামতো আন্দোলন চালাবার সুযোগ পায় তাহলে তারা চলাচল ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটাতে পারে, সেনাবিভাগের ব্যবহার্য জিনিসপত্র এবং মিলিটারী ডিপোগুলো পুড়িয়ে ধ্বংস করতে পারে এবং আরো বহুবিধ উপায়ে ইংরেজের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। আমি তাই মনে করি, এইরকম অবস্থার উদ্ভব হলে যে ধরনের গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তার ফলে ইংরেজরা হয়তো শেষ পর্যন্ত একটা আপসে আসতে বাধ্য হবে। তবে এটা যে একটা বিরাট ঝুঁকি তাতে কোনোই ভুল নেই। কিন্তু ঝুঁকি যদি নিতেই হয় তাহলে খোলা চোখেই তা নিতে হবে, অর্থাৎ ভবিষ্যতে কী ঘটবে বা ঘটতে পারে

সে কথা জেনেশুনেই গণ-আন্দোলনের ঝুঁকি নিতে হবে। কিন্তু গান্ধীজীর প্রস্তাবিত অহিংস আন্দোলন এ অবস্থায় কী ভাবে চলতে পারে তা আমার বোধগম্য হয় না।

আমাদের আলোচনা শুরু হয় ৫ই জুলাই এবং সে আলোচনা চলে কয়েক দিন ধরে। আলোচনার সময় গান্ধীজীর সঙ্গে আমার তীব্র মতবিরোধ হয়। আগেও অনেকবার তাঁর সঙ্গে আমার মতবিরোধ হয়েছে কিন্তু এবারের মতো তীব্র মতবিরোধ আগে কোনোদিনই হয়নি। অবস্থা চরমে পৌঁছয় যখন গান্ধীজী আমাকে একটি চিঠি লিখে জানিয়ে দেন, আমাদের মধ্যে মতবিরোধ এমন তীব্র হয়ে উঠেছে যার ফলে তাঁর পক্ষে আমার সঙ্গে একত্রে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। চিঠিতে তিনি আরো লেখেন, কংগ্রেস যদি তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেয় তাহলে আমাকে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে এবং ওয়ার্কিং কমিটি থেকে সরে যেতে হবে। জওহরলালের সম্বন্ধেও তিনি একই কথা বলেন, অর্থাৎ তাঁকেও ওয়ার্কিং কমিটি থেকে সরে যেতে হবে। এই চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি জওহরলালকে খবর দিয়ে এনে গান্ধীজীর চিঠিখানা তাঁকে দেখাই। কিছুক্ষণ পরে সর্দার প্যাটেল আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং গান্ধীজীর চিঠি দেখে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীর কাছে চলে যান এবং এ ব্যাপারে তীব্রভাবে আপত্তি জানান। তিনি গান্ধীজীকে বলেন, আমি যদি প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সরে যাই এবং আমি আর জওহরলাল ওয়ার্কিং কমিটি থেকে বিদায় নিই তাহলে সারা ভারতে এক গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। এতে জনসাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি তো হবেই, উপরন্তু কংগ্রেসের ভিত্তিমূলই এর ফলে বিচলিত হয়ে উঠবে।

গান্ধীজী আমাকে ওই চিঠিটি লিখেছিলেন ৭ই জুলাই সকালে। ওই দিনই দুপুরের দিকে তিনি আমাকে ডেকে পাঠান। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, সকালে তিনি তাড়াতাড়িতে চিঠিখানা লিখেছিলেন, কিন্তু পরে এ বিষয়ে আরো চিন্তা করে তিনি চিঠিখানা প্রত্যাহার করে নেবেন বলে স্থির করেছেন। গান্ধীজীকে এইভাবে নতি স্বীকার করতে দেখে আমিও আর তাঁর সঙ্গে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হই না এবং তাঁর অভিমতই মেনে নিই।

এরপর বেলা তিনটের সময় যখন ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসে তখন গান্ধীজী বলেন, মৌলানার কাছে অন্যায়কারী ফিরে এসেছে। আমরা তখন

প্রস্তাবিত আন্দোলনের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করি। এই সময় গান্ধীজী বলেন, অন্যান্য বারের মতো এবারের আন্দোলনও অহিংস পদ্ধতিতেই চলবে এবং হিংসার পন্থা ছাড়া যে-কোনো পন্থা অবলম্বিত হবে। এই সময় জওহরলাল বলেন, গান্ধীজী যা বলছেন তা প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর মতে এটাকে 'অহিংস বিদ্রোহ' বলে আখ্যাত করা যায়। জওহরলালের দেওয়া এই সংজ্ঞাটি গান্ধীজীর খুবই মনঃপূত হয়। তিনিও তখন প্রস্তাবিত আন্দোলনকে 'অহিংস বিদ্রোহ' বলে আখ্যাত করেন।

ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব

এরপর ১৪ই জুলাই ওয়ার্কিং কমিটি নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি পাস করে:

দিনের পর দিন যেসব ঘটনা ঘটছে এবং ভারতের জনসাধারণ যেসব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসকর্মীরা মনে করে, ভারতে ইংরেজ শাসনের এখনই অবসান হওয়া দরকার। বিদেশী শাসন জনগণের পক্ষে শুধুমাত্র অপমানজনক বলেই নয়, পরন্তু ভারতীয়রা পরাধীন থাকার ফলে দেশের প্রতিরক্ষার ব্যাপারেও তারা কিছু করতে পারছে না এবং যে যুদ্ধ সমগ্র মানবজাতির ওপরে এক মহা অভিশাপরূপে দেখা দিয়েছে তার বিরুদ্ধেও কোনোরকম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারছে না। ভারতের স্বাধীনতা শুধু যে তার নিজের স্বার্থেই প্রয়োজন তাই নয়, পৃথিবীকে বিপন্মুক্ত করার জন্য এবং নাৎসীবাদ, ফ্যাসীবাদ এবং জঙ্গীবাদ প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদের অপরাপর পদ্ধতির অবসানের জন্য এবং এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির ওপরে প্রভুত্বের অবসানের জন্যও এর প্রয়োজন আছে।

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সময় থেকেই কংগ্রেস ব্রিটেনকে বিব্রত করতে চায়নি; এমন কি সত্যাগ্রহ আন্দোলন করতেও সে চায়নি। কংগ্রেস মনে করেছিলো, ইংরেজরা তার এই সদিচ্ছা ও সুনীতিকে যথাযথভাবে অনুধাবন করে জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে দেশের শাসনভার ছেড়ে দেবে যার ফলে ভারতের জনগণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জনগণের মতো স্বাধীনতার স্বাদ উপলব্ধি করতে পারবে এবং সেই অনুসারে কাজ করতে পারবে। কংগ্রেস আরো মনে করেছিলো, ইংরেজরা এমন কিছু করবে না যার ফলে

ভারতের ওপরে তাদের অধিকার এবং প্রভুত্ব আরো দৃঢ় হবে। কিন্তু তার এই আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। ক্রিপস-প্রস্তাব দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতের প্রতি ইংরেজের মতিগতির কোনোই পরিবর্তন হয়নি। উক্ত প্রস্তাব দ্বারা আরো বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতের ওপর থেকে ইংরেজরা তাদের বজ্রমুষ্টি কোনোরূপেই শিথিল করবে না। স্যার স্ট্যাফোর্ডের সঙ্গে আলোচনার সময় কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলো জাতীয় দাবির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ন্যূনতম ক্ষমতাও অন্তত ভারতীয়দের হাতে অর্পণ করা হবে; কিন্তু সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। ভারতবাসীর প্রতি এইরকম অবজ্ঞা আর অবিশ্বাসের ফলে তাদের মনে ইংরেজের প্রতি ক্রোধের সঞ্চার হয়েছে। শুধু তাই নয়, জাপানের প্রতিও তারা সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। ওয়ার্কিং কমিটি এইসব বিষয় লক্ষ্য করে গভীরভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কমিটি মনে করে, এখনই এর অবসান ঘটাতে না পারলে দেশবাসীর এই মনোভাব পরোক্ষভাবে শত্রুপক্ষকেই সাহায্য করবে। কমিটি আরো মনে করে, সব রকম আক্রমণকেই প্রতিরোধ করা দরকার, কারণ আক্রমণকারীর প্রতি দেশবাসীর সহানুভূতির অর্থ তাদের নৈতিক অধঃপতন। ভারতেও মালয়, সিঙ্গাপুর এবং ব্রহ্মদেশের মতো অবস্থার সৃষ্টি হয় কংগ্রেস তা চায় না। এবং এই কারণেই সে যথোপযুক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলে জাপান এবং যে-কোনো আক্রমণকারীর মোকাবিলা করতে চায়।

ইংরেজের প্রতি ভারতীয়দের মনে যেরকম ক্রোধ ও ঘৃণার সঞ্চার হয়েছে কংগ্রেস তার পরিবর্তন ঘটিয়ে দেশবাসীকে ইংরেজের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সদিচ্ছাপরায়ণ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু এটা সম্ভব হতে পারে একটি মাত্র উপায়ে এবং সে উপায়টি হলো ভারতীয়দের হৃদয়কে স্বাধীনতা-দীপালোকে আলোকিত করা।

কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে; কিন্তু ভারতের বুকে বিদেশী শক্তির অবস্থানের জন্যই তার এই শুভ প্রচেষ্টা সাফল্যলাভ করতে পারেনি। এই বিদেশী শক্তির অতীত ক্রিয়াকলাপ থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারা গেছে, সে 'বিভক্ত করে শাসন'-এর নীতি গ্রহণ করে ভারতে সাম্প্রদায়িকতা জিইয়ে রেখে তার আধিপত্য বজায় রাখতে চায়। বিদেশীদের আধিপত্যের অবসান ঘটলেই বর্তমান অশান্ত অবস্থা পুনরায় শান্ত হয়ে আসবে এবং

জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে ভারতের জনসাধারণ তাদের নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারবে। বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলো ইংরেজের প্রসাদলাভ করে তাদের সাহায্য করবার উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়েছে। বিদেশীদের আধিপত্যের অবসান হলে এইসব রাজনৈতিক দলও আর কোনো কাজ বা অকাজ করবার সুযোগ পাবে না। ভারতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই বোধের সৃষ্টি হবে : রাজা, জমিদার, জায়গীরদার ও ভূম্যধিকারী এবং ধনবান ব্যক্তিরা যেসব চাষী ও শ্রমিকদের শোষণ করে এসেছে, এবার সেই শোষিত মানুষদের হাতেই ক্ষমতা আসছে। ভারতের বুক থেকে ইংরেজ শাসনের অবসান হবার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এগিয়ে এসে সাময়িকভাবে তাদের সরকার গঠন করবে; তারপর ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা একত্রে বসে এমন এক পরিকল্পনা গ্রহণ করবে যার দ্বারা একটি গণপরিষদ গঠিত হবে এবং সেই গণপরিষদ এমন এক সংবিধান রচনা করবে যা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীর গ্রহণীয় হবে। পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের প্রতিনিধিরা এবং গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিনিধিরা একত্রে বসে উভয় দেশের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কিরকম হবে এবং উভয় দেশ কিভাবে একে অপরের মিত্ররাষ্ট্র হিসেবে শত্রুর মোকাবিলা করবে তা স্থির করবে। শত্রুকে যথোপযুক্তভাবে প্রতিরোধ করাই হলো কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্য। এবং এই উদ্দেশ্য সে জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও সদিচ্ছার সাহায্যেই সাধন করবে।

ভারত থেকে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটাবার প্রস্তাব করা হলেও গ্রেট ব্রিটেন এবং মিত্রপক্ষকে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ব্যাপারে কোনোরকম বিব্রত করবার ইচ্ছা কংগ্রেসের নেই। তাছাড়া শত্রুপক্ষকে ভারত আক্রমণের সুযোগ দেবার অথবা চীনের ওপরে জাপান অথবা অক্ষশক্তির অপর কোনো দেশ কর্তৃক চাপ বৃদ্ধি করবার প্রচেষ্টাকেও কংগ্রেস সর্বতোভাবে বাধা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মিত্রপক্ষের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে কোনোরকম খর্ব করবার বাসনাও কংগ্রেসের নেই। জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য এবং চীনকে সাহায্য করবার জন্য মিত্রপক্ষ যদি ভারতের বুকে তাদের সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখতে চায় তাতেও কংগ্রেসের কোনো আপত্তি নেই।

এখানে আরো প্রকাশ থাকে যে, ভারত থেকে ব্রিটিশ শক্তির অপসারণ

প্রস্তাব দ্বারা সকল ইংরেজকে ভারত থেকে বিদায় নেবার কথা বলা হচ্ছে না। যেসব ইংরেজ ভারতের নাগরিক হিসেবে ভারতে বসবাস করতে ইচ্ছুক তাঁরা প্রত্যেকেই ভারতবাসীর সঙ্গে সমান সুযোগ-সুবিধে নিয়ে ভারতে থাকতে পারবেন। এই সম্পর্কে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ওয়ার্কিং কমিটি বিষয়টিকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কাছে পেশ করছে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা আগামী ৭ই আগস্ট (১৯৪২) বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হবে।

ভারত ছাড়ো

ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতের বুকে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ চলতে শুরু করে। প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু বিবেচনা না করে জনসাধারণ মনে করতে থাকে, ইংরেজদের ভারত থেকে বিদায় করবার জন্য কংগ্রেস খুব শীগগিরই এক গণ-আন্দোলন শুরু করবে। বাস্তবক্ষেত্রেও দেখা যায়, জনগণ এবং সরকার উভয়েই এই প্রস্তাবকে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব বলে মনে করছে। ওয়ার্কিং কমিটির কতিপয় সদস্যের মতো ভারতের জনসাধারণেরও গান্ধীজীর ওপরে একটা অখণ্ড বিশ্বাস ছিলো। তারা মনে করতো, গান্ধীজীর মনে এমন কোনো উদ্দেশ্য আছে যার দ্বারা তিনি সরকারকে অচল করে ফেলে নতি স্বীকারে বাধ্য করতে পারবেন। এই প্রসঙ্গে আমি আরো একটি কথা বলতে চাই, ভারতে তখন এমনও অনেক লোক ছিলো যারা মনে করতো গান্ধীজী কোনোরকম অলৌকিক ক্ষমতাবলে ভারতের স্বাধীনতা এনে দিতে পারবেন। এবং এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তারা প্রস্তাবটির ফলাফল সম্বন্ধে কোনোরকম চিন্তাই করলো না।

প্রস্তাব পাস করবার পর ওয়ার্কিং কমিটি সরকারের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবার উদ্দেশ্যে কয়েকদিন অপেক্ষা করবে বলে স্থির করে। সরকার যদি প্রস্তাবে উল্লিখিত দাবি মেনে নেয় অথবা প্রস্তাব সম্বন্ধে সুবিবেচনার পরিচয় দেয় তাহলে তাদের সঙ্গে পরবর্তী আলোচনায় বসা যাবে। কিন্তু সরকার যদি কংগ্রেসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাহলে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সংগ্রাম শুরু হবে। আমার মনে কিন্তু কোনোরকম সন্দেহই ছিলো না যে সরকার এই দাবি কিছুতেই মেনে নেবে। পরবর্তী ঘটনাবলীই প্রমাণ করে, আমার ধারণাই সঠিক ছিলো।

বিদেশী সংবাদপত্রের বহুসংখ্যক প্রতিনিধি তখন ওয়ার্ধায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সবাই ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত জানবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। ১৫ই জুলাই গান্ধীজী এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন। উক্ত সম্মেলনে কোনো এক বিদেশী সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, আন্দোলন শুরু হলে তা ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে অহিংস বিদ্রোহের রূপ নেবে।

প্রস্তাব পাস হবার পরে গান্ধীজীর সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই মিস স্লেডকে বলেন, তিনি যেন ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করে প্রস্তাবের বিষয়বস্তু তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে আসেন। এখানে মিস স্লেডের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। ইনি ছিলেন ইংরেজদের নৌ-বাহিনীর একজন অ্যাডমিরালের মেয়ে। কিন্তু ইংরেজ-দুহিতা হয়েও ইনি গান্ধীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর আশ্রয়ে বাস করতে থাকেন। ইনি মীরা বেন নামে জনসাধারণের কাছে সমধিক পরিচিতা ছিলেন।

মিস স্লেডকে বলা হয়েছিলো, কংগ্রেসের প্রস্তাবিত আন্দোলন কিভাবে চলবে সে কথা যেন তিনি ব্যাখ্যা করে ভাইসরয়কে বুঝিয়ে দেন।

মীরা বেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ভাইসরয়ের অসম্মতি

মহাদেব দেশাইয়ের কথামতো মিস স্লেড ওয়ার্ধা থেকে দিল্লীতে গিয়ে ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করতে চান। কিন্তু ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী তাঁকে জানিয়ে দেন, গান্ধীজী তাঁর প্রস্তাবিত আন্দোলনকে 'বিদ্রোহ' বলে আখ্যাত করায় ভাইসরয় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে সম্মত নন। প্রাইভেট সেক্রেটারী তাঁকে সুস্পষ্টভাবে বলে দেন, যুদ্ধের সময় সরকার কোনোরকম বিদ্রোহ বরদাস্ত করবে না—সে বিদ্রোহ হিংসই হোক বা অহিংসই হোক। তাছাড়া যে প্রতিষ্ঠান বিদ্রোহের কথা বলে তার কোনো প্রতিনিধির সঙ্গে সরকার কোনোরকম আলোচনা করতেও ইচ্ছুক নয়।

ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করতে না পেরে মীরা বেন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন। আমি তখন দিল্লীতে ছিলাম বলে তিনি সেই আলোচনার বিষয়বস্তু আমাকেও জানিয়ে দেন। এরপর তিনি ওয়ার্ধায় ফিরে গিয়ে গান্ধীজীকেও সব কথা জানিয়ে দেন।

এর কয়েকদিন পরেই মহাদেব দেশাই সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, গান্ধীজীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মহলে নানারকম ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। গান্ধীজী ইংরেজদের বিরুদ্ধে অহিংস বিদ্রোহ শুরু করবেন বলে যে ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তা মোটেই ঠিক নয়।

মহাদেব দেশাইয়ের এই বিবৃতি পড়ে আমি রীতিমতো বিস্মিত হই। আসল ব্যাপার হলো, 'অহিংস বিদ্রোহ' কথাটা প্রথম জওহরলাল ব্যবহার করেন এবং তার পর থেকেই গান্ধীজী ওই কথাটা বলতে শুরু করেন। তিনি হয়তো কথাটাকে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন এবং সে সম্বন্ধে নিজের মনে একটি ব্যাখ্যাও তৈরি করে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর মুখ থেকে ওই কথাটা শুনে জনসাধারণের মনে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হয় যে কংগ্রেস এবার ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য করবার জন্য অহিংস পদ্ধতিতে বলপ্রয়োগ করবে। আমি আগেই বলেছি, গভর্নমেন্টের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমার মনে কোনোরকম ভ্রান্ত ধারণা ছিলো না। সুতরাং গান্ধীজী অথবা তাঁর প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করতে ভাইসরয়ের অসম্মতির কথা শুনে আমি মোটেই বিস্মিত হইনি।

এরপর বোম্বাইতে এ. আই. সি. সি.র সভা আহ্বান করা হয়। স্থির হয়, ১৯৪২-এর ৭ই আগস্ট উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং সেই সভায় এই বিষয়টি আলোচনা করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১৪ই জুলাই থেকে ৫ই আগস্ট পর্যন্ত আমি সারা দেশময় উল্কার মতো ছোটাছুটি করে বিভিন্ন অঞ্চলের কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করি। আমি তাঁদের বুঝিয়ে দিতে চাই, সরকার যদি আমাদের দাবি মেনে নেয় কিংবা নিদেনপক্ষে তারা যদি আমাদের আন্দোলনে বাধা না দেয় তাহলে আমাদের এই আন্দোলনটা গান্ধীজীর নির্দেশ অনুসারেই চলবে। কিন্তু সরকার যদি গান্ধীজী এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করে তাহলে হিংসা-অহিংসার কথা বিবেচনা না করে জনসাধারণ তাদের ইচ্ছামতো আন্দোলনকে চালিয়ে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ সরকার যদি হিংসাপদ্ধতি গ্রহণ করে তাহলে যে-কোনো উপায়ে তাদের প্রতিরোধ করতে হবে। নেতারা যতোদিন বাইরে থাকবেন এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন ততোদিন আন্দোলনের নেতৃত্ব তাঁদের হাতেই থাকবে। কিন্তু সরকার যদি তাঁদের গ্রেপ্তার করে তাহলে ফলাফলের জন্য তারাই দায়ী হবে। স্বাভাবিক কারণেই এইসব নির্দেশ গোপন রাখা হয়েছিলো। আন্দোলন সম্পর্কে আমি যা বুঝতে পেরেছিলাম তা হলো : বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ,

বোম্বাই এবং দিল্লী সর্বতোভাবে প্রস্তুত ছিলো। ওইসব প্রদেশে আন্দোলন যে ব্যাপকভাবে চলবে তাও বুঝতে পেরেছিলাম। সে সময় আসাম ছিলো ইংরেজদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্র। ওখানে তখন প্রচুরসংখ্যক সৈনিক এবং সেনানায়ক উপস্থিত ছিলো। এই কারণে ওখানে কোনোরকম প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করা সম্ভব ছিলো না। ওখানে যা কিছু করতে হবে তার সবই করা হবে বাংলা এবং বিহারের মাধ্যমে এবং এই কারণে উক্ত প্রদেশ দুটোর গুরুত্ব ছিলো অত্যন্ত বেশি। অন্যান্য প্রদেশগুলোকে আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করতেও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম। তবে বলতে বাধা নেই, সেসব প্রদেশের প্রকৃত অবস্থা আমি সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি।

ভাইসরয় মীরা বেনের সঙ্গে দেখা করতে অসম্মত হবার ফলে গান্ধীজী বুঝতে পারেন গভর্নমেন্ট সহজে নতি স্বীকার করবে না। সুতরাং তাঁর মনে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিলো তা কিছুটা শ্লথ হয়ে আসে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মনে করেছিলেন, গভর্নমেন্ট হয়তো গুরুতর কিছু করবে না। তিনি তাই স্থির করেছিলেন, এ. আই. সি. সি.র মিটিংয়ের পরে আন্দোলন কিভাবে চালানো হবে তার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করবার মতো যথেষ্ট সময় তিনি পাবেন এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারে আন্দোলনকে ব্যাপকতর করে তুলতে পারবেন। আমি কিন্তু এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করতাম। ২৮শে জুলাই আমি গান্ধীজীর কাছে বিস্তারিতভাবে একটি চিঠি লিখে তাতে জানিয়ে দিই, সরকার সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে আছে এবং বোম্বাইতে এ. আই. সি. সি.র মিটিং শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা তাদের কাজ করবে। এর উত্তরে গান্ধীজী লেখেন, তিনি নিজেও এ বিষয়ে ঘটনাবলীর দিকে লক্ষ্য রাখছেন এবং তিনি এখনো বিশ্বাস করেন কোনো-না-কোনো পথ নিশ্চয়ই বের করা যাবে। সুতরাং আমি যেন তাড়াতাড়ি করে কোনোরকম সিদ্ধান্ত না নিই।

৩রা আগস্ট আমি কলকাতা থেকে বোম্বাই রওনা হই। সেই সময় আমার কেন যেন মনে হয়েছিলো, এবার আমি দীর্ঘদিনের জন্য কলকাতা পরিত্যাগ করছি। আমি যেসব খবর পেয়েছিলাম তা থেকে জানতে পেরেছিলাম, সরকার এমনভাবে প্রস্তুত হয়ে আছে যে কংগ্রেস তার প্রস্তাব পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই তারা কংগ্রেসের সব নেতাকেই গ্রেপ্তার করবে।

৫ই আগস্ট ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসে। সেই সভায় কমিটি একটি খসড়া প্রস্তাব রচনা করে এবং খসড়া প্রস্তাবটি ৭ই আগস্ট এ. আই. সি. সি.র সামনে পেশ করা হয়। আমার উদ্বোধনী ভাষণে আমি এ. আই. সি. সি.র

বিগত অধিবেশনের পরে যেসব ঘটনা ঘটেছে তার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিই। ওয়ার্কিং কমিটি কেন' তার পূর্ব অভিমত পরিহার করে ভারতের স্বাধীনতার জন্য জাতিকে এক নতুন আন্দোলনে নামবার জন্য ডাক দিয়েছে, তার কারণও আমি সংক্ষেপে ব্যক্ত করি। আমি আরো বলি, জাতির ভাগ্য যখন দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে তখন সে কিছুতেই নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারে না। ভারত গণতান্ত্রিক পক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চেয়েছিলো কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতের এই সদিচ্ছাকে কার্যে পরিণত করতে দেননি। এদিকে জাপানী আক্রমণ আসন্ন হয়ে পড়ায় জাতির পক্ষে আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ইংরেজরা যেভাবে সিঙ্গাপুর, মালয় এবং ব্রহ্মদেশ থেকে সরে এসেছে, তারা ইচ্ছা করলে ভারত থেকেও সেইভাবে সরে যেতে পারে। কিন্তু ইংরেজরা সরে গেলেও ভারতবাসীরা তাদের নিজের মাতৃভূমি পরিত্যাগ করতে পারে না। অতএব ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে নতুন আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করা জাতির পক্ষে আরো প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

সামান্য-সংখ্যক কমিউনিস্ট বাদে এ. আই. সি. সি.র প্রায় সব সদস্যই ওয়ার্কিং কমিটির খসড়া প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। গান্ধীজীও এই সভায় বক্তৃতা করেন। দুদিন উক্ত খসড়া প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা এবং বিচার-বিবেচনা করবার পর ৮ই আগস্ট বিপুল ভোটাধিক্যে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করা হয়। এ. আই. সি. সি.র প্রস্তাবটি এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে দেখতে পাওয়া যাবে।

আমি গ্রেপ্তার হলাম

আমি বোম্বাই গেলে প্রায়ই ভুলাভাই দেশাইয়ের বাড়িতে থাকতাম। এবারেও আমি সেখানেই উঠলাম। শ্রীদেশাই তখন অসুস্থ ছিলেন। কিছুদিন যাবৎ তাঁর শরীরটা ভালো যাচ্ছিলো না। আমি এ. আই. সি. সি.র মিটিংয়ের পরে যখন ভুলাভাইয়ের বাড়িতে ফিরলাম তখন বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, ভুলাভাই আমার জন্য জেগে বসে আছেন। তখন বেশ রাত হয়ে গিয়েছিলো। আমি ভেবেছিলাম তিনি হয়তো শুয়ে পড়েছেন। তাঁকে জেগে থাকতে দেখে আমি বলি, অত রাত পর্যন্ত জেগে থাকাটা তাঁর উচিত হয়নি। কিন্তু আমার

কথায় কান না দিয়ে তিনি বললেন, মহম্মদ তাহের নামে আমার এক আত্মীয় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাহের সাহেব বোম্বাইতে ব্যবসা করতেন। শ্রীদেশাই বললেন, তিনি আমার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন, কিন্তু আমি আসছি না দেখে তিনি ভুলাভাইয়ের কাছে একটা খবর দিয়ে গেছেন। বোম্বাইয়ের পুলিস বিভাগে মহম্মদ তাহেরের একজন বন্ধু চাকরি করতেন। তিনি সেই পুলিস অফিসারের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন পরদিন ভোরবেলাতেই কংগ্রেসের সব নেতা গ্রেপ্তার হবেন। তাহের সাহেবের বন্ধু তাঁকে আরো বলেছেন, সঠিকভাবে না জানলেও তিনি যে সংবাদ পেয়েছেন, তা হলো, সবাইকে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

কলকাতা থেকে রওনা হবার আগে আমিও এইরকম একটা খবর পেয়েছিলাম। এবার বুঝতে পারলাম সে খবরটা মোটেই ভিত্তিহীন নয়। গভর্নমেন্ট হয়তো ভেবেছে গ্রেপ্তার করবার পর আমাদের ভারতে রাখা যুক্তিযুক্ত হবে না। এইজন্যই তারা দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্নমেন্টের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করেছিলো। হয়তো শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্নমেন্টের সঙ্গে তাদের মতবিরোধ হয় এবং সেই কারণে তারা তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। শীগগিরই আমরা জানতে পারি, গান্ধীজীকে পুনা জেলে এবং অন্যান্য নেতাদের আমেদাবাদ ফোর্ট জেলে বন্দী করে রাখা হবে।

তাহের সাহেবের কাছ থেকে খবরটা জানবার পর ভুলাভাই রীতিমতো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এবং এই কারণেই তিনি আমার জন্য জেগে বসেছিলেন। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম বলে ওসব গুজব শোনবার কোনোরকম ইচ্ছা আমার ছিলো না। আমি তাই ভুলাভাইকে বলি, খবরটা যদি সত্যি হয় তাহলে আর মাত্র কয়েক ঘন্টা আমি স্বাধীন থাকতে পারবো। সুতরাং ওসব কথা চিন্তা না করে আমি তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়বো যাতে সকালবেলা আমি ভালোভাবে ঘটনার মোকাবিলা করতে পারি। যে সামান্য সময় আমার স্বাধীনতা আছে, সে সময়টা গুজবের কথা নিয়ে আলোচনা না করে ঘুমিয়ে নেওয়াই সঙ্গত হবে। ভুলাভাইও এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত হন এবং এ ব্যাপারে আর কোনো আলোচনা না করে শুয়ে পড়েন।

ভোরবেলা কিছুক্ষণ ভ্রমণ করা আমার বহুদিনের অভ্যাস। সেদিনও আমি

তাই ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে উঠি। তখনো আমার শরীরের ক্লান্তি দূর হয়নি। আমার মাথাটা তখনো বেশ ভারি বোধ করছিলাম। আমি দুটো অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট এবং এক কাপ চা খেয়ে কাজ করতে বসে যাই। আমরা স্থির করেছিলাম, কংগ্রেসের প্রস্তাবের একটা নকল এবং একখানা চিঠি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে পাঠিয়ে দেবো। ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন বলেই আমরা এটা করতে চেয়েছিলাম। আমি তাই প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে যে চিঠি লেখা হবে তার খসড়া তৈরি করতে শুরু করি। কিন্তু আমার শারীরিক ক্লান্তির জন্যই হোক বা অ্যাসপিরিন ব্যবহারের জন্যই হোক, ঘুমে আমার চোখ বুজে আসছিলো। তাই লেখা বন্ধ করে আবার আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

পনেরো মিনিটও ঘুমোইনি, হঠাৎ কে যেন আমার পায়ে হাত দিচ্ছে বলে মনে হলো। চোখ খুলতেই দেখি ভুলাভাইয়ের ছেলে ধীরুভাই দেশাই একখানা কাগজ হাতে নিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কাগজখানা যে কী বস্তু তা আমি ওটার দিকে একবার তাকিয়েই বুঝতে পারি। ওটা যে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তা বুঝতে আমার দেরি হয় না। ধীরুভাইও এই কথাই বলে। সে বলে, বোম্বাইয়ের ডেপুটি কমিশনার অব পুলিস আমাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য ওই ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছিলো। ধীরুভাই আরো বলে, তিনি আমার জন্য বারান্দায় অপেক্ষা করছেন। আমি ধীরুভাইকে বলি, সে যেন ডেপুটি কমিশনারকে জানিয়ে দেয়, আমার প্রস্তুত হতে সামান্য একটু সময় লাগবে।

আমি স্নান সেরে জামাকাপড় পরে নিলাম। ইতিমধ্যে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী মহম্মদ আজমল খাঁ আমার কাছে এসে হাজির হয়েছিলেন। তাঁকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবার পর আমি বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই দেখি, ভুলাভাই এবং তাঁর জামাই ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে কথা বলছেন। আমি মৃদু হেসে ভুলাভাইকে বললাম, গতরাত্রে যে বন্ধুটি এসে খবর দিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর সেই খবরটা দেখছি সত্যি। এরপর আমি ডেপুটি কমিশনারের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমি প্রস্তুত। সময় তখন ভোর পাঁচটা।

আমি ডেপুটি কমিশনারের গাড়িতে উঠে বসলাম। আর একটি গাড়িতে আমার জিনিসপত্র তুলে নেওয়া হলো। গাড়ি দুটো সোজা এসে হাজির হলো ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনে। তখন লোকাল ট্রেনগুলো ছাড়বার কথা,

কিন্তু আমি দেখতে পেলাম, স্টেশনে একখানা লোকাল ট্রেনও নেই। কোনো যাত্রীও দেখতে পেলাম না সেখানে। মনে হলো সব ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

আমি মোটর থেকে নামতেই অশোক মেহতাকে দেখতে পেলাম। তাঁকেও গ্রেপ্তার করে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে আনা হয়েছে। তাঁকে দেখে বুঝতে পারলাম, গভর্নমেন্ট শুধু ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের গ্রেপ্তার করেই ক্ষান্ত হননি; বোম্বাইয়ের অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদেরও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমার আরো মনে হলো, সারা ভারতবর্ষ জুড়েই হয়তো ওইভাবে কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

প্ল্যাটফর্মে তখন একটি মাত্র ট্রেন অপেক্ষা করছিলো। একটি ইঞ্জিন তখন একটা ডাইনিং কারকে সেই ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছিলো। ট্রেনটাতে করিডর থাকায় এক কামরা থেকে অপরাপর কামরায় যাবার সুযোগ ছিলো। এই ধরনের করিডরযুক্ত ট্রেন বোম্বাই ও পুনার মধ্যে চলাচল করতো। আমাকে ওই ট্রেনের একটি কামরায় তুলে দেওয়া হলে আমি একটা জানলার পাশে আসন গ্রহণ করলাম।

একটু পরেই জওহরলাল, আসফ আলী এবং ডাঃ সৈয়দ মামুদ এসে হাজির হলেন। জওহরলালের কাছ থেকে শুনলাম গান্ধীজীকেও স্টেশনে আনা হয়েছে এবং তাঁকে অপর একটি কামরায় স্থান দেওয়া হয়েছে। এই সময় একজন ইয়োরোপীয়ান মিলিটারী অফিসার আমাদের সামনে এসে আমরা চা খেতে চাই কিনা জানতে চাইলো। আমি যদিও সকালে চা খেয়ে এসেছি তবুও আর এক কাপ চাইলাম।

এই সময় আর একজন মিলিটারী অফিসার আবির্ভূত হয়ে আমাদের গুনতে শুরু করলো। তার চালচলন দেখে আমার মনে হলো, কোনো ব্যাপারে সে একটু ঘাবড়ে গেছে। এরকম মনে হলো তাকে বার বার গুনতে দেখে। আমাদের কামরায় এসে সে বেশ একটু জোরে উচ্চারণ করলো—ত্রিশ। দু-তিনবার যখন সে ত্রিশ সংখ্যাটি উচ্চারণ করলো, তখন আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম—বত্রিশ। আমার কথা শুনে লোকটা আরো ঘাবড়ে গেলো। সে তখন আবার গুনতে শুরু করলো। একটু পরেই গার্ডের বাঁশি বেজে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটা চলতে শুরু করলো। এই সময় আমি শ্রীমতী আসফ আলীকে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তিনি তাঁর স্বামীকে বিদায় অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে

তিনি বললেন, 'আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমি চুপ করে বসে থাকবো না।' পরবর্তীকালে জানতে পারি, তিনি তাঁর কথামতোই কাজ করেছিলেন।

আগে বলেছি, ট্রেনটাতে করিডর ছিলো। শ্রীমতী নাইডু আমাদের কামরায় এসে বললেন, গান্ধীজী আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। তাঁর কথা শুনে আমরা করিডর দিয়ে গান্ধীজীর কামরায় গেলাম। গান্ধীজীকে তখন খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছিলো। আমি তাঁকে এতোটা বিমর্ষ আর কোনোদিন দেখিনি। আমার মনে হলো, ব্যাপারটা যে এতোদূর গড়াবে, অর্থাৎ তাঁকে যে এইভাবে গ্রেপ্তার করা হবে এটা হয়তো তিনি আশা করেননি। তিনি ভেবেছিলেন গভর্নমেণ্ট কোনোরকম গুরুতর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না। আমি কিন্তু আগেই তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলাম এতোটা আশাবাদী হওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু তিনি তাঁর বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে থাকেন। এবারে তাঁর চিন্তাধারা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হওয়ায় পরবর্তী পন্থা কী হবে তা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না।

মিনিট দুই কথা বলবার পর গান্ধীজী আমাকে বললেন, 'গন্তব্যস্থানে পৌঁছেই আপনি গভর্নমেণ্টকে জানিয়ে দেবেন, এখনো আপনি কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট হিসেবে কাজ করছেন; এবং এর জন্য আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারীকে আপনার কাছে আসা-যাওয়া করতে দিতে হবে এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও দিতে হবে। গতবারে আপনাকে যখন গ্রেপ্তার করে নাইনি জেলে রাখা হয়েছিলো সেই সময় গভর্নমেণ্ট আপনাকে এই সব সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলো। এবারেও আপনি সেইরকম সুযোগ-সুবিধা দাবি করবেন এবং দরকার হলে এই ব্যাপারটাকে প্রাধান্য দেবেন।'

আমি কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। আমি তাঁকে বললাম, এবারের অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা খোলা চোখেই আমাদের পথ বেছে নিয়েছি, সুতরাং তার ফলাফলের জন্যও আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। কংগ্রেসের কোনো সিদ্ধান্তের পক্ষে যদি আমাকে সংগ্রাম করতে হতো তাহলে আমার কোনো আপত্তি হতো না, কিন্তু ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার জন্য সংগ্রাম করাটা আমি সঠিক কাজ বলে মনে করতে পারি না। আমার আরো মনে হয়, প্রেসিডেণ্ট হিসেবে কাজ করবার জন্য আমার প্রাইভেট সেক্রেটারীকে আমার কাছে যাতায়াত করবার দাবি জানানোটা ঠিক হবে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ধরনের কাজ করা, অর্থাৎ এইরকম একটা সামান্য ব্যাপারকে প্রাধান্য দিয়ে তিলকে তাল করাটা কোনোক্রমেই

সম্মত হবে না।

আমরা যখন গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা করছিলাম সেই সময় বোম্বাইয়ের পুলিস কমিশনার সেখানে এসে হাজির হলেন। তিনি আমাদের নিজের নিজের কামরায় চলে যেতে বললেন। তিনি আরো বললেন, গান্ধীজীর কাছে একমাত্র শ্রীমতী নাইডু ছাড়া আর কেউ থাকতে পারবেন না। আমি আর জওহরলাল তখন আমাদের কামরায় ফিরে এলাম। ট্রেন তখন দ্রুত-গতিতে কল্যাণ অভিমুখে যাচ্ছিলো। কিন্তু কল্যাণ স্টেশনে না থেমে ট্রেন পুনার পথ ধরলো। আমার তখন মনে হলো, আমাদের হয়তো ওখানেই বন্দী করে রাখা হবে। আমার এই বিশ্বাস আরো দৃঢ় হলো, যখন আমি দেখতে পেলাম ট্রেন পুনা স্টেশনে এসে থেমে গেলো।

ওখানকার দৃশ্য দেখে আমার মনে হলো, আমাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ আগেই পুনায় পৌঁছে গেছে। সারা প্ল্যাটফর্মটা পুলিসে ভরতি হয়ে রয়েছে এবং তারা জনসাধারণকে সেখানে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। কিন্তু ওভারব্রীজের ওপরে বহু লোক জমায়েত হয়েছে দেখা গেলো। ট্রেন স্টেশনে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই জনতা 'মহাত্মা গান্ধীকি জয়' বলে চিৎকার করতে শুরু করলো। জনতার সেই চিৎকার থামাবার উদ্দেশ্যে কমিশনার তাদের ওপর লাঠি চার্জ করবার জন্য পুলিসকে নির্দেশ দিলেন। কমিশনার বললেন, কোনোরকম জনজমায়েত অথবা ধ্বনি উচ্চারণ করা বরদাস্ত করা হবে না বলে গভর্নমেন্ট আদেশ জারী করেছেন।

জওহরলাল একটি জানলার পাশে বসে ছিলেন। তিনি যখন দেখতে পেলেন পুলিস জনতার ওপরে লাঠিচার্জ করছে তখন তিনি এক লাফে কামরা থেকে নেমে দ্রুতপদে পুলিসের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'জনতার ওপর লাঠিচার্জ করবার কোনো অধিকার তোমাদের নেই।'

জওহরলালকে ওইভাবে এগিয়ে যেতে দেখে পুলিস কমিশনার ছুটতে ছুটতে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে কামরায় ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হলেন। জওহরলাল কিন্তু তাঁর কোনো কথাই শুনতে রাজী হলেন না। তিনি তখন ভীষণ রেগে গেছেন। এই সময় ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্য শঙ্কররাও দেও-ও প্ল্যাটফর্মে নেমে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে চারজন পুলিস তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালো এবং তাঁকে ট্রেনে ওঠবার জন্য বলতে লাগলো। কিন্তু তিনি যখন তাদের নির্দেশ মানতেও সম্মত হলেন না তখন তারা তাঁকে ধরে পাঁজাকোলা করে ট্রেনে তুলে দিলো। আমি তখন জওহরলালের দিকে তাকিয়ে তাঁকে

ফিরে আসতে বললাম। জওহরলাল রাগান্বিত দৃষ্টি নিয়েই আমার দিকে ফিরে তাকালেন। কিন্তু তিনি আমার অনুরোধ মেনে নিলেন। এই সময় পুলিস কমিশনার আমার কাছে এসে বললেন, 'আমি খুবই দুঃখিত, কিন্তু গভর্নমেন্ট আমাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন আমি তা মানতে বাধ্য।' কথাটা তিনি দু-তিনবার বললেন।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমি দেখতে পেলাম, গান্ধীজী এবং শ্রীমতী নাইডুকে ট্রেন থেকে নামিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিছুদিন পরে আমরা জানতে পারি, তাঁদের আগা খাঁর প্রাসাদে বন্দী করে রাখা হয়েছে। বোম্বাইতে গ্রেপ্তার হওয়া আর একজন লোকও ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিস তাঁকে বাধা দিতে এগিয়ে আসে। কিন্তু পুলিসের বাধা অগ্রাহ্য করে তিনি এগিয়ে যেতে থাকেন। পুলিস তখন তাঁকে জোর করে ধরে ট্রেনে তুলে দেয়। আমার মনে হয় তিনি গান্ধীজীর নির্দেশ অনুসারেই পুলিসের বাধাকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। গান্ধীজীর নির্দেশ স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, বর্তমান আন্দোলনে কোনো লোকই স্বেচ্ছায় পুলিসের এবং বিনা বলপ্রয়োগে গ্রেপ্তার বরণ করবে না।

গান্ধীজীকে সরিয়ে নিয়ে যাবার পর ট্রেন আবার চলতে শুরু করলো। এবার আমি বুঝতে পারলাম, আমাদের আহম্মদনগরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বেলা প্রায় দেড়টার সময় আমরা স্টেশনে এসে উপস্থিত হলাম। প্ল্যাটফর্মে তখন কয়েকজন পুলিস অফিসার ছাড়া আর কোনো জনপ্রাণী ছিলো না। ওখানে আমাদের ট্রেন থেকে নামতে বলা হলো। আগে থেকেই কয়েকটা মোটরগাড়ি স্টেশনের বাইরে অপেক্ষা করছিলো। আমাদের সবাইকে সেইসব গাড়িতে তুলে দেওয়া হলো। আমরা বসতেই গাড়িগুলো চলতে শুরু করলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আহম্মদনগর দুর্গের ফটকের ভেতরে ঢুকে পড়লাম। একজন মিলিটারী অফিসার সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পুলিস কমিশনার একটা তালিকা বের করে তাঁর হাতে দিলেন। তালিকাটি দেখে সেই মিলিটারী অফিসার একে একে আমাদের নাম ডাকতে লাগলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যাঁর যাঁর নাম ডাকা হলো তাঁদের প্রত্যেককে ভেতরে যেতে বললেন। প্রকৃতপক্ষে পুলিস কমিশনার আমাদের ভার মিলিটারী কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত করলেন। এখন থেকে আমরা মিলিটারীর অধীনস্থ হলাম।

আহম্মদনগর ফোর্ট জেল

আমাকে এবং ওয়ার্কিং কমিটির নজন সদস্যকে আহম্মদনগর ফোর্টে নিয়ে আসা হয়। যে নজন সদস্যকে এখানে আনা হয় তাঁরা হলেন, জওহরলাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল, আসফ আলী, শঙ্কররাও দেও, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়া, ডঃ সৈয়দ মামুদ, আচার্য কৃপালনী এবং ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ। রাজেনবাবু যদিও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন, কিন্তু তিনি বোম্বাইয়ের সভায় উপস্থিত ছিলেন না বলে তাঁকে পাটনায় গ্রেপ্তার করে সেখানেই বন্দী করে রাখা হয়।

দুর্গের ভেতরে যে দালানটায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো সেটা দেখতে অনেকটা মিলিটারী ব্যারাকের মতো। প্রায় ২০০ ফিট লম্বা একটা ফাঁকা উঠোনের চারপাশ ঘিরে অনেকগুলো ঘর। পরে আমরা জানতে পারি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিদেশী বন্দীদের এখানে রাখা হয়েছিলো। আমাদের খবরদারি করবার জন্য পুনা থেকে একজন জেলারকে ওখানে পাঠানো হয়েছিলো। প্রথমেই সে আমাদের জিনিসপত্রগুলো তল্লাসী শুরু করলো। আমার একটি ছোট পোর্টেবল রেডিও ছিলো। ওটাকে আমি সব সময় আমার কাছে রাখতাম। জেলার মশাই আমার অন্যান্য জিনিসগুলো আমাকে দিলেও রেডিওটাকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। ওটা আবার আমাকে ফেরত দেওয়া হয় মুক্তির দিনে। তার আগে পর্যন্ত ওটাকে আমি দেখতেই পাইনি।

কিছুক্ষণ পরেই লোহার থালায় করে আমাদের খেতে দেওয়া হলো। থালাগুলো দেখে আমাদের মেজাজ খাট্টা হয়ে গেলো। আমি তখন জেলারকে বললাম, আমরা চীনামাটির প্লেটে খেতে অভ্যস্ত। লোহার থালা আমাদের মোটেই পছন্দ নয়। আমার কথার উত্তরে জেলার বিনীতভাবে, বললেন, পরদিন থেকে আমাদের জন্য ডিনার সেট আনা হবে। আমাদের খাদ্য তৈরি করবার জন্য পুনা থেকে একজন কয়েদীকে নিয়ে আসা হয়েছিলো। লোকটা আমাদের পছন্দমতো খাবার তৈরি করতে পারতো না বলে কয়েক-দিন পরেই তার বদলে নতুন একজন রসুইদারকে নিয়ে আসা হয়। এ লোকটার রান্নাও তথৈবচ।

আমাদের যে আহম্মদনগর দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়েছে তা সযত্নে গোপন রাখা হয়েছিলো। আমার কিন্তু মনে হয়েছিলো, ওই গোপনতা বেকুবী ছাড়া

আর কিছু নয়, কারণ খবরটা বেশীদিন গোপন রাখা সম্ভব হবে না। যাই হোক, গভর্নমেন্টের এই ধরনের অতিরিক্ত সতর্কতা দেখে আমি মোটেই বিস্মিত হইনি। এইসব ব্যাপারে সব গভর্নমেন্টই এই ধরনের বেকুবী করে থাকে।

দু-তিনদিন পরে বোম্বাইয়ের ইনস্পেক্টর জেনারেল অব প্রিজনস্ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি আমাদের জানিয়ে দেন আমরা কোনো চিঠিপত্র লিখতে পারবো না; এমন কি আত্মীয়স্বজনদের কাছেও না। তাছাড়া আমাদের নামে যেসব চিঠিপত্র আসবে সেগুলোও আমাদের দেওয়া হবে না এবং কোনো সংবাদপত্রও আমাদের সরবরাহ করা হবে না। এটা নাকি গভর্নমেন্টের আদেশ। তিনি বিনয় প্রকাশ করে বলেন, গভর্নমেন্টের নির্দেশ তাঁকে পালন করতেই হবে। তবে এইসব সুযোগ-সুবিধে ছাড়া আমরা আর যা যা চাইবো তা তিনি আনন্দের সঙ্গেই আমাদের দেবেন।

আমি যখন কলকাতা থেকে বোম্বাইতে আসি তখন আমার শরীরটা ভালো ছিলো না। এ. আই. সি. সি.র মিটিঙের সময়ও আমি ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগছিলাম। এ কথা গভর্নমেণ্টও জানতেন। ইনস্পেক্টর জেনারেল নিজেও একজন ডাক্তার। তিনি তাই আমার রোগ পরীক্ষা করতে চান। আমি কিন্তু তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হই না।

আমরা বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিলাম বলে বাইরে কি হচ্ছে তা আমরা জানতেই পারিনি। এই অবস্থায় থাকলে আমাদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে মনে করে আমরা একটা কিছু করবার কথা চিন্তা করতে থাকি। আগেই বলেছি, আমাদের ঘরগুলো একটা উঠোনকে বেষ্টন করে অবস্থিত ছিলো। আমি ছিলাম প্রথম ঘরে। দ্বিতীয় ঘরে জওহরলাল এবং তৃতীয় ঘরে ছিলেন আসফ আলী ও ডঃ সৈয়দ মামুদ। এই লাইনের শেষ ঘরটিকে আমাদের খাবার ঘর করা হয়েছিলো, সকাল আটটায় আমরা প্রাতঃরাশের জন্য এবং এগারোটায় দুপুরের খাবারের জন্য আমরা সেই ঘরটায় মিলিত হতাম। এর পরে আমাদের আলাপ-আলোচনা চলতো আমার ঘরে বসে। বিভিন্ন ধরনের আলোচনা হতো ঘন্টার পর ঘন্টা। আলোচনার পরে আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতাম। তারপর আবার আমরা বিকেলের চা পানের জন্য চারটের সময় পূর্বোক্ত খাবার ঘরে মিলিত হতাম। চা পানের পরে আমরা উন্মুক্ত উঠোনে কিছুক্ষণ ব্যায়াম করতাম। ডিনার সরবরাহ করা হতো রাত আটটার সময়। ডিনারের পরে রাত দশটা পর্যন্ত আবার চলতো আলোচনা। এরপর আমরা যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তাম।

ফুলের বাগান তৈরি

আমরা যখন জেলখানায় এলাম তখন ব্যারাকের ভিতরে উঠোনটা একেবারেই ফাঁকা ছিলো। উঠোনটা দেখে জওহরলাল একদিন বললেন, ওখানে ফুলের বাগান তৈরি করলে বেশ হয়। দিনের পর দিন নিষ্কর্মা অবস্থায় বসে বসে আমরা হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। বাগান করার প্রস্তাবটা তাই খুবই মনঃপূত হলো আমাদের। এতে আমরা কায়িক পরিশ্রম করবার সুযোগ পাবো। আমরা তাই সঙ্গে সঙ্গে জওহরলালের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে গেলাম। আমরা তখন জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে বললাম, তিনি যেন পুনা থেকে ফুলগাছের কিছু বীজ আনিয়ে দেন। এরপর আমরা সবাই মিলে লেগে গেলাম জমি তৈরি করতে। বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে জওহরলালই নেতৃত্ব নিয়েছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই বীজ এসে গেলো। আমরা তিরিশ-চল্লিশ রকমের বীজ পুঁতে প্রতিদিন তাতে জল সেচন করতে শুরু করলাম। বীজ থেকে যখন অঙ্কুরোদ্গম হলো, তখন আমাদের কী আনন্দ। যেন একটা কাজের মতো কাজ করে ফেলেছি। এরপর গাছগুলো বড় হয়ে যখন ফুল ফুটলো, তখন উঠোনটা ভারী সুন্দর দেখাতে লাগলো।

আমরা জেলখানায় আসবার দিন পাঁচেক পরে একজন অফিসার এসে জেলখানার ভার নিলেন। শুনতে পেলাম সে এসেছে জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হয়ে। লোকটা শহরে থাকতো এবং প্রতিদিন সকাল আটটায় আসতো এবং সন্ধ্যার সময় চলে যেতো। এর নাম আমরা জানতে পারিনি। কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধে বোধ করিনি। কারণ আমরা নিজেরাই ওর একটি নামকরণ করে নিয়েছিলাম। আমার মনে পড়ে যায়, চাঁদ বিবিকে যখন এই জেলখানায় বন্দিনী করে রাখা হয়েছিলো তখন এখানে চিতা খাঁ নামে একজন জেলার ছিলো। আমি তাই প্রস্তাব করলাম, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেবকে এই নামটাই দেওয়া হোক। আমার সহকর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রস্তাব মেনে নিলেন। নামটা এতোই জনপ্রিয় হয়েছিলো, কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেলো, সবাই তাঁকে চিতা খাঁ বলে উল্লেখ করছে। তিন-চারদিন পরে জেলার এসে আমাদের জানিয়ে দিয়ে গেলেন, চিতা খাঁ সেইদিন সকালেই ওখান থেকে বিদায় নিয়েছেন।

আমরা আরো জানতে পারি, এই চিতা খাঁ জাপানী আক্রমণের সময়

পোর্ট ব্লেয়ারে ছিলো। পোর্ট ব্লেয়ার যখন জাপানের অধিকারে যায় তখনো সে ওখানেই ছিলো।

২৫শে আগস্ট আমি ভাইসরয়কে একটি চিঠি লিখি। চিঠিতে আমি বলি, আমাকে এবং আমার সহকর্মীদের বিরুদ্ধে গভর্নমেণ্ট যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে তার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। তবে জেলখানায় আমাদের প্রতি যেরকম ব্যবহার করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ আছে। জেলখানার কয়েদীদেরও তাদের আত্মীয়স্বজনদের কাছে চিঠি লিখতে দেওয়া হয়; কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে এটা অস্বীকার করা হয়েছে। চিঠিতে আমি আরো লিখি, দু সপ্তাহের মধ্যে আমরা যদি গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে কোনোরকম সন্তোষজনক উত্তর না পাই তাহলে আমি এবং আমার সহকর্মীরা পরবর্তী ব্যবস্থা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।

১০ই সেপ্টেম্বর চিতা খাঁ আমাদের সঙ্গে দেখা করে বলে, সে গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছে আমরা আমাদের আত্মীয়স্বজনের কাছে সপ্তাহে একবার করে চিঠি লিখতে পারবো। এ ছাড়া একটি দৈনিক পত্রিকাও প্রতিদিন আমাদের দেওয়া হবে। একটা 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' আমার টেবিলে দেওয়া হলো। পরদিন থেকে নিয়মিতভাবেই আমরা ওই সংবাদপত্র পেতে থাকি। সে রাত্রে বহুদিন পরে আমি খবরের কাগজ পড়ি। প্রায় এক মাস যাবৎ আমরা বাইরের কোনো খবরই জানতে পারিনি। এতোদিন পরে দেশের খবরাখবর এবং যুদ্ধের অবস্থা আমরা জানতে পারি।

পরদিন আমি চিতা খাঁকে বলি সে যেন পত্রিকার পুরনো সংখ্যাগুলো আমাদের দেয়। গভর্নমেণ্ট আমাদের সংবাদপত্র সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছে বলে চিতা খাঁ আমার প্রস্তাবটি মেনে নেয়। দু-তিনদিন পরেই 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া'র পুরনো সংখ্যাগুলোর একটি সম্পূর্ণ ফাইল আমাদের দেওয়া হয়। আমার গ্রেপ্তারের দিন থেকে গতকাল পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যাই সে ফাইলে ছিলো।

পত্রিকাগুলো পড়বার পর আমি জানতে পারি, আমি যা আগে অনুমান করেছিলাম, ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন ঠিক সেই পথেই গেছে। বাংলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং বোম্বাইতেই সরকার-বিরোধী আন্দোলন বেশী করে বিস্তৃত হয়েছে। ওইসব প্রদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপর্যয় সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বহু কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া বহুসংখ্যক থানা এবং রেলস্টেশন পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। বহুসংখ্যক মিলিটারী

লরিও পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম তৈরি প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হয়েছে। এক কথায় বলা চলে, জনসাধারণ হিংসা দ্বারাই সরকারী হিংসা নীতির মোকাবিলা করছে। আমি ঠিক এইরকমই অনুমান করেছিলাম। এবং এইরকম একটা কিছু ঘটবে বা ঘটতে পারে ভেবেই কর্মীদের যথাযোগ্য নির্দেশ দিয়েছিলাম। সহকর্মীদের সঙ্গেও এ ব্যাপারে আমি তখন আলোচনা করেছিলাম।

১৯৪২-এর পরবর্তী মাসগুলোতে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়নি।

গান্ধীজীর অনশন

কিন্তু ১৯৪৩ শুরু হতেই আবহাওয়া আবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সংবাদপত্র থেকে জানতে পারি, গান্ধীজী একুশদিন অনশন করবার সঙ্কল্প নিয়েছেন এবং তাঁর সেই সঙ্কল্পের কথা একটি চিঠিতে ভাইসরয়কে জানিয়ে দিয়েছেন। এই অনশনকে তিনি আত্মশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন বলে ঘোষণা করেছেন। আমার মনে হয়, দুটি প্রধান কারণে গান্ধীজী এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আমি আগেই বলেছি, গান্ধীজীর ধারণা ছিলো, গভর্নমেণ্ট তাড়াহুড়ো করে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না ; এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি ভেবেছিলেন, নিজের অহিংস পদ্ধতিতে আন্দোলন পরিচালনা করবার যথেষ্ট সময় এবং সুযোগ তিনি পাবেন। কিন্তু তাঁর সব আশাই ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়ায় সমস্ত বিষয়ের জন্য তিনি নিজেকে দায়ী মনে করেন এবং এইজন্যই তিনি অনশন করে আত্মশুদ্ধি করবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। আমি কিন্তু তাঁর এই অনশনের মতলবটা খুশী মনে মেনে নিতে পারিনি। ব্যাপারটা আমার কাছে নিতান্তই অযৌক্তিক মনে হয়েছিলো।

ওদিকে গভর্নমেণ্ট কিন্তু ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, গান্ধীজীর যা বয়স এবং তাঁর স্বাস্থ্যের যেরকম অবস্থা তাতে একুশদিন অনশন করা মানেই ইচ্ছামৃত্যু বরণ করা। তাঁরা আরো ভেবেছিলেন, বিশ্বের চোখে তাঁর মৃত্যুর জন্য গভর্নমেণ্টকে দায়ী করবার উদ্দেশ্যেই তিনি অনশনের মতলব করেছেন। পরে আমরা জানতে পারি, গান্ধীজীর মৃত্যু হবেই ধরে নিয়ে তাঁকে দাহ করবার জন্য গভর্নমেণ্ট চন্দনকাঠও সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। গভর্নমেণ্ট আরো স্থির করেছিলেন,

গান্ধীজীর মৃত্যু হলেও তাঁরা তাঁদের নীতি পরিবর্তন করবেন না। তাঁরা আরো স্থির করেছিলেন, গান্ধীজীকে আগা খাঁ প্রাসাদেই সৎকার করা হবে এবং সৎকারের পরে তাঁর চিতাভস্ম তাঁর ছেলেদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

এই সময় কলকাতা থেকে ডাঃ বি. সি. রায় গভর্নমেন্টকে একটি চিঠি লিখে তাতে প্রস্তাব করেন, গান্ধীজীর অনশনের সময় তিনি তাঁর কাছে থাকতে চান। গভর্নমেন্ট এতে কোনো আপত্তি জানান না। অনশন শুরু হবার পরে এমন একটা সময় আসে যখন গান্ধীজীর চিকিৎসকরা তাঁর প্রাণের আশা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু অসাধারণ মনোবল এবং জীবনীশক্তির সাহায্যে গান্ধীজী সে ধাক্কা কাটিয়ে ওঠেন এবং একুশদিন পর অনশন ভঙ্গ করেন।

গান্ধীজীর অনশনের পরে উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হয়ে এলে আমরা আবার আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে মনোযোগ দিই। তাঁর অনশনের সময় বারবার আমাদের মনে হয়েছে বন্দীজীবনের অসহায় অবস্থার কথা।

গত কয়েক বছর যাবৎ আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছিলো না। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে আমি যখন নাইনি জেলে বন্দী ছিলাম, তখন তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়েছিলো। মুক্তিলাভের পর আমি তাঁর সম্বন্ধে ডাক্তারদের মতামত নিই। তাঁরা সবাই বায়ু পরিবর্তনের কথা বলেন। এরপর স্ত্রীকে আমি রাঁচিতে পাঠিয়ে দিই। রাঁচি থেকে তিনি ফিরে আসেন ১৯৪২-এর জুলাই মাসে। সে সময় তিনি অপেক্ষাকৃত ভালো ছিলেন বলে আমি আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে বোম্বাই রওনা হই। এরপর তাঁর অবস্থা আবার খারাপ হয়ে পড়ায় আমি বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়ি। ৯ই আগস্ট আমার গ্রেপ্তার হবার সংবাদে তিনি রীতিমতো বিচলিত হয়ে পড়েন। এবং তাঁর অবস্থা আবার খারাপ হয়ে পড়ে। আমার বন্দীদশায় তাঁর স্বাস্থ্যের কথা ভেবে আমার মনটা সব সময়ই খারাপ হয়ে থাকতো।

১৯৪৪-এর প্রথম দিকে আমি বাড়ি থেকে আবার খবর পাই তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে। পরবর্তীকলে তাঁর অবস্থা যখন আরো খারাপ হয়ে পড়ে তখন তাঁর চিকিৎসকরা রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং আমাকে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে দেবার প্রার্থনা জানিয়ে গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন করেন। গভর্নমেন্ট কিন্তু তাঁদের এই আবেদনে কর্ণপাতও করেননি। আমিও একই উদ্দেশ্য জানিয়ে ভাইসরয়ের কাছে একটা চিঠি লিখি। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হয় না।

এপ্রিল মাসের কোনো এক তারিখে চিতা খাঁ হঠাৎ দুপুরবেলায় আমার সঙ্গে দেখা করে। এটা একেবারেই অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো, কারণ ওই-রকম সময় সে আর কোনোদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। সে কোনো কথা না বলে আমার হাতে একটি টেলিগ্রাম তুলে দেয়। টেলিগ্রাম সাঙ্কেতিক ভাষায় ইংরেজীতে লেখা ছিলো। কিন্তু তার একটি ইংরেজী অনুবাদও ওই সঙ্গে ছিলো। টেলিগ্রাম এসেছিলো কলকাতা থেকে। এবং তাতে লেখা ছিলো, আমার স্ত্রী আর জীবিত নেই। টেলিগ্রাম দেখবার পরে আমি ভাইসরয়কে আবার একটি চিঠি লিখি। সেই চিঠিতে আমি তাঁকে জানিয়ে দিই, গভর্নমেন্ট ইচ্ছা করলে আমাকে সাময়িকভাবে কলকাতার জেলখানায় বদলি করতে পারতেন এবং তা করা হলে আমি আমার স্ত্রীর অন্তিম সময়ে তাঁকে একবার চোখের দেখাটাও দেখতে পারতাম। এ চিঠিরও কোনো উত্তর আমাকে দেওয়া হয়নি।

তিন মাস পরে আমার জন্য আর একটা দুঃসংবাদ জমা হয়ে ছিলো। আমার বোন আবরু বেগম ভুপালে বাস করতো। হঠাৎ খবর পেলাম, সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এরপর দু সপ্তাহের মধ্যে তার মৃত্যুসংবাদ শুনতে পাই আমি।

এই সময় হঠাৎ একদিন খবরের কাগজ থেকে জানতে পারি গান্ধীজীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। খবরটা পড়ে আমার মনে হয় গান্ধীজী নিজেও তাঁর এই মুক্তির খবর আগে থেকে জানতেন না। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাঁদের নীতি পরিবর্তন করেছেন এবং সেইজন্যই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে জানা যায়, এ ব্যাপারেও তাঁর অনুমান অভ্রান্ত ছিলো না। আসল ঘটনা হলো, অনশনের পরে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং তিনি একটা না একটা অসুখে ভুগতে থাকেন। পুনার সিভিল সার্জন তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে গভর্নমেন্টের কাছে এক রিপোর্ট দেন। রিপোর্টে তিনি লেখেন, গান্ধীজী আর বেশীদিন বাঁচবেন না। সিভিল সার্জনের এই রিপোর্ট পড়বার পরেই ভাইসরয় গান্ধীজীকে মুক্তি দেবার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর মৃত্যুর দায়িত্ব যাতে গভর্নমেন্টের ওপর না বর্তায় সেইজন্যই তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এছাড়া রাজনৈতিক অবস্থা যে-ভাবে পরিবর্তিত হয়েছিলো তাতে তাঁকে ভয় করবার মতো কোনো কারণ আছে বলেও ইংরেজরা আর মনে করতো না। যুদ্ধের অবস্থা তখন ইংরেজদের অনুকূলে এসে গেছে। মিত্রপক্ষের জয় এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। গভর্নমেন্ট আরো মনে করেছিলেন, কংগ্রেসের সব নেতাই যখন জেলে আবদ্ধ রয়েছেন

সে অবস্থায় গান্ধীজী একা কিছু করতে পারবেন না। অপরপক্ষে তাঁর মুক্তিতে ভারতবাসীর হিংস মনোভাবেরও অবসান হবে এবং তারা হিংসার পথ থেকে সরে যাবে।

গান্ধীজীর রাজনৈতিক কার্যকলাপ

মুক্তির পরেও কিছুদিন গান্ধীজী খুবই অসুস্থ ছিলেন। তিনি এতোই অসুস্থ ছিলেন কোনোরকম কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবার সাধ্যও তাঁর ছিলো না। কয়েক মাস যাবৎ চিকিৎসা চলে। এরপর শরীরের অবস্থা একটু ভালো হলেই আবার তিনি রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করেন।

তাঁর সেই সময়কার রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে দুটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি হলো মুসলিম লীগের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসবার জন্য মিঃ জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং অপরটি হলো সরকারের সঙ্গে আর একবার আলোচনার প্রচেষ্টা। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে লণ্ডনের 'নিউজ ক্রনিক্যাল' পত্রিকায় এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। সেই বিবৃতিতে তিনি বলেন, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হলে ভারতবাসী স্বেচ্ছায় ইংরেজের পক্ষে যোগ দেবে এবং যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে সর্বতোভাবে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। গান্ধীজীর সেই বিবৃতি পড়ে আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই। আমার তখন বার বার মনে হতে থাকে তাঁর উভয় প্রচেষ্টাই বিফল হবে।

আমার মতে এই সময় মিঃ জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়ে গান্ধীজী এক বিরাট ভুল করেছিলেন। এর ফলে মিঃ জিন্নার গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং তিনি তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। জিন্নার প্রতি গান্ধীজীর মনোভাব প্রথম থেকেই দুর্বোধ্য ছিলো, মিঃ জিন্না কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যাবার পর তাঁর রাজনৈতিক গুরুত্ব বিশেষভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু গান্ধীজীর ভ্রান্ত কার্যকলাপের ফলে মিঃ জিন্না আবার ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব অর্জন করতে সমর্থ হন। গান্ধীজী যদি তাঁর প্রতি ওই ধরনের মনোভাব পোষণ না করতেন তাহলে জিন্না সাহেব পুনরায় রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রাধান্য অর্জন করতে পারতেন কিনা সে বিষয়ে আমার রীতিমতো সন্দেহ আছে। ভারতের মুসলমান সমাজের এক বিরাট অংশ মিঃ জিন্না এবং তাঁর অনুসৃত নীতিকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। কিন্তু তাঁরা যখন দেখতে পান গান্ধীজী

অনবরত তাঁর পেছনে ছুটছেন এবং নানাভাবে তাঁকে তোয়াজ করছেন, তখন অনেকেই মিঃ জিন্নাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেন। তাঁরা তখন মনে করতে থাকেন, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় এবং সুবিধেজনক শর্তাবলী গ্রহণের ব্যাপারে মিঃ জিন্নাই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি।

এই প্রসঙ্গে আমি আরো একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। কথাটি হলো, গান্ধীজীই সর্বপ্রথমে মিঃ জিন্নাকে 'কায়েদ-ই-আজম' অর্থাৎ মহান নেতা বলে উল্লেখ করেন। গান্ধীজীর আশ্রমে আমতুস সালাম নামে একজন ধর্মপ্রাণা মহিলা বাস করতেন। তিনি নাকি কোনো এক উর্দু পত্রিকায় দেখেছিলেন মিঃ জিন্নাকে 'কায়েদ-ই-আজম' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গান্ধীজী যখন মিঃ জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়ে তাঁর কাছে চিঠি লিখতে বসেছিলেন, সেই সময় আমতুস সালাম তাঁকে বলেন, বিভিন্ন উর্দু পত্রিকায় জিন্না সাহেবকে 'কায়েদ-ই-আজম' বলে অভিহিত করা হয়েছে ; অতএব তিনিও (গান্ধীজীও) ওই কথাটা ব্যবহার করতে পারেন। গান্ধীজী তখন কিছুমাত্র চিন্তা না করেই তাঁর চিঠিতে মিঃ জিন্নাকে 'কায়েদ-ই-আজম' বলে সম্বোধন করেন। কিছুদিন পরেই গান্ধীজীর সেই চিঠিটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ওই চিঠিতে গান্ধীজী মিঃ জিন্নাকে 'কায়েদ-ই-আজম' বলে সম্বোধন করেছেন দেখে ভারতীয় মুসলমানরা মনে করতে থাকেন সত্যিই বুঝি মিঃ জিন্না একজন মহান নেতা বা 'কায়েদ-ই-আজম'। ১৯৪৪-এর জুলাই মাসে আমি যখন সংবাদপত্রে দেখতে পাই গান্ধীজী মিঃ জিন্নার কাছে চিঠিপত্র লিখছেন এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য বোম্বাই যাচ্ছেন, তখন আমি সহকর্মীদের বলি গান্ধীজী একটা মহা ভুল করছেন। তাঁর এই কাজের ফলে রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতির পরিবর্তে অবনতি ঘটবে। পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করে আমার অনুমানই সঠিক ছিলো। মিঃ জিন্না এই ঘটনার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে নিজের নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি কিছুই করেন না, এবং তার জন্য একটি কথাও বলেন না।

গান্ধীজীর দ্বিতীয় কার্য, অর্থাৎ গভর্নমেন্টের সঙ্গে আলোচনা করার প্রস্তাবটাও সময়োপযোগী হয়নি। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বিশেষভাবে চেষ্টা করেছিলাম যাতে যুদ্ধের ব্যাপারে কংগ্রেস একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী এবং ইতিবাচক মনোভাব গ্রহণ

করে। সেই সময় গান্ধীজী বলেছিলেন, ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ হলো অহিংসার প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন। তিনি সে সময় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যদি অহিংসার নীতি বিসর্জন দিয়ে কংগ্রেস যুদ্ধের ব্যাপারে ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চায়, তাহলে তিনি কংগ্রেসে থাকবেন না। কিন্তু আজ তিনিই বলছেন, ভারতবর্ষকে যদি স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাহলে কংগ্রেস ইংরেজের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবে। তাঁর পূর্বতন ঘোষণার সঙ্গে বর্তমান উক্তির আকাশপাতাল প্রভেদ দেখে দেশে এবং বিদেশে এক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। এর ফলে ভারতবাসীর মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তার চেয়েও দুর্ভাগ্যজনক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ব্রিটেনে। ইংরেজদের মধ্যে অনেকেই মনে করতে থাকেন, যুদ্ধের অবস্থা যখন ইংরেজদের প্রতিকূলে ছিলো সেই সময় গান্ধীজী তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অথবা যুদ্ধের ব্যাপারে কোনোরকম সাহায্য করতে চাননি। কিন্তু বর্তমানে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হওয়ায় তিনি সহযোগিতার কথা বলছেন। আমি কিন্তু মনে করি, যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করে গান্ধীজী তাঁর মত এবং পথ পরিবর্তন করেছেন বলে তাঁরা যা ভেবেছেন সেটা মোটেই সঠিক নয়। কিন্তু আমি যা-ই ভাবি না কেন, ইংরেজরা গান্ধীজীর প্রস্তাবের এই ব্যাখ্যাই করেন যে মিত্রপক্ষের বিজয় প্রায় অবধারিত দেখে তিনি ইংরেজদের সহানুভূতি পাবার জন্য নতুন করে চেষ্টা শুরু করেছেন। এবং এইরকম ধারণার বশবর্তী হবার ফলেই গান্ধীজীর প্রস্তাবের প্রতি তাঁরা কর্ণপাত করেন না। এছাড়া, আগে যেমন ভারতের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন বলে ইংরেজরা মনে করতেন, বর্তমানে তাঁরা তা মনে করেন না। গান্ধীজীর প্রস্তাবের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করার এটাও একটা কারণ।

আজ এই ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই বই লিখবার সময় আমি যখন পেছনের ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করছি তখন আমি সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি, আগে যাঁরা গান্ধীজীর অহিংসা মন্ত্রের উপাসনা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারতেন না, তাঁদের মনোভাবও পরবর্তীকালে বেশ কিছুটা পরিবর্তিত হয়। অতীতে কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত একটি প্রস্তাবে যখন বলা হয়েছিলো ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যদি ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেন তাহলে কংগ্রেস তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে, তখন সর্দার প্যাটেল, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, আচার্য কৃপালনী এবং ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ ওয়ার্কিং কমিটি থেকে রিজাইন দিতে চেয়েছিলেন।

তাঁরা তখন লিখিতভাবে আমাকে জানিয়েছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা অপেক্ষা অহিংসাই তাঁদের কাছে বেশী কাম্য। কিন্তু পরবর্তীকালে, অর্থাৎ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা লাভ করে তখন এইসব নেতা কেউই এমন কথা বলেন না যে ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনী ভেঙে দেওয়া হোক। শুধু যে একথা বলেননি তাই নয়, তাঁরা এমন কথাও বলেন ভারতীয় বাহিনীকে বিভক্ত করে সরাসরি ভারত সরকারের অধীনে আনা হোক। তাঁদের এই প্রস্তাব তৎকালীন কমাণ্ডার-ইন-চীফের মতামতের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। কমাণ্ডার-ইন-চীফ বলেছিলেন, ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীকে তিন বছর একই কমাণ্ডের অধীনে রাখা উচিত এবং এই তিন বছর উক্ত বাহিনী অভিজ্ঞ অবস্থায় যুক্তভাবে কাজ করবে; কিন্তু এই নেতারা তাতে রাজী হননি। এখানে প্রশ্ন ওঠে, অহিংসাই যদি তাঁদের একমাত্র উপাস্য মন্ত্র হয় তাহলে তাঁরা কিভাবে সেই গভর্নমেন্টে অংশগ্রহণ করেন, যে গভর্নমেন্ট প্রতি বছর প্রতিরক্ষা খাতে একশো কোটি টাকা ব্যয় করেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার প্রতিরক্ষা খাতে আরো বেশী অর্থ ব্যয় করবার জন্যও সুপারিস করেন। এখানে আরো উল্লেখযোগ্য, বর্তমানে প্রতিরক্ষা খাতে প্রায় দুশো কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে।

আমি সব সময়ই মনে করতাম, আমার এইসব বন্ধু এবং সহকর্মী রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁদের নিজেদের ইচ্ছামতো চলতেন না। ও ব্যাপারে তাঁরা সর্বতোভাবে গান্ধীজীর কথামতো চলতেন। গান্ধীজীকে আমি ওঁদের চেয়ে কম শ্রদ্ধা করতাম না এবং এখনো করি না· কিন্তু আমি অন্ধভাবে তাঁর কথামতো চলি না। আমার কাছে এইটা সত্যিই বিস্ময়কর, কারণ ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে যাঁরা হিংসা-অহিংসার প্রশ্নে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, ভারত স্বাধীন হবার পর সে প্রশ্ন তাঁদের মন থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়ে গেলো। এক মুহূর্তের জন্যও তাঁদের মনে এ প্রশ্ন উঠলো না যে সশস্ত্রবাহিনী এবং প্রতিরক্ষা খাতে বিরাট অর্থব্যয় না করে গভর্নমেন্ট চালাতে হবে। শুধু তাই নয়, যুদ্ধ পরিহার করার কথাটাও তাঁরা বললেন না। এখানে উল্লেখযোগ্য, একমাত্র জওহরলালেরই এ ব্যাপারে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ছিলো এবং তিনি প্রথম থেকেই আমার অভিমতের সমর্থক ছিলেন। আমি মনে করি, পরবর্তী ঘটনাবলীর লজিক অনুসারে আমাদের অভিমতই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে খবরের কাগজে ‘ডি’ ডে সম্পর্কে একটা রিপোর্ট দেখতে

পাই। যুদ্ধের মোড় মিত্রপক্ষের অনুকূলে আসবার দরুনই এই বিশেষ দিনটির কথা ঘোষিত হয়। মিত্রপক্ষের বিজয় এখন আর কল্পনার বস্তু নয়। সারা বিশ্ব এবার বুঝতে পারছে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং দূরদৃষ্টিই বিজয়কে নিশ্চিত করেছে। ভবিষ্যতের চিত্রও ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে আসছে। এশিয়া এবং আফ্রিকায় মিত্রপক্ষ জয়ী হয়েছে। এবার তারা হিটলারের সিটাডেল অভিমুখে মার্চ করছে। আমার কাছে এটা কিছু বিস্ময়কর বলে মনে হয়নি। জার্মানীর কার্যকলাপ দেখে আমার আগেই মনে হয়েছিলো, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো এবারের যুদ্ধেও দুই রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে মারাত্মকরকমে ভুল করেছে। হিটলার যেদিন রাশিয়া আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয় সেইদিনই সে তার পতনের বীজ বপন করে। এখন আর ধ্বংসের হাত থেকে তার নিজের এবং তার দেশের রক্ষা পাবার আর কোনো পথই নেই।

এই সময় আমাদের ক্যাম্পে একটা অভাবিত ঘটনা ঘটে। চিতা খাঁ একদিন হঠাৎ আমার কাছে এসে বলে, ডঃ সৈয়দ মামুদকে মুক্তি দেবার জন্য সে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছে। খবরটা শুনে সবাই আমরা বিস্মিত হলাম। বেছে বেছে একজনকে মুক্তির আদেশ দেবার কোনো যুক্তি-সঙ্গত কারণ আমরা দেখতে পেলাম না।

কয়েক মাস আগে আহম্মদনগরে মহামারীর আকারে কলেরা শুরু হয়েছিলো। চিতা খাঁ তখন আমাদের সবাইকে কলেরা-প্রতিষেধক টিকা নিতে বলেছিলো। আমাদের মধ্যে পাঁচজন, অর্থাৎ জওহরলাল, পট্টভি সীতারামাইয়া, আসফ আলী, ডঃ সৈয়দ মামুদ এবং আমি তাঁর পরামর্শমতো কাজ করেছিলাম; কিন্তু বাকি চারজন, অর্থাৎ সর্দার প্যাটেল, আচার্য কৃপালনী, শঙ্কর-রাও দেও এবং ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ টিকা নিতে অস্বীকৃত হন। টিকা নেবার ফলে আমার বেশ একটু জ্বর হয়েছিলো, কিন্তু ডঃ সৈয়দ মামুদ এলার্জিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। প্রায় পনেরদিন যাবৎ তিনি প্রবল অবিরাম জ্বরে শয্যাগত ছিলেন। আমরা সবাই তাঁর সেবা করেছিলাম। জওহরলাল তো রীতিমতো নার্সের কাজ করেছিলেন সে-সময়। শুধু কি তাই, তিনি নিজের হাতে রুগীর মলমূত্রও পরিষ্কার করেছিলেন। ডঃ মামুদ তখন চিতা খাঁর চিকিৎসাধীন ছিলেন। কিন্তু তাঁর মুক্তির আদেশ যখন এলো তখন তিনি প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হয়ে গেছেন। সুতরাং তাঁকে যে স্বাস্থ্যের জন্য মুক্তি দেওয়া হচ্ছে, এ কথাটা আমরা কেউই মেনে নিতে পারিনি। আমাদের মনে হয়েছিলো, এতে হয়তো গভর্নমেন্টের মতিগতির পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। হয়তো তাঁরা

এখন আমাদের প্রতি কিছুটা সদয় ব্যবহার করবেন বলে স্থির করেছেন। পরবর্তীকালে অবশ্য এর আসল কারণটা আমি জানতে পেরেছিলাম। কিন্তু দীর্ঘকাল পরে ও ব্যাপারে আর কোনো আলোচনা করবার ইচ্ছা আমার নেই।

আমরা যদিও আমাদের মুক্তির সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু জানতে পারিনি, কিন্তু তবুও আমাদের মনে হয়েছিলো মুক্তির হয়তো আর বেশী দেরি নেই। আসলেও তাই দেখা গেলো। ১৯৪৪-এর মাঝামাঝি গভর্নমেন্ট সিদ্ধান্ত নেন, আমাদের আর আহম্মদনগর দুর্গে বন্দী করে রাখার প্রয়োজন নেই। ওখানে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো বিভিন্ন কারণে। গভর্নমেন্ট হয়তো ভেবেছিলেন যে ওখানে আমাদের বন্দী থাকার খবরটা গোপন রাখা যাবে। তাঁরা আরো ভেবেছিলেন, আমাদের যদি কোনো অসামরিক জেলে রাখা হয় তাহলে হয়তো জেলে থাকা অবস্থাতেই বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবো। কিন্তু মিলিটারী জেলে রাখলে এটা সম্ভব হবে না। আহম্মদনগর ক্যাম্প জেলে তখন শুধু ইয়োরোপীয় সৈনিক ছাড়া আর কোনো রক্ষী ছিলো না। সুতরাং তাদের মাধ্যমে বাইরের কোনো লোকের সঙ্গে কোনো-রকম যোগাযোগই আমরা করতে পারবো না; এবং এরকম কিছু করতে গেলে তারা নিশ্চয়ই বাধা দেবে। আমরা এমন প্রমাণও পেয়েছিলাম, আহম্মদনগর জেলে আসবার পর আমরা যাতে বাইরের কোনো লোকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে না পারি তার জন্যে গভর্নমেন্ট বিশেষভাবে সচেতন এবং উদ্বিগ্ন ছিলেন। আমরা যে ব্যারাকে বাস করছিলাম তার ছাদে কয়েকটা স্কাইলাইট ছিলো। ওইসব স্কাইলাইটের ভেতর দিয়ে দুর্গের ভেতরের উঠোনটা দেখতে পাওয়া যেতো। কিন্তু আমাদের আসবার আগেই সেগুলোকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো। সাড়ে তিন বছর আমরা আহম্মদনগর দুর্গে বন্দী ছিলাম। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ওখানে কোনো ভারতবাসীর আগমন আমরা দেখতেই পাইনি। একবার বা দুবার সামান্য কিছু মেরামতী কাজ করা হলেও কোনো ভারতীয় শ্রমিককে সে কাজে নিযুক্ত করা হয়নি। অর্থাৎ, ওখানে আমরা বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিলাম।

গভর্নমেন্ট যদিও বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বন্ধ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য বিফল হয়েছিলো। আমরা ওখানে আসবার এক সপ্তাহের মধ্যেই জনসাধারণ জেনে ফেলেছিলো আমরা সবাই আহম্মদনগর দুর্গে বন্দী অবস্থায় রয়েছি। এখন অবশ্য গোপনীয়তা রক্ষার

আর প্রয়োজন নেই। ইংরেজের বিজয় এখন দৃষ্টিসীমার ভেতরে এসে গেছে। ভারত গভর্নমেন্ট তাই মনে করলেন, এখন আর আমাদের মিলিটারী জেলে রাখবার দরকার নেই; এখন নিরাপদে আমাদের নিজ নিজ প্রদেশের অসামরিক জেলখানায় বদলি করা যেতে পারে।

অসামরিক কারাগারে বদলি

প্রথমেই সর্দার প্যাটেল এবং শঙ্কররাও দেওকে পুনা জেলে বদলি করা হলো। আসফ আলীকে পাঠানো হলো বাতালায়। দিল্লীর রাজনৈতিক বন্দীদের সাধারণত ওখানেই রাখা হতো তখন। জওহরলালকে প্রথমে এলাহাবাদের কাছে নাইনিতে, পরে আলমোড়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। যাবার সময় জওহরলাল আমাকে বললেন, আমাদের মুক্তির সময় হয়তো আসন্ন হয়ে এসেছে। তিনি আমাকে আরো একটি অনুরোধ করলেন, মুক্তির পরেই আমি যেন ওয়ার্কিং কমিটির অথবা এ. আই. সি. সি.র কোনো সভা আহ্বান না করি। তিনি বললেন, মুক্তির পরে তাঁর কিছুদিন বিশ্রামের দরকার, এছাড়া ভারত সম্বন্ধে যে বইখানা লেখায় তিনি হাত দিয়েছেন সেখানা সম্পূর্ণ করার জন্যও কিছুটা সময় তাঁর চাই।

আমি তাঁকে বললাম, আমিও ঠিক ওইরকমই চিন্তা করছিলাম। আমারও কিছুটা বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তখনো আমি ভাবতে পারিনি যে মুক্তির অব্যবহিত পরেই আমাদের আবার কর্মসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। অর্থাৎ আমাদের বাকি জীবনে বিশ্রামের কোনো প্রশ্নই আর উঠবে না।

আমার বদলির সময় যখন এলো তখন চিতা খাঁ আমাকে বললে, আমার যা শরীরের অবস্থা তাতে কলকাতার মতো আর্দ্র আবহাওয়া আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো হবে না। তার কথা থেকে বুঝতে পারলাম, আমাকে হয়তো বাংলার কোনো শুকনো জায়গায় পাঠানো হবে। একদিন সন্ধ্যার সময় সে আমাকে প্রস্তুত হতে বললে। আমার জিনিসপত্র একটা মোটর গাড়িতে তুলে দেওয়া হলো। এরপর আমি গাড়িতে উঠে বসলে সে নিজে গাড়িটা চালাতে লাগলো। আমাকে আহম্মদনগর স্টেশনে না নিয়ে গিয়ে কয়েক মাইল দূরের একটা গ্রাম্য স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হলো। এর কারণ হলো, আমি যদি আহম্মদনগর স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠি তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সে খবর জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। আমার গন্তব্যস্থানটি সাধারণের মধ্যে প্রচারিত

হোক এটা গভর্নমেণ্ট চান না।

আমি যখন আহম্মদনগর জেলে ছিলাম তার বেশীর ভাগ সময়ই আমার কেটেছে নিদারুণ মানসিক দুশ্চিন্তায়। এতে আমার স্বাস্থ্যের ওপর বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। গ্রেপ্তার হবার সময় আমার ওজন ছিলো ১৭০ পাউণ্ড। ওই জেল থেকে যখন বদলি হই তখন আমার ওজন কমে ১৩০ পাউণ্ডে আসে। আমার খিদেও এতো কমে গিয়েছিলো যে বিশেষ কিছু খেতেই পারতাম না।

বাংলা থেকে একজন সি· আই· ডি. ইনস্পেক্টর এসেছিলো আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্য। চারজন কনেস্টবলও সঙ্গে এনেছিলো সে। আমরা স্টেশনে উপস্থিত হবার পর চিতা খাঁ আমাকে তার হাতে সমর্পণ করে। আমরা আহম্মদনগর থেকে কল্যাণী হয়ে আসানসোলে আসি। ওখানে আমাকে রিটায়ারিং রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আমার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। গভর্নমেণ্ট সমস্ত বিষয়টা গোপন করে রাখতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা গেলো, সংবাদপত্রগুলো আমার খবর জেনে ফেলেছে। আমি দেখতে পেলাম কলকাতা থেকে কয়েকজন রিপোর্টার এবং এলাহাবাদ থেকে আমার কয়েকজন বন্ধু আসানসোলে এসে হাজির হয়েছেন। স্থানীয় লোকের এক বিরাট জনতাও সমবেত হয়েছে স্টেশনে।

আসানসোলের পুলিস সুপার এসে আমার ভার নেন। তিনি আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে একটা আবেদন করেন। তিনি বলেন, আমি যদি জনসাধারণের সঙ্গে দেখা করতে চাই তাহলে তিনি আমাকে বাধা দিতে পারবেন না, কিন্তু আমি তা করলে গভর্নমেণ্ট তাঁর ওপরে অত্যন্ত বিরক্ত হবেন এবং তাঁর কাছ থেকে কৈফিয়ত তলব করবেন। তিনি আরো বলেন, আমি যদি জনসাধারণের সঙ্গে দেখা না করে সোজা দোতলায় যেতে সম্মত হই তাহলে তিনি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ হবেন। আমি তাঁকে বলি, তাঁর ক্ষতি হয়, গভর্নমেণ্ট তাঁর ওপরে বিরক্ত হন এরকম কোনো কাজ করবার ইচ্ছা আমার নেই। এরপর আমি তাঁর সঙ্গে দোতলার একটা ঘরে যাই।

ঢাকার নবাবের সঙ্গে উক্ত পুলিস সুপারের আত্মীয়তা ছিলো। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী আমার দেখাশুনা করতে থাকেন। তাঁর স্ত্রী আমাকে একটি অটোগ্রাফ বইতেও সই দিতে অনুরোধ করেন। আমার সুখসুবিধের জন্য ওঁরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন।

এবার আমি জানতে পারি, আমাকে বাঁকুড়া নিয়ে যাওয়া হবে। বিকেল

চারটের ট্রেন প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করে। সেই ট্রেনে আমার জন্য একটা কামরা সংরক্ষিত ছিলো। আমাকে সেই কামরায় নিয়ে আসা হয়। ইতিমধ্যে এক বিরাট জনতা প্ল্যাটফর্মে এসে জমায়েত হয়েছে। কলকাতা, এলাহাবাদ এবং লক্ষ্ণৌ থেকেও এসেছে অনেকে। প্ল্যাটফর্মে সেই জনজমায়েত দেখে পুলিস সুপার এবং তাঁর অধীনস্থ ইনস্পেক্টর বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে ওঠেন। জনতার দৃষ্টি থেকে কি ভাবে আমাকে আড়াল করে রাখা যায়, এই হলো তাঁদের দুশ্চিন্তার কারণ। সূর্যের উত্তাপ খুব বেশী থাকায় আমার জন্য একটি ছাতা আনা হয়েছিলো। ইনস্পেক্টর সেই ছাতাটি খুলে আমার মাথার ওপরে ধরে ছিলেন। জনতার দৃষ্টি থেকে আমাকে আড়াল করবার উদ্দেশ্যে তিনি ছাতাটি নীচু করতে করতে প্রায় আমার মাথার সঙ্গে ঠেকিয়ে ফেলেন। জনতা যাতে আমার মুখ দেখতে না পায় সেই উদ্দেশ্যেই এ কাজটি তিনি করেন। তিনি ভেবেছিলেন, এইভাবে ছাতা আড়াল দিয়ে তিনি আমাকে ট্রেনের কামরায় নিয়ে যেতে পারবেন।

কারো সঙ্গে দেখা করবার কোনোরকম বিশেষ ইচ্ছা আমার ছিলো না। কিন্তু আমি যখন দেখতে পেলাম, আমাকে একবার চোখের দেখা দেখবার জন্য কলকাতা, এলাহাবাদ এবং লক্ষ্ণৌ থেকে বহু লোক ছুটে এসেছে তখন আমার মনে হলো, তাদের দিকে না তাকানোটা আমার পক্ষে অন্যায় কাজ হবে। আমি তাই ইনস্পেক্টরের হাত থেকে ছাতাটা টেনে নিয়ে সেটাকে বন্ধ করে ফেলি। জনতা তখন আমার দিকে ছুটে আসতে থাকায় আমি তাদের থামতে বলি। প্রত্যেক লোকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সম্ভাষণ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। আমি তাই জনতার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলি, পুলিস সুপার আর ইনস্পেক্টর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। প্রতিমুহূর্তেই তাঁদের দুশ্চিন্তার বোঝা ভারী হচ্ছে, সুতরাং এই গরমের দিনে তাঁদের মাথা-ধরাটা আর আমি বাড়াতে চাই নে।

এরপর জনতার উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার কামরায় উঠে পড়ি। কিন্তু জনতা এসে কামরাটির সামনে ভীড় করে দাঁড়ায়। আর একদল লোক ট্রেনের অপর দিকের রেললাইন পার হয়ে আমার কামরার পাশে হাজির হয়। একটু পরেই ট্রেন ছেড়ে দেয় এবং সাতটার মধ্যেই আমরা বাঁকুড়ায় পৌঁছে যাই। ওখানে বাঁকুড়ার পুলিস সুপার এবং আরো কয়েকজন অফিসার আমাকে সঙ্গে করে শহরের বাইরের একটা দোতলা বাংলোয় নিয়ে যান।

তখন এপ্রিলের প্রারম্ভ। দিনের বেলাটা খুবই গরম ছিলো তখন। যাই-হোক, আমি যখন দোতলার বারান্দায় বসি তখন সান্ধ্য হাওয়া ফুরফুর করে আমার মুখে এসে লাগতে থাকে। সকাল এবং সন্ধ্যাবেলাটা খুব খারাপ লাগতো না, কিন্তু দিনের বেলা প্রচণ্ড গরম বোধ হতো। আমার জন্য একটা বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। এছাড়া বরফও রাখা হতো আমার জন্য। কিন্তু দুপুরের দিকে ওতে বিশেষ কোনো সুবিধে হতো না। কলেক্টর প্রতি সপ্তাহে একবার করে আমার সঙ্গে দেখা করতেন। একদিন তিনি আমাকে বলেন, আমার পক্ষে বাঁকুড়ায় থাকা কষ্টকর হয়েছে দেখে তিনি আমাকে কোনো ঠাণ্ডা জায়গায় পাঠাবার জন্য গভর্নমেন্টের কাছে চিঠি লিখেছেন। তিনি আরো বলেন, এখন তিনি তাঁর চিঠির উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছেন। উত্তর এলেই আমাকে কোনো ঠাণ্ডা জায়গায় পাঠিয়ে দেবেন।

ভালো রসুইদার সব সময় পাওয়া যায় না। বাঁকুড়াতেও প্রথম দিকে এ ব্যাপারে অসুবিধের সৃষ্টি হয়েছিলো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই একজন ভালো রসুইদার নিযুক্ত করা হয়। তার রান্না এতোই ভালো ছিলো যে মুক্তির পরে আমি তাকে সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে আসি।

আমি আগেই বলেছি, আহম্মদনগর দুর্গে যাবার পর আমার রেডিও সেটটি আমার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছিলো। কিছুদিন পরে চিতা খাঁ আমার সঙ্গে দেখা করে রেডিওটা ব্যবহার করবার জন্য আমার কাছ থেকে অনুমতি চান। আমি খুশি মনেই তাঁকে অনুমতি দিই। কিন্তু আহম্মদনগর থেকে চলে আসার দিন পর্যন্ত ওটার চেহারা আর আমি দেখতে পাইনি। আমাকে যখন বাংলায় বদলি করা হয় তখন রেডিও সেটটাকে আমার জিনিসপত্রের ভেতরে রেখে দেওয়া হয়। রেডিওটা ব্যবহার করতে গিয়ে দেখি, ওটা খারাপ হয়ে গেছে। বাঁকুড়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে আর একটা রেডিও সেট দেন। বহুদিন পরে আবার আমি রেডিওর মাধ্যমে দেশ-বিদেশের খবরাখবর শুনতে পাই।

এপ্রিলের শেষদিকে আমি খবরের কাগজ থেকে জানতে পারি, আসফ আলী বাটালা জেলে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বেশ কিছুদিন তিনি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন এবং তাঁর প্রাণের আশা একরকম ছিলোই না। গভর্নমেন্ট তাই তাঁর মুক্তির আদেশ দিয়েছেন এবং তাঁকে দিল্লীতে সরিয়ে নিয়েছেন।

মুক্তির আদেশ

১৯৪৫-এর মে মাসে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য লর্ড ওয়াভেল লণ্ডনে যান এবং মে মাসের শেষদিকে ভারতে ফিরে আসেন। এই সময় একদিন সন্ধ্যায় আমি যখন রেডিওতে দিল্লীর সংবাদ শুনছিলাম তখন শুনতে পাই, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পূর্ব-ঘোষিত নীতির পরিপ্রেক্ষিতে ভাইসরয় ঘোষণা করেছেন ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য আবার নতুন করে প্রচেষ্টা চালানো হবে। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সিমলাতে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। খবরে আরো বলা হয়, কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা যাতে উক্ত সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন তার জন্য তাঁদের মুক্তি দেওয়া হবে।

পরদিন আমি শুনতে পাই, আমার এবং আমার সহকর্মীদের মুক্তির আদেশ জারি হয়েছে। খবরটা আমি শুনতে পাই রাত নটার সময়। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটও শুনতে পেয়েছিলেন খবরটা। তিনি আমার কাছে একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে আমাকে জানিয়ে দেন, রেডিওতে আমার মুক্তির সংবাদ প্রচারিত হলেও তাঁর কাছে কোনো সরকারী নির্দেশ তখনো এসে পৌঁছয়নি। সরকারী নির্দেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমাকে তা জানিয়ে দেবেন। রাত দুপুরের সময় জেলার এসে আমাকে জানিয়ে দেন, আমার মুক্তির আদেশ এসে গেছে। অতো রাত্রে কোনোরকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব ছিলো না। পরদিন সকালে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি আমার মুক্তির আদেশপত্র পড়ে শোনান। এরপর তিনি বলেন, কলকাতা যাবার ট্রেন বিকেল পাঁচটায় বাঁকুড়া থেকে ছাড়বে। ওই ট্রেনে আমার জন্য একটা ফার্স্ট ক্লাস কুপে রিজার্ভ করা হয়েছে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কলকাতা থেকে একদল সাংবাদিক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। স্থানীয় লোকেরাও হাজার হাজার এসে হাজির হয় বাংলোর সামনে। বিকেল সাড়ে তিনটের সময় স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি একটি জনসভার আয়োজন করেন। আমি ওই সভায় উপস্থিত হয়ে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিই। সভা শেষ হবার পরে আমি এক্সপ্রেস ট্রেনে কলকাতা রওনা হই

এবং পরদিন সকালে হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হই।

হাওড়া স্টেশন এবং বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে তখন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। জনতার ভীড় এতো বেশী হয়েছে যে ট্রেনের কামরা থেকে নেমে আমার মোটর গাড়ি পর্যন্ত যেতে রীতিমতো অসুবিধে হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দত্ত এবং আরো কয়েকজন স্থানীয় নেতা আমার সঙ্গে গাড়িতে ছিলেন। গাড়ি স্টার্ট দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখতে পাই, গাড়িটার আগে একটি ব্যাণ্ডপার্টি ব্যাণ্ড বাজাতে শুরু করেছে। শ্রীমতী দত্তকে আমি জিজ্ঞাসা করি, ব্যাণ্ডপার্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে কেন? আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এটি আমার মুক্তির জন্য একটি সামান্য অনুষ্ঠান। আমার এটা মোটেই পছন্দ ছিলো না ; আমি তাই শ্রীমতী দত্তকে বলি, যদিও আমি মুক্তি পেয়েছি তবু এখনো আমার হাজার হাজার বন্ধু এবং সহকর্মী জেলে রয়েছেন, সুতরাং এ অবস্থায় কোনোরকম আনন্দানুষ্ঠান করা উচিত নয়।

আমার অনুরোধে তখুনি ব্যাণ্ড বাজনা থামানো হয় এবং ব্যাণ্ডপার্টি সরিয়ে নেওয়া হয়। গাড়িটা যখন হাওড়া ব্রীজের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলো, তখন আমার মন ভেসে যায় অতীতের দিকে। আমার মনে পড়ে যায়, তিন বছর আগে আমি যেদিন ওয়ার্কিং কমিটির এবং এ. আই. সি. সি.র সভায় যোগদানের জন্য বোম্বাই অভিমুখে রওনা হই, সেদিন আমার স্ত্রী বাড়ির সদর ফটক পর্যন্ত এগিয়ে এসে আমাকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তিন বছর পরে আবার আজ আমি বাড়িতে ফিরছি, কিন্তু তিনি আজ আর নেই। তাঁর নশ্বর দেহ তখন মাটির শীতল কোলে স্থানলাভ করেছে। আমার তখন ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের কবিতার দুটি লাইন মনে পড়ে যায় :

'But she's in her grave and oh
The difference to me.'

সঙ্গীদের আমি গাড়ি ঘুরিয়ে আমার স্ত্রীর সমাধিক্ষেত্রের দিকে নিয়ে যেতে বলি। বাড়িতে ঢোকবার আগে আমি তাঁর সমাধিটা একবার দেখে যেতে চাই। গাড়িতে বহুসংখ্যক ফুলের মালা ছিলো। আমি একটি মালা নিয়ে তাঁর সমাধির ওপরে রেখে নিঃশব্দে ফতেহা আবৃত্তি করি।

সিমলা সম্মেলন

যুদ্ধের শুরু থেকেই আমেরিকার জনগণ বলে আসছে যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করা না হলে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় তার কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। তারা তাই ভারতকে স্বাধীনতা দেবার জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে চাপ দিয়ে আসছে। জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করবার পর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তখন ভারতের বিষয়টি বারবার চার্চিলের কাছে উত্থাপন করেছেন। অবশেষে ইংরেজরাও হয়তো মনে করেছেন যে আমেরিকার দাবী পূরণের জন্য কিছু একটা অবশ্যই করতে হবে। ক্রিপস-মিশন যখন ভারতে আসে তখন বি. বি. সি.র বৈদেশিক সার্ভিস বার বার ঘোষণা করেছে, ভারত এবার স্বাধীনতা লাভের সুযোগ পাচ্ছে এবং এখন সে যুদ্ধ সম্পর্কে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের একজন ব্যক্তিগত প্রতিনিধিও সে সময় ভারতে আসেন। আমার কাছে প্রেসিডেন্ট একটি চিঠিও পাঠিয়েছিলেন তাঁর হাত দিয়ে। চিঠিতে প্রেসিডেন্ট এই আশা প্রকাশ করেছিলেন, ভারতবর্ষ ক্রিপস-প্রস্তাব গ্রহণ করে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করবে। কিন্তু ক্রিপস-মিশন অকৃতকার্য হওয়ায় পরিস্থিতি আগের মতোই থেকে যায়।

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে আমাদের গ্রেপ্তারের ঘটনাটা চীন এবং আমেরিকায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তখন আমরা এটা জানতে না পারলেও পরবর্তীকালে জানতে পারি, ওই দুই দেশের জনগণ ইংরেজদের সেই কাজের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে আপত্তি জানিয়েছিলেন। ওয়াশিংটনের সেনেটে এবং প্রতিনিধি সভায় বিষয়টি আলোচিত হয়। বিভিন্ন বক্তা এর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় মতামত প্রকাশ করে বক্তৃতা দেন।

ইয়োরোপে যুদ্ধের অবস্থা উন্নতির দিকে যাওয়ায় ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য আমেরিকানরা নতুন করে চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। হয়তো এই কারণেই লর্ড ওয়াভেল ভারত সম্বন্ধে পরবর্তী কার্যক্রম কী হবে সে বিষয়ে ভারত সচিবের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্য ১৯৪৫-এর মে মাসে লণ্ডনে গিয়েছিলেন। পরামর্শে স্থির হয়, এ ব্যাপারে একটি গোলটেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা করতে হবে। ইয়োরোপের যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে এপ্রিল মাসেই শেষ

হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু এশিয়ার যুদ্ধ তখনো পুরোমাত্রায়ই চলছে, এবং সে যুদ্ধের আশু সমাপ্তিরও কোনোরকম লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। জাপান তখনো বিশাল ভূখণ্ড অধিকার করে বসে আছে এবং তার মূল ভূখণ্ডে কোনোরকম আঘাতই লাগেনি। আমেরিকার অস্ত্রশস্ত্র এতোদিন ইয়োরোপের যুদ্ধেই বেশী করে নিয়োজিত থাকার ফলে জাপানের পরাজয়ের তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে জার্মানীর পরাজয় অপেক্ষা জাপানের পরাজয়ই বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। এই কারণেই প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মার্শাল স্তালিনকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন, ইয়োরোপের যুদ্ধ শেষ হলেই রাশিয়া জাপান আক্রমণ করবে। আমেরিকানরা আরো মনে করতেন, ভারতের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাওয়া গেলে জাপানের পরাজয় সহজতর হবে। জাপানীরা ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়া অধিকার করে বসে আছে। এর প্রতিটি অঞ্চলেই ভারত বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে। ইয়োরোপে হিটলারী দম্ভ বিচূর্ণিত হলেও জাপানকে পরাজিত করবার জন্য ভারতের সহযোগিতা প্রয়োজন। প্রধানত এই কারণেই, অর্থাৎ ভারতের সমর্থন পাবার জন্যই, আমেরিকানরা ইংরেজের ওপরে চাপ দিচ্ছিলো।

কলকাতা শহর তখন পূর্বাঞ্চলে আমেরিকার সর্ববৃহৎ যুদ্ধ-ঘাঁটি হয়ে উঠেছিলো। এই কারণে কলকাতা তখন বহু আমেরিকান সাংবাদিক এবং উচ্চ-পদস্থ সামরিক অফিসারে ভরতি ছিলো। আমার মুক্তির সংবাদ পেয়ে তাঁরা আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। আমি কলকাতায় আসবার পরের দিনই কয়েকজন আমেরিকান সাংবাদিক আমার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা কোনো ভূমিকা না করে সরাসরি মূল বিষয়টা নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। তাঁরা ভাইসরয়ের ‘অফার’ সম্বন্ধে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া কী হবে সেই সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করেন। আমি তখন তাঁদের বলি, উক্ত ‘অফারে’ কী বস্তু আছে তা না জানা পর্যন্ত আমি কোনো সঠিক উত্তর দিতে পারি না। আমি আরো বলি, ভারতবর্ষ যতোদিন ইংরেজের অধীনে থাকবে ততোদিন যুদ্ধের ব্যাপারে তার অনুপ্রাণিত হবার মতো কারণ থাকতে পারে না।

তাঁরা তখন আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করেন। তাঁদের প্রশ্নটা হলো আটলান্টিক সনদে কি ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি, ওই সনদ আমি দেখিনি এবং ওটা কোথায় এবং কী অবস্থায় আছে তাও আমি জানি না।

আমি আরো বলি, আটলান্টিক সনদ বলতে তাঁরা হয়তো মিঃ চার্চিলের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের আলোচনা এবং তাঁর প্রদত্ত এক বিবৃতির কথা উল্লেখ করছেন। প্রেসিডেন্ট তাঁর সেই বিবৃতিতে বলেছিলেন, যুদ্ধের পরে প্রতিটি জাতিই তার নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই নির্ধারণ করবার সুযোগ পাবে। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যখন মিঃ চার্চিলকে প্রশ্ন করা হয় প্রেসিডেন্টের ওই বিবৃতি ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হবে কিনা, তার উত্তরে তিনি সুস্পষ্ট-ভাবে বলেন, 'না।' বার বার তিনবার তিনি ঘোষণা করেন, তথাকথিত ওই সনদ ভারতের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে না। মিঃ চার্চিলের এই বক্তব্য সম্বন্ধে যখন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তখন তিনি স্বীকার করেন, মিঃ চার্চিলের সঙ্গে তাঁর শুধু মৌখিকভাবে আলোচনা হয়েছিলো এবং সে আলোচনার কোনো লিখিত প্রমাণ নেই। অতএব ওটাকে সনদ বলা ঠিক হবে না।

আমেরিকান সাংবাদিকরাও এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলেন না। তাই আমি যখন তাঁদের বলি, 'সনদটা কোথায় এবং কি অবস্থায় আছে তা আমি জানি না' তখন তাঁদের মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। সাংবাদিকদের মধ্যে একজন মহিলা ছিলেন, তিনি আমাকে প্রশ্ন করেন, মিঃ চার্চিলের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের আলোচনার কোনো লিখিত বিবরণ নেই বলে প্রেসিডেন্টের স্বীকৃতির জন্যই আমি ওকথা বলেছি কি?

এর উত্তরে আমি বলি, 'হ্যাঁ, এইরকমই আমি মনে করি।'

সাংবাদিকদের সর্বশেষ প্রশ্ন, 'কংগ্রেস যদি ওয়াভেলের প্রস্তাব গ্রহণ করে তাহলে ভারত কি সৈন্য সংগ্রহের সর্বাত্মক ব্যবস্থা (conspiration) সমর্থন করবে?'

এর উত্তরে আমি বলি, ভারতকে যদি স্বাধীনতা দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহলে সে নিশ্চয়ই স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যোগদান করবে। তখন আমাদের প্রথম কর্তব্য হবে জাতিকে সর্বতোভাবে 'মোবিলাইজ' করা; সুতরাং ভারত অবশ্যই 'কনস্ক্রিপশান' সমর্থন করবে।

আমি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসেবে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে যে বিবৃতি দিয়েছিলাম সেই বিবৃতির কথাটা সাংবাদিকদের স্মরণ করিয়ে দিই। সেই বিবৃতিতে আমি বলেছিলাম, ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হলে সে স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যোগদান তো করবেই, তাছাড়া সে 'কনস্ক্রিপশান' ব্যবস্থা মেনে নিয়ে প্রতিটি সক্ষম যুবককে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করবে। আমি তখন আরো বলে-

ছিলাম, এটা শুধু বাঁচার প্রশ্ন নয়,—এটা গণতন্ত্রের জন্য মৃত্যুবরণ করার কথাও বটে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ইংরেজরা আমাদের সম্মানজনকভাবে মৃত্যুবরণ করবার সুযোগও দেননি। তখন তাঁরা আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

মিঃ আমেরির বিবৃতি

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুন, ভারত সচিব মিঃ এল. এস. আমেরি হাউস অব কমন্সে ঘোষণা করেন, ভারতবাসীকে স্বাধীন জাতি হিসেবে যুদ্ধের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হবে। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হয়, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের গভর্নমেন্ট পরিচালনা করতে দেওয়া হবে কি না, তার উত্তরে মিঃ আমেরি বলেন, তিনি কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগকে গভর্নমেন্ট গঠন করবার জন্য আহ্বান জানাবেন। অতএব কংগ্রেস মৌলানা আজাদ এবং পণ্ডিত নেহরু সহ তার প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে।

এই বিবৃতির ফলে ভারতের জনসাধারণের মনে এইরকম ধারণার সৃষ্টি হয়, অবশেষে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হতে চলেছে। জনগণ আরো মনে করতে থাকে, এবারের প্রস্তাব গ্রহণ করার ব্যাপারে কংগ্রেসের সামনে আর কোনো বাধার সৃষ্টি হবে না। এই সময় প্রতিদিন শত শত টেলিগ্রাম এবং চিঠি আমার কাছে আসতে থাকে। কংগ্রেস যাতে এবারের প্রস্তাবটি মেনে নেয় সেই কথাই বলা হয় ওইসব টেলিগ্রাম এবং চিঠিতে। দেশের আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি দেখে আমি তখন সংবাদপত্রে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রকাশ করি। উক্ত বিবৃতিতে আমি বলি, কংগ্রেস কখনো দায়িত্ব পরিহার করতে চায়নি ; সে-সব সময়ই দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ছিলো। ভারতকে যদি তার ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের, অর্থাৎ তার রাজনৈতিক এবং শাসনতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে আমি এই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করবার জন্য আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করবো। আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করি, আমাদের উদ্দেশ্য সব সময়ই গঠনমূলক—ধ্বংসমূলক কখনোই নয়।

আমার মুক্তির একদিন পরে, অর্থাৎ আমি যখন কলকাতায় অবস্থান করছিলাম, সেই সময় ভাইসরয়ের কাছ থেকে আমি এক আমন্ত্রণলিপি পাই। উক্ত আমন্ত্রণলিপিতে আমাকে ২৫শে জুন সিমলায় এক গোলটেবিল বৈঠকে

যোগদান করবার জন্য অনুরোধ করা হয়। ভাইসরয়ের সেই পত্রের উত্তরে আমি তাঁকে জানিয়ে দিই, ২১শে জুন আমি বোম্বাইতে ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা আহ্বান করেছি। উক্ত সভায় তাঁর চিঠিটি আলোচিত হবে এবং প্রতিনিধি হিসেবে কাকে পাঠানো হবে তাও ওই সভাতেই স্থিরীকৃত হবে। আমি তাঁকে আরো লিখি, সিমলা সম্মেলনের আগে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাছাড়া আমি যখন আহম্মদনগর ফোর্ট জেলে আবদ্ধ ছিলাম সেই সময় আমার আর তাঁর মধ্যে যেসব চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়েছে সেগুলো সংবাদপত্রে প্রকাশ করার ব্যাপারে তাঁর কোনো আপত্তি আছে কি না সে কথাও আমি তাঁর কাছে জানতে চাই।

এই সময় আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা খুবই খারাপ ছিলো। আমার ওজন কমে গিয়েছিলো চল্লিশ পাউণ্ডেরও বেশী। ক্ষিদেও ছিলো না। আমার শরীর তখন এতোই দুর্বল হয়ে পড়েছিলো যে চলাফেরা করতেও কষ্ট হতো। আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে ডাক্তারেরা আমাকে বলেছিলেন সম্মেলনটা আরো দু সপ্তাহ পেছিয়ে দেবার জন্য আমি যেন ভাইসরয়কে অনুরোধ করি। দু সপ্তাহ সময় পেলে চিকিৎসার ব্যাপারে কিছুটা সুরাহা হবে। আমি কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের জন্য ওই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনকে পিছিয়ে দেওয়াটা ঠিক হবে না বলে মনে করি।

আমি বঙ্গীয় বিধানসভার নেতৃস্থানীয় সদস্য হুমায়ুন কবীরকে সিমলা কনফারেন্সের সময় আমার সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করবার জন্য বলি। তাঁর সঙ্গে সেই থেকে আমার যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সে সম্পর্ক এখনো অম্লান রয়েছে। আমি জওহরলালকে একটি চিঠি লিখে সেই চিঠিটি সহ আগেই তাঁকে বোম্বাইতে পাঠিয়ে দিই। ওই চিঠিতে আমি জওহরলালকে বলি, ওয়ার্কিং কমিটির সভা শুরু হবার আগে তাঁর সঙ্গে আমি আলোচনা করে আমাদের কর্মপন্থা স্থির করে নিতে চাই। জওহরলাল আমার প্রস্তাবে সম্মত হন। তিনি বলেন, তিনি নিজেও এই রকমই চিন্তা করছিলেন।

২১শে জুন আমি বোম্বাইতে পৌঁছই। অন্যান্য বারের মতো এবারও আমি ভুলাভাই দেশাইয়ের বাড়িতেই উঠি। ১৯৪২-এর ৯ই আগস্ট সকালে যে ঘর থেকে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো, এবারেও সেই ঘরটিতেই আমি থাকি। আমি যখন বারান্দায় বসে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন আমার মনেই হচ্ছিলো না যে ইতিমধ্যে তিনটি বছর পার হয়ে গেছে। আমার মনে হয়েছিলো, আমি যেন গতকাল বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথা বলেছি

এবং ৯ই আগস্টের ঘটনা আদৌ ঘটেনি। সেই সুপরিচিত পরিবেশে সেইসব পুরনো বন্ধুর সঙ্গেই কথা বলছি। সামনে সেই চিরপরিচিত আরব সাগর সেদিনের মতো আজও দিগন্তবিস্তৃত হয়ে রয়েছে।

গান্ধীজী তাঁর প্রথা অনুসারে বিড়লা-ভবনে বাস করছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির সভাও সেখানেই অনুষ্ঠিত হয়। আমি কমিটির কাছে ভাইসরয়ের সেই আমন্ত্রণলিপির কথা বলি। চিঠিটাও কমিটির সামনে পেশ করি। কমিটি উক্ত চিঠিখানার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করে আমাকেই প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করেন। স্থির হয়, গোলটেবিল বৈঠকে আমিই কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করবো। খবরটা ভাইসরয়কে জানিয়ে দেওয়া হলে তিনি বোম্বাই থেকে আমাদের যাত্রার ব্যবস্থা করে দেন। তিনি আমার ব্যবহারের জন্য একটি এরোপ্লেন পাঠিয়ে দেন। ওই এরোপ্লেনে করে আমি আম্বালায় যাই। সেখান থেকে মোটরে সিমলা যাই। এখানে আর একটা কথা বলে রাখা দরকার, আমি বোম্বাই পরিত্যাগ করবার আগেই ভাইসরয়ের কাছ থেকে আমার চিঠির উত্তর পেয়ে যাই। আমার চিঠিতে লিখেছিলাম, কনফারেন্সের আগে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। উত্তরে ভাইসরয় আনন্দের সঙ্গে আমার প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছেন। আমাদের চিঠিপত্র সংবাদপত্রে প্রকাশের ব্যাপারে তিনি বলেছেন, ও ব্যাপারে সাক্ষাতে আলোচনা হবে।

দিল্লীতে বিরাট অভ্যর্থনা

যেদিন আমি দিল্লীতে যাই সেদিনটা ছিলো বেজায় গরম। এতো গরম যে আমি রীতিমতো অস্থির হয়ে পড়ছিলাম। আম্বালা থেকে কালকা পর্যন্ত মোটরে আসবার ফলে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আসবার পথে অগণিত জনতার সঙ্গে আমাকে দেখা করতে হয়েছে। জনতা অনেক বার আমার গাড়িকে ঘিরে ফেলে আমার গতিরোধ করেছে। অনেকে গাড়ির ভেতরেও উঠে পড়েছে। যারা গাড়ির ভেতর ঢুকতে পারেনি তাদের মধ্যে কেউ কেউ পাদানিতে এবং ছাদের ওপরেও উঠে পড়েছে। তাদের হাত থেকে সহজে আমি ছাড়া পাইনি। অবশেষে আমি যখন বিশেষ-ভাবে তাদের অনুরোধ করি পথে এইভাবে দেরি করলে কাজের খুব অসুবিধে হবে তখন তারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে ছেড়ে দেয়। অবশেষে রাত প্রায় দশটার সময় আমি সিমলায় উপস্থিত হই। ওখানে পৌঁছে আমি সোজা চলে

যাই স্যাভয় হোটেলে। ওই হোটেলে আমার জন্য কয়েকখানা ঘর রিজার্ভ করে রাখা হয়েছিলো। হোটেলে আমাকে বেশীদিন থাকতে হয়নি। আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে লর্ড ওয়াভেল মনে করেন হোটেলে থাকা আমার পক্ষে উচিত হবে না। তিনি তাই বড়লাট ভবনের সংলগ্ন একটা বাংলো আমাকে ছেড়ে দেন। শুধু তাই নয়, লাটপ্রাসাদের কর্মচারীদেরও তিনি নির্দেশ দেন আমাকে দেখাশুনা করবার জন্য। ভাইসরয়ের এই সৌজন্য দেখে আমি রীতিমতো মুগ্ধ হয়ে যাই। এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বলতে চাই, লর্ড ওয়াভেলকে আমি সব সময়ই অপরের সুখ-সুবিধার প্রতি সজাগ থাকতে দেখেছি।

ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

পরদিন সকাল দশটায় আমি ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করি। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে আমার সঙ্গে আলোচনা করেন। আলোচনার সময় ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রস্তাবের বিষয়বস্তুও তিনি আমাকে জানিয়ে দেন। তিনি বলেন, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত শাসনব্যবস্থায় কোনোরকম গুরুত্বপূর্ণ রদবদল করা হবে না, তবে ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিল একমাত্র ভারতীয়দের দ্বারাই গঠিত হবে। তিনি আরো বলেন, ভাইসরয় প্রকৃতপক্ষে কাউন্সিলের পরামর্শ মতোই চলবেন। তিনি আমার কাছে আবেদন রাখেন, আমি যেন গভর্নমেন্টকে বিশ্বাস করি। তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা, যুদ্ধ শেষ হবার পরেই ভারতের সমস্যা সমাধান হবে, অতএব ভারতের নিজের স্বার্থেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রস্তাব গ্রহণ করে যুদ্ধকে যাতে জয়ের পথে নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এরপর তিনি মুসলিম লীগ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার।

আমি তাঁকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিই, লীগের সঙ্গে বোঝাপড়ার ব্যাপারে আমার মনে সন্দেহ আছে। লীগের উর্ধ্বতন নেতারা মনে করেন, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সর্ববিষয়ে তাঁদের সমর্থন করেন, সুতরাং তাঁরা কোনো কথাই শুনতে চাইবেন না।

ভাইসরয় তখন দৃঢ়ভাবে বলেন, গভর্নমেন্ট কর্তৃক লীগকে সমর্থনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। মুসলিম লীগের নেতাদের মনে যদি এইরকম ধারণা থেকে

থাকে তাহলে তা হবে নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা। তিনি আমাকে পরিষ্কারভাবে বলেন, এ ব্যাপারে গভর্নমেন্ট সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করবে।

এরপর আমি আহম্মদনগর ফোর্ট জেলে থাকাকালীন আমার এবং তাঁর মধ্যে যেসব চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়েছে সেগুলো সম্বন্ধে কথা তুলি। আমি তাঁকে বলি, ওগুলো খবরের কাগজে প্রকাশ করতে তাঁর তরফ থেকে কোনোরকম আপত্তি হবে না বলে আশা করি।

ভাইসরয় বলেন, আমি যদি ওগুলো প্রকাশ করবার জন্য খুবই আগ্রহান্বিত হই তাহলে তিনি তাতে আপত্তি করবেন না। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ওগুলো প্রকাশিত হওয়াটা দুর্ভাগ্যজনক হবে বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে আমরা যখন এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ভারতের সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন করে আলোচনায় বসছি, তখন অতীতের তিক্ততা ভুলে যাওয়াটাই সঙ্গত হবে। এই সময় যদি পূর্বতন ঘটনাবলীকে পুনরায় টেনে আনা হয় তাহলে পরিবেশটা বদলে যাবে এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ার পরিবর্তে ক্রোধ এবং অবিশ্বাসের সৃষ্টি হবে। তিনি তাই আমার কাছে বিশেষভাবে আবেদন করেন, আমি যেন ওইসব চিঠিপত্র প্রকাশ করবার ব্যাপারে অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ না করি। অবশেষে তিনি বলেন, তাঁর কথাটা আমি মেনে নেবো বলে তিনি আন্তরিকভাবে আশা করেন।

আমি বুঝতে পারি, ভাইসরয় এখন সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য আন্তরিকভাবে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছেন। আমি তাই তাঁকে বলি, তাঁর প্রস্তাব আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। পরিবেশটা যাতে সুস্থ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ হয় তার জন্য আমিও তাঁরই মতো আগ্রহান্বিত। সুতরাং আবহাওয়ার অবনতি ঘটে এমন কোনো কাজ আমি কখনোই করবো না। অর্থাৎ, আমি তাঁর প্রস্তাব মেনে নিলাম।

ভাইসরয় তখন আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে দুবার বলেন, আমার এই মনোভাব দেখে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন।

এরপর ভাইসরয় তাঁর প্রস্তাবের খুঁটিনাটি আমার কাছে প্রকাশ করেন। প্রস্তাবের ব্যাখ্যা শুনে প্রথমটায় আমার মনে হয়, ক্রিপস-প্রস্তাবের সঙ্গে বর্তমান প্রস্তাবের বিশেষ কোনো তফাত নেই। তবে একটি বিষয়ে উভয় প্রস্তাবের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই আছে। ক্রিপস-প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিলো এমন সময়, যখন ভারতের সাহায্য ও সহযোগিতা ইংরেজের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন ছিলো। আজ ইয়োরোপের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং মিত্রপক্ষ

হিটলারের বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করে ফেলেছে। কিন্তু তা সত্বেও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁদের পূর্ব প্রস্তাব পুনরুত্থাপন করেছেন ভারতে এক নতুন রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে।

আমি ভাইসরয়কে জানিয়ে দিই, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যদিও আমাকে তার প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করেছে এবং আমার ইচ্ছামত কাজ করবার স্বাধীনতা দিয়েছে তবুও এ ব্যাপারে মতামত দেবার আগে আমি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই। আমি তাই সিমলাতে ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা আহ্বান করি। বলা বাহুল্য, ভাইসরয়ের প্রস্তাবটি নিয়ে বিচার-বিবেচনা করবার জন্যই ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহূত হয়। আমি মনে করি, এই বিচার-বিবেচনার ফলে কংগ্রেসের বক্তব্য আমি আরো সুষ্ঠুভাবে কনফারেন্সের সময় তুলে ধরতে পারবো। আমি ভাইসরয়কে বলি, এ ব্যাপারে যাতে কোনোরকম অসুবিধের সৃষ্টি না হয় এবং আমরা যাতে একটা সমাধানে আসতে পারি তার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

ভাইসরয় যেরকম আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর প্রস্তাবটি ব্যাখ্যা করলেন তাতে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এ ব্যাপারে তিনি রাজনীতিকের মতো কথা না বলে সৈনিকের মতো বলেছেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে কোথাও কোনো গোপনীয়তা ছিলো না। আমি আরো লক্ষ্য করি, তাঁর কথাবার্তা এবং চালচলন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের কথাবার্তা এবং চালচলন অপেক্ষা সম্পূর্ণ আলাদা। স্যার স্ট্যাফোর্ড অনেক কিছু গোপন রেখে তাঁর প্রস্তাবটিকে চমকপ্রদ বস্তু হিসেবে উপস্থাপিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন; কিন্তু লর্ড ওয়াভেল আসল ঘটনার ওপরে কোনোরকম রঙ চাপিয়ে তাকে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করতে চাননি। তিনি বলেন, যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি, কারণ প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রবল শত্রু জাপান এখনো ভীষণভাবে সক্রিয়, সুতরাং এ অবস্থায় কোনোরকম সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এর জন্য যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। তবে তিনি এমন একটা আশা প্রকাশ করেন যে ভবিষ্যতের বিরাট পরিবর্তনের ভিত্তি এখনই স্থাপিত হতে চলেছে। একজিকিউটিভ কাউন্সিলকে ভারতীয়করণের ফলে দেশের সর্বোচ্চ শাসনব্যবস্থাও ভারতীয়দের হাতে থাকছে। একবার এই ব্যবস্থা চালু হলে পরবর্তীকালে আরো অনেক পরিবর্তন ঘটবে।

লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার সিমলায় এক নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। সেই রাত্রেই ভাইসরয় এক রাষ্ট্রীয় ভোজসভার ব্যবস্থা করেন।

পরে আমি জানতে পারি, উক্ত ভোজসভায় তিনি উচ্ছ্বসিতভাবে আমার প্রশংসা করেছিলেন। তিনি আরো বলেছিলেন, কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁর যতোই মতবিরোধ থাক না কেন, কংগ্রেসের নেতারা সবাই যে অত্যন্ত ভদ্র সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। কংগ্রেস নেতাদের সম্বন্ধে ভাইসরয়ের এই মন্তব্য সিমলা শহরের সরকারী এবং বে-সরকারী ব্যক্তিদের মধ্যে এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। যেসব উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এতোদিন কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে এসেছেন এবং আমাকে অবজ্ঞা করে এসেছেন তাঁরা হঠাৎ আমাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় হয়ে ওঠেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই নানারকম উপহার সামগ্রীসহ আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং কথায় কথায় আমাকে জানিয়ে দেন, তাঁরা মনে মনে চির-দিনই কংগ্রেসকে ভালবেসেছেন। তাঁরা সবাই যে কংগ্রেসের পক্ষে আছেন এ কথাও তাঁরা জানাতে ভুল করেন না।

২৪ তারিখ বিকেলবেলা সর্দার হরনাম সিংয়ের বাসভবনে ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসে। গান্ধীজী তখন ওখানেই বাস করছিলেন। সভার প্রারম্ভে আমি ভাইসরয়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করি। আমার সেই বক্তব্যে আমি এই অভিমত জ্ঞাপন করি, পূর্ববর্তী ক্রিপস-প্রস্তাবের সঙ্গে বর্তমান প্রস্তাবের বিশেষ কোনো হেরফের না থাকলেও এ প্রস্তাব আমাদের গ্রহণ করা উচিত। আমার বক্তব্যের পরিপূরক হিসেবে আমি বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করি। ইয়োরোপের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং জাপানও আর বেশীদিন টিকে থাকতে পারবে না। সুতরাং যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষে আমাদের সাহায্য চাইবার আর কোনো বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হবে না। এই অবস্থায় লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা আমাদের পক্ষে মোটেই সমীচীন হবে না। অতএব আমাদের পক্ষে সম্মেলনে যোগদান করে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রস্তাবটা গ্রহণ করাই উচিত হবে।

আমার এই বক্তব্যের পর ওয়ার্কিং কমিটি বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। অবশেষে স্থির হয়, আমরা সম্মেলনে যোগ দিয়ে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো সম্বন্ধে জোরালোভাবে আমাদের অভিমত জ্ঞাপন করবো :

(১) ভাইসরয়ের সঙ্গে একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সম্পর্ক কী হবে সে সম্বন্ধে আমরা পরিষ্কার ব্যাখ্যা দাবী করবো। কাউন্সিল যদি সর্বসম্মতভাবে কোনো সিদ্ধান্তে আসেন তাহলে ভাইসরয় কি সেই সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বাধ্য

থাকবেন? কাউন্সিলের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নাকচ করে দেবার ভেটো-ক্ষমতা ভাইসরয়ের থাকবে কি?

(২) সেনাদলের অবস্থা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দাবি করতে হবে। জনগণ এবং সেনাদলের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে এমনভাবে তার পরিবর্তন ঘটাতে হবে যাতে ভারতীয় নেতারা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবার সুযোগ পান।

(৩) ভারতের জনমতকে উপেক্ষা করে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতকে যুদ্ধের মধ্যে টেনে এনেছেন। কংগ্রেস এটা মেনে নিতে চায়নি। এবার যদি কোনো সমাধান হয় এবং নতুন একজিকিউটিভ কাউন্সিল গঠিত হয় তাহলে ভবিষ্যতে কোনো যুদ্ধের ব্যাপারে ভারতের অংশগ্রহণের বিষয়টি আইনসভার সামনে পেশ করবার ক্ষমতা কাউন্সিলের থাকবে। জাপানের বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধ ইংরেজদের অভিপ্রায় অনুসারে চলবে না; এ বিষয়টি ভারতের নিজস্ব প্রতিনিধিদের ভোটে স্থিরীকৃত হবে।

ওয়ার্কিং কমিটির এই সভায় গান্ধীজীও উপস্থিত ছিলেন এবং কমিটিকর্তৃক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তিনিও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবার তিনি অহিংসার প্রশ্নটি তোলেননি; অর্থাৎ যুদ্ধে যোগদান মানেই অহিংসার মতবাদকে বর্জন করা, এ কথাটি তিনি কমিটির সামনে উত্থাপন করেননি। ওয়ার্কিং কমিটির যে কজন সভ্য এই বিষয়টির জন্য আগে একবার রিজাইন দিয়েছিলেন তাঁরাও এবার চুপ করেই থাকেন।

ভাইসরয়ের ঘোষণা অনুসারে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের সভাপতিদ্বয় এবং তপশিলী সম্প্রদায় ও শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগদান করবেন বলে স্থির হয়। এছাড়া কেন্দ্রীয় আইনসভার কংগ্রেস লীডার, মুসলিম লীগের প্রতিনিধি হিসাবে কাউন্সিল অব স্টেটের মুসলমান ডেপুটি লীডার এবং আইনসভার অন্যান্য জাতীয়তাবাদী দলগুলোর এবং ইয়োরোপীয় গ্রুপের লীডাররাও নিমন্ত্রিত হন। সম্মেলনে আরো যাঁরা যোগদান করেন তাঁরা হলেন প্রাদেশিক সরকারসমূহের তৎকালীন প্রধান-মন্ত্রীগণ। হিন্দুমহাসভাও নিমন্ত্রণ পাবার জন্য চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু ভাইসরয় তাদের দাবি মেনে নেননি।

সম্মেলন শুরু হবার কিছুক্ষণ আগেই আমাদের উপস্থিত হতে বলা হয়েছিলো। ভাইসরয় আমাদের স্বাগত জানান বড়লাট ভবনের প্রাঙ্গণে। ওখানে আমাদের সবাইকে নিয়মানুগভাবে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। আমি তখন এতোই দুর্বল বোধ করছিলাম যে কয়েক মিনিটের বেশি দাঁড়িয়ে

থাকা আমার পক্ষে কষ্টকর ছিলো। আমার সেই শারীরিক দুর্বলতার কথা আমি ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী স্যার ইভান জেনকিন্সকে বললে তিনি আমাকে একটা কোণে নিয়ে গিয়ে একটা সোফায় বসিয়ে দিয়ে যান। কয়েক মিনিট ওখানে বসবার পরে তিনি একজন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে আবার আমার কাছে ফিরে আসেন এবং মহিলাটিকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এই সময় তিনি বলেন, উক্ত মহিলাটি আরবী ভাষায় সু-অভিজ্ঞা। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, আমি ওখানে একা থাকায় একজন সঙ্গী আমার দরকার হবে। এবং এইজন্যই তিনি প্রাচ্যের ওই বিদুষী মহিলাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিলেন। আমি মহিলাটির সঙ্গে আরবী ভাষায় কথা বলতে গিয়ে বুঝতে পারি, তার 'নাম' (হ্যাঁ) আর 'লা' (না) ছাড়া আর কোনো আরবী শব্দ জানা নেই। আমি তখন ইংরেজীতে তাঁকে জিজ্ঞেস করি, প্রাইভেট সেক্রেটারী তাঁকে আরবী ভাষায় অভিজ্ঞা বলে মনে করলেন কেন?

আমার কথার উত্তরে মহিলাটি বললেন, 'গতরাত্রে এক ভোজসভায় আমি সেখানে উপস্থিত ভদ্রলোকদের বলেছিলাম, আরবীয়রা ডিনার টেবিলে বসবার পর 'আজিব, আজিব' বলে থাকেন। স্যার জেনকিন্সও সেই ভোজসভায় উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া তিনি আরো জানতেন আমি কয়েক মাস বোগদাদে ছিলাম।'

এরপর একটু মৃদু হেসে মহিলাটি আবার বলেন, 'এইজন্যই হয়তো স্যার জেনকিন্স ধরে নিয়েছিলেন, আমি আরবী ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিলাভ করেছি।'

কয়েক মিনিট পরে লর্ড ওয়াভেল আমার কাছে এসে বললেন, সম্মেলন-কক্ষে যাবার সময় হয়েছে। আপনি আসুন।'

সম্মেলনকক্ষে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলাম, সেখানে ভাইসরয়কে মাঝখানে রেখে প্রতিনিধিদের জন্য অর্ধচন্দ্রাকারে আসন স্থাপন করা হয়েছে। প্রধান বিরোধীদল হিসেবে কংগ্রেসের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে ভাইসরয়ের বাম-দিকের আসনগুলো এবং লীগের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে ডানদিকের আসনগুলো। সাধারণত সরকারের সমর্থকদলের জন্যই ডানদিকের আসনগুলো নির্দিষ্ট থাকে। এর ফলে সঙ্গতভাবেই মনে হয়, সরকার মুসলিম লীগকে তাঁদের সমর্থক হিসেবে গণ্য করেন। তবে এমনও হতে পারে, উদ্যোক্তাদের অজ্ঞতার জন্যই এরকম ব্যবস্থা হয়েছে।

একটু পরেই সম্মেলন শুরু হলো। লর্ড ওয়াভেল একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন। তাঁর ভাষণ শেষ হতেই আমি দাঁড়িয়ে

উঠে সভার সামনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মতামত ব্যক্ত করি, পূর্বে যে তিনটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে তার প্রত্যেকটি বিষয়ই আমি সভার সামনে তুলে ধরি।

এরপর ভাইসরয়ের উত্তর দেবার পালা। বলতে বাধা নেই, ভাইসরয় আমার প্রত্যেকটি প্রশ্নেরই সন্তোষজনক উত্তর দেন।

তার পরেই শুরু হলো আলোচনা এবং সারাদিন ধরেই তা চলতে লাগলো তবে মাঝে একবার লাঞ্চের জন্য কিছুক্ষণ আলোচনা স্থগিত ছিলো।

সম্মেলনে যথেষ্ট গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছিলো। সাংবাদিকদেরও সেখানে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি। প্রথম দিনের অধিবেশনের পরেই আমি তাই লর্ড ওয়াভেলকে বলি, সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের যদি সম্মেলন সম্বন্ধে কোনো প্রেসনোট বা ওইরকম কিছু না দেওয়া হয় তাহলে নানারকম গুজবের সৃষ্টি হবে, সুতরাং বিভিন্ন দলের সম্মতিক্রমে 'প্রেস রিলিজ' ইসু করলে ভালো হয়। আমার কথার উত্তরে ভাইসরয় বলেন, প্রত্যেক অধিবেশনের শেষেই একটি সরকারী বিবৃতি তৈরি করা হবে এবং বিভিন্ন দলের অনুমোদন নিয়ে সেটি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দেওয়া হবে। ভাইসরয়ের কথামত সেদিনের অধিবেশন শেষ হতেই সরকারী বিবৃতির একটা খসড়া আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়। খসড়াটি পড়ে সামান্য একটু অদলবদল করে আবার আমি সেটিকে ফিরিয়ে দিই। এরপর যখন 'প্রেস রিলিজ' তৈরি করে সাংবাদিকদের দেওয়া হয় তখন আমি খুশির সঙ্গে লক্ষ্য করি, আমার প্রতিটি সংশোধনই সরকারী বিবৃতিতে স্থান পেয়েছে। এরপর থেকে প্রতদিনই এই পদ্ধতি অনুসৃত হতে থাকে।

সম্মেলন শুরু হবার পর থেকেই কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মতবিরোধ সুস্পষ্টভাবে দেখা দেয়। দ্বিতীয় দিনে সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণ এবং আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত ও গৃহীত হয়। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের ব্যাপারে সর্বতোভাবে সহযোগিতার কথা এবং ভারত শাসন আইনে এক-জিকিউটিভ কাউন্সিল পুনর্গঠনের বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করার কথাও সম্মেলনে আলোচিত ও গৃহীত হয়। শেষোক্ত ব্যাপারে মিঃ জিন্না দাবি তোলেন: কংগ্রেস শুধু হিন্দু সদস্যদেরই মনোনীত করতে পারবে। মুসলমান সদস্যদের মনোনীত করবে একমাত্র মুসলিম লীগ। মিঃ জিন্নার এই অযৌক্তিক দাবির উত্তরে আমি বলি, কংগ্রেস তাঁর দাবি কখনই মেনে নেবে না। কংগ্রেস চির-দিনই জাতীয় মনোভাব নিয়ে যাবতীয় রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে

এবং সে ব্যাপারে কংগ্রেস কোনোদিনই হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কোনো রকম পার্থক্য টানেনি সুতরাং কংগ্রেস যে শুধু হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান এটা সে কিছুতেই মেনে নেবে না। এই কথা বলে আমি পাল্টা দাবি উত্থাপন করে বলি, কংগ্রেস হিন্দু মুসলমান ক্রিশ্চান শিখ পার্শী নির্বিশেষে যে-কোনো ভারতীয়কে তার প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করবে। আমি আরো বলি, কংগ্রেসের এই দাবি মেনে নেওয়া না হলে সে সম্মেলন থেকে সরে দাঁড়াবে। মুসলিম লীগ তার ইচ্ছামত প্রতিনিধি মনোনয়ন করতে পারে, সে সম্পর্কে কংগ্রেসের কোনো বক্তব্য নেই।

সম্মেলন আবার শুরু হয় ২৬শে জুন এবং লাঞ্চের বিরতির আগে পর্যন্ত আলোচনা চলে। কথা হয়, লাঞ্চের সময় প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবেন।

এই সময় মিঃ জিন্না বলেন, তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা করতে চান। আমি তখন পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থকে এ ব্যাপারে মনোনীত করি। আমার মতে মিঃ জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করবার ব্যাপারে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। আলোচনা চলে কয়েক দিন ধরে, কিন্তু তাতে কোনোই ফল হয় না। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী খিজির হায়াৎ খানও সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলন চলাকালে তিনি অনেকবার আমার সঙ্গে আলোচনা করেন। আমি আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করি, সম্মেলনে উত্থাপিত প্রতিটি প্রশ্নেই তিনি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রতিটি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সর্বতোভাবে সহযোগিতার আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন।

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে সিমলা কনফারেন্স একটি যুগান্তকারী ঘটনা। যদিও এই সম্মেলন শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি। কিন্তু তা না হবার কারণ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে মতবিরোধ নয়; সম্মেলন ফলপ্রসূ না হবার কারণ হলো মুসলিম লীগের উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবসঞ্জাত অসহ-যোগিতা। মুসলিম লীগের এই অসহযোগিতার কারণ জানতে হলে লীগের ইতিহাস অনুধাবন করা দরকার। রাজনৈতিক সমস্যার ব্যাপারে মুসলিম লীগের মনোভাবকে সুস্পষ্টভাবে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যায়। এই তিনটি স্তর সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

মুসলিম লীগের উৎপত্তি এবং উদ্দেশ্য

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বড়দিনের সময় ঢাকা শহরে একটি 'মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলন চলাকালে ঢাকার তৎকালীন নবাব মুস্তাক হোসেনের প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগ জন্মগ্রহণ করে। সেই সম্মেলনে আমিও উপস্থিত ছিলাম। উক্ত সম্মেলনে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রস্তাবের মধ্যে দুটি প্রস্তাবের কথা এখনো আমার বেশ মনে আছে। প্রথম প্রস্তাবে বলা হয়, ভারতের মুসলমানদের সর্বউপায়ে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অনুগত করে তুলতে হবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার নামে এবং সরকারী চাকরিতে মুসলমানদের বেশী করে নেবার দাবীতে হিন্দু এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্য উত্থাপন করা হয়। এই কারণেই মুসলিম লীগের নেতারা কংগ্রেস কর্তৃক উত্থাপিত রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবীর বিরোধিতা করে এসেছেন। তাঁরা মনে করতেন, মুসলমানরা যদি রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের সামিল হয় তাহলে এর পরেই আসে দ্বিতীয় স্তর। মুসলিম লীগ যখন দেখতে পায়, কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলে গভর্নমেন্ট নানারকম সংস্কার করতে বাধ্য হচ্ছেন, তখনই লীগ তার কাজের ধারাকে কিছুটা পরিবর্তন করে। লীগ বেশ কিছুটা অস্বস্তির সঙ্গেই লক্ষ্য করে, কংগ্রেস ধাপে ধাপে তার লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু এটা দেখেও লীগ স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে। তবে রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকলেও কংগ্রেসকে কোনো সুযোগ-সুবিধে পেতে দেখলেই লীগ এগিয়ে আসতে থাকে সুযোগ-সুবিধের ভাগ বসাবার জন্য। মুসলিম সমাজের স্বার্থরক্ষার নামেই তারা তখন এগিয়ে আসে। মুসলিম লীগের এই প্রোগ্রামটি গভর্নমেন্টের খুবই মনঃপূত হয়। অতএব এটা সঙ্গতভাবেই মনে করা যেতে পারে, মুসলিম লীগ ইংরেজদের ইচ্ছা অনুসারেই চালিত হচ্ছিলো। মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কারের সময় এবং মন্টফোর্ড (মণ্টেগু চেমসফোর্ড) পরিকল্পিত প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনাধিকার প্রবর্তনের সময়ও মুসলিম লীগ ঠিক এইরকম মনোভাবই নিয়েছিলো।

এরপর আসে তৃতীয় পর্ব। এই পর্বের সূচনা হয় প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। এই সময় কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বেড়ে যায়। অবস্থা দেখে মনে হয়, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট হয়তো ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেবেন। এই সময়

মুসলিম লীগের নেতৃত্ব মিঃ জিন্নার হাতে এসে গিয়েছিলো। তিনি তখন শুরু করলেন এক নতুন খেলা। এ খেলা হলো গভর্নমেন্ট এবং কংগ্রেসের মধ্যে প্রতিটি বিরোধের সুযোগ নেওয়া। যখনই কংগ্রেস এবং গভর্নমেন্টের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে কোনো আলোচনা শুরু হতো তখনই মিঃ জিন্না তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে চুপ করে থাকতেন। আলোচনা যদি ফেঁসে যেতো তখন তিনি উভয়পক্ষের ওপরে দোষারোপ করে বিবৃতি প্রচার করতেন। ওইসব বিবৃতিতে তিনি বলতেন, যেহেতু আলোচনায় কোনো কিছুর সমাধান হয়নি সেইহেতু ব্রিটিশ-প্রস্তাব সম্পর্কে মুসলিম লীগ কোনোরকম অভিমত প্রকাশ করবে না। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট-প্রস্তাব এবং ১৯৪২-এর ক্রিপস-প্রস্তাব সম্পর্কেও মিঃ জিন্না এই খেলাই খেলেন। কিন্তু সিমলা কনফারেন্সে এসে তিনি একটু বেকায়দায় পড়ে যান, কারণ এবার আর তাঁর সেই পুরনো চাল কার্যকরী হবে না বলে তিনি বুঝতে পারেন।

আমি আগেই বলেছি, ইতিপূর্বে কংগ্রেস এবং গভর্নমেন্টের মধ্যে প্রতিটি আলোচনাই রাজনৈতিক কারণে ফেঁসে গেছে। ইংরেজরা ক্ষমতা হস্তান্তর করতে সম্মত হতেন না এবং কংগ্রেসও ভারতের স্বাধীনতা ছাড়া আর কোনো সমাধানেই সম্মত হতো না। এই কারণেই পূর্ববর্তী আলোচনাগুলো ভেস্তে গেছে। সুতরাং সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন সেসব ক্ষেত্রে আদৌ উত্থাপিত হয়নি। কিন্তু সিমলা কনফারেন্সে পরিস্থিতি ভিন্নতর হয়ে ওঠে। এবার আমি লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব মেনে নিতে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সম্মত করতে সক্ষম হই। সুতরাং এবারে আর উভয়পক্ষের ওপর দোষারোপ করে ভালোমানুষ সাজা সম্ভব হয় না মিঃ জিন্নার পক্ষে। এবারের আলোচনা ভেস্তে গেলো নতুন একজিকিউটিভ কাউন্সিলে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সদস্য নির্বাচনের প্রশ্নে।

আমি ইতিপূর্বেই ব্যাখ্যা করেছি, এই প্রশ্নে কংগ্রেস জাতীয় মনোভাব গ্রহণ করে কিন্তু মুসলিম লীগ বায়না ধরে যে কংগ্রেস তার জাতীয় চরিত্র পরিহার করে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করুক। মিঃ জিন্না এক অদ্ভুত দাবী তুলে বলেন, একজিকিউটিভ কাউন্সিলে কংগ্রেস শুধু হিন্দু প্রতিনিধি পাঠাবে। আমি সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যদের কাছে জানতে চাই, কংগ্রেস কাদের মনোনয়ন দেবে না দেবে সে সম্বন্ধে কথা বলার অধিকার মিঃ জিন্নাকে এবং মুসলিম লীগকে কে দিয়েছে? কংগ্রেস যদি মুসলমান, পার্শী, শিখ অথবা খ্রীষ্টান সদস্য মনোনীত করে তাহলে তো হিন্দু সদস্যের সংখ্যাই

কমে যাবে ; এতে মুসলিম লীগের কী বক্তব্য থাকতে পারে ? আমি লর্ড ওয়াভেলকে সরাসরি প্রশ্ন করি, মুসলিম লীগের এই বক্তব্য তিনি সমর্থন-যোগ্য বলে মনে করেন কিনা।

আমার প্রশ্নের উত্তরে লর্ড ওয়াভেল বলেন, মুসলিম লীগের দাবীকে তিনি বাস্তবানুগ বলে মনে করেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলেন, এই বিষয়টি কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে আলোচিত হয়ে স্থির হওয়া দরকার ; গভর্নমেন্ট অথবা ব্যক্তিগতভাবে তিনি নিজে উভয় পার্টির ওপরে কোনরকম সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে চান না।

একজিকিউটিভ কাউন্সিলে সদস্য মনোনয়ন সম্পর্কে

একজিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন সম্পর্কে এই মতবিরোধ আরো প্রকটিত হয়ে ওঠে যখন রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়া হয়ে যায়। একজি-কিউটিভ কাউন্সিল গঠনের বিষয়টি সাধারণভাবে গৃহীত হবার পরেই বিভিন্ন পার্টি কর্তৃক সদস্য মনোনয়নের প্রশ্ন ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেসের তরফ থেকে তার প্রেসিডেন্টের নামই কংগ্রেসী সদস্য তালিকায় শীর্ষস্থান পায়। আমরা জওহরলাল নেহরু এবং সর্দার প্যাটেলের নামও কংগ্রেসী সদস্য হিসেবে প্রস্তাব করি। অপর দুজন সদস্যের নাম সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘ আলোচনা হয় এবং অবশেষে আমরা এ বিষয়ে একটি ঐক্যমতেও আসি। আমি একজন পার্শী এবং একজন ভারতীয় খ্রীষ্টানকে কংগ্রেসী সদস্য হিসেবে মনোনীত করতে চাই।

এই দুটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে সদস্য নেবার জন্য কেন আমি চাপ দিয়েছিলাম সে সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আমরা যখন গ্রেপ্তার হই সেই সময় কয়েকটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে কংগ্রেসের বিরুদ্ধবাদী করে তোলবার জন্য ইংরেজ সরকার বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। এদের মধ্যে একটি ছিলো পার্শী সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়টি ক্ষুদ্র হলেও তার শিক্ষা, আর্থিক সচ্ছলতা এবং ক্ষমতার দিক থেকে ভারতের জাতীয় জীবনে এরা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। বোম্বাইতে যখন প্রথম কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিলো সেই সময় পার্শী সম্প্রদায়ের মিঃ নরীম্যানের প্রতি অবিচার করা

হয়েছিলো বলে আমি মনে করি। এছাড়া ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত কংগ্রেসের একটি সিদ্ধান্তও পার্শী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যায়। বোম্বাইতে যখন মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হয় তখন পার্শী সম্প্রদায়ের লোকেরাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মদের ব্যবসায়ে এরা প্রায় একচেটিয়া অধিকার ভোগ করতো; কিন্তু মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়ায় পার্শী মদ্যব্যবসায়ীদের এক কোটি টাকার বেশী লোকসান হয়। এইসব কারণেই হয়তো গভর্নমেণ্ট মনে করেছিলেন পার্শীরা কংগ্রেসের বিরোধিতা করতে এগিয়ে আসবে; কিন্তু সম্প্রদায় হিসেবে এরা গভর্নমেণ্টের হাতের পুতুল হতে অস্বীকার করে। পার্শী সম্প্রদায়ের সব নেতা এবং প্রায় সব বিশিষ্ট ব্যক্তি এক বিবৃতির মাধ্যমে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন, ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁরা অতীতে যেভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলেন ভবিষ্যতেও ঠিক সেইভাবেই কংগ্রেসের সঙ্গে থাকবেন।

আহম্মদনগর জেলে আমি যখন তাঁদের ওই বিবৃতি খবরের কাগজের মাধ্যমে দেখতে পাই তখন এঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হই। আমি তখন আমার সহকর্মীদের কাছে বলি, ওই বিবৃতি প্রচার করে পার্শীরা খুব ভালোভাবে ভারতের সেবা করেছেন। আমি আরো বলি, পার্শীদের এই মনোভাবের প্রতি আমরা অবশ্যই সকৃতজ্ঞ সমর্থন জ্ঞাপন করবো। লোকসংখ্যার দিক থেকে নগণ্য হলেও আমি মনে করি, স্বাধীন ভারতে তাঁদের স্থান হবে সর্বাগ্রে। এই কারণেই আমরা যখন একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যদের নামের তালিকা প্রণয়ন করতে বসেছিলাম তখন পার্শী সম্প্রদায় থেকে একজন সদস্য নেবার জন্য আমি বিশেষভাবে মত প্রকাশ করেছিলাম। আমার এই মনোভাব দেখে গান্ধীজীও খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু খুশি হলেও তিনি বলেন, কংগ্রেস যখন মাত্র পাঁচজন প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে, তখন পার্শীদের ভেতর থেকে কাউকে নেওয়া সম্ভব নয়। আমি তাতে সম্মত হতে পারিনি। আমি বলি, ভবিষ্যৎ যেখানে অনিশ্চিত, সেখানে বর্তমান সুযোগকে আমরা নষ্ট হতে দিতে পারি না। আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে একজন পার্শীকে আমরা অবশ্যই নেবো। দুদিন আলোচনার পরে অবশেষে আমার কথাটাই মেনে নেন সবাই।

ভারতীয় খ্রীষ্টানদের ভেতর থেকেও একজনকে আমি প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত করতে চাই। আমি জানতাম, শিখ এবং তপসিলী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি কাউন্সিলে আসবার সুযোগ পাবে কিন্তু কংগ্রেস যদি ভারতীয়

খ্রীষ্টানদের ভেতর থেকে কাউকে না নেয় তাহলে এই সম্প্রদায় থেকে কোনো লোক কাউন্সিলে আসবার সুযোগ পাবে না। এই প্রসঙ্গে আমার আরো মনে পড়ে, ভারতীয় খ্রীষ্টানরা সব সময়ই কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলেন এবং আছেন এবং রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে তাঁরা সব সময়ই কংগ্রেসের বক্তব্য ও কর্মধারাকে সমর্থন করে এসেছেন।

আমাদের আলোচনার ফলশ্রুতি শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ায়, কংগ্রেস কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধিদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা হয় মাত্র দুজন। এতেই প্রমাণ হয়, অবশ্য প্রমাণ যদি কেউ চায়, কংগ্রেস প্রকৃতই একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। হিন্দুদের ভেতর থেকে এতে আপত্তি ওঠা স্বাভাবিক ছিলো, কারণ হিন্দুরাই হলেন ভারতের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়। কিন্তু তাঁরা এ ব্যাপারে কোনোই আপত্তি তোলেননি। কংগ্রেস যখন তার পাঁচজন সদস্যের মধ্যে মুসলমান, খ্রীষ্টান এবং পার্শী সম্প্রদায় থেকে তিনজন এবং হিন্দুসম্প্রদায় থেকে মাত্র দুজন প্রতিনিধি মনোনীত করলো, তখন হিন্দুমহাসভা এই ব্যাপারটাকে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির মতলবে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলো। কিন্তু সবাই জানেন, মহাসভা এ ব্যাপারে কোনোই সুবিধে করতে পারেনি। তাদের চিৎকারে কেউ কানই দেননি। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, হিন্দুমহাসভার মতো মুসলিম লীগও কংগ্রেস কর্তৃক মুসলমান প্রতিনিধি মনোনয়নে আপত্তি জ্ঞাপন করলো।

আজ দশ বছর বাদে সেদিনের ঘটনাবলীর কথা বলতে গিয়ে মুসলিম লীগের অদ্ভুত মনোভাব এবং ততোধিক অদ্ভুত আচরণের কথা বার বার বিস্ময়ের সঙ্গে মনে পড়ছে। লর্ড ওয়াভেল সাময়িকভাবে যে তালিকা তৈরি করেছিলেন তাতে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের প্রতিনিধি ছাড়া আরো চারজন প্রতিনিধির নাম ছিলো। এই চারজনের মধ্যে একজন ছিলেন শিখ, দুজন তপসিলী সম্প্রদায়ের লোক এবং বাকি একজন ছিলেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী খিজির হায়াৎ খান। এই তালিকা দেখে মিঃ জিন্না প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে যান। তিনি তীব্রভাবে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলেন, মুসলিম লীগের মনোনীত প্রতিনিধি ছাড়া একজিকিউটিভ কাউন্সিলে অপর কোনো মুসলমান প্রতিনিধি থাকতে পারবে না। জিন্নার এই বক্তব্য শোনবার পর খিজির হায়াৎ খান আমার সঙ্গে দেখা করে এ ব্যাপারে কংগ্রেসের মনোভাব জানতে চান। আমি তাঁকে জানিয়ে দিই, তাঁর বিরুদ্ধে আমরা একটি কথাও বলবো না অথবা কোনোরকম আপত্তি তুলবো না। লর্ড ওয়াভেলকেও আমি এ সম্বন্ধে বলি, মিঃ জিন্নার বিরোধিতার জন্য সম্মেলন যদি ভেস্তে না যেতো তাহলে যে নতুন

একজিকিউটিভ কাউন্সিল গঠিত হতো তাতে মুসলমানরাই হতেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও কাউন্সিলের চোদ্দ-জন সদস্যের মধ্যে সাতজনই হতেন মুসলমান। এই ব্যাপারে একদিকে যেমন কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী মনোভাব আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে মুসলিম লীগের বোকামিও প্রকটিত হয়েছে। লীগ-নেতারা হামেসাই বলতেন, মুসলিম লীগই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা ভারতের মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা করছে, কিন্তু একজিকিউটিভ কাউন্সিলে সদস্য মনোনয়নের ব্যাপারে দেখা গেলো বৃহত্তর মুসলিম সমাজের স্বার্থ অপেক্ষা সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের দিকেই তাদের নজর বেশী। মুসলিম লীগের বিরোধিতার জন্যই নতুন গভর্নমেন্ট গঠিত হতে পারলো না, যে গভর্নমেন্টের একজিকিউটিভ কাউন্সিলে মুসলমান সদস্যই হতো সবচেয়ে বেশী।

কনফারেন্স শেষ হবার পরে আমি সংবাদপত্রের মাধ্যমে একটি বিবৃতি প্রচার করি। একটি সাংবাদিক সম্মেলনও আমি আহ্বান করি। সিমলা কনফারেন্সে কংগ্রেস যেসব অসুবিধের মুখোমুখি হয়েছিলো সেগুলো আমি সাংবাদিকদের কাছে ব্যাখ্যা করি। আমি বলি, কনফারেন্সের এই প্রস্তাব আমাদের কাছে হঠাৎ আসে। আমি এবং আমার সহকর্মীরা মুক্তিলাভ করি ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন। মুক্তির অব্যবহিত পরেই সিমলা কনফারেন্সে যোগ-দানের জন্য আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। সুতরাং এ ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করবার মতো যথেষ্ট সময় আমরা পাইনি। আমরা বুঝতে পারি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে এবং সেই পরিবর্তনের জন্যই ভারতের সমস্যাকে নতুন করে সমাধানের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভারত ও এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর স্বাধীনতার প্রশ্নও এই পরিবর্তনের জন্যই উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এ সব সম্বন্ধে ভালোভাবে বিচার-বিবেচনা করে দেখবার আগেই আমাকে সিমলা কনফারেন্সে যোগদান করতে হলো। কিন্তু এতো সব অসুবিধে সত্ত্বেও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করা হবে বলে ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়।

সাংবাদিকদের আমি বলি, সম্মেলন চলাকালে আমি সব সময়ই কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ওপরে জোর দিয়েছিলাম। ভাইসরয়কেও আমি বলেছিলাম, বর্তমান রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি আমাকে সর্বতোভাবে গভর্নমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করবার নির্দেশ দিয়েছেন।

আমি বলি, সিমলা কনফারেন্স যদি সাফল্যমণ্ডিত হতো তাহলে জাপানের বিরুদ্ধে ইংরেজদের যে যুদ্ধ চলছে তা শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো না, ভারতবর্ষও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো। এ ব্যাপারে ভারতবর্ষের একটা দায়িত্বও আছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো জাপানের কবল থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত ভারতবর্ষ জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তবে ওইসব দেশের স্বাধীনতা এই নয় যে, পূর্বতন ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার জন্য একজন ভারতীয় সৈনিকও যুদ্ধ করবে না অথবা একটি পাই-পয়সাও ভারত তার জন্য ব্যয় করবে না।

সাংবাদিকদের আমি আরো বলি, ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি যখন মূলগতভাবে স্থিরীকৃত হয় তখন কনফারেন্সে একজিকিউটিভ কাউন্সিলের গঠনপদ্ধতি এবং সদস্যসংখ্যা নিয়ে বিবেচনা শুরু হয়। এই সময় বিভিন্ন দলের মধ্যে ঘরোয়াভাবে আলোচনার দরুন সভার কাজ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাকে। কিন্তু সেই ঘরোয়া আলোচনায় কোনো ফলই হয় না। আলোচনার সময় মিঃ জিন্না দাবি করে বসেন, একজিকিউটিভ কাউন্সিলের মুসলমান সদস্যদের মনোনয়ন একমাত্র মুসলিম লীগই করবে; কংগ্রেস কোনো মুসলমান সদস্য মনোনীত করতে পারবে না'। কংগ্রেস এ দাবী কিছুতেই মেনে নিতে পারে না, কারণ এ দাবি মেনে নেবার অর্থ হলো কংগ্রেসের জাতীয় চরিত্রকে বিসর্জন দেওয়া। এটা শুধু সামান্য কটি আসনের ব্যাপারই নয়, এতে কংগ্রেসের মূল নীতিও জড়িত। মুসলিম লীগকে উপযুক্ত স্থান দিতে আমরা সব সময়ই আগ্রহান্বিত ছিলাম। কিন্তু মিঃ জিন্না এক অসহযোগী মনোভাব নিয়ে বসে রইলেন। তাঁর দাবি মেনে নেওয়া না হলে তিনি নামের তালিকা দিতেও অস্বীকৃত হলেন। পরিস্থিতির এইরকম পরিণতি দেখে ভাইসরয় আমাকে বলেন, মিঃ জিন্নাকে সহযোগিতার মনোভাব নেবার জন্য তিনি নানাভাবে চেষ্টা করেও তাঁর মত পরিবর্তন করতে পারেননি। তাঁর এক কথা, একজিকিউটিভ কাউন্সিলে মুসলমান সদস্য একমাত্র মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটিই মনোনীত করবে। তাঁর এই অযৌক্তিক দাবি ভাইসরয়ও মেনে নিতে পারেন না; তিনি তাই মনে করেন, এরপর সম্মেলন চালিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ নিরর্থক হবে।

এই সম্পর্কে আমি তখন যে বিবৃতি প্রচার করেছিলাম তা থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে:

বর্তমান পরিস্থিতিতে দুটি বিশেষ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়; একটি হলো মুসলিম লীগের একগুঁয়ে মনোভাবের জন্য সম্মেলন ভেস্তে যাওয়া এবং মুসলিম লীগ সরে দাঁড়ালেও ভাইসরয় এ ব্যাপারে এগিয়ে যাবেন কিনা। ভাইসরয় এ ব্যাপারে আর এগোবেন না বলে মনস্থ করেন। এই সম্পর্কে আমি সম্মেলনে যে কথা বলেছিলাম এখানে আর একবার তার পুনরুল্লেখ করছি। ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ইংলণ্ডের সরকারেরও দায়িত্ব আছে এবং সে দায়িত্ব তারা পরিহার করতে পারে না। আজই হোক বা কালই হোক, এ ব্যাপারে তাদের দৃঢ় এবং ন্যায়-সঙ্গত মনোভাব গ্রহণ করতেই হবে। এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। ইংরেজ সরকার যদি এইরকম সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে আবার আমরা এগিয়ে আসবো। যারা এগিয়ে যেতে চাইবে তাদের অবশ্যই এগিয়ে যেতে দিতে হবে এবং যারা অসহযোগিতার মনোভাব নিয়ে বাইরে থাকতে চাইবে তাদের বাইরেই রাখতে হবে। তবে দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ না করলে কোনো কিছুই করা সম্ভব হবে না। দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব এবং ভীত পদ-ক্ষেপ কখনোই আমাদের উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারবে না। প্রতিটি পদক্ষেপের আগেই আমাদের বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে; কিন্তু একবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে হবে—দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব শুধু দুর্বলতাই প্রকাশ করে।

সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের আমি বলি, সম্মেলনে কংগ্রেস যে মনোভাব গ্রহণ করেছিলো তার জন্য আমি মোটেই দুঃখিত নই। মিঃ জিন্নাকে খুশি করতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাঁর সেই অযৌক্তিক দাবি, অর্থাৎ মুসলিম লীগই ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় সংস্থা, এটা আমরা কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারিনি, যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেসব প্রদেশেও লীগ-মন্ত্রিসভা নেই। সীমান্ত প্রদেশে রয়েছে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা, সিন্ধুপ্রদেশে স্যার গোলাম হোসেনকে কংগ্রেসের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। আসামেও একই অবস্থা। অতএব মুসলিম লীগই যে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান এ দাবি ধোপে টেকে না। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় মুসলমানদের একটি বিরাট অংশ তখন মুসলিম লীগের আওতার বাইরে ছিলো।

এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করবার আগে আমি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু বলার দরকার বোধ করছি। উক্ত আন্দোলনের সময় কয়েকজন নতুন নেতা ও নেত্রী ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ওঁরা সবাই সেই সময়কার পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রেখে চলতেন। এঁদের মধ্যে শ্রীমতী আসফ আলীও ছিলেন। আমি আগেই বলেছি, ১৯৪২-এর ৯ই আগস্ট তিনি বোম্বাইয়ের রেল স্টেশনে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সেদিন তিনি বলেছিলেন তিনি চুপ করে বসে থাকবেন না। আমাদের গ্রেপ্তারের পরে তিনি উল্কার মতো ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছোটাছুটি করে ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশবাসীদের ক্ষেপিয়ে তুলে এমন এক প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলেন যার ফলে ইংরেজদের যুদ্ধপ্রচেষ্টা ভীষণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলো। ওই আন্দোলন পরিচালনার ব্যাপারে তিনি হিংসা ও অহিংসা নিয়ে মাথা ঘামাননি। প্রয়োজনের তাগিদে তিনি যে-কোনো পন্থাই গ্রহণ করেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর কার্যকলাপ সম্বন্ধে সরকার সজাগ হয়ে ওঠে। তারা তখন শ্রীমতী আসফ আলীকে গ্রেপ্তার করবার জন্য সচেষ্ট হয়। কিন্তু তিনি এমনভাবে আত্মগোপন করে আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন যার ফলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই সময় বহু-সংখ্যক ভারতবাসী তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। সাহায্যকারীদের মধ্যে সরকারী কর্মচারী এবং শিল্পপতির সংখ্যাও কম ছিলো না। এঁরা সরকারের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও শ্রীমতী আসফ আলীকে সাহায্য করেছিলেন। বোম্বাই এবং কলকাতার কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যবসায়ীও তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। এমন কি সময় সময় তিনি ভারতীয় আই. সি. এস. এবং উচ্চ-পদস্থ সামরিক কর্মচারীদের গৃহেও আত্মগোপন করে বাস করেছিলেন। নিজের প্রয়োজনের জন্য অর্থসংগ্রহ করতেও তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। আমরা যতোদিন জেলখানায় বন্দী ছিলাম ততোদিন তিনি এইভাবেই তাঁর কার্য-কলাপ চালিয়ে গিয়েছিলেন।

১৯৪৩ সালে আমি মুক্তিলাভ করবার অব্যবহিত পরেই তিনি কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন। আমি তাঁর সম্বন্ধে লর্ড ওয়াভেলকে বললে তিনি আমাকে কথা দেন শ্রীমতী আসফ আলীর পূর্বতন কার্যকলাপের জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে না। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, ভবিষ্যতে কী হবে? আমি লর্ড ওয়াভেলকে বলি, বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তিত হবার ফলে শ্রীমতী আসফ আলী আর কোনোরকম গোপন আন্দোলন করবেন না।

এরপর আমি যখন বুঝতে পারি তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে না, তখন আমি তাঁকে আত্মপ্রকাশ করতে বলি। আমার কথায় তিনি ১৯৪৫-এর শেষদিকে আত্মপ্রকাশ করেন।

তাঁর কার্যকলাপ সরকারী মহলে এমনই সুপরিচিত হয়ে পড়েছিলো যে ভাইসরয়ও রীতিমতো চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন। একবার একটি বক্তৃতায় তিনি শ্রীমতী আসফ আলীর সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে কংগ্রেসের অহিংসনীতির প্রতিও সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ওয়ার্কিং কমিটির একজন সদস্যের স্ত্রী যেখানে হিংসপদ্ধতি গ্রহণ করে মারমুখী আন্দোলন চালাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের অহিংস-নীতি সম্বন্ধে বিশ্বাস রাখা কঠিন। আমরা আহম্মদনগর দুর্গে বন্দী থাকাকালে যখন এইসব কথা জানতে পারি তখন আসফ আলী তাঁর নিজের বন্দীদশার জন্য চিন্তিত না হলেও তাঁর স্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য রীতিমতো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আমি তাঁকে তখন এই বলে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করি, এজন্য তাঁর চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। আমার কথার উত্তরে আসফ আলী বলেন, তাঁর স্ত্রী যেরকম অসমসাহসিকতার পরিচয় দিচ্ছেন তার জন্য তিনি গর্ববোধ করছেন।

সাধারণ নির্বাচন

সিমলা কনফারেন্সের পরে ডাক্তাররা আমাকে বায়ু-পরিবর্তনের জন্য কাশ্মীরে যেতে বলেন। আমার শরীরের অবস্থা তখন এতোই খারাপ হয়ে পড়েছিলো যে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসেবে যেসব সাধারণ কাজকর্ম করতে হয়, তা করাও আমার পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে। জওহরলালেরও বায়ু-পরিবর্তনের দরকার হয়ে পড়েছিলো। আমি কাশ্মীরে যাবো শুনে তিনিও আমার সঙ্গে যাবেন বলে মনস্থ করেন। জুলাই এবং আগস্ট মাস আমি গুলমার্গে থাকি। এই সময় আমি জানতে পারি, ইংলণ্ডের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিকদল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে নির্বাচনে জয়ী হয়েছে। এই খবর জানবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি মিঃ অ্যাটলি এবং স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের কাছে টেলিগ্রামে অভিনন্দনবার্তা প্রেরণ করি। টেলিগ্রামে আমি আশা প্রকাশ করি, এবার যখন শ্রমিকদল ক্ষমতায় এলেন তখন তাঁরা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁদের প্রতিশ্রুতিসমূহ কার্যকর করবেন। আমার টেলিগ্রামের উত্তরে মিঃ অ্যাটলি জানান, ভারতের সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধান করতে শ্রমিকদল অবশ্যই

তাঁদের যথাসাধ্য করবেন। ক্রিপস তাঁর টেলিগ্রামে আশা প্রকাশ করেন, ভারতকে এবার আর হতাশ হতে হবে না। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার, ব্রিটিশ নেতাদের সঙ্গে আমার এইসব টেলিগ্রামের আদান-প্রদান গান্ধীজী এবং জওহরলাল পছন্দ করেননি। ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ শ্রমিক-দলের মনোভাবকে তাঁরা সুনজরে দেখতেন না। আমি কিন্তু বিশ্বাস করতাম, শ্রমিকদল ভারতবর্ষ সম্পর্কে নতুনভাবে এবং নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিবেচনা করবেন এবং তার ফলাফল ভারতের পক্ষে শুভ হবে।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই ভাইসরয় ঘোষণা করেন, আগামী শীত-কালেই ভারতবর্ষে এক সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তাঁর এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ওয়ার্কিং কমিটির এবং এ. আই. সি. সি.র সভা আহ্বান করার দরকার হয়ে পড়ে। সিমলা কনফারেন্স ভেস্তে যাবার ফলে কংগ্রেস এবার কী মনোভাব গ্রহণ করবে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। কংগ্রেসের মধ্যে কিছু-সংখ্যক লোক নতুন করে আন্দোলন শুরু করবার কথা বলছিলেন : আর একদলের অভিমত ছিলো, আন্দোলন শুরু হোক বা না হোক, ভারতের আসন্ন নির্বাচন বয়কট করতেই হবে। আমি কিন্তু এই উভয় মতামতের কোনোটাকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতাম না। আমার মতে সিমলা কনফারেন্স ইংরেজদের দোষে ভেস্তে যায়নি ; কনফারেন্স ভেস্তে গেছে সাম্প্রদায়িক কারণে, রাজনৈতিক কারণে নয়।

হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা নিক্ষেপ

আমি তখন গুলমার্গে। এই সময় পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটি ঘটনা ঘটে যেরকম ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। ঘটনাটি হলো আমেরিকানদের দ্বারা জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকির ওপরে অ্যাটম বোমা নিক্ষেপ। এই বোমা ব্যবহারের আগে সাধারণভাবে মনে করা হতো, জাপানের প্রতিরোধ-ক্ষমতা চূর্ণ করতে হলে কমপক্ষে দু বছর সময় লাগবে। কিন্তু হিরোসিমা এবং নাগাসাকির ঘটনার পরে ঘটনার গতি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই ভয়াবহ অস্ত্রের মোকাবিলা করবার মতো কোনো শক্তিই জাপানের ছিলো না। তাই তারা নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ইয়োরোপের যুদ্ধ আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিলো। এবার জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধও শেষ হয়ে গেলো।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমেরিকান সেনাবাহিনী জাপানের মাটিতে পদার্পণ করে টোকিও অধিকার করে নিলো। জেনারেল ম্যাকআর্থার জাপানের শাসনকর্তা হয়ে বসলেন।

আমি এখনো মনে করি, আগে থেকে কোনোরকম সাবধানবাণী প্রচার না করে অ্যাটম বোমা ব্যবহার করা উচিত হয়নি। এই বোমা এমনই মারাত্মক অস্ত্র যা শুধু সেনাবাহিনীকেই ধ্বংস করে না, এটা অসামরিক জনসাধারণকেও নিশ্চিহ্ন করে। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যৎ বংশধরগণও এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানরা যখন মিত্রপক্ষের ওপরে বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ করেছিলো তখন সারা পৃথিবী প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলো। জার্মানরা তখন অমানুষিক অপরাধে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হয়েছিলো, কিন্তু আমেরিকানদের বেলায় তা না হবার কোনো কারণ থাকতে পারে কি? আমি মনে করি, এই মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করায় মিত্রপক্ষের সুনাম এবং বীরত্বকে যথেষ্ট রকমে ক্ষুণ্ণ করেছে। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করি, এই অমানুষিক কাজকে মিত্রপক্ষ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা এবং বিরাট জয় বলে দাবী করেছিলেন এবং এর বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রতিবাদও কোথাও উত্থিত হয়নি।

আমার স্বাস্থ্য তখনো খুবই খারাপ। কাশ্মীরে জুলাই আর আগস্ট মাস মোটেই স্বাস্থ্যকর নয় এবং এই কারণেই আমার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হয়নি; কিন্তু সেপ্টেম্বর মাস পড়তেই আমার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। আমার খিদে বেড়ে যায় এবং আমি ব্যায়াম করতেও সক্ষম হই। আমি যদি আর একটা মাস ওখানে থাকতে পারতাম তাহলে আমি সম্পূর্ণভাবে আমার হৃতস্বাস্থ্য ফিরে পেতাম। কিন্তু ঘটনাচক্রের পরিপ্রেক্ষিতে আমি কাশ্মীর থেকে চলে আসতে বাধ্য হই। ওয়ার্কিং কমিটি এবং এ. আই. সি. সি. আমার উপস্থিতি দাবী করছিলো। ফলে আমি যখন সমতলভূমিতে নেমে এলাম তখন আমার স্বাস্থ্য আবার খারাপ হয়ে পড়লো।

সে সময় কাশ্মীর এবং ভারতের অন্যান্য অংশের মধ্যে বিমান চলাচলের ব্যবস্থা ছিলো না। কাশ্মীরে যেতে হলে তখন সুদীর্ঘ এবং দুর্গম পার্বত্যপথ মোটরে করে পাড়ি দিতে হতো। তবে, আমেরিকান মিলিটারী অফিসাররা প্রায়ই বিমানে করে কাশ্মীরে যেতেন। ওঁরা কাশ্মীরে যেতেন বিশ্রাম নেবার এবং আনন্দ উপভোগ করবার জন্য। প্রতি দু সপ্তাহ অন্তর একদল অফিসার বিমানে করে শ্রীনগরে যেতেন। ওঁদের মধ্যে কেউ কেউ

আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তাঁরা যখন শুনতে পেলেন আমি দিল্লীতে ফিরে যাচ্ছি, তখন আমাকে তাঁরা একটি বিশেষ বিমান দিতে চাইলেন। তাঁদের দেওয়া বিমানে করেই আমি ১০ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে আসি এবং সেখানে এসেই সোজা রওনা হই পুনার উদ্দেশে। ১৪ই সেপ্টেম্বর পুনায় ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসে এবং পরবর্তী সভা বোম্বাইতে হবে বলে স্থির হয়। ওয়ার্কিং কমিটিতে এবং এ. আই. সি. সি-র মিটিংয়ে আমাদের নতুন কর্মপন্থা সম্বন্ধে উত্তপ্ত আলোচনা হয়। গান্ধীজী সহ বেশিরভাগ সদস্য গঠনমূলক কাজ করার কথা বলেন। তাঁদের মতে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কোনো সুযোগ নেই।

ব্রিটেনে শ্রমিক সরকার গঠিত হওয়ায় সেখানে একটা যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে এ কথাটা আমিও বিশ্বাস করি। শ্রমিকদল সব সময়ই ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলো। তাদের সেই মনোভাবকে এবার যাতে তারা সরকারী-ভাবে প্রকাশ করতে পারে তার জন্য তাদের সুযোগ দেওয়া দরকার। আমি তাই দৃঢ়ভাবে মনে করি, এই সময় কোনোরকম আন্দোলন আরম্ভ না করে সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাই আমাদের উচিত হবে। আমি আরো বলি, সিমলা কনফারেন্সে ভারতের সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষভাবেই চেষ্টা করা হয়েছে। কনফারেন্স যদিও এ ব্যাপারে কৃতকার্য হতে পারেনি, তবুও লর্ড ওয়াভেল আন্তরিকভাবেই ভারতের সমস্যা সমাধান করতে চেয়েছিলেন। এবার শ্রমিকদল ক্ষমতায় আসার ফলে আরো সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। অনেক আলোচনার পর অবশেষে আমার অভিমতই মেনে নেওয়া হয়।

বন্দী-মুক্তির আদেশ

আমি মনে করি, বন্দীমুক্তির প্রশ্নটা এবার উত্থাপন করা দরকার: ভারত সরকার ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তি দিলেও হাজার হাজার সাধারণ সদস্য তখনো কারাগারে বন্দী ছিলো। সিমলা কনফারেন্সের সময় আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে সে বিষয়টা আমার কাছে তেমন স্পষ্ট ছিলো না। এবং এই কারণেই বন্দী-মুক্তির প্রশ্নটি তখন আমি তুলিনি।

কনফারেন্সের পরে দুটি বিশেষ ঘটনা সমগ্র পরিস্থিতিকে পরিবর্তিত করে দেয়। প্রথম ঘটনা হলো ব্রিটেনে শ্রমিকদলের বিরাট জয় এবং দ্বিতীয়

ঘটনা হলো অ্যাটম বোমা নিক্ষেপের ফলে যুদ্ধের অবসান। এর ফলে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় এই উভয় ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক চিত্র অনেকটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমি মনে করি, এই অবস্থায় আমাদের দ্বৈত-ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত। প্রথমত আমরা ভারতবাসীর সংগ্রামী মনোভাবকে জাগরিত রাখতে পারবো, এবং দ্বিতীয়ত এই সময় কোনোরকম আন্দোলন করা থেকে আমরা বিরত থাকবো।

আমি যা ভেবেছিলাম সেইভাবেই ঘটনার গতি এগোতে থাকে। যুদ্ধ শেষ হবার কয়েকদিন পরেই লর্ড ওয়াভেল ভারতে সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা-বাণী শুনতে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হয়, এবার হয়তো বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে। ভারতের জনসাধারণ এবং গভর্নমেন্ট উভয়ের স্বার্থেই এটা দরকার। বন্দীরা পাঁচ বছর যাবৎ জেলে রয়েছেন। আরো কিছুদিন থাকতেও তাঁদের আপত্তি হবে না। তাঁদের এই সুদীর্ঘ বন্দীদশা ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের বিশেষ কোনো ক্ষতি করতে না পারলেও সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে এতে এক বিরাট অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং সরকার যদি নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে চান তাহলে তাঁদের এখন সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিতেই হবে।

লর্ড ওয়াভেল এক তারবার্তায় আমাকে জানিয়ে দেন আমার প্রস্তাব তিনি মেনে নিয়েছেন এবং শীঘ্রই রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির আদেশ জারি করছেন। কিন্তু তিনি ব্যাপকভাবে বন্দী-মুক্তির আদেশ জারি করেন না। ফলে বেশির ভাগ কংগ্রেস সদস্য মুক্তি পেলেও বামপন্থী মনোভাবাপন্ন কিছু-সংখ্যক সদস্য তখনো জেলে রয়ে গেলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামানন্দন মিশ্র এবং আরো কয়েকজন এঁদের মধ্যে ছিলেন।

আমার প্রস্তাবের এইরকম পরিণতি দেখে আমি খুশি হতে পারিনি। সামান্য কয়েকজন বামপন্থী সদস্যকে মুক্তি না দেবার কারণ আমার বোধগম্য হয় না। ভারত সরকার এঁদের ওপরে সন্দেহ পোষণ করতেন। কিন্তু তাঁদের হাতে এমন কোনো প্রমাণ ছিলো না যে ওইসব সদস্য অন্যান্য কংগ্রেসী সদস্য অপেক্ষা 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনে ভিন্নতর পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। এ. আই. সি. সি.র বোম্বাই অধিবেশনের পরে সেপ্টেম্বর মাসে আমি লর্ড ওয়াভেলকে এক দীর্ঘ পত্র লিখি।

আমি তাঁকে জানিয়ে দিই, কয়েকজন সদস্যকে মুক্তি না দেবার ফলে দেশের মধ্যে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। লর্ড ওয়াভেল যদি একটি

নতুন রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চান তাহলে তাঁকে সাধারণ বন্দী-মুক্তি (general amnesty) মেনে নিতে হবে। লর্ড ওয়াভেল শেষ পর্যন্ত আমার প্রস্তাব মেনে নেন এবং সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিতে সম্মত হন।

এ. আই. সি. সি. সিদ্ধান্ত নেয়, কংগ্রেস একটি নির্বাচনী ইস্তাহার প্রচার করবে। সিদ্ধান্তে আরো বলা হয়, ওয়ার্কিং কমিটি ওই ইস্তাহারের খসড়া তৈরি করে অনুমোদনের জন্য তাঁদের কাছে পেশ করবেন। ওয়ার্কিং কমিটিকে কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটির তরফ থেকে একটি প্রাথমিক ইস্তাহার প্রচার করবার জন্যও বলা হয়। সাধারণ নির্বাচনের দিন নিকটবর্তী হবার ফলে এ. আই. সি. সি. কর্তৃক কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার নিয়ে বিচার-বিবেচনার মতো সময় আর ছিলো না ; তাই এ. আই. সি. সি.র সভা আহ্বান না করে ওয়ার্কিং কমিটি তার নিজ ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত ইস্তাহাটি প্রচার করে :

ওয়ার্কিং কমিটির ইস্তাহার

সুদীর্ঘ ষাট বৎসর যাবৎ জাতীয় কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে এসেছে। এবং তার এই বহু বৎসরের ইতিহাস জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে পরিণত হয়েছে, অর্থাৎ পরাধীনতার শৃঙ্খল হতে দেশকে মুক্ত করার সংগ্রামী ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। অতিসামান্য প্রারম্ভিক সূচনা থেকে ধাপে ধাপে প্রগতির পথে অগ্রসর হয়ে এই প্রতিষ্ঠান এক সুমহান জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং এই বিরাট দেশের প্রতিটি শহর এবং সুদূর পল্লীগ্রামের মানুষদের কাছেও স্বাধীনতার অমৃতবাণী পৌঁছে দিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত গণশক্তিতে শক্তিমান হয়ে কংগ্রেস এক বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে দেশের অগণিত নরনারী কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হয়ে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে এবং এখনো সেই সংগ্রামী ঐতিহ্যকে বজায় রেখেছে। এই সংগ্রামের সামিল হয়ে তারা অশেষ দুঃখ ও নির্যাতন সহ্য করেছে। এই সংগ্রামে বহুসংখ্যক নরনারী আত্মাহুতিও দিয়েছে। স্বাধীনতার জন্য জনগণের এই দুঃখভোগ এবং জাতির অবমাননার বিরুদ্ধে তাদের দৃঢ় মনোভাবের কল্যাণে কংগ্রেস বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

কংগ্রেসের ঐতিহ্য একাধারে জনগণের কল্যাণের জন্য গঠনমূলক কাজ এবং স্বাধীনতার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। এই সংগ্রামের জন্য কংগ্রেসকে বহুবার বহুবিধ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং অস্ত্রবলে বলীয়ান এক বিরাট শক্তিশালী সাম্রাজ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছে। কিন্তু শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি অনুসরণ করে কংগ্রেস এই বিপজ্জাল থেকে আত্মরক্ষা করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন শক্তি সংগ্রহ করে নববলে বলীয়ান হয়ে উঠেছে। বিগত তিন বৎসরের অভাবনীয় গণজাগরণ এবং সেই গণজাগরণ দমনে শাসকশ্রেণীর নিষ্ঠুরতম পীড়ন কংগ্রেসকে আরো শক্তিশালী এবং আরো বেশী জনপ্রিয় করে তুলেছে।

কংগ্রেস নরনারী-নির্বিশেষে ভারতের প্রতিটি নাগরিকের সম অধিকার স্বীকার করে সকল সম্প্রদায় এবং সকল প্রকার ধর্মীয় দলভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য তাদের শুভ-বুদ্ধি জাগ্রত করবার কাজে আত্ম-নিয়োগ করেছে। ভারতের জনসাধারণ যাতে পরিপূর্ণ সুযোগ পেয়ে তাদের নিজ নিজ ইচ্ছা অনুসারে উন্নত হতে পারে এবং প্রতিটি সম্প্রদায় ও প্রতিটি অঞ্চল যাতে একজাতি একপ্রাণ হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করে সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই কংগ্রেস তার কাজ করে চলেছে। এই উদ্দেশ্যকে সফল করবার জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল এবং বিভিন্ন প্রদেশকে ভাষা এবং কৃষ্টির ভিত্তিতে পুনর্গঠন করতে হবে। সামাজিক অত্যাচার এবং নানাবিধ অবিচারের ফলে যেসব লোক অবিরত নির্যাতিত হচ্ছে, কংগ্রেস তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে সমস্ত রকম অত্যাচার ও অবিচারের অবসান ঘটিয়ে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে সৌভ্রাত্র স্থাপনের জন্য চেষ্টা করছে।

কংগ্রেস এমন এক স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করতে চায়, যে রাষ্ট্রের সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকার এবং নাগরিক ও পৌর স্বাধীনতা বিধিবদ্ধ থাকবে। কংগ্রেস আরো মনে করে, এই সংবিধান কেন্দ্রীয় ফেডারেল গভর্নমেন্টের ভিত্তিতে রচিত হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রদেশের অথবা রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থাকবে, রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নকারী সংস্থাগুলোও প্রাপ্তবয়স্কের অবাধ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হবে।

দেড় শতাধিক বৎসরের পরাধীনতার ফলে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে এবং এমন সব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, যেগুলোর আশু সমাধানের প্রয়োজন।

অমানুষিক শোষণের ফলে দেশ এবং জাতি আজ দুঃখ দৈন্য এবং অনাহারের মুখে উপনীত হয়েছে। বৈদেশিক প্রভুত্বের ফলে দেশ যে শুধু রাজনৈতিকভাবে পরাধীন হয়ে অবমাননা সহ্য করছে তাই নয়, সামাজিক, আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও দেশ এবং জাতি আজ পশ্চাৎপদ হয়ে পড়েছে। যুদ্ধের সময় এবং এমন কি এখনো সেই শোষণ সমভাবেই চলছে। এ ব্যাপারে শাসক সম্প্রদায় ভারতের স্বার্থকে এমনভাবে পদদলিত করে জনগণের বুকের ওপর দিয়ে নির্দয় শাসন ও শোষণের রথচক্র চালিয়ে দিয়েছে যার ফলে সমগ্র দেশ আজ এক মহা মন্বন্তরের সম্মুখীন হয়েছে এবং জনসাধারণ অশেষ দুঃখ ও ক্লেশ ভোগ করছে। সুতরাং কংগ্রেস যে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে সে স্বাধীনতা শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাই নয়, সেটি আর্থনীতিক ও সামাজিক স্বাধীনতাও বটে।

বর্তমানে ভারতের সর্বপ্রধান সমস্যা হলো দেশ থেকে দারিদ্র্যকে বিদূরিত করে জনসাধারণের জীবনধারণের মান উন্নত করা। এবং এই উদ্দেশ্যেই কংগ্রেস এ ব্যাপারে বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়ে গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এর জন্য শিল্প এবং কৃষিকে আধুনিকভাবে উন্নত করতে হবে এবং সামাজিক অগ্রগতি ও জনগণের উন্নয়নমূলক কাজগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে এমনভাবে দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করতে হবে যাতে অপরের ওপরে নির্ভরশীল না হয়ে দেশ এবং জাতি দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে। এই কর্মসূচীকে রূপায়িত করবার জন্য বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে এমনভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যাতে সামাজিক উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি না হতে পারে এবং যাতে দেশের আর্থনীতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করে বেকারী ও কর্মহীনতা দূর করতে পারা যায়। দেশের ধনসম্পদ এবং ক্ষমতা যাতে মুষ্টিমেয় কায়েমী-স্বার্থবাদীর করায়ত্ত হতে না পারে, অর্থাৎ খনিজ সম্পদ, পরিবহন ব্যবস্থা এবং কৃষিজ, শিল্পজ ও অন্যান্য উৎপাদন ব্যবস্থা যাতে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির করায়ত্ত না হয় পরিকল্পনাকে সেইভাবে রূপ দিতে হবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হলো স্বাধীন জাতিসমূহের এক বিশ্বফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা। যতোদিন পর্যন্ত বিশ্বে এই অবস্থার সৃষ্টি না হবে, ততোদিন ভারত সর্বদেশের ও সর্বজাতির প্রতি বন্ধুত্ব এবং সৌভ্রাত্রের নীতি মান্য করে চলবে। দূর প্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে ভারতবর্ষ সহস্র সহস্র বৎসর বাণিজ্যিক ও

সাংস্কৃতিক সূত্রে আবদ্ধ ছিলো, স্বাধীনতা অর্জনের পরে ভারত আবার ওই সকল দেশের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক সৃষ্টি করবে। সামগ্রিক নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ বাণিজ্যের প্রসারের জন্যও এইসব দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া দরকার। ভারত তার নিজস্ব অহিংস পদ্ধতিতে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। বিশ্বশান্তি এবং বিশ্বের জনগণের সহযোগিতার জন্যও ভারত সব সময় এই নীতিই অনুসরণ করে চলবে। অন্যান্য পরাধীন জাতিসমূহের স্বাধীনতার জন্যও ভারত সর্বউপায়ে তাদের সাহায্য করবে, কারণ, সে জানে যে সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে এইসব দেশ মুক্তিলাভ না করলে বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগস্ট নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটি যে প্রস্তাব পাস করেছিলো তা ভারতের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। সেই দাবিতে কংগ্রেস এখনো অবিচল রয়েছে এবং সেই দাবিকেই এখনো তার দাবি হিসেবে ব্যক্ত করছে। সেই দাবি এবং সেদিনের সেই রণহুঙ্কার (Battle-cry) পুনর্বার ব্যক্ত করে কংগ্রেস এবার কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইন-সভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চলেছে।

কেন্দ্রীয় আইনসভা একটি ক্ষমতাহীন বাকসর্বস্ব সংস্থা। এর একমাত্র কাজ হলো উপদেশ (advice) দেওয়া, তবে সে উপদেশ অনুসারে কাজ হবে কি হবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই অকার্যকরী সংস্থাটির লোক-দেখানো যে সামান্যতম গণতান্ত্রিক কাঠামো দেখানো হয়েছে তা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। এর জন্য যে নির্বাচনী ব্যবস্থা রয়েছে তাও অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। এইসব ভুলত্রুটি সংশোধনেরও কোনো ব্যবস্থা নেই। বিরাট-সংখ্যক ভারতবাসী এখনো কারাগারে বন্দীজীবন যাপন করছে। যাঁরা মুক্তিলাভ করেছে তাদেরও ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। জনসভা অনুষ্ঠান করবার ওপরে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিলো সে নিষেধাজ্ঞা এখনো বহু জায়গায় বলবৎ আছে। এই সকল বাধা এবং অসুবিধে সত্ত্বেও কংগ্রেস নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার কারণ হলো, কংগ্রেস বিশ্ববাসীকে দেখাতে চায় স্বাধীনতার প্রশ্নে দেশ এবং দেশবাসী কংগ্রেসের পেছনেই রয়েছে। সুতরাং এই নির্বাচনে সমস্ত রকম ছোটখাটো বিষয় বাদ দিয়ে একমাত্র স্বাধীনতার দাবি নিয়েই কংগ্রেস নির্বাচনে দাঁড়াবে বলে স্থির করেছে।

কংগ্রেস তাই সারা ভারতে ভোটারদের কাছে এই আবেদন করছে,

কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনে তাঁরা যেন ঐক্যবদ্ধভাবে কংগ্রেসের পেছনে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়যুক্ত করেন। ভারতবাসী বহুবার স্বাধীনতার জন্য তাদের দৃঢ়সঙ্কল্পের কথা ব্যক্ত করেছে, সেই সঙ্কল্প এবারও গ্রহণ করতে হবে আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেসকে সমর্থন করে। তবে একথাও মনে রাখতে হবে, এই নির্বাচনের দ্বারা স্বাধীনতা পাওয়া যাবে না। শীগগিরিই এমন সময় আসছে যখন স্বাধীনতার জন্য নির্বাচনের পন্থা বাদ দিয়ে আমাদের ভিন্নতর পথে পদক্ষেপ করতে হবে। এই নির্বাচন আমাদের কাছে একটি ক্ষুদ্র পরীক্ষারূপে উপস্থিত হয়েছে, যে পরীক্ষা বৃহত্তর ভবিষ্যতেরই সূচনামাত্র। সুতরাং স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সংকল্পবদ্ধ তাঁরা যেন এই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হবার জন্য পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে অগ্রসর হন।

সাধারণভাবে যা আশা করা গিয়েছিলো নির্বাচনের শেষে তাই সঠিক বলে প্রমাণিত হলো। বাংলা, পাঞ্জাব এবং সিন্ধুপ্রদেশ বাদে অন্যান্য সব প্রদেশেই কংগ্রেস সর্ববৃহৎ একক দল হিসাবে অর্ধেকেরও বেশী আসনে জয়ী হলো। পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট পার্টি এবং মুসলিম লীগ প্রায় সমান-সংখ্যক আসন অধিকার করেছে। সিন্ধুপ্রদেশে মুসলিম লীগ বহুসংখ্যক আসন লাভ করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারেনি। একমাত্র বাংলাদেশেই (তৎকালীন অবিভক্ত বাংলা) মুসলিম লীগ অর্ধেকের বেশী আসন অধিকার করতে সক্ষম হয়েছে। এই তিনটি প্রদেশেই মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। মুসলিম লীগ ওইসব প্রদেশে সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মের জিগির তুলে নির্বাচনে জয়লাভ করতে চেয়েছিলো। লীগের এই সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় জিগিরের ফলে কংগ্রেসের মুসলমান প্রার্থীদের খুবই অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়। এমনও দেখা যায় তাঁরা জনসভা করতেও পারেননি। সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত আবহাওয়া এমনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো যে মুসলমান জনসাধারণ কংগ্রেসের মুসলমান প্রার্থীদের বক্তব্যও শুনতে চাননি অনেক জায়গায়। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলমানরা বিরাটভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে লীগ মোটেই সুবিধে করতে পারেনি। কংগ্রেসই ওখানে গভর্নমেন্ট গঠন করে।

এবারে ভারতের সেই সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা আর একবার উল্লেখ করছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন কমিউনিস্টরা বেশ একটু বে-কায়দায় পড়ে গিয়েছিলো। হিটলার এবং স্টালিনের মধ্যে

অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার ফলেই ওরা ওইরকম বে-কায়দায় পড়ে গিয়েছিলো। এই চুক্তি সাক্ষরিত হবার আগে পর্যন্ত কমিউনিস্টরা হিটলারের শ্রাদ্ধ করে চলেছিলো এবং কথায় কথায় নাৎসীবাদকে বরবাদ করে চলে-ছিলো। ভারতের কমিউনিস্টরা অন্তরে অন্তরে বুঝতে পারছিলো, হিটলারের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করে স্টালিন একটা বিরাট রকমের অপকর্ম করে ফেলেছেন। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কমিউনিস্টদের মতো তাদেরও এর বিরুদ্ধে কথা বলবার সাহস ছিলো না। ওরা তাই বিষয়টাকে এই বলে চাপা দেবার চেষ্টা করছিলো যে এর ফলে নাকি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রসারকে বন্ধ করা সম্ভব হয়েছিলো। মহা অসুবিধেয় পড়ে ওরা এমন কথাও বলছিলো, হিটলার নাকি ততোটা বদলোক নয়। এইরকম অসুবিধেজনক অবস্থায় পড়ে ইংরেজকে তারা কোনো সাহায্য করতে পারছিলো না ; শুধু তাই নয়, ভারতের নিরপেক্ষ নীতিকেও তারা তখন প্রবলভাবে সমর্থন করতে শুরু করেছিলো। কিন্তু এরপর হিটলার যখন রাশিয়া আক্রমণ করে বসলো তখন কমিউনিস্টরা হঠাৎ একেবারে ভোল পাল্টে ফেললো। ওরা তখন যুদ্ধটাকে 'জনযুদ্ধ' বলে আখ্যাত করে পরিপূর্ণভাবে ইংরেজদের সমর্থন করতে শুরু করলো। ভারতে তারা প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধের প্রচারকার্যেও সহায়তা করতে লাগলো। মিঃ এম. এন. রায় ইংরেজদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে প্রকাশ্যভাবেই যুদ্ধের পক্ষে প্রচার করতে লাগলেন। কমিউনিস্টরাও নানাভাবে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে সাহায্য পেতে লাগলো। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা যুদ্ধের পক্ষে প্রচারের কাজে গভর্নমেন্টকে সহায়তা করছিলো বলে তাদের পার্টির ওপরে যে নিষেধাজ্ঞা ছিলো সেই নিষেধাজ্ঞাও গভর্নমেন্ট তুলে নিলেন।

অপরপক্ষে কংগ্রেস তখন 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু করে। এর ফলে বিপুল সংখ্যক কংগ্রেসী সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু কমিউনিস্টদের বেলায় অন্যরকম দেখা যায়। আগে যেসব কমিউনিস্টকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো অথবা কমিউনিস্ট পার্টির যেসব সদস্য আত্মগোপন করে অবস্থান করছিলো তারা সবাই বেরিয়ে এসে তাদের দলীয় স্বার্থে কাজ করতে শুরু করলো। এরপর সিমলা কনফারেন্সের পরে যখন কংগ্রেস সদস্যরা মুক্তিলাভ করলো তখন কমিউনিস্টরা তাদের পরবর্তী কর্মসূচী ঠিক করতে না পেরে কংগ্রেসের পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যে দেশাত্মবোধের প্রসার

এই সময় আর একটি নতুন জিনিস দেখা গেলো। এটা হলো সরকারী কর্মচারীদের মনোভাবের পরিববর্তন। যুদ্ধের সময় প্রতিরক্ষা বিভাগ বিরাট-সংখ্যক ভারতীয় যুবককে সেনা-বিভাগে নিযুক্ত করেছিলো। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে এদের সংগ্রহ করা হয়েছিলো। আগের দিনে ভারতের কয়েকটি মাত্র বিশেষ সম্প্রদায় থেকে ইংরেজরা সৈনিক সংগ্রহ করতেন, কিন্তু এবারের যুদ্ধে প্রয়োজনের তাগিদ অত্যন্ত বেশী হওয়ায় আগের দিনের সেই বাদ-বিচার তুলে দেওয়া হয়। ভারতীয় যুবকদের বলা হয়েছিলো যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। ইংরেজের এই কথায় বিশ্বাস করেই ভারতীয় যুবকরা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো। এবং এই বিশ্বাসের ফলেই তারা যুদ্ধের সময় প্রাণ তুচ্ছ করে যুদ্ধের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলো। এবার যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ায় ওরা আশা করলো ভারত এবার স্বাধীন হবে।

সশস্ত্রবাহিনীর তিনটি শাখা, অর্থাৎ নৌবাহিনী, স্থলবাহিনী এবং বিমান-বাহিনী। এই তিন শাখাই দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হয়েছে তখন। তাঁদের এই দেশাত্মবোধ এমন পর্যায়ে এসেছিলো যে কোনো কংগ্রেস নেতাকে দেখলে তাঁর কাছে তাঁদের মনোভাব অকপটে প্রকাশ করতেন। ওই সময় আমি যেখানেই গেছি সেখানেই সশস্ত্রবাহিনীর যুবকরা আমাকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থনের কথা ব্যক্ত করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁরা ইংরেজ অফিসারদেরও তোয়াক্কা করতেন না। আমি যখন করাচিতে গিয়েছিলাম সেই সময় নৌবাহিনীর একদল অফিসার আমার সঙ্গে দেখা করেন। কংগ্রেসের প্রতি তাঁরা তাঁদের আন্তরিক সমর্থন জানিয়ে বলেন, কংগ্রেস ডাক দিলেই তাঁরা ছুটে আসবেন। তাঁরা আরো বলেন কংগ্রেস এবং গভর্নমেন্টের মধ্যে যদি কোনো বিরোধ সৃষ্টি হয় তাহলে তাঁরা কংগ্রেসকেই সমর্থন করবেন, গভর্নমেন্টকে নয়। বোম্বাই শহরেও নৌবাহিনীর শত শত অফিসার এই মনোভাবই ব্যক্ত করেন।

এইরকম মানসিকতা যে শুধু অফিসারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো তা নয়, নিচু স্তরের নৌ-সৈনিকরাও এই মনোভাবই পোষণ করতেন। এই সময় আমি পাঞ্জাবে গভর্নমেন্ট গঠন করবার উদ্দেশ্যে বিমানে করে লাহোরে গিয়েছিলাম।

বিমানক্ষেত্রের পাশেই স্থানীয় গুর্খা রেজিমেন্টের সদর কার্যালয় অবস্থিত ছিলো। ওই রেজিমেন্টের সৈনিকরা যখন শুনতে পান আমি ওখানে আসছি তখন তাঁরা লাইনবন্দী হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকেন আমাকে দর্শন করবার জন্য। এমন কি, পুলিসের লোকেরাও এই মনোভাবই সেদিন ব্যক্ত করেছিলো। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে দেখা গেছে পুলিসরা সব সময়ই গভর্নমেন্টকে সমর্থন করে এসেছে। রাজনৈতিক নেতা এবং কর্মীদের প্রতি তাদের সহানুভূতি আদৌ দেখা যায়নি। তাঁদের প্রতি সব সময়ই ওরা খারাপ ব্যবহার করে এসেছে। এহেন পুলিসদলও শেষ পর্যন্ত দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং কংগ্রেসের প্রতি তাদের আনুগত্য জ্ঞাপন করে।

একবার আমি যখন কলকাতার লালবাজার স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন সেখানে ট্রাফিক জ্যাম থাকায় আমার গাড়িটা থামিয়ে দিতে বাধ্য হই। এই সময় কয়েকজন কনস্টেবল আমাকে চিনতে পেরে নিকটবর্তী পুলিস ব্যারাকে খবর দেয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বহুসংখ্যক কনস্টেবল এবং হেড-কনস্টেবল এসে আমার গাড়িটা ঘিরে ফেলে। ওরা আমাকে সেলাম করে এবং কেউ কেউ আমার পা ছুঁয়েও প্রণাম করে। ওরা সবাই কংগ্রেসের প্রতি ওদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। ওরা আরো বলে যে আমাদের নির্দেশ-মতো ওরা কাজ করবে। আরো একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। বাংলার গভর্নর একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি যখন লাট-কুঠিতে যাই তখন ওখানে প্রহরারত কনস্টেবলরা আমার গাড়িটাকে ঘিরে দাঁড়ায়। এরপর আমি যখন গাড়ি থেকে নেমে মাটিতে পা দিই তখন ওরা একে একে এগিয়ে এসে আমাকে অভিনন্দন জনায়। ওরা সবাই আমাকে বলে ওরা আমার নির্দেশ অনুসারে কাজ করবে। কিন্তু আমি সেদিন গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে গেছি বলে ওখানে কোনোরকম শ্লোগান দেওয়া আমি উচিত বলে মনে করিনি। কনস্টেবলরা কিন্তু চুপ করে থাকে না; তারা মুহুর্মুহু আমার জয়ধ্বনি দিতে থাকে। এইসব ঘটনার ফলে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায় কনস্টেবলরা মনেপ্রাণে কংগ্রেসকে সমর্থন করে এবং তাদের মনোভাব প্রকাশ করতে তারা মোটেই ভয় পায় না। কংগ্রেসের প্রতি তাদের এই সহানুভূতির জন্য গভর্নমেন্ট যদি তাদের শাস্তি দিতেন তাতেও তাদের আপত্তি ছিলো না।

এই সব ঘটনা স্বভাবতই কর্তৃপক্ষের গোচরে আসে। গভর্নমেন্ট তখন এই

জাতীয় যাবতীয় ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করে ভারত-সচিবের কাছে পাঠিয়ে দেন। এর ফলে ইংরেজরা বুঝতে পারেন ভারতের প্রতি স্তরের প্রতিটি মানুষই স্বাধীনতার জন্য পাগল হয়ে ওঠায় সেখানে এক অগ্নিগর্ভ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবি এখন আর শুধু কংগ্রেসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, ও দাবি এখন ভারতের সর্বস্তরের মানুষদের। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, সামরিক এবং অসামরিক সরকারী কর্মচারীদের মনোভাবের পরিবর্তন। একথা আর তখন গোপন নেই যে সর্বশ্রেণীর সরকারী কর্মচারীরা স্বাধীনতার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন। সশস্ত্রবাহিনীর সৈনিক এবং অফিসাররা প্রকাশ্যেই তখন ঘোষণা করছেন, যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে বলে তাঁদের কাছে কথা দেওয়া হয়েছিলো বলেই তাঁরা তাঁদের রক্ত ঢেলেছেন। এবার তাঁরা দাবি করছেন তাঁদের যে কথা দেওয়া হয়েছিলো সে কথাকে সম্মান দিতে হবে।

প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠন

সাধারণ নির্বাচনের পরে প্রত্যেক প্রদেশে নতুন করে সরকার গঠনের প্রশ্ন উঠলো। এর ফলে আমাকে বিভিন্ন প্রদেশের রাজধানীতে গিয়ে মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে তদারক করার প্রয়োজন দেখা দিলো। আমার হাতে তখন বেশী সময় ছিলো না। কিন্তু বিমানে যাতায়াত করায় সমস্যাটার সমাধান করা গেলো। যুদ্ধের সময় বিমান পরিবহন ব্যবস্থাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়েছিলো। বিমানে অসামরিক যাত্রীদের কতগুলো আসন ব্যবহার করতে দেওয়া হবে তাও সরকারই স্থির করে দিতেন। আমার ক্ষেত্রে লর্ড ওয়াভেল নির্দেশ জারি করেছিলেন আসনের ব্যাপারে আমাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। লর্ড ওয়াভেলের এই নির্দেশের ফলেই অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের রাজধানীতে হাজির হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো।

বিহারে গিয়ে আমি দেখতে পাই, কংগ্রেসের বিভিন্ন উপদলের মধ্যে তখন এমন রেষারেষি চলছে যে মন্ত্রিসভা গঠনের কাজ রীতিমতো জটিল হয়ে উঠেছে। এর সঙ্গে আবার কোনো কোনো নেতার ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাও যুক্ত হয়েছিলো। শ্রীকৃষ্ণ সিংহ এবং অনুগ্রহনারায়ণ সিংহের মধ্যে আগে থেকেই রেষারেষি ছিলো। এবার তা আরো বেশী করে প্রকট হয়ে উঠেছে। ডাঃ সৈয়দ মামুদের বিরুদ্ধেও কয়েকজন কংগ্রেস সদস্য সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন।

অবশেষে এই তিনজনকেই মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়ে সমস্যার সমাধান করা গেলো। বিহারের কংগ্রেস নেতাদের এবং বিশেষ করে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের প্রচেষ্টার ফলেই সমস্যাটার সমাধান করা গিয়েছিলো।

আমি স্থির করেছিলাম মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে মুসলিম লীগের প্রতি আমরা সদিচ্ছামূলক মনোভাব গ্রহণ করবো। মুসলিম লীগের টিকিটে যেসব মুসলমান সদস্য আইনসভায় এসেছিলেন আমি তাঁদের ডেকে পাঠিয়ে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে তাঁদের সহযোগিতা করতে অনুরোধ করি। যেসব প্রদেশে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিলো অথবা যেসব প্রদেশে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে প্রাধান্য অর্জন করেছিলো, সেসব প্রদেশেও আমি মুসলিম লীগের সদস্যদের কাছে এই প্রস্তাব রেখেছিলাম। আমি জানতাম, অনেক প্রদেশে, বিশেষ করে বিহার, আসাম এবং পাঞ্জাবে মুসলিম লীগের সদস্যরা আনন্দের সঙ্গে মন্ত্রিসভায় অংশ গ্রহণ করতে সম্মত ছিলেন, কিন্তু মিঃ জিন্নার নীতি ছিলো কংগ্রেসের সঙ্গে সর্বতোভাবে অসহযোগিতা করা।

পাঞ্জাবের পরিস্থিতিই ছিলো সবচেয়ে জটিল। পাঞ্জাব মুসলমানপ্রধান প্রদেশ হওয়া সত্ত্বেও কোনো পার্টিই ওখানে সুস্পষ্টভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। মুসলিম সদস্যরা ইউনিয়নিস্ট পার্টি এবং মুসলিম লীগের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। আমি উভয় দলের সঙ্গেই আলোচনা করি ; কিন্তু মিঃ জিন্নার অসহযোগী মনোভাবের ফলে মুসলিম লীগ আমার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে। তবে ইউনিয়নিস্ট পার্টি আমার সমর্থনে মন্ত্রিসভা গঠন করতে সম্মত হয়। পাঞ্জাবের গভর্নর ব্যক্তিগতভাবে মুসলিম লীগের পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু তিনি দেখতে পান যে ইউনিয়নিস্ট পার্টির নেতা খিজির হায়াৎ খানকে মন্ত্রিসভা গঠন করবার জন্য আহ্বান করা ছাড়া তাঁর গত্যন্তর নেই।

এইবারই প্রথম কংগ্রেস পার্টি পাঞ্জাবের গভর্নমেন্টে প্রবেশ করে। এটা যে সম্ভব হবে বা হতে পারে আগে তা চিন্তাও করা যায়নি। এ ব্যাপারে সারা ভারতের রাজনৈতিক মহল একবাক্যে স্বীকার করলো পাঞ্জাবে মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে আমি অসাধ্যসাধন করেছি। সমগ্র দেশের নির্দলীয় সদস্যরাও আমাকে অভিনন্দন জানালেন। উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের মুখপত্র 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখলো, পাঞ্জাবের জটিল সমস্যাকে আমি যেভাবে সমাধান করেছি তাতে আমার গভীর রাজনীতিজ্ঞান এবং জটিল সমস্যার গ্রন্থিমোচনে আমার অসামান্য পারদর্শিতাই সূচিত হয়েছে।

জওহরলালের বিরোধিতা

দেশের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে আমি খুবই খুশি হই। তবে সাময়িকভাবে একটা ব্যাপারে আমি দুঃখিত না হয়ে পারি না। আমি কংগ্রেসে আসার পর থেকেই জওহরলালের সঙ্গে আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। প্রতিটি পদক্ষেপেই আমরা উভয়ে উভয়কে সর্বতোভাবে সমর্থন করতে থাকি। আমাদের ভেতরে কোনোরকম ঈর্ষা অথবা প্রাধান্য অর্জনের মনোভাব কখনো দেখা যায়নি। বস্তুতপক্ষে নেহরু-পরিবারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা শুরু হয় পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর আমল থেকেই। প্রথম দিকে আমি জওহরলালকে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র হিসেবে দেখতাম এবং তিনিও আমাকে তাঁর পিতৃবন্ধু হিসেবে শ্রদ্ধা করতেন।

জওহরলালের উদার হৃদয়ে ব্যক্তিগত ঈর্ষা কখনো স্থান পায়নি। কিন্তু তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে এমন কিছু লোক ছিলেন যাঁরা আমার এবং তাঁর ভেতরের হৃদ্যতাটা সুনজরে দেখতেন না। তাঁরা তাই সব সময় চেষ্টা করতেন আমাদের সেই প্রীতির বন্ধনকে ছিন্ন করে দিতে। জওহরলালের মনে তথ্যের প্রতি একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা ছিলো। ওইসব লোক তাঁর সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমার বিরুদ্ধে তাঁর মনটাকে বিষিয়ে তুলবার জন্য সচেষ্ট হন। তাঁরা জওহরলালকে বলেন, ইউনিয়নিস্ট দলের সঙ্গে কংগ্রেসের সহযোগিতা করাটা নীতির দিক থেকে একটি ভুল পদক্ষেপ। তাঁরা বলেন, সমঝোতা এবং সহযোগিতা করতে হলে মুসলিম লীগের সঙ্গেই করা দরকার, কারণ মুসলিম লীগই হলো মুসলমান জনগণের সর্ববৃহৎ দল। কমিউনিস্টরাও এই মতবাদ পোষণ করতেন এবং প্রকাশ্যেই সে কথা ঘোষণা করতেন। এই ধরনের কথা এবং মতবাদ জওহরলালকে প্রভাবিত করে। তিনি হয়তো মনে করেন, ইউনিয়নিস্ট পার্টির সঙ্গে সমঝোতা করে আমি বামপন্থী মতবাদকে বিসর্জন দিয়েছি।

আমার এবং জওহরলালের মধ্যে যাঁরা বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছিলেন, তাঁরা তাঁকে আরো বলতে থাকেন, আমার প্রতি যেভাবে প্রীতি সম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে তাতে অন্যান্য নেতার প্রতি রীতিমতো অবিচার করা হচ্ছে। জওহরলালের উদার মনোভাবের কথা তাঁরা ভালো করেই জানতেন, সেই-জন্য তাঁরা তাঁর কথা বাদ দিয়েই অন্যান্য নেতার কথা বলেন। কিন্তু আমার প্রতি তাঁর মনকে বিরূপ করে তোলবার জন্য তাঁরা তাঁকে বোঝাতে থাকেন,

'ন্যাশনাল হেরাল্ড' পত্রিকায় যেভাবে আমার প্রশস্তি প্রকাশ করা হচ্ছে তার ফলে আমি নাকি শীগগিরই কংগ্রেসের মধ্যে অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করে একমেবাদ্বিতীয়ম নেতা হিসেবে পরিগণিত হবো—যেটা নাকি গণতন্ত্র এবং কংগ্রেস, কারো পক্ষেই মঙ্গলদায়ক হবে না।

আমি জওহরলালকে ব্যক্তিগত ঈর্ষা এবং রেষারেষির ঊর্ধ্বে বলে মনে করি। কিন্তু রাজনৈতিক মতাদর্শের ব্যাপারে তাঁর মনটা হয়তো বা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলো। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বোম্বাই অধিবেশনের সময় এটা আমি সর্বপ্রথম লক্ষ্য করি তিনি আমার বিরোধিতা করছেন। এতোদিন আমরা একসঙ্গে কাজ করে এসেছি এবং এতোদিন কোনো ব্যাপারেই তিনি আমার বিরোধিতা করেননি : কিন্তু বোম্বাইতে ওয়ার্কিং কমিটির সভায় তিনি আমার প্রত্যেকটি প্রস্তাবেরই বিরোধিতা করতে লাগলেন। জওহরলাল যে অভিমত ব্যক্ত করলেন তা হলো, পাঞ্জাবে আমি যে নীতি গ্রহণ করেছি তা সঠিক নয়। তিনি একথাও বললেন আমি কংগ্রেসের সুনামকে মসীলিপ্ত করেছি। তাঁর মুখ থেকে এই কথা শুনে আমি রীতিমতো বিস্মিত এবং দুঃখিত হই। পাঞ্জাবে আমি যা করেছি তা হলো ওখানকার গভর্নরের মনোগত বাসনাকে নস্যাৎ করে আমি কংগ্রেসকে গভর্নমেণ্টের ভেতরে আনতে পেরেছি। গভর্নরের ইচ্ছা ছিলো মুসলিম লীগই ওখানে মন্ত্রিসভা গঠন করুক। আমার প্রচেষ্টার ফলেই কংগ্রেস সংখ্যালঘু দল হওয়া সত্ত্বেও পাঞ্জাব মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়েছে। খিজির হায়াৎ খান কংগ্রেসের সমর্থনেই পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হতে পেরেছেন, তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি কংগ্রেসের প্রভাবাধীনে এসে পড়েছেন।

জওহরলালের বক্তব্য হলো সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করে মন্ত্রিসভায় যাওয়াটা উচিত নয়। এতে কংগ্রেসকে আপসের পথে আসতে হবে। যার ফলে হয়তো তার নীতিকেও বিসর্জন দিতে হবে। আমি বলি, নীতি বিসর্জন দেবার কোনো প্রশ্নই এখানে উঠছে না। সঙ্গে সঙ্গে আমি একথাও বলি, ওয়ার্কিং কমিটি যদি আমার কাজকে অনুমোদন না করেন তাহলে তাঁরা যে-কোনো নতুন নীতি গ্রহণ করতে পারেন। পাঞ্জাবের মন্ত্রিসভাকে কংগ্রেস এমন কোনো গ্যারাণ্টি দেয়নি যে মন্ত্রিসভায় কংগ্রেস থাকবেই। সুতরাং কংগ্রেসী সদস্যরা যখন খুশি মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন।

এই সময় গান্ধীজী দৃঢ়ভাবে আমার মতামতকে সমর্থন করেন। তিনি বলেন পাঞ্জাবে কংগ্রেস পার্টি সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও আলোচনার মাধ্যমে

সে মন্ত্রিসভায় আসতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব কংগ্রেসের ওপরেই নির্ভর করছে। তিনি আরো বলেন এর চেয়ে ভালো সমাধান আর কিছু হতে পারে না এবং আমি ওখানে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি সে ব্যবস্থার কোনোরকম পরিবর্তন করা কোনোক্রমেই উচিত হবে না। গান্ধীজী যখন ওইভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করলেন তখন ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্যই আমাকে সমর্থন করলেন। জওহরলালের প্রস্তাব গৃহীত হলো না।

এই ঘটনার পরে জওহরলাল হয়তো মনে করেছিলেন তিনি আমার কাছ থেকে এতোদূরে সরে গেছেন যার ফলে আমার মনে রীতিমতো আঘাত লেগেছে। আগের মতো এবারেও আমি ভুলাভাই দেশাইয়ের বাড়িতেই উঠেছিলাম। ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়ের পরদিন সকালেই তিনি সেখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে বলেন, ওয়ার্কিং কমিটিতে তিনি আমার কাজের যে সমালোচনা করেছেন সেটা নেহাতই মামুলি। আমার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং প্রীতি ঠিক আগের মতোই আছে এবং আমার নেতৃত্বের প্রতিও তাঁর পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তিনি অকপটভাবে স্বীকার করেন, তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গীতে ঘটনাবলীর বিচার করেছিলেন তা সঠিক ছিলো না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, জওহরলাল কোনো সময়ই ভুল স্বীকার করতে সঙ্কোচ বোধ করতেন না। তাঁর কথা শুনে আমি খুবই খুশি হলাম। আমরা সব সময়ই একে অপরের অকৃত্রিম বন্ধু, সুতরাং তাঁর এবং আমার ভেতরে কোনোরকম মতানৈক্য থাকা মোটেই উচিত নয়।

নৌ-সেনানীদের অভাব-অভিযোগ

আমি আগেই বলেছি, নৌবাহিনীর কয়েকজন অফিসার করাচিতে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সে সময় কথা প্রসঙ্গে তাঁরা আমাকে জানিয়েছিলেন নৌবাহিনীতে জাতিভেদ প্রথা বিদ্যমান আছে। তাঁরা আরো বলেছিলেন এ ব্যাপারে তাঁরা আপত্তি উত্থাপন করলেও কর্তৃপক্ষ তাঁদের আপত্তিতে কর্ণপাত করেননি। এই ব্যাপারে তাঁদের মনে যে বিদ্রোহী মনোভাব সঞ্চিত হয়েছিলো তা বেড়েই চলতে থাকে। আমি দিল্লীতে থাকাকালে একদিন হঠাৎ খবরের কাগজে দেখতে পাই নৌবাহিনীর অফিসাররা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে পদক্ষেপ করেছেন। গভর্নমেন্টের কাছে

এক নোটিস দিয়ে তাঁরা বলেছেন একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে যদি তাঁদের দাবি-দাওয়া মেনে না নেওয়া হয় তাহলে তাঁরা একযোগে পদত্যাগ করবেন। সেই নির্দিষ্ট তারিখ তখন পার হয়ে গিয়েছিলো। তাঁরা তাই তাঁদের সেই দাবি-দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বোম্বাই শহরে এক বিরাট জনসভা করে সেই সভায় প্রকাশ্যভাবে তাঁদের দাবি পুনরুত্থাপন করে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই সংবাদ বিদ্যুৎচমকের মতো সারা দেশে চমক সৃষ্টি করে এবং দেশের জনগণের বেশিরভাগ অংশই তাঁদের পেছনে এসে দাঁড়ায়। ব্যাপার দেখে গভর্নমেণ্ট রীতিমতো রুষ্ট হয়ে ওঠেন। তাঁরা নৌবাহিনীর ইংরেজ সৈনিকদের আহ্বান করেন এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর সমস্ত জাহাজকে ইংরেজ অফিসারদের হাতে তুলে দেন।

আমি মনে করি এ সময় কোনোরকম প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অথবা গণ-আন্দোলন করা ঠিক হবে না। এখন আমাদের ঘটনাস্রোতকে লক্ষ্য করতে হবে এবং ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে নতুন করে আলোচনা শুরু করতে হবে। তাই ভারতীয় নৌবাহিনীর অফিসারদের এই কাজকে আমি ভুল পদক্ষেপ বলে মনে করি। জাতিভেদ প্রথার জন্য যেসব অসুবিধে তাঁরা ভোগ করছেন তা শুধু নৌবাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আসলে ওটা সমগ্র সেনাবাহিনীতেই বিদ্যমান রয়েছে। এই অসাম্য দূর করবার জন্য প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে তাঁরা ঠিকই করেছিলেন; কিন্তু আমার মতে বর্তমান সময়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে নামাটা তাঁদের পক্ষে অবিবেচনার কাজ হয়েছে।

শ্রীমতী আসফ আলী নৌ-অফিসারদের দাবি সমর্থন করে প্রবলভাবে তাঁদের সমর্থন করতে থাকেন। এ ব্যাপারে তিনি দিল্লীতে এসে আমার সঙ্গেও দেখা করেন এবং আমার সমর্থন আদায় করবার চেষ্টা করেন। আমি তাঁকে বলি, অফিসাররা সুবিবেচনার পরিচয় দেননি, সুতরাং তাঁদের নিঃশর্তে কাজে যোগদান করা উচিত। বোম্বাইয়ের কংগ্রেস কমিটি আমার কাছে টেলিফোন করে আমার উপদেশ জানতে চান। আমি তাঁদের কাছে একটি টেলিগ্রাম করে আমার উপরোক্ত অভিমত জানিয়ে দিই। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তখন বোম্বাইতে ছিলেন। তিনিও এ বিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁকেও আমি বলি নৌ-অফিসাররা যে পথে গেছেন সেটা ভুল পথ। সুতরাং তাঁদের এখন কাজে ফিরে যাওয়াই উচিত। সর্দার প্যাটেল আমাকে জিজ্ঞেস করেন গভর্নমেণ্ট যদি তাঁদের কাজে যোগদান করবার সুযোগ না দেন তাহলে কি করা হবে। এর উত্তরে আমি বলি,

ঘটনাবলীকে আমি যেভাবে বিশ্লেষণ করেছি তাতে আমার ধারণা গভর্নমেণ্ট কোনোরকম বাধার সৃষ্টি করবেন না এবং অফিসারদের কাজে ফিরে যাবার প্রস্তাবে সম্মত হবেন। তবে গভর্নমেণ্ট যদি কোনোরকম অসুবিধের সৃষ্টি করেন তাহলে আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করবো।

পরদিনই আমার পেশোয়ার রওনা হবার কথা। মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারেই আমার ওখানে যাবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু এই পরিস্থিতির জন্য আমি পেশোয়ার যাত্রা স্থগিত রেখে কমাণ্ডার-ইন-চীফ লর্ড অচিনলেকের সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করতে চাই। পরদিন সকাল দশটায় তিনি আমার সঙ্গে পার্লামেণ্ট ভবনে দেখা করেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনার সময় আমি নিম্নোক্ত বিষয় দুটি উত্থাপন করি :

(১) নৌ-অফিসারদের কাজকে কংগ্রেস সমর্থন করে না। কংগ্রেস তাঁদের অবিলম্বে কাজে যোগ দেবার জন্য পরামর্শ দিয়েছে। তবে কংগ্রেস আশা করে তাঁদের ওপরে কোনোরকম প্রতিশোধ নেওয়া হবে না। গভর্নমেণ্ট যদি প্রতিশোধ নেবার মতলব করেন কংগ্রেস তাহলে নৌ-অফিসারদের পক্ষে দাঁড়াবে।

(২) জাতিভেদমূলক অসুবিধে এবং নৌ-অফিসারদের অন্যান্য অভাব-অভিযোগ বিচার-বিবেচনা করতে হবে এবং সেগুলোকে দূর করতে হবে।

লর্ড অচিনলেক এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে বন্ধুর মতো আলোচনা করেন। আমি যতোটা আশা করেছিলাম তার চেয়েও আন্তরিকতা লক্ষ্য করি তাঁর কথাবার্তায়। তিনি বলেন অফিসাররা যদি নিঃশর্তে কাজে ফিরে আসেন তাহলে তাঁদের ওপরে কোনোরকম প্রতিশোধ নেওয়া হবে না। জাতিভেদ-মূলক অসাম্যের ব্যাপারে তিনি বলেন, ওই অসাম্য যাতে সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হয় তার জন্য তিনি সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন। তাঁর বক্তব্য শুনে আমি খুবই খুশি হই। আমি তখন একটি বিবৃতি প্রচার করে অফিসারদের কাজে ফিরে যেতে বলি। আমি তাঁদের এ আশ্বাসও দিই, তাঁদের ওপরে কোনোরকম প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে না।

তৎকালীন পরিস্থিতিতে বোম্বাইয়ের নৌবাহিনীর অফিসারদের বিদ্রোহ একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পরে এই প্রথমবার ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়ে প্রকাশ্য বিদ্রোহ দেখা দেয়। এটা যে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা তা কিন্তু মোটেই নয়। যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের ফলেই

সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের মনোভাব সঞ্চারিত হয়েছিলো। সুভাষচন্দ্রের সেই বাহিনী ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেছিলো এবং একসময় তারা ইম্ফল অধিকার করে নেবার অবস্থায় এসে পড়েছিলো। জাপানের আত্মসমর্পণের পরে ইংরেজরা ব্রহ্মদেশকে পুনরায় অধিকার করে নেন এবং সেই সময় আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের বন্দী করেন। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকরা ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার ব্যাপারে কোনোরকম অনুশোচনাই প্রকাশ করেন না। এঁদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ব্যক্তির বিরুদ্ধে তখন রাজদ্রোহের মামলা দায়ের করা হয়েছিলো। এইসব ঘটনার ফলে ইংরেজের মনে হয় ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সশস্ত্রবাহিনীর ওপরে কর্তৃত্ব বজায় রাখা আর সম্ভব হবে না।

আই. এন. এ. অফিসারদের বিচার

আমি যখন সিমলা কনফারেন্সের পরে কাশ্মীরের গুলমার্গে বাস করছিলাম সেই সময়ই আমি সর্বপ্রথমে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের বন্দী করবার সংবাদ শুনতে পাই। মিঃ প্রতাপ সিং নামে পাঞ্জাব হাইকোর্টের একজন বিচারপতি একদিন উত্তেজিতভাবে আমার কাছে এসে বলেন, সুভাষচন্দ্র বোসের অধীনে যে সেনাবাহিনী ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো সেই বাহিনীর কয়েকজন অফিসারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত অফিসারদের মধ্যে ওই ভদ্রলোকের একজন আত্মীয় ছিলেন বলেই তিনি অতোটা উত্তেজনা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মনোভাবটা তৎকালীন সিভিলিয়ানদের মতোই ছিলো। তিনি এই মত প্রকাশ করেছিলেন কংগ্রেস যদি এ ব্যাপারে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করে তাহলে মামলাটা খারাপের দিকে যাবে অতএব কংগ্রেস যেন আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যাপারে নাক না গলায়। তাঁর মতে এই বিচারকে রাজনীতির বাইরে রাখাই ঠিক হবে। আমি তাঁকে বলি, তাঁর মতটা একেবারেই ভুল। কংগ্রেস যদি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে তাহলে গভর্নমেন্ট আই. এন. এ. অফিসারদের কঠিন সাজা দেবেন। এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো চরম দণ্ড দেওয়া হবে। এইসব অফিসারদের মধ্যে এমন কয়েকজন প্রতিভাসম্পন্ন যুবক ছিলেন যাঁদের কারাদণ্ড বা প্রাণদণ্ড হলে জাতির সমূহক্ষতি। আমি তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, আই. এন. এ. অফিসারদের বিচারে কংগ্রেস তাঁদের পক্ষ সমর্থন করবে। আমি তাই কালবিলম্ব না করে

এক বিবৃতির মাধ্যমে আমার সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করি।

যা ভাবা গিয়েছিলো তাই হলো। আমি ভেবেছিলাম ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ওইসব অফিসারদের কাজকর্ম সম্বন্ধে কোনো অভিযোগই আনতে পারবেন না। ভারতীয় বাহিনীর একটি অংশকে ব্রহ্মদেশে এবং সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয়েছিলো। জাপান যখন ওই অঞ্চলগুলো অধিকার করে নেয়, ইংরেজরা তখন ভারতীয় সৈনিকদের ভাগ্য তাদের নিজেদের হাতে ছেড়ে দিয়ে সরে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে একজন ইংরেজ অফিসারই ভারতীয় সৈনিকদের জাপানের হাতে ছেড়ে দেন। ভারতীয় সৈনিকরা যদি যুদ্ধবন্দী হিসেবে থাকতেন তাহলে শত্রুপক্ষ তাঁদের দিয়ে রাস্তা তৈরীর কাজ করাতো অথবা তাঁদের কলকারখানায় নিয়োজিত করতো। এবং ওইসব কাজ জাপানের যুদ্ধপ্রচেষ্টারই সহায়ক হতো। তাঁরা যখন এইভাবে জাপানের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিলেন সেই সময় তাঁরা যদি জাপানের পক্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে থাকেন তাহলে সেটা মোটেই দূষণীয় কাজ বলে গণ্য হতে পারে না। কিন্তু তাঁরা ঠিক জাপানের তাঁবেদার হতে চাননি। তাঁরা একটি স্বাধীন ফৌজের সামিল হয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্যই যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁরা যতোদিন জাপানীদের হাতে যুদ্ধবন্দী অবস্থায় ছিলেন, ততোদিন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাঁদের কোনোভাবেই সাহায্য করতে পারেননি। সুতরাং তাঁরা যদি জাপানের পক্ষভুক্ত হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন তাহলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কিছু বলবার থাকতো না। কিন্তু ওঁরা অনেক ভালো কাজ করেছেন। ওঁরা স্বাধীন মুক্তিফৌজ গঠন করে মাতৃভূমিকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করবার জন্য অস্ত্রধারণ করেছিলেন। এ কাজ নিঃসন্দেহে শ্রেয়তর। ওঁরা বিশ্বাস করতেন, ইংরেজদের ভারত থেকে বিতাড়িত করতে পারলে তাঁরা ভারত দখল করে স্বাধীন ও সার্বভৌম সরকার গঠন করতে পারবেন। দেশকে জাপানীদের হাতে তুলে দেবার কোনোরকম ইচ্ছা তাঁদের কখনো ছিলো না। আমি তাই আই. এন. এ.র সদস্যদের বিচার করবার মতো কোনো কারণই দেখতে পাই না।

কংগ্রেস মনে করে গভর্নমেন্ট যদি আই. এন. এ. অফিসারদের বিচার করতেই চান, তা করতে হবে প্রকাশ্য আদালতে এবং সেই বিচারের সময় কংগ্রেস তাঁদের পক্ষ সমর্থন করবে। আমি এই বিষয়ে লর্ড ওয়াভেলকে একটি চিঠি লিখে তাঁকে অনুরোধ করি, তিনি যেন কংগ্রেসের এই অভিমত মেনে নেন। লর্ড ওয়াভেল আমার প্রস্তাবে সম্মত হন এবং এক আদেশ

জারি করে বলেন আই. এন. এ. অফিসারদের বিচার প্রকাশ্যভাবে লাল কেল্লায় অনুষ্ঠিত হবে। এই বিচার জনসাধারণের মনে এক বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিলো। কয়েক মাস বিচার চলবার পর অবশেষে অফিসাররা মুক্তি পান। কেউ কেউ আদালতের আদেশেই মুক্তি পান এবং বাকি আসামীরা মুক্তি পান ভাইসরয়ের বিশেষ আদেশের ফলে।

কয়েকজন অফিসারের সম্বন্ধে আদালতের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়; তাই প্রথম দিকে তাঁরা মুক্তি পান না। এর ফলে জনগণের মধ্যে বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং সারা দেশ জুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন চলতে থাকে। আমি যখন পাঞ্জাবের মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে লাহোরে গিয়েছিলাম সেই সময় ওখানকার ছাত্ররা এক বিরাট শোভাযাত্রা বের করে। তারা সমগ্র শহর পরিক্রমা করে আমি যে বাড়িতে বাস করছিলাম সেখানে এসে হাজির হয়। আমার কিন্তু প্রথম থেকেই মনে হয়েছিলো এ কাজটি ঠিক হচ্ছে না। আমি তাই দৃঢ়ভাবে ছাত্রদের বলি, কংগ্রেস যখন এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে, সে অবস্থায় ছাত্রদের এইভাবে প্রতিবাদ করে শোভাযাত্রা বের করা অনুচিত হয়েছে। আমরা বন্দীদের পক্ষ সমর্থন করবার এবং তাঁদের মুক্ত করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং এর জন্য নিয়মতান্ত্রিক পথে সর্বপ্রকার আইনসঙ্গত পন্থা গ্রহণ করেছি। সুতরাং এই অবস্থায় অননুমোদিতভাবে কোনোরকম প্রতিবাদ বা আন্দোলন করলে মামলাটির ক্ষতিই করা হবে। ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে তখন আলাপ-আলোচনা চলছে। ব্রিটেনে শ্রমিকদল পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে নতুন গভর্নমেন্ট গঠন করেছেন। তাঁরা আমাদের কথা দিয়েছেন ভারতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। তাঁদের সে সুযোগ দিতেই হবে। কংগ্রেস তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বর্তমানে কোনোরকম আন্দোলন করা হবে না। অতএব দেশবাসীদের এখন সর্বতোভাবে কংগ্রেসের নির্দেশ মেনে চলা উচিত।

আগেই বলেছি যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন চলছিলো। কোনো কোনো জায়গায় সে আন্দোলন হিংসপথেও গিয়েছিলো। দিল্লীতে জনসাধারণ সরকারী ভবনগুলোতে অগ্নিসংযোগ করতে চেষ্টা করেছিলো এবং অনেক সরকারী সম্পত্তি ধ্বংস করেছিলো। আমি দিল্লীতে ফিরে এসে লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে দেখা করলে তিনি আমাকে ওইসব ঘটনার কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেই ভারতের রাজনৈতিক

সমস্যার সমাধান করা হবে বলে কংগ্রেস যে কথা দিয়েছিলো এইসব ঘটনা তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাঁর সেই অভিযোগ মেনে নেওয়া ছাড়া আমার কোনো পথ ছিলো না। কারণ অভিযোগগুলো সবই সত্যি ছিলো। আমি তখন দিল্লীর সমস্ত কংগ্রেস কর্মীকে ডেকে পাঠাই। তাদের কাছে আমি বলি, কংগ্রেস এক মহা সমস্যার মধ্যে পড়ে গেছে। প্রতিটি জাতীয় আন্দোলনেই এমন একটা স্তর আসে যখন নেতাদের স্থির করতে হয় তাঁরা নেতৃত্ব দেবেন, না আন্দোলনকারী জনতাকে অনুসরণ করে চলবেন। ভারতেও তখন তেমনি এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো। কংগ্রেস যদি মনে করে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ভারতীয় সমস্যার সমাধান করা হবে, তাহলে কংগ্রেস কর্মীদের কর্তব্য হবে জনগণের কাছে সেই কথা পৌঁছে দেওয়া এবং কংগ্রেসের নির্দেশ অনুসারে কাজ করা। আমি তাদের আরো বলি, জনতা যদি অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের কাছে আমি কোনোক্রমেই নতি স্বীকার করতে রাজী নই। আমি জনমতকে সঠিক পথে সংগঠিত করতে চেষ্টা করবো এবং তাদের যথাকর্তব্য নির্দেশ দেবো, কিন্তু কোনোক্রমেই জনতার যে-কোনো কাজকে সমর্থন করে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবো না।

লিয়াকত আলীর সঙ্গে ভুলাভাইয়ের আলোচনা

বর্তমান পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করবার আগে নবগঠিত কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী দল থেকে ভুলাভাইকে কেন বাদ দেওয়া হলো সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলার দরকার বোধ করছি। তাঁকে পার্লামেণ্টারী দলে স্থান না দেওয়ায় অনেকেই বিস্ময়বোধ করেছিলেন। কিন্তু কেন যে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছিলো সে কথা মাত্র কয়েকজন লোক ছাড়া আর কেউ জানতেন না। আমি মনে করি ওই ব্যাপারে আমি যদি সেই ইতিহাস না বলি তাহলে সে ব্যাপারটা চিরদিন অজ্ঞাতই থেকে যাবে।

ভুলাভাই ছিলেন বোম্বাইয়ের সবচেয়ে নামকরা ব্যবহারজীবী। পরবর্তীকালে তিনি সমগ্র ভারতের মধ্যেই অগ্রগণ্য ব্যবহারজীবী হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। প্রথমে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না; কিন্তু ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত হবার পর কংগ্রেস যখন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত নেয় তখন তিনি কংগ্রেস টিকিটে কেন্দ্রীয় আইনসভায়

আসেন। তিনি তখন কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেস পার্টির নেতা নির্বাচিত হন এবং অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে কর্তব্য সম্পন্ন করতে থাকেন। তাঁর সুষ্ঠু কাজের ফলে অচিরেই তিনি কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ মহলে স্থানলাভ করেন। পরে তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন এবং একজন প্রথম সারির নেতারূপে পরিচিত হন। কংগ্রেসের মধ্যে ভুলাভাইয়ের এইরকম প্রতিষ্ঠা দেখে কয়েকজন নেতা তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন। তাঁরা মনে করেন নবাগত একজন ব্যক্তিকে অতোটা প্রাধান্য দেওয়া ঠিক হচ্ছে না।

শেষদিকে ভুলাভাইয়ের স্বাস্থ্য ভালো চলছিলো না। আমি তাই আমার ওয়ার্কিং কমিটিতে তাঁকে গ্রহণ করিনি। এই কারণেই ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গ্রেপ্তার হননি। এর ফলে জেলের বাইরে তিনিই ছিলেন কংগ্রেসের প্রধান নেতা। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজীর মুক্তির পরে যেসব ঘটনা ঘটেছিলো সে সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে। প্রথম দিকে তিনি যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ভারতীয়দের সহযোগিতার প্রশ্নে ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু মুক্তিলাভের পর তাঁর মানসিকতা সম্পূর্ণভাবে বদলে যায়। তিনি তখন স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করতে সম্মত হন। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা সাফল্যলাভ করে না; পরিস্থিতি যেমন ছিলো তেমনি থেকে যায়। দিল্লীতে তখন অনেকেই মনে করতে থাকেন, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের ভেতর আলোচনার অচল অবস্থার অবসান হবে না; এটা হতে পারে কেন্দ্রীয় আইনসভার কংগ্রেস পার্টি ও মুসলিম লীগ পার্টির মধ্যে আলোচনা হলে। উভয় পার্টির আলোচনায় যদি কোনোরকম সমাধানের পথ পাওয়া যায়, সে সমাধান হবে সাময়িকভাবে; তবে যুদ্ধ চলাকালে যদি মতৈক্য হয় বা হতে পারে তাহলে যুদ্ধ শেষ হবার পর সেই মতৈক্যের ভিত্তিতেই কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে স্থায়ীভাবে একটি নিষ্পত্তিও হতে পারবে।

উভয় পক্ষের সঙ্গে পরিচিত এবং উভয় পক্ষের বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তিরা তখন মুসলিম লীগ পার্টির ডেপুটি লিডার লিয়াকত আলী এবং কংগ্রেস পার্টির নেতা ভুলাভাই দেশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের মধ্যে আলোচনার কথা বলেন। লিয়াকত আলী এতে সম্মত হন।

এই আলোচনার প্রস্তাবে ভুলাভাইও আগ্রহান্বিত ছিলেন, তবে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলে দেন যে কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়া এ ব্যাপারে তিনি এগুতে পারেন না। তিনি আরো বলেন, আইনসভার উভয় পার্টির মধ্যে সমঝোতায় বিশেষ কোনো ফল হবে না। সমঝোতা হওয়া দরকার উভয় প্রতিষ্ঠানের

মধ্যে। কংগ্রেসের সব নেতারা তখন জেলে থাকায় তাঁদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। ভুলাভাই তখন বলেন এ ব্যাপারে তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর উপদেশ মতো কাজ করবেন।

ভুলাভাই তখন গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে লিয়াকত আলী এবং অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর আলোচনার কথা গান্ধীজার কাছে প্রকাশ করেন। ভুলাভাই তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন সোমবারে। কিন্তু সোমবার গান্ধীজীর মৌনদিবস হওয়ায় তিনি তাঁর অভিমত গুজরাটি ভাষায় লিখে দেন। তাঁর সেই লিখিত বক্তব্যের সার কথা হলো, ভুলাভাই এ ব্যাপারে এগিয়ে যেতে পারেন এবং আলোচনার বিষয়বস্তু ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে স্থির করে আবার যেন তাঁকে জানিয়ে দেন।

গান্ধীজীর নির্দেশ পাবার পর ভুলাভাই লিয়াকত আলীর সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। আলোচনায় স্থির হয়, একজিকিউটিভ কাউন্সিল পুনর্গঠিত হবে এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সদস্যরা তাতে অংশগ্রহণ করবেন। আলোচনায় আরো স্থির হয়, আইনসভায় কংগ্রেস পার্টির লিডার হিসেবে ভুলাভাই একজিকিউটিভ কাউন্সিলে যোগদান করবেন, কিন্তু তা যদি কোনো কারণে সম্ভব না হয় তাহলে ডেপুটি লিডার আবদুল কোয়ায়ুম খান কাউন্সিলে আসবেন। ভুলাভাই এসব কথা গান্ধীজীকে জানিয়ে দেন। কিন্তু নানা কারণে আলোচনা আর এগোয় না, ফলে আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়।

এরপর ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আমরা সবাই যখন জেল থেকে বেরিয়ে আসি তখন উপরোক্ত আলোচনার কথা আমাদের জানিয়ে দেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে তখন আর একবার দীর্ঘ আলোচনা চলে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভুলাভাই যে গান্ধীজীর মতানুসারে উক্ত আলোচনা করেছিলেন সে কথা কেউ গ্রাহ্যই করেন না। এ ব্যাপারে সর্দার প্যাটেলই অগ্রণী ভূমিকা নেন। এবং কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে যে-কোনোভাবেই হোক, এই-রকম একটা ধারণার সৃষ্টি হয় যে ভুলাভাই লিয়াকত আলীর সঙ্গে আলোচনা করে পেছনের দরজা দিয়ে একজিকিউটিভ কাউন্সিলে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন। আগেই বলেছি, ভুলাভাইয়ের ওপরে অনেক কংগ্রেস নেতাই ঈর্ষার মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি যে দ্রুতগতিতে কংগ্রেসের ভেতরে প্রতিষ্ঠা অর্জন করছেন এটা তাঁরা সুনজরে দেখতেন না। ভুলাভাইয়ের বিরোধীরা গান্ধীজীর কাছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে নানারকম কুৎসা করে গান্ধীজীকেও শেষ পর্যন্ত ভুলাভাইয়ের বিরোধী করে তুলতে সক্ষম হন। এই-

সব অভিযোগের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলো মিথ্যা। কিন্তু কয়েক মাস ধরে এমনভাবে প্রচার চালানো হয় যার ফলে ভুলাভাই যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হন।

কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে এমনও কয়েকজন ছিলেন যাঁরা গান্ধীজীকে তাঁদের স্বমতে আনবার জন্য তাঁর অন্তরঙ্গ মহলের সাহায্য নিতেন। অন্তরঙ্গ মহলের ওইসব লোকেরাই গান্ধীজীর কানে নানারকম কথা তুলতেন। সাধারণত গান্ধীজী ওইসব কান-ভাঙানো কথায় সায় দিতেন না। কিন্তু বার বার যখন একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাঁর কানে তোলা হতো তখন তাঁর বিচারবোধ ক্ষুণ্ণ হতো। আমার মনে আছে, মতিলাল নেহরুর বিরুদ্ধেও গান্ধীজীর মনকে ঠিক এইভাবেই বিষাক্ত করে তোলা হয়েছিলো। জওহরলালের বিরুদ্ধেও একবার এইরকম একটি ব্যাপার ঘটেছিলো। কিন্তু পরবর্তীকালে গান্ধীজী যখন প্রকৃত ঘটনা জানতে পারেন তখন তিনি সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভুলাভাইয়ের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয় এবং গান্ধীজীর মন থেকে ভুলাভাইয়ের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবটা বিদূরিত হয় না।

আমি আগেই বলেছি, লিয়াকত আলীর সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে গান্ধীজীর পরামর্শ নেবার জন্য ভুলাভাই এক সোমবারে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং সেদিনটি গান্ধীজীর মৌনদিবস হওয়ায় তিনি তাঁর বক্তব্য একটি কাগজে লিখে ভুলাভাইয়ের হাতে দিয়েছিলেন। গান্ধীজীর লেখা সেই কাগজটি ভুলাভাই যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন। তিনি সেই কাগজটি সর্দার প্যাটেল এবং অন্যান্য নেতাদের দোখয়ে দেন এবং তাঁদের বলেন গান্ধীজীর মত নিয়েই তিনি আলোচনা চালিয়েছিলেন, সুতরাং এ ব্যাপারে তাঁর ওপরে দোষারোপ করা সঙ্গত হচ্ছে না।

ভুলাভাইয়ের এই আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যাপারে নেতারা কোনো কথাই বলেন না। অর্থাৎ, তাঁর বক্তব্যকে (এবং গান্ধীজী-লিখিত অভিমতকেও) ওইসব নেতারা কোনোরকম আমল দেন না। উপরন্তু, ভুলাভাইয়ের বিরুদ্ধে প্রচার চলতে থাকে তিনি মুসলিম লীগের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। এই প্রচার তখন এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো যে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে (১৯৪৫-৪৬) ভুলাভাইকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয় না।

এই ব্যাপারে ভুলাভাই বিশেষভাবে মানসিক আঘাত পান এবং সেই মানসিক আঘাত তাঁর স্বাস্থ্যের ওপরেও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আগেও তিনি হৃদযন্ত্রের অসুখে ভুগছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার পরে প্রায়ই তাঁর হার্ট

অ্যাটাক হতে থাকে। তাঁর মনে বার বার এই কথাটিই ঘুরতে থাকে, বিশ্বস্তভাবে কংগ্রেসের সেবা করার ফল হিসেবে তিনি পেলেন শুধু অসম্মান এবং অপমান।

এই সময়ে আমি একবার বোম্বাইয়ে যাই এবং চিরাচরিত অভ্যাসবশে ভুলাভাইয়ের বাড়িতেই বাস করি। আমি যখন তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হই তখন দেখতে পাই তিনি শুয়ে আছেন। কেমন আছেন জিজ্ঞেস করলে তিনি কাঁদতে শুরু করেন। তাঁর প্রধানতম দুঃখ হলো, গান্ধীজী সবকিছু জেনেও তাঁর পক্ষে দাঁড়ালেন না। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করি কিন্তু তাতে কোনোই ফল হয় না। আমি এই বিষয়ে পরে গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা করি। কিন্তু ইতিমধ্যে ভুলাভাইয়ের বিরুদ্ধে এতো সব অভিযোগ তাঁর কাছে করা হয়েছিলো যে তাঁর মনটা ভুলাভাইয়ের প্রতি রীতিমতো বিষাক্ত হয়ে উঠেছিলো। এর কিছুদিন পরেই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ভুলাভাই পরলোকগমন করেন। এই ঘটনা আজও আমি ভুলতে পারিনি। আজও ভুলাভাইয়ের কথা মনে পড়লে আমার মন দুঃখে এবং শোকে অভিভূত হয়ে পড়ে। বার বার আমার মনে হয় ভুলাভাই কংগ্রেসকে কায়মনোবাক্যে সেবা করেছিলেন। কিন্তু সেই সেবার পরিবর্তে তিনি পেয়েছিলেন চরম অবিচার।

মন্ত্রিমিশন

১৯৪৬ সালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করতে বসে আমি দেখতে পাই দেশের অবস্থা তখন সম্পূর্ণভাবে বদলে গেছে। সম্পূর্ণ নতুন এক ভারতবর্ষের জন্ম হয়েছে তখন। সরকারী, বে-সরকারী নির্বিশেষে ভারতের জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। ইংরেজদের মনোভাবেও পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। প্রথম দিকে যা ভাবা গিয়েছিলো, ইংলণ্ডের শ্রমিক সরকার সেই পথেই চলেছে দেখা গেলো। তারা তখন সঠিক পথেই ভারতের পরিস্থিতি বিচার-বিবেচনা করছে। ক্ষমতায় আধষ্ঠিত হবার অব্যবহিত পরেই ওরা এক পার্লামেন্টারী ডেলিগেশন ভারতে পাঠায়। এই ডেলিগেশন ভারতে আসে ১৯৪৫-৪৬-এর শীতকালে। ডেলিগেশনের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে আমি বুঝতে পারি ভারতীয়দের মনোভাব তাঁরা সঠিকভাবেই অনুধাবন করেছেন। তাঁরা নিশ্চিতরূপেই বুঝতে পেরেছেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবার ব্যাপারটাকে আর বেশিদিন ঝুলিয়ে রাখা চলবে না। ইংলণ্ডের

সরকারের কাছেও সেইরকম রিপোর্টই তাঁরা দেন। ওঁদের সেই রিপোর্ট হস্তগত হবার পরেই শ্রমিক মন্ত্রিসভা স্থির করেন যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারতের সমস্যাটির একটি সুষ্ঠু সমাধান করতে হবে।

১৯৪৬-এর ১৭ই ফেব্রুয়ারী রাত সাড়ে নটায় আমি রেডিওতে ইংরেজ সরকারের নতুন সিদ্ধান্তের সংবাদ শুনতে পাই। সংবাদে বলা হয়, লর্ড পেথিক লরেন্স পার্লামেন্টে ঘোষণা করেছেন ইংরেজ সরকার ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নটি আলোচনা করবার জন্য মন্ত্রীপর্যায়ের একটি মিশনকে ভারতে পাঠাবেন বলে স্থির করেছে। একই দিনে ভারতের ভাইসরয়ও ওই কথাই ঘোষণা করেন। মন্ত্রিমিশনের সদস্য হিসেবে কে কে আসছেন তাঁদের নামও ঘোষণা করা হয়। এঁরা হলেন ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, বোর্ড অব ট্রেডের প্রেসিডেন্ট স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এবং ফার্স্ট লর্ড অব অ্যাডমিরালিটি মিঃ এ. ভি. আলেকজাণ্ডার। রেডিওতে এই ঘোষণাবাণী প্রচারিত হবার আধ ঘন্টার মধ্যেই অ্যাসো-সিয়েটেড প্রেসের একজন প্রতিনিধি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

আমি তাঁকে বলি, শ্রমিক সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে আমি খুশী হয়েছি। আমি আরো খুশী হয়েছি মন্ত্রিমিশনের সদস্যদের মধ্যে আমাদের পুরনো বন্ধু স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসও থাকছেন জেনে। স্যার স্ট্যাফোর্ড আগেও একবার ভারতে এসে এখানকার সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে গেছেন।

আমি আরো বলি, একটি বিষয় আমার কাছে খুবই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে যে ইংলণ্ডের নতুন সরকার ভারতের সমস্যাকে আর ঝুলিয়ে রাখতে চায় না। তারা যেভাবে সাহসের সঙ্গে এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে তাকে অবশ্যই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

১৯৪৬-এর ১৫ই মার্চ ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী কমনস্ সভায় ভারতীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে এক বিবৃতি দেন। ইঙ্গ-ভারত সম্পর্কের ব্যাপারে সেটি এক অভূতপূর্ব ঘটনা। তিনি অকপটে এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করেন, পরিস্থিতি বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, যার ফলে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এ ব্যাপারে অগ্রসর হবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন· পুরনো পদ্ধতি আঁকড়ে ধরে থাকলে কোনো সমাধান তো হবেই না, উপরন্তু আর একবার অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে; আর তা যদি হয় তাহলে ভারতবর্ষে এক অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে।

মিঃ এটলির সেই বিবৃতির কিছু কিছু অংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, উভয়পক্ষেই কিছু না কিছু দোষ-ত্রুটি ছিলো; সুতরাং আগের দিনের সেসব কথাকে পুরোপুরিভাবে পরিহার করে এবার নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে গেলে মোটেই ভালো ফল পাওয়া যাবে না; কারণ, ১৯৪৬-এর মেজাজ ১৯২০, ১৯৩০ এবং ১৯৪২-এর মেজাজ অপেক্ষা সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি আরো বলেন, ভারতীয়দের মধ্যে মতভেদের ব্যাপারে তিনি জোর দেবেন না। কারণ মতভেদ যতই থাক না কেন, ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁরা সবাই একমত। জাতিধর্মনির্বিশেষে ভারতীয়দের একই দাবি—ভারতের স্বাধীনতা। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, মারাঠী প্রভৃতি সবাই চায় ভারতকে স্বাধীনতা দিতে হবে। এমন কি সরকারী কর্মচারীরাও এই কথাই বলেন। মিঃ এটলি অকপটভাবে স্বীকার করেন ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধ এখন এমন এক পর্যায়ে এসে গেছে যে সেনাবাহিনীর মধ্যেও তা ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতের যে সেনাবাহিনী যুদ্ধের সময় চমৎকারভাবে কাজ করেছে তারাও আজ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ। মিঃ এটলির মতে ভারতীয়দের ভেতর যেসব সামাজিক ও আর্থনীতিক অসাম্য বিদ্যমান রয়েছে সেগুলো তারা নিজেরাই সমাধান করবে। অবশেষে তিনি এই বলে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন, মন্ত্রিমিশন একটি সুনির্দিষ্ট মনোভাব নিয়ে ভারতে যাচ্ছে এবং তিনি আশা করেন মিশন সর্বতোভাবে সাফল্য অর্জন করবে।

মন্ত্রিমিশনের সদস্যরা ভারতে আসেন ২৩শে মার্চ। আগের বারে যখন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ভারতে এসেছিলেন তখন বাংলার কংগ্রেস নেতা মিঃ জে. সি. গুপ্ত তাঁর আপ্যায়নের ভার নিয়েছিলেন। এবারও মিঃ গুপ্ত আমার সঙ্গে দেখা করে বলেন স্যার স্ট্যাফোর্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য তিনি দিল্লী যাচ্ছেন। আমি তখন স্যার স্ট্যাফোর্ডকে পুনরায় ভারতে আসার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে একটি চিঠি লিখে মিঃ গুপ্তর হাতে দিই।

মন্ত্রিমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

আমি দিল্লীতে পৌঁছই ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল। আমার মনে হয়, এবারের আলোচনায় রাজনৈতিক সমস্যার চেয়ে সাম্প্রদায়িক সমস্যাই

বেশী গুরুত্বপূর্ণ হবে। সিমলা কনফারেন্সের সময়ই আমি স্থিরনিশ্চয় হই, রাজনৈতিক প্রশ্ন সমাধানের স্তরে এসে গেছে কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনোই সমাধান হয়নি। একটা কথা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না, সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানরা তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুবই উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছেন। এটাও সত্যি, কোনো কোনো প্রদেশে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ; সুতরাং প্রাদেশিক স্তরে তাঁদের মনে কোনোরকম আশংকা নেই। কিন্তু সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে তাঁরা সংখ্যালঘিষ্ঠ বলেই তাঁদের ভয় যে স্বাধীন ভারতে তাঁরা যথোপযুক্ত স্থান পাবেন না।

এই বিষয়টি নিয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করেছি। সারা পৃথিবীতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কথা নিয়ে আলোচনা চলছে। ভারতের মতো বিরাট দেশে, যেখানকার জনগণ বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং যেখানকার ভৌগো-লিক অবস্থাও একরকম নয়, সেখানে সর্বক্ষমতাসম্পন্ন একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত হবে না। তাছাড়া ফেডারেল গভর্নমেন্টে ক্ষমতার বিকেন্দ্রী-করণ করা হলে সংখ্যালঘুদের আশঙ্কাও বিদূরিত হবে। এইসব কথা চিন্তা করে অবশেষে আমি এই সিদ্ধান্তে আসি, ভারতের সংবিধান হবে ফেডারেল ধরনের এবং তাতে যথাসম্ভব বেশি করে প্রদেশগুলোর হাতে ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে। তবে জাতীয় সংহতি বজায় রেখেই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। এবং এটা করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারগুলোর মধ্যে ক্ষমতার বন্টন এবং কেন্দ্রের সঙ্গে প্রাদেশিক সবকারের সম্পর্কের ব্যাপারে একটি সুচিন্তিত ফরমুলা বের করতে হবে। কতকগুলো বিভাগ এবং ক্ষমতা অবশ্যই কেন্দ্রের হাতে থাকবে এবং কতকগুলো অবশ্যই প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকবে। এছাড়া আরো কিছু বিভাগ থাকবে যেগুলো উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে কেন্দ্র অথবা প্রদেশের হাতে ন্যস্ত থাকবে। তবে এ ব্যাপারে প্রথমেই স্থির করতে হবে কেন্দ্রের হাতে ন্যূনপক্ষে কি কি ক্ষমতা থাকবে যেগুলো অবশ্যই কেন্দ্রের হাতে রাখতে হবে। এছাড়া আরো কতকগুলো বিষয়ের একটি তালিকা তৈরি করতে হবে যেগুলো প্রদেশের সম্মতিক্রমে কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত হবে। তালিকাভুক্ত এইসব বিষয় হবে স্বেচ্ছাধীন, অর্থাৎ যে-কোনো প্রদেশ তার ইচ্ছানুসারে এগুলোকে সার্বিক-ভাবে অথবা আংশিকভাবে কেন্দ্রের হাতে ছেড়ে দিতে পারে।

একটি বিষয় সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছই, প্রতিরক্ষা, চলাচল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পররাষ্ট্র-বিষয়ক ক্ষমতা অবশ্যই কেন্দ্রের হাতে

থাকবে, কারণ এগুলো সবাই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এগুলোর মধ্যে যে-কোনো একটিও যদি প্রদেশের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে সমস্ত উদ্দেশ্যই বিঘ্নিত হবে এবং ফেডারেল গভর্নমেন্টের ভিত্তিমূলেই আঘাত করবে। তবে কোনো কোনো বিষয় অবশ্যই প্রদেশের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু এছাড়া একটি তৃতীয় তালিকাও থাকবে যে তালিকাভুক্ত বিষয়গুলো প্রদেশের হাতে থাকবে অথবা কেন্দ্রের হাতে থাকবে তা স্থিরীকৃত হবে প্রাদেশিক আইনসভাগুলোর দ্বারা।

এইসব বিষয় নিয়ে আমি যতোই চিন্তা করতে থাকি ততোই আমার কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, ভারতের সমস্যাবলী সমাধানের অন্য কোনো পথ নেই। সংবিধানে যদি এইসব বিষয় অঙ্গীভূত হয় তাহলে মুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলো উপরোক্ত তিনটি বিষয় বাদে আর সব ক্ষমতাই নিজেদের হাতে রাখতে পারবে। এবং এতে মুসলমানদের মন থেকে হিন্দুভীতি, অর্থাৎ হিন্দুদের দ্বারা শাসিত হবার ভীতিও দূর হবে। একবার যদি এই ভীতি দূর হয় তাহলে প্রদেশসমূহ স্বেচ্ছাক্রমেই অনেক বিষয়ের ভার কেন্দ্রের হাতে ছেড়ে দেবে। আমি আরো বুঝতে পারি, সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন বাদেও ভারতের মতো একটি দেশে এটাই হবে সর্বোত্তম রাজনৈতিক সমাধান। ভারতবর্ষ একটি বিরাট দেশ এবং এদেশ 'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান' দ্বারা বহুধা-বিভক্ত। সুতরাং এই বিবিধের মাঝে মিলনসেতু স্থাপন করতে হলে প্রদেশসমূহের হাতে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার ছেড়ে দিতে হবে।

আমার মনে ক্রমে ক্রমে এই চিত্রটি আরো সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে মন্ত্রি-মিশনের ভারত আগমনে। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা এখানে বলে রাখা দরকার, আমার এই চিন্তাধারা সম্বন্ধে তখনো আমি আমার সহকর্মীদের সঙ্গে কোনোরকম আলোচনা করিনি। আমি মনে মনে স্থির করেছিলাম, এসব বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করবো।

মন্ত্রিমিশনের সদস্যদের সঙ্গে সর্বপ্রথম আমি দেখা করি ১৯৪৬-এর ৬ই এপ্রিল। মিশন তাঁদের আলোচনার জন্য কতকগুলো প্রশ্ন আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিলেন। প্রথম প্রশ্নটি ছিলো ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে। মিশন যখন আমাকে জিজ্ঞেস করেন, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান আমি কিভাবে করতে চাই, তার উত্তরে আমি আমার পূর্ব অভিমতেরই পুনরুক্তি করি। এরপর আমি যখন বলি, কেন্দ্রের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়গুলোর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট এবং একটি স্বেচ্ছাধীন তালিকা থাকবে তখন লর্ড পেথিক

লরেন্স বলেন, 'আপনি সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য এক নতুনতর পথের কথা বলছেন।'

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস আমার এই প্রস্তাবটিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে এ বিষয়ে আমাকে জেরা করতে শুরু করেন। অবশেষে তিনিও আমার এই নতুন প্রস্তাবে রীতিমতো খুশি হন।

এরপর ১২ এপ্রিল যখন ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন শুরু হয় তখন আমি মন্ত্রিমিশনের সঙ্গে আমার আলোচনার বিষয়বস্তু কমিটির কাছে প্রকাশ করি। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানকল্পে আমি যে অভিমত প্রকাশ করে-ছিলাম তা আরো বিশদভাবে আমি ব্যাখ্যা করি। এই প্রথমবার গান্ধীজী এবং আমার সহকর্মীরা আমার পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করবার সুযোগ পান। ওয়ার্কিং কমিটি প্রথমদিকে এ বিষয়ে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব গ্রহণ করেন যার ফলে কমিটির সদস্যরা নানারকম সন্দেহের কথা ব্যক্ত করে বাধার সৃষ্টি করতে থাকেন। আমি তাঁদের সমস্ত সন্দেহের নিরসন করে তাঁদের বিভিন্ন প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর দিয়ে তাঁদের আপত্তি খণ্ডন করতে সক্ষম হই। অবশেষে ওয়ার্কিং কমিটি আমার প্রস্তাবের সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করেন। গান্ধীজীও আমার প্রস্তাবে পূর্ণ সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

গান্ধীজী এই বলে আমাকে অভিনন্দন জানান, এ যাবৎ যে সমস্যা নিয়ে সবাই বিব্রত হয়েছিলেন আমি সেই সমস্যার একটি সুষ্ঠু সমাধানের পথ বের করেছি। তিনি আরো বলেন আমার এই সমাধান গোঁড়া সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম লীগপন্থীদের মন থেকেও সবরকম ভয় দূর করতে সমক্ষ হবে এবং এর ফলে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে জাতীয় মনোভাবের সৃষ্টি হবে। গান্ধীজীও সুস্পষ্টভাবে বলেন, ভারতের মতো একটি দেশের পক্ষে ফেডারেল গঠনতন্ত্রই সর্বোত্তম। তিনি তাই আমার সমাধানের পন্থাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, যদিও এটা কোনো নতুন পন্থা নয়, তবুও ভারতীয় ফেডারেশনের ব্যাপারে এটি অবশ্যই একটি সুচিন্তিত পথ।

সর্দার প্যাটেল আমাকে জিজ্ঞেস করেন, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা শুধু তিনটিমাত্র বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে কিনা। তিনি বলেন, এই তিনটি বিষয় ছাড়া কারেন্সি এবং আর্থিক বিষয়ও কেন্দ্রের এক্তিয়ারে থাকা দরকার। তিনি আরো বলেন, ব্যবসায় এবং শিল্পকে সর্বভারতীয় পর্যায়ে উন্নত করতে হলে ও দুটি ক্ষেত্রেও কেন্দ্রের আধিপত্য থাকা দরকার এবং ব্যবসায়-সংক্রান্ত

নীতিও এইভাবেই নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন।

তাঁর এইসব আপত্তির উত্তর আমাকে আর দিতে হয় না। গান্ধীজী নিজেই আমার অভিমত গ্রহণ করে সর্দার প্যাটেলের প্রশ্নাবলীর উত্তর দেন। তিনি বলেন, এ কথা মনে করবার কোনোই কারণ নেই যে কারেন্সী এবং শুল্ক ইত্যাদির ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করবে। তাদের নিজেদের স্বার্থেই এ ব্যাপারে তারা একটি ঐক্যবদ্ধ নীতি গ্রহণ করবে। সুতরাং কারেন্সি অথবা আর্থিক বিষয় সুনির্দিষ্ট তালিকার অঙ্গীভূত করবার কোনো কারণ নেই।

পাকিস্তান প্রস্তাব মুসলমানদের পক্ষে ক্ষতিকর

মুসলিম লীগ তার লাহোর প্রস্তাবে ভারত বিভাগের কথা বলে। পরবর্তী-কালে এই প্রস্তাবটি 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে আখ্যাত হয়। মুসলিম লীগের আশঙ্কা দূর করবার উদ্দেশ্যেই আমি আমার ওই সমাধান প্রস্তাব এনেছিলাম। প্রস্তাবটি নিয়ে আমার সহকর্মীদের সঙ্গে এবং মন্ত্রিমিশনের সঙ্গে আলোচনা করবার পরে আমার মনে হয়, বিষয়টি এবার দেশবাসীকে জানানো দরকার। এই কথা মনে হতেই আমি ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল এক বিবৃতি মারফত আমার প্রস্তাবের বিষয়বস্তু প্রচার করি। এখন (অর্থাৎ এই গ্রন্থ রচনাকালে—অনুবাদক) ভারত বিভাগ নির্ধারিত হয়ে গেলেও এবং (পূর্বোক্ত প্রস্তাবের পরে) দশ বছর পার হয়ে গেলেও আমি সুস্পষ্ট-ভাবে দেখতে পাচ্ছি, আমার সেই বিবৃতিতে যে কথা তখন বলেছিলাম সেই কথাই সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। উক্ত বিবৃতিতে ভারতীয় সমস্যার সমাধান সম্পর্কে আমার সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশিত হয়েছিলো বলে বিবৃতিটিকে এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

> আমি মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব সম্পর্কে নানা দিক থেকে বিচার-বিবেচনা করে দেখেছি। একজন ভারতবাসী হিসেবে ভবিষ্যৎ ভারতে এর প্রতিক্রিয়ার প্রশ্নও আমি বিশেষভাবে পরীক্ষা করেছি। আবার একজন মুসলমান হিসেবে মুসলমানদের ভাগ্যের ওপরে এর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে সে কথাও বিচার-বিবেচনা করে দেখেছি।

প্রস্তাবটির সব দিক বিচার-বিবেচনা করে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি এটা ভারতের পক্ষে বিপজ্জনক তো বটেই, মুসলমানদের পক্ষেও এটা বিপজ্জনক। প্রকৃতপক্ষে এর ফলে আরো অনেকরকম সমস্যার সৃষ্টি হবে।

আমি অকপটে স্বীকার করছি, 'পাকিস্তান' কথাটাই আমার বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ করছে। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে পৃথিবীর কিছু অংশ পবিত্র বা খাঁটি এবং বাকি অংশ অপবিত্র বা মেকি। এইভাবে, অর্থাৎ 'পবিত্র' এবং 'অপবিত্র' (অর্থাৎ 'খাঁটি' এবং 'মেকি') হিসেবে বিভিন্ন অঞ্চলকে বিভক্ত করার প্রস্তাবটা ইসলাম-বিরোধী ; ইসলামের অন্তর্নিহিত ঔদার্য এর দ্বারা বিঘ্নিত হচ্ছে। ইসলাম এ ধরনের কোনো বিভাগ স্বীকার করে না। ইসলাম ধর্মের রসুল বলেছেন—'আল্লাহ্ সমগ্র পৃথিবীকে আমার জন্য একটি মসজিদে পরিণত করেছেন।'

উপরন্তু পাকিস্তান পরিকল্পনাটি একটি পরাজয়সুলভ মনোবৃত্তির ফলে উদ্ভূত হয়েছে। ইহুদীরা যেভাবে তাদের জন্য বাসভূমির দাবী করছে, এটাও ঠিক সেই রকমই একটি দাবী। এই প্রস্তাব দ্বারা এটা স্বীকার করা হয়েছে, ভারতীয় মুসলমানরা সামগ্রিকভাবে ভারতে বাস করার পরিবর্তে তাদের জন্য নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলে গিয়ে বাস করতে চায়।

ইহুদীদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি লোকের সহানুভূতি আছে, কারণ তারা যাযাবরের মতো সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। তাদের কোনো নিজস্ব বাসভূমি নেই যেখানে তারা নিজেদের সরকার গঠন করে নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।* কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। সংখ্যার দিক থেকে ন কোটিরও বেশী হওয়ায় ভারতের জনজীবনে এঁরা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন এবং সংখ্যাগত ও গুণগত দিক থেকে যে-কোনো শাসনতান্ত্রিক অথবা নীতিনির্ধারণের ব্যাপারেও এঁরা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে সক্ষম। এ ব্যাপারে প্রকৃতিও তাঁদের সাহায্য করেছে। কারণ মুসলমানরা কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলেই অধিক সংখ্যায় বাস করছেন।

এই সব কথা বিবেচনা করলে স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারা যায়,

---

* এই বিবৃতি যখন প্রচারিত হয়েছিলো তখন পর্যন্ত ইজরায়েল রাষ্ট্র স্থাপিত হয়নি।—অনুবাদক।

পাকিস্তান-দাবীর কোনো অন্তর্নিহিত শক্তি নেই। একজন মুসলমান হিসেবে আমি এক মুহূর্তের জন্যও সমগ্র ভারতের ওপর আমার দাবী তথা সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাসের ব্যাপারে আমার অংশকে পরিহার করতে আমি প্রস্তুত নই। আমার কাছে এটা ভীরুতা ছাড়া আর কিছু নয়।

সকলেই জানেন, মিঃ জিন্নার পাকিস্তান পরিকল্পনা দ্বি-জাতি তত্ত্বের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর তত্ত্ব হলো, ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন জাতি বাস করে এবং ওইসব জাতির ধর্মবিশ্বাসও আলাদা। এইসব জাতির মধ্যে প্রধান দুটি জাতি হলো হিন্দু আর মুসলমান। সুতরাং এই দুটি প্রধান জাতির জন্য দুটি আলাদা রাষ্ট্র অবশ্যই প্রয়োজন।

ডঃ এডোয়ার্ড টমসন একদা মিঃ জিন্নাকে বলেছিলেন, হিন্দু মুসলমান সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ হাজার হাজার শহরে, গ্রামে ও পল্লীতে একসঙ্গে মিলেমিশে বাস করছে। তার উত্তরে মিঃ জিন্না বলেন, এর দ্বারা তাদের আলাদা জাতিত্ব বিঘ্নিত হয় না। মিঃ জিন্নার মতে উভয় জাতির লোকেরা গ্রাম, শহর ও বিভিন্ন অঞ্চলে পাশাপাশি বাস করলেও পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিরোধী মনোভাব পোষণ করে এবং এই কারণেই তাদের উভয়ের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের প্রয়োজন।

আমি বিভিন্ন সমস্যার কথা বাদ দিয়ে এখানে শুধু মুসলমানদের স্বার্থের কথাটাই আগে বিচার করছি। আমি এ বিষয়ে আরো অগ্রসর হয়ে বলতে চাই, আমাকে যদি বুঝিয়ে দেওয়া যায় পাকিস্তান পরিকল্পনার দ্বারা মুসলমানদের সত্যিই কোনো মঙ্গল হবে তাহলে আমিই সর্বাগ্রে এই নীতিকে মেনে নেবো এবং অপরেও যাতে মেনে নেয় তার জন্য কাজ করে যাবো। কিন্তু প্রকৃত কথা হলো, আমি যদি এই পরিকল্পনাকে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থের দিক থেকে বিচার করি তাহলেও আমি বাধ্য হয়ে এই সিদ্ধান্তে আসি যে এর দ্বারা তাঁদের (মুসলমানদের) কোনোই সুরাহা হবে না এবং তাঁদের মন থেকে ভীতিও দূর হবে না।

এবার নিরপেক্ষভাবে পাকিস্তান পরিকল্পনার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করা যাক। ধরে নেওয়া গেলো, ভারতবর্ষ দুটি আলাদা রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছে ; একটি রাষ্ট্রে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অপর রাষ্ট্রে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু হিন্দুস্থান রাষ্ট্রে সাড়ে তিন কোটি মুসলমান ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বাস করবেন।

উত্তরপ্রদেশে শতকরা ১৭, বিহারে শতকরা ১২ এবং মাদ্রাজে শতকরা ৯ জন মাত্র মুসলমান হওয়ায় এঁরা বর্তমানে যেভাবে হিন্দুসংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে বাস করছেন, তার চেয়ে অনেক দুর্বল হয়ে যাবেন। হাজার বছরেরও বেশী এঁরা এইসব অঞ্চলে বাড়ি-ঘর করে বাস করছেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম সংস্কৃতি ও মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্র স্থাপন করেছেন।

হঠাৎ একদিন নিশি ভোর হলে তাঁরা সবিস্ময়ে দেখতে পাবেন, নিজ বাসভূমিতে তাঁরা বিদেশী হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। শিল্প, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক দিকে পশ্চাৎপদ হওয়ায় তাঁরা হিন্দুদের দয়ার ওপরে বসবাস করতে বাধ্য হবেন, যার ফলে ওইসব অঞ্চলে নির্ভেজাল 'হিন্দ-রাজ'-এর সৃষ্টি হবে।

অপর পক্ষে, পাকিস্তান রাষ্ট্রেও তাঁদের অবস্থা মোটেই সুখকর হবে না। পাকিস্তানের কোনো অঞ্চলেই মুসলমানরা এমন সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না, যেরকম সংখ্যাগরিষ্ঠতা হিন্দুস্থান রাষ্ট্রে হিন্দুরা পাবেন।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দুদের চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও উভয়ের সংখ্যার ব্যবধান হবে খুবই কম। কিন্তু ওইসব অঞ্চলে অমুসলমানরা অর্থনৈতিক, শিক্ষা এবং রাজনৈতিক দিকে যেরকম প্রাধান্য নিয়ে বাস করছেন তাতে সব-কিছুই বানচাল হয়ে যেতে পারে। এরকম যদি নাও হয় এবং পাকিস্তানে যদি মুসলমানরা বিরাটভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, তাহলেও হিন্দুস্থানের মুসলমানদের কোনো সমস্যাই এঁরা সমাধান করতে পারবেন না।

দুটি রাষ্ট্র যদি বিবদমান হয় তাহলে একে অপরের সংখ্যালঘুদের সমস্যার সমাধান তো করতে পারবেই না, উপরন্তু উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস সঞ্জাত হবার ফলে পারস্পরিক শত্রুতারই সৃষ্টি করবে। অতএব পাকিস্তান পরিকল্পনার দ্বারা মুসলমানদের কোনোরকম সমস্যারই সমাধান হবে না। যেখানে তারা সংখ্যালঘু সেখানেও তাদের স্বার্থরক্ষা করতে পারবে না, কিংবা পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে ভারত অথবা পৃথিবীর কোনো ব্যাপারেই তাঁরা নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না, অথচ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তাঁরা একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের সুযোগ পাবেন।

এখানে তর্ক উঠতে পারে, পাকিস্তান যদি মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থীই হবে তাহলে বিরাটসংখ্যক মুসলমান এর জন্য এতোটা লালায়িত হয়ে

উঠেছেন কেন? এর উত্তর পাওয়া যেতে পারে কয়েকজন গোঁড়া হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীর মনোভাব দেখে। মুসলিম লীগ যখন পাকিস্তানের কথা বলতে শুরু করে, এঁরা তখন পাকিস্তান পরিকল্পনার মধ্যে মুসলিম জগতের এক ষড়যন্ত্র দেখতে পান এবং ভারতীয় মুসলমানদের আন্তর্ভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তির কথা মনে করে ভীত হয়ে এর বিরুদ্ধতা করতে থাকেন।

এঁদের এই বিরোধিতার ফলে লীগের সুবিধাই হয়। হিন্দুদের এই বিরোধিতাকে লীগ নেতাদের কাছে হিন্দু-বিরোধিতার নজীর হিসেবে প্রকাশ করতে থাকেন। এই চিন্তাধারার ফলে তাঁরা বলতে থাকেন, হিন্দ কর্তৃক পাকিস্তানের এইরকম বিরোধিতার ফলে এটিই প্রমাণিত হচ্ছে পাকিস্তান মুসলমানদের সুবিধে করবে। এই ব্যাপারে তাঁরা এতো বেশি সোচ্চার হয়ে ওঠেন যার ফলে এমন এক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, যাতে স্থির মস্তিষ্কে কোনো বিষয় চিন্তা না করে সাম্প্রদায়িকতার পথে দ্রুত ধাবিত হন। যুব সম্প্রদায়ই এ ব্যাপারে বেশী করে অগ্রসর হন। আমার মনে তাই কোনোরকম সন্দেহই থাকে না যেরাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক উত্তাপ যখন আর থাকবে না এবং সমগ্র বিষয়টি নিয়ে যখন স্থিরমস্তিষ্কে চিন্তা করা যাবে তখন আজ যাঁরা পাকিস্তানের সমর্থনে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন তাঁরাই এটাকে মুসলিম স্বার্থের পরিপন্থী এবং ক্ষতিকর পরিকল্পনা বলে বর্ণনা করবেন।

আমি যে সমাধান মেনে নেবার জন্য কংগ্রেসকে সম্মত করতে সক্ষম হয়েছি তাতে পাকিস্তান পরিকল্পনার অবাঞ্ছিত বিষয়গুলো থাকবে না, অথচ পাকিস্তানের মূলকথা তাতে অবশ্যই থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারে হিন্দুদের প্রাধান্য থাকবে বলে মুসলমানদের মনে এই ভয়টা ঢুকে গেছে, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশেও কেন্দ্রীয় সরকার অশুভ প্রভাব বিস্তার করে মুসলমানদের স্বার্থকে পদদলিত করবে। এই ভয় থেকেই পাকিস্তান পরিকল্পনা উদ্ভূত হয়েছে। মুসলমানদের এই ভীতি নিরসন করবার জন্য কংগ্রেস প্রাদেশিক স্তরে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার দিতে সম্মত হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কি কিঁ বিষয় থাকবে সে সম্বন্ধেও কংগ্রেস দুটি তালিকা তৈরি করেছে। এই তালিকা দুটির একটি হলো আবশ্যিক এবং অপরটি হলো স্বেচ্ছাধীন। এই স্বেচ্ছাধীন বিষয়গুলো প্রাদেশিক সরকারসমূহ ইচ্ছা করলে কেন্দ্রের হাতে ছেড়ে দিতে পারে

কিংবা নিজেদের হাতেও রাখতে পারে, কংগ্রেসের এই পরিকল্পনা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোর উন্নতির পথে কোনোরকম বাধার সৃষ্টি তো করবেই না, উপরন্তু প্রদেশগুলোকে প্রায় স্বাধীনভাবে চলবার সুযোগ দিয়েছে। এই পরিকল্পনা যদি কার্যকর হয়, তাহলে প্রদেশসমূহ সব সময়ই কেন্দ্রের ওপরে তাদের প্রভাব বিস্তার করবার সুযোগ পাবে।

ভারতবর্ষের পরিস্থিতি এমনই যাতে সর্বক্ষমতাযুক্ত কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করতে চেষ্টা করা হলে সে প্রচেষ্টা বিফল হতে বাধ্য। আবার ভারত বিভাগের প্রচেষ্টাও, অর্থাৎ ভারতকে দুটি আলাদা রাষ্ট্রে পরিণত করবার প্রচেষ্টাও বিপর্যয় ডেকে আনবে। এইসব প্রশ্ন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই, কংগ্রেসের পরিকল্পনাটাই সর্বোত্তম পন্থা, কারণ এই পরিকল্পনায় কেন্দ্র এবং প্রদেশসমূহের মধ্যে একটা সুষ্ঠু সমঝোতার সৃষ্টি হবে। কংগ্রেসের এই পরিকল্পনা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে বস্তুতপক্ষে পাকিস্তান পরিকল্পনারই সামিল হবে। অপরপক্ষে পাকিস্তান পরিকল্পনায় যেসব অসুবিধে রয়েছে সেগুলোও এতে থাকবে না। অর্থাৎ এই পরিকল্পনায় মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশসমূহে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার ভয়ও মুসলমানদের থাকবে না।

আমি তাঁদেরই মধ্যে একজন যাঁরা বর্তমান সাম্প্রদায়িক তিক্ততার অধ্যায়কে ভারতীয় জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে মনে করেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ভারত তার নিজের ভাগ্য নিজে নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার পাবার সঙ্গে সঙ্গেই এ সমস্যা আর থাকবে না। এই প্রসঙ্গে গ্ল্যাডস্টোনের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, জল দেখে যারা ভয় পায় তাদের মন থেকে জল-ভীতি দূর করবার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো তাদের জলের ভেতরে নিক্ষেপ করা। ঠিক এইভাবে সন্দেহবাদীদের মন থেকে সমস্ত সন্দেহ এবং ভীতি নিরসন করবার আগেই ভারতকে তার নিজের ভাগ্য নিজে নিয়ন্ত্রণ করবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

ভারত যখন তার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ করবে তখনই সে বর্তমান সাম্প্রদায়িক সন্দেহ ও বিরোধের অধ্যায়কে ভুলে গিয়ে যাবতীয় সমস্যাগুলোকে আধুনিক জীবনধারা অনুসারে সমাধান করতে সচেষ্ট হবে। মতভেদ এবং বৈষম্য তখনও যে থাকবে না তা নয়, তবে সেগুলো হবে

অর্থনৈতিক অসাম্য। সাম্প্রদায়িক বৈষম্য কদাচ নয়। রাজনৈতিক দলগুলোর ক্রিয়াকলাপ তখনও চলতে থাকবে। কিন্তু সেসব ক্রিয়াকলাপ ধর্মের ভিত্তিতে না হয়ে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ভিত্তিতে চলবে। ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে সম্প্রদায়ের পরিবর্তে শ্রেণীই বেশী করে প্রাধান্য অর্জন করবে। তর্কের খাতিরে যদি বলা হয় এটা একটা বিশ্বাস মাত্রা এবং বাস্তবক্ষেত্রে এটা অকার্যকর বলে প্রমাণিত হবে, তাহলে আমি বলবো, ভারতের ন কোটি মুসলমান এমন এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করবেন যা কোনো অবস্থাকেই কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। নিজেদের স্বার্থরক্ষা করবার এবং নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবার মতো যথেষ্ট শক্তি তাদের আছে।

মুসলিম লীগ তার লাহোর প্রস্তাবের পরে ভারত বিভাগের পরিকল্পনা নিয়ে আরো এগিয়ে এসেছে। তবে লীগ যে আসলে কি চায় তা সে কোনো সময়েই সুস্পষ্ট করে বলেনি। লীগের প্রতিটি প্রস্তাবের ভাষাই প্রায় অর্থহীন এবং কখনো কখনো দ্ব্যর্থবোধক। তবে প্রস্তাবের ভাষা যাই হোক না কেন, একটি বিষয় তাতে খুবই স্পষ্ট ছিলো। মুসলিম লীগ আগে দাবা করছিলো, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার দিতে হবে। এই প্রস্তাব সিকান্দার হায়াৎ খানও সমর্থন করেন। কিন্তু বর্তমানে লীগ নেতারা তাঁদের দাবীর বহর আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁরা এখন প্রায়ই ভারত বিভাগের কথা এবং মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলি নিয়ে একটি আলাদা স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের কথা বলতে শুরু করেছেন। মন্ত্রিমিশন কিন্তু এই দাবী মেনে নিতে সম্মত নন। তাঁরা আমার পরিকল্পনাটিকেই সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট পন্থা বলে মনে করতে থাকেন।

মন্ত্রিমিশনের সঙ্গে আলোচনা

এপ্রিল মাসের শেষ পর্যন্ত আলোচনা চলে। এই আলোচনার সময় অনেকবার মিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়েছে এবং মিশনও অনেকবার তাঁদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছেন। এই সময় মিশন কিছুদিনের ছুটি নিয়ে কাশ্মীরে বেড়াতে যান। গ্রীষ্মকাল এসে পড়ায় দিল্লী তখন দিনের পর দিন উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। আমিও এই সময় কয়েকদিন বিশ্রাম নেবার জন্য ব্যগ্র

হয়ে পড়ি। প্রথম দিকে মনে মনে স্থির করি আমি কাশ্মীরে যাবো। এই চিন্তা করে কাশ্মীরের বন্ধুদের কাছে আমি চিঠিও লিখি। কিন্তু যখন আমি জানতে পারলাম মন্ত্রিমিশনের সদস্যরা কাশ্মীরে যাচ্ছেন, আমি তখন আমার পূর্বসিদ্ধান্ত বাতিল করি। আমার মনে হয়, আমি যদি এই সময় কাশ্মীরে থাকি তাহলে অনেকে হয়তো ব্যাপারটাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করবেন। তাঁরা হয়তো বলবেন, মিশনের সদস্যদের প্রভাবিত করবার উদ্দেশ্যেই আমি কাশ্মীরে গেছি। সুতরাং আমি আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে মুসুরী যাবো বলে স্থির করি।

আমি আগেই বলেছি, ক্রিপস মিশন বিফল হবার পরে শ্রীরাজাগোপালাচারী প্রচার শুরু করেন কংগ্রেসের পক্ষে মুসলিম লীগের দাবী মেনে নেওয়া উচিত। ভারত বিভাগের কথাও তিনি নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছিলেন। এইরকম প্রচার ও মতবাদের ফলে তিনি ওয়ার্কিং কমিটি থেকে বেরিয়ে যান এবং কংগ্রেসীদের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা হারান। গান্ধীজীও রাজাজীর ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন করেননি। রাজাজী মন্ত্রিমিশনের সঙ্গে দেখা করুন বা আলোচনা করুন এটাও তিনি চাননি। রাজাজীকে তিনি মাদ্রাজেই থাকতে বলেন। রাজাজী এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। তবে ক্ষুব্ধ হলেও কিছুদিন চুপ করে থাকেন। আমি যখন বিশ্রামের জন্য মুসুরীতে ছিলাম তখন রাজাজীর কাছ থেকে আমি একটি চিঠি পাই। সেই চিঠি থেকে আমি সর্বপ্রথম জানতে পারি গান্ধীজী তাঁকে দিল্লীতে আসতে নিষেধ করেছেন। আমার তখন মনে হয় গান্ধীজী হয়তো এখনও রাজাজীর দিল্লীতে আসাটা চান না। আমি তাই গান্ধীজীর সঙ্গে এ বিষয়ে কোনোরকম পরামর্শ না করে নিজের দায়িত্বেই রাজাজীকে লিখি. তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে দিল্লীতে আসতে পারেন। আমার চিঠি পেয়েই তিনি দিল্লীতে চলে আসেন। গান্ধীজী এতে একটু বিরক্ত হন। কিন্তু আমি তাঁকে বলি, আমার চিঠি পেয়েই রাজাজী দিল্লীতে এসেছেন। আমি গান্ধীজীকে আরো বলি, রাজাজীকে দিল্লীতে আসতে বাধা দেওয়াটা আমি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করিনি।

২৪শে এপ্রিল মিশন পুনরায় দিল্লীতে ফিরে আসেন এবং ফিরে এসেই ভাইসরয়ের সঙ্গে আলোচনা করেন। বারকয়েক আলোচনার পরে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস সেইসব আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে আসেন। ২৭শে এপ্রিল মিশন এক বিবৃতি প্রচার করেন। বিবৃতির মাধ্যমে তাঁরা বলেন, দুই প্রধান দলের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির জন্য আরো

আলোচনার প্রয়োজন আছে। মিশনের সদস্যরা এরপর কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্টদ্বয়কে নিজ নিজ দল থেকে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে অনুরোধ করেন। মিশন আরো বলেন, ওই দুটি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরাই সিমলাতে মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। এই ব্যাপারে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আমাকে কয়েকজন প্রতিনিধি মনোনীত করবার দায়িত্ব দেন। আমি তখন জওহরলাল এবং সর্দার প্যাটেলকে আমার সহকর্মী হিসেবে মনোনীত করি। স্থির হয় যে তিনজনের এই প্রতিনিধি সভাই কংগ্রেসের তরফ থেকে আলোচনা চালাবে। গভর্নমেণ্ট আমাদের সিমলায় থাকার ব্যবস্থা করে দেন। গান্ধীজী যদিও আলোচনা সভার সদস্য ছিলেন না, তবুও মিশন তাঁকে সিমলায় আসতে অনুরোধ করেন। প্রয়োজন হলে তাঁর সঙ্গেও যাতে আলোচনা করা যায় সেই উদ্দেশ্যেই মিশন তাঁকে সিমলায় আসতে অনুরোধ করেন। মিশনের এই অনুরোধ তিনি মেনে নেন এবং সিমলায় এসে মানোর ভিলায় বাস করতে থাকেন। ওখানে ওয়ার্কিং কমিটির সভা হয় এবং গান্ধীজী সে সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সিমলাতে আলোচনা শুরু হয় ২রা মে এবং সে আলোচনা চলে ১২ই মে পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে সরকারীভাবে আলোচনা করা ছাড়াও আমরা বে-সরকারীভাবে মিশনের সঙ্গে কয়েকবার আলোচনা করি। আমি তখন 'রিট্রিটে' বাস করছিলাম। মিশনের সদস্যরা ওখানে এসেও কয়েকবার আমার সঙ্গে দেখা করেন। আমিও কয়েকবার তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যাই এবং কয়েকবার এককভাবে এবং কয়েকবার যৌথভাবে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করি। এই আলোচনার সময় আসফ আলী এবং হুমায়ুন কবিরও আমার সঙ্গে থাকতেন।

প্রায় দু সপ্তাহ পরে আমরা দিল্লীতে ফিরে আসি। ওখানে এসে মন্ত্রিসভার সদস্যরা তাঁদের নিজেদের মধ্যে আরো আলোচনা করে তাঁদের প্রস্তাব তৈরি করেন। তাঁদের সেই প্রস্তাব মিঃ এটলি কর্তৃক ১৬ই মে বিলাতের কমন্স সভায় বিবৃত হয়। পরিকল্পনার বিষয়বস্তু নিয়ে একটি শ্বেতপত্রও রচিত হয়। শ্বেতপত্রে বলা হয়, মন্ত্রিমিশন তাঁদের সেই প্রস্তাবকেই ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের সর্বোত্তম প্রস্তাব বলে বিবেচনা করেন। মন্ত্রিমিশনের এই প্রস্তাব এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে উদ্ধৃত করা হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকরা উক্ত প্রস্তাব এবং আমার ১৫ই এপ্রিলের পরিকল্পনা তুলনামূলকভাবে পড়ে দেখতে পারেন।

সিমলাতে যে আলোচনা হয়েছিলো তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আরো আলোচনার পক্ষপাতী ছিলাম। আমি তাই লর্ড ওয়াভেলকে বলি, দিল্লীর উত্তপ্ত আবহাওয়ার মধ্যে আলোচনা না করে সিমলার শীতল আবহাওয়াতেই আলোচনার সমাপ্তি হলে ভালো হয়। এর উত্তরে লর্ড ওয়াভেল আমাকে বলেন, তিনি যদি খুব বেশীদিন দিল্লীর বাইরে থাকেন তাহলে সরকারী কাজে অসুবিধে হবে। আমি এ ব্যাপারে মন্তব্য করি, দিল্লীর বড়লাটভবন শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় তাঁর পক্ষে এখানে থাকা অসুবিধেজনক না হলেও মন্ত্রিমিশনের সদস্যবৃন্দ এবং আমাদের পক্ষে এখানে থাকা রীতিমতো কষ্টকর এবং দিল্লীর জ্বলন্ত চুল্লীর মধ্যে বসে ঠাণ্ডা মাথায় আলোচনা করা অত্যন্ত অসুবিধেজনক। লর্ড ওয়াভেল বলেন, এটা মাত্র কয়েকটা দিনের ব্যাপার।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো, মে মাসের বাকি দিনগুলো এবং পুরো জুন মাস আমাদের দিল্লীতে থাকতে হলো। এ বছর আবহাওয়া ছিলো অস্বাভাবিক রকমে উত্তপ্ত। মন্ত্রিমিশনের সদস্যরাও এটা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। কারণ গরম সহ্য করতে না পেরে লর্ড পেথিক লরেন্স একদিন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন। ভাইসরয় আমার জন্য একটি শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষের ব্যবস্থা করেছিলেন। এতে আমার পক্ষে কিছুটা সুবিধে হলেও সকলেই চাইছিলেন আলোচনাটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মতানৈক্যের কিছুতেই সমাধান করা গেলো না; ফলে আলোচনা শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হলো না।

মন্ত্রিমিশন এবং তাঁদের পরিকল্পনা নিয়ে আমরা যখন মাথা ঘামাচ্ছি সেই সময় কাশ্মীরে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অঙ্গীভূত হয়। কাশ্মীরের জনগণের রাজনৈতিক অধিকারের জন্য ওখানকার ন্যাশনাল কনফারেন্স শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মন্ত্রিমিশন ভারতে আসবার পর তিনি তাঁর দাবীকে আরো জোরদার করবার জন্য 'কাশ্মীর ছাড়ো' ধ্বনি তুলে মন্ত্রিমিশনের কাছে তাঁর দাবী পেশ করেন। তাঁর দাবী হলো, কাশ্মীরের মহারাজাকে তাঁর স্বেচ্ছাচারতন্ত্র পরিহার করে জনগণের হাতে স্বায়ত্তশাসনাধিকার দিতে হবে। মহারাজার সরকার এর উত্তর দেন শেখ আবদুল্লা এবং তাঁর সহকর্মীদের গ্রেপ্তার করে। কিছুদিন আগে ন্যাশনাল কনফারেন্সের একজন প্রতিনিধিকে সরকারেরর ভেতরে স্থান দেওয়া হয়েছিলো। এর ফলে আশা করা গিয়েছিলো ওখানকার সমস্যার একটা সমাধান হয়তো হবে। কিন্তু শেখ আবদুল্লা এবং তাঁর

সহকর্মীদের গ্রেপ্তারে সমাধানের আশা সুদূরপরাহত হয়ে পড়ে।

জওহরলাল কাশ্মীরের রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রতি সব সময়ই সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি চাইতেন ওখানে জনপ্রতিনিধিমূলক সরকার গঠিত হোক। তাই ওখানে যখন এইরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তখন তিনি কাশ্মীরে যাবেন বলে স্থির করেন। ন্যাশনাল কনফারেন্সের যেসব সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো, আদালতে তাঁরা যাতে ভালোভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারেন তার জন্য আইনগত সাহায্য দেবার প্রয়োজনও অনুভূত হয়েছিলো। আমি আসফ আলীকে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছিলাম। জওহরলাল বলেন, তিনিও আসফ আলীর সঙ্গে যাবেন। এর পরেই তাঁরা দুজনে কাশ্মীরে রওনা হন। মহারাজার সরকার আমাদের এই সিদ্ধান্তের কথা জেনে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয় এবং ওঁদের কাশ্মীরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে এক আদেশ জারি করে। ফলে ওঁরা যখন রাওলপিণ্ডি পরিত্যাগ করে কাশ্মীর সীমান্তে উপস্থিত হন তখন উরিতে তাঁদের গতিরোধ করা হয়। ওঁরা রাজাদেশ মানতে অস্বীকার করেন, ফলে কাশ্মীর সরকার ওঁদের গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনার ফলে সারা দেশে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

এইরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় আমি মোটেই খুশি হতে পারিনি। আমি তাই কাশ্মীর সরকারের ক্রিয়াকলাপের প্রতি ধিক্কার জানালেও এটা মনে করি যে এই সময় কাশ্মীরের ব্যাপার নিয়ে একটা নতুন বিবাদের সৃষ্টি করা উচিত হয়নি। আমি তাই ভাইসরয়কে বলি, ভারত সরকার যদি আমাকে জওহরলালের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলবার সুযোগ করে দেয় তাহলে আমি বাধিত হবো। তাঁকে (জওহরলালকে) একটি ডাকবাংলোয় রাখা হয়েছিলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি সেখানকার সঙ্গে টেলিফোন-সংযোগ পেয়ে যাই। ফোনে আমি জওহরলালকে বলি, আমার মতে এক্ষুণি তাঁর দিল্লিতে ফিরে আসা দরকার। বর্তমান সময়ে তাঁর পক্ষে কাশ্মীরে প্রবেশ করবার জন্য পীড়াপীড়ি করা ঠিক হবে না। কাশ্মীরের ব্যাপারে আমি তাঁকে বলি, কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসেবে এ ব্যাপারে যা করণীয় তা আমিই করবো। শেখ আবদুল্লা এবং তাঁর সহকর্মীদের মুক্তির জন্য আমি চেষ্টা করবো। কিন্তু জওহরলালের এখুনি ফিরে আসা দরকার।

প্রথমে জওহরলাল এতে আপত্তি জ্ঞাপন করেন, কিন্তু পরবর্তী আলোচনার ফলে এবং বিশেষ করে আমি যখন বলি কাশ্মীরের বিষয়টি আমি

নজেই দেখবো, তখন তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হন। আমি তখন জওহরলাল এবং আসফ আলীকে ফিরিয়ে আনার জন্য একটি বিমানের ব্যবস্থা করে দিতে লর্ড ওয়াভেলকে অনুরোধ জানাই। সন্ধ্যা প্রায় সাতটার সময় আমি ভাইসরয়কে উপরোক্ত অনুরোধ করি। তিনি সেই রাত্রেই একটি বিমান পাঠিয়ে দেন। রাত প্রায় দশটার সময় বিমান শ্রীনগরে পৌঁছয় এবং রাত প্রায় দুটোর সময় জওহরলাল এবং আসফ আলীকে নিয়ে দিল্লীতে ফিরে আসে। এ ব্যাপারে লর্ড ওয়াভেল প্রথম থেকেই বন্ধুর মতো ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর সেই বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের কথা আমি কোনোদিনই ভুলবো না।

আমি আগেই বলেছি, ১৫ই মে মন্ত্রিমিশন তাঁদের পরিকল্পনাটি প্রকাশ করেছিলেন। এই পরিকল্পনাটি মুলত আমার ১৫ই এপ্রিলের প্রস্তাবের অনুরূপ ছিলো। মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনায় উল্লিখিত হয় যে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বাধ্যতামূলকভাবে থাকবে মাত্র তিনটি বিষয়। এই তিনটি বিষয় হলো প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিভাগ এবং যোগাযোগ বিভাগ। আমার প্রস্তাবেও এই কথাই আমি বলেছিলাম। মিশন আর একটি নতুন বিষয় তাঁদের পরিকল্পনায় জুড়ে দেন। এটি হলো সমগ্র দেশকে ক, খ এবং গ এই তিনটি এলাকায় বিভক্তকরণ। মিশন মনে করেছিলেন এতে সংখ্যালঘুদের মনে আস্থার ভাব ফিরে আসবে। পরিকল্পিত 'খ' এলাকা হিসেবে দেখানো হয়েছিলো পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং ব্রিটিশ বেলুচিস্তান। এটি মুসনমানপ্রধান অঞ্চল। 'গ' এলাকায় দেখানো হয়েছিলো বাংলা এবং আসামকে। এই এলাকায় মুসলমানেরা সংখ্যায় সামান্য কিছু বেশী ছিলেন। মন্ত্রিমিশন মনে করেছিলেন, এই ব্যবস্থায় মুসলিম সংখ্যালঘুদের পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে এবং মুসলিম লীগের আশংকাও বিদূরিত হবে।

মিশন আমার আরো একটি প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। এটি হলো সরকারের বেশির ভাগ বিষয়ই প্রদেশগুলোর কর্তৃত্বাধীনে থাকবে। এই হিসেবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভ করবে। মাত্র কয়েকটি স্বীকৃত বিষয় শুধু কেন্দ্র অথবা প্রদেশগুলোর অধীনে থাকবে। এ ক্ষেত্রেও 'খ' এবং 'গ' এলাকার মুসলমানেরা প্রাধান্য অর্জন করতে পারবেন এবং নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিজেরাই পূরণ করতে পারবেন। কেন্দ্রের হাতে থাকছে তিনটি মাত্র বিষয়। এই বিষয়গুলো প্রদেশসমূহের

হাতে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব ছিলো না। মন্ত্রিমিশনের এই পরিকল্পনা মূলগত-ভাবে আমার প্রস্তাবের অনুরূপ হওয়ায় এবং মাত্র একটি নতুন বিষয় (অর্থাৎ এলাকার ভিত্তিতে দেশ বিভক্তকরণ) ওতে যুক্ত হওয়ায় আমার মনে হয়, পরিকল্পনাটা গ্রহণ করা চলতে পারে।

মিঃ জিন্না প্রথম দিকে এই পরিকল্পনার ঘোর বিরোধিতা করেন। মুসলিম লীগ তার স্বাধীন পাকিস্তানের দাবি নিয়ে তখন এতোটা অগ্রসর হয়েছিলো যে তাদের পক্ষে সেখান থেকে পেছনে সরে আসা রীতিমতো কঠিন ছিলো। মিশন সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন যে দেশ বিভাগ করে নতুন কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য তাঁরা ইংরেজ সরকারকে কিছুতেই বলবেন না। লর্ড পেথিক লরেন্স এবং স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস বার বার বলেছিলেন, মুসলিম লীগের পরিকল্পিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা একটি অবাস্তব পরিকল্পনা। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, আমার পরিকল্পনাটিই ছিলো সব দিক থেকে ভালো, কারণ তাতে প্রদেশসমূহের হাতে সর্বাধিক ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে কেন্দ্রের হাতে শুধু তিনটি মাত্র বিষয় রাখবার কথা বলা হয়েছিলো। লর্ড পেথিক লরেন্স একাধিকবার বলেছিলেন, এই সমাধানসূত্র গ্রহণ করবার ফলে মুসলমানপ্রধান প্রদেশসমূহ প্রথম দিকে তিনটি মাত্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে ছেড়ে দেবে, যার ফলে ওইসব প্রদেশের মুসলমানেরা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভ করবেন। হিন্দুসংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহ আরো কয়েকটি বিষয় স্বেচ্ছায় কেন্দ্রের হাতে ছেড়ে দেবে বলে স্থির হয়। মন্ত্রি-মিশন মনে করেন, এতে কোনোরকম অন্যায় বা জবরদস্তির ব্যাপার নেই। একটি প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রে, কেন্দ্রের এক্তিয়ারে কোন্ কোন্ বিষয় থাকবে তা স্থির করবার স্বাধীনতা যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্থ রাজ্যসমূহের থাকা দরকার।

তিনদিন আলোচনা করবার পর মুসলিম লীগ কাউন্সিল এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শেষদিনে জিন্না স্বীকার করেন, সংখ্যালঘুদের সমস্যা সমাধানকল্পে মন্ত্রিমিশন যে পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছেন তার চেয়ে ভালো সমাধান আর কিছু হতে পারে না। এছাড়া আর কিছু বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। লীগ কাউন্সিলকে তিনি বলেন, মন্ত্রিমিশন যে পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছেন তার চেয়ে বেশী কিছু তিনিও করতে পারতেন না। তিনি তাই কাউন্সিলকে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গ্রহণের পক্ষে ভোট দিতে বলেন।

আমি যখন মুসুরিতে ছিলাম সেই সময় মুসলিম লীগের কয়েকজন সদস্য

আমার সঙ্গে দেখা করে তাঁদের বিস্ময় ও অসন্তুষ্টির কথা আমার কাছে ব্যক্ত করেন। তাঁরা বলেন, মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনাই যখন লীগ কর্তৃক গৃহীত হলো তখন স্বাধীন রাষ্ট্রের জিগির তোলা হয়েছিলো কেন? আমি তাঁদের সঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করি। অবশেষে তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হন, মুসলিম লীগ যাই বলুক না কেন, ভারতের মুসলমানদের কাছে মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনার চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না।

ওয়ার্কিং কমিটিতে বিষয়টি নিয়ে যখন আলোচনা শুরু হয় তখন আমি বলি, কংগ্রেস যে পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিলো, মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনাটিও মূলত সেই অনুসারেই রচিত হয়েছে। সুতরাং ওয়ার্কিং কমিটি একরকম বিনা দ্বিধায়ই পরিকল্পনাটিকে মূলগতভাবে গ্রহণ করেন। তবে আলোচনার সময় ভারতের সঙ্গে কমনওয়েলথের সম্পর্কের কথাটাও উত্থাপিত হয়। আমি মন্ত্রিমিশনকে এ বিষয়টি ভারতের হাতে ছেড়ে দিতে বলি। আমি মনে করেছিলাম, এইভাবেই বিষয়টির সুসমাধান করা সম্ভব হবে। আমি আরো বলেছিলাম যে বিষয়টি যদি ভারতের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে ভারত হয়তো কমনওয়েলথের মধ্যে থাকার জন্যই তার রায় দেবে। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসও এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হন। সুতরাং মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনায় এই বিষয়টিকে ভারতের হাতে ছেড়ে দেবার কথাই উক্ত হয়। এর ফলে মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে। অবশেষে আরো আলোচনার পরে ওয়ার্কিং কমিটি তাঁদের ২৬শে জুনের প্রস্তাবে মিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত ভবিষ্যৎ ভারতের পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়, তবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সম্বন্ধে মিশন যে প্রস্তাব রেখেছিলেন তা ওয়ার্কিং কমিটি গ্রহণ করতে পারেন না।

মিশনের সদস্যদের অভিনন্দন জ্ঞাপন

এই বিষয়ে আমি মন্ত্রিমিশনকে আন্তরিকভাবে সাধুবাদ জ্ঞাপন করতে চাই। তাঁরা যেভাবে সম্পূর্ণ বিষয়টি নিয়ে সুষ্ঠুভাবে বিচার-বিবেচনা করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। মিশনের সদস্যদের মধ্যে স্যার স্ট্যাফোর্ড ছিলেন আমাদের পুরনো বন্ধু। তাঁর সম্বন্ধে আমি আগেই আমার অভিমত জানিয়েছি। তবে লর্ড পেথিক লরেন্স এবং মিঃ আলেকজান্ডারের সঙ্গে আগে আমার দেখা হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের সম্বন্ধে আমি উচ্চ ধারণা পোষণ করি। বিশেষ

করে লর্ড পেথিক লরেন্স যেরকম সহানুভূতিসূচক মনোভাব প্রদর্শন করেন তাতে আমি অত্যন্ত আনন্দলাভ করি। বয়সে তিনি বৃদ্ধ হলেও কর্মশক্তিতে তিনি ছিলেন যুবকের মতো। তাঁর স্বচ্ছ মনোভাব, ভারতের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা এবং মৌলিক অসুবিধেগুলো সম্বন্ধে দ্রুত এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার জন্য আমরা তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করেছি। মিঃ আলেকজান্দার বেশী কথা বলতেন না। কিন্তু যখনই তিনি কিছু বলেছেন তাতে তাঁর কূট রাজনীতি জ্ঞানেরই পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ কর্তৃক মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করাটা একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এর ফলে ভারতের স্বাধীনতা ব্যাপারে সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নটি বিরোধ এবং হিংস-পদ্ধতির মাধ্যমে সমাধান না হয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই সুষ্ঠুভাবে সমাধান করা সম্ভব হয়। এর ফলে আরো দেখা যায়, সাম্প্রদায়িক অসুবিধা-গুলোও পরিহার করা সম্ভব হয়েছে। এই পরিকল্পনা গৃহীত হবার পরে সারা দেশের ওপর দিয়ে এক আনন্দের স্রোত বইতে থাকে এবং দেশবাসীরা তাঁদের স্বাধীনতার দাবিতে একতাবদ্ধ হন। আমরাও এতে আনন্দিত হই। কিন্তু তখনো আমরা জানতাম না এই আনন্দ ক্ষণস্থায়ী। এবং ভবিষ্যতে এক মহা অমঙ্গল এবং অনর্থ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

ভারতবিভাগের প্রাক্-পর্ব

রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের মুখে আসবার পর অপর একটি বিষয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। আমি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলাম ১৯২৯ সালে। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র অনুসারে প্রেসিডেন্ট পদে আমার থাকার কথা মাত্র এক বছর। অবস্থা স্বাভাবিক থাকলে একবার ১৯৪০ সালে এবং আর একবার ১৯৪২ সালে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হতো। কিন্তু ইতিমধ্যে সরকার কর্তৃক কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটি বে-আইনী ঘোষিত হবার ফলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্ভব হয়নি। যার ফলে এই দীর্ঘ সময় আমিই প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করি।

এখন অবস্থা স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে এসেছে; সুতরাং স্বাভাবিকতাবেই নতুন করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অথবা মনোনয়নের প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়।

প্রশ্নটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারত থেকে দাবি ওঠে আমাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনর্নির্বাচিত করতে হবে। যে কারণে আমার পুনর্নির্বাচনের দাবি ওঠে তা হলো- স্যার স্ট্যাফোর্ডক্রিপস, লর্ড ওয়াভেল এবং মন্ত্রিমিশনের সঙ্গে আলোচনায় আমিই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলাম এবং সিমলা সম্মেলনে যখন সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিলো তখন আমিই সর্বপ্রথম রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের পথ বের করতে সক্ষম হয়েছিলাম। কংগ্রেসের মধ্যে তাই একটি দৃঢ় মনোভাব জেগে উঠেছিলো, আমি যেহেতু শেষ পর্যন্ত আলোচনা চালিয়ে এসেছি সেইহেতু এর একটি সুষ্ঠু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এবং সমাধানের পরে বিষয়টি কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত আমার হাতেই সমস্ত বিষয়টি থাকা দরকার। বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিহার এবং উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস কমিটিগুলো তখন খোলাখুলিভাবেই বলতে শুরু করেছে, মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা কার্যকর করবার দায়িত্ব আমাকেই দিতে হবে।

কংগ্রেস মহলে এই দাবী উত্থাপিত হলেও আমি বুঝতে পারি, কংগ্রেসের উচ্চতর কর্তৃপক্ষের মধ্যে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি এ বিষয়ে ভিন্ন অভিমত পোষণ করছেন। আমি আরো বুঝতে পারি, সর্দার প্যাটেল এবার প্রেসিডেন্ট হবার বাসনা পোষণ করছেন। তাঁর বন্ধুরাও এটাই চাইছিলেন। ব্যাপারটি আমাকে বেশ কিছুটা অসুবিধের মধ্যে ফেলে ; যার ফলে এ ব্যাপারে আমার কি করণীয় সে সম্বন্ধে মনস্থির করতে কিছুটা বিলম্ব হয়। অবশেষে সমগ্র বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে আমি সিদ্ধান্ত নিই, যেহেতু আমি ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সাত বছর প্রেসিডেণ্ট পদে বহাল রয়েছি সেইহেতু আমার পক্ষে এখন সরে দাঁড়ানো উচিত। অতএব আমি স্থির করি, এরপর আমি প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমার নাম প্রস্তাবিত হতে দেবো না।

পরবর্তী প্রেসিডেন্টরূপে জওহরলাল

পরবর্তী প্রশ্ন হলো, কে আমার উত্তরাধিকারী হবেন? আমি চাইছিলাম পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে এমন একজন ব্যক্তির আসা দরকার যিনি আমার সঙ্গে সর্ববিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন এবং আমি যেভাবে আলোচনা চালিয়ে এসেছি সেই অনুসারে পরবর্তী কর্মপন্থা গ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে সব দিক বিচার-বিবেচনা করে আমি এই সিদ্ধান্তে আসি, পরবর্তী প্রেসিডেন্ট

হিসেবে জওহরলালই সবদিক থেকে উপযুক্ত। আমি তাই ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল এক বিবৃতি প্রচার করে তাতে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য জওহরলালের নাম প্রস্তাব করি এবং সেই বিবৃতির মাধ্যমে কংগ্রেস কর্মীদের কাছে আবেদন জানাই তাঁরা যেন সর্বসম্মতভাবে জওহরলালকে নির্বাচিত করেন। গান্ধীজী বোধহয় এ ব্যাপারে সর্দার প্যাটেলের দিকেই ঝুঁকেছিলেন; কিন্তু আমি জওহরলালের নাম প্রস্তাব করে বিবৃতি দেবার ফলে তিনি এ বিষয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। কেউ কেউ অবশ্য সর্দার প্যাটেল ও আচার্য কৃপালনীর নাম প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জওহরলালই সর্বসম্মতিক্রমে প্রেসিডেন্ট হন।

আমি যা সবচেয়ে ভালো এবং সঙ্গত মনে করেছিলাম সেইভাবেই আমি কাজ করেছিলাম। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলী দেখে আমার মনে হয় আমি হয়তো ভুল করেছিলাম এবং যাঁরা আমাকেই প্রেসিডেন্ট হিসেবে আরো কিছুকাল থাকার কথা বলেছিলেন তাঁরাই হয়তো সঠিক ছিলেন।

আমার সিদ্ধান্ত সারা দেশের কংগ্রেসী মহলে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে। কয়েকজন নামকরা নেতা কলকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ থেকে আমার কাছে ছুটে আসেন এবং বিবৃতি প্রত্যাহার করে নেবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। আমার নাম যাতে পুনর্বার প্রস্তাবিত হতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই তাঁরা আমায় বিবৃতিটি প্রত্যাহার করতে বলেছিলেন। সংবাদপত্রেও একইভাবে আবেদন প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু আমি একবার যে সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছি তা প্রত্যাহার করে নিতে কিছুতেই সম্মত হইনি।

মুসলিম লীগ কাউন্সিল মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা অনুমোদন করেছিলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও পরিকল্পনাটি অনুমোদন করেছিলেন। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির এই অনুমোদন ছিলো এ. আই. সি. সি.র (নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির) সম্মতিসাপেক্ষ। আমরা অবশ্য এটাকে একটি নিয়মতান্ত্রিক বিষয় হিসাবেই মনে করেছিলাম। কারণ, অতীতে ওয়ার্কিং কমিটির প্রতিটি সিদ্ধান্তই এ. আই. সি. সি. সর্বেতোভাবে অনুমোদন করে এসেছেন। এই অনুসারে ৭ই জুলাই বোম্বাইতে এ. আই. সি. সি.র সভা আহূত হয়। এদিকে সিদ্ধান্তটি যখন একবার গৃহীত হয়ে গেছে, সে অবস্থায় আমার পক্ষে দিল্লীতে বসে থাকার আর কোনো প্রয়োজন ছিলো না। দিল্লীর আবহাওয়াও তখন অত্যন্ত বেশী উত্তপ্ত। আমি তাই ৩০শে জুন দিল্লী থেকে কলকাতায় ফিরে

আসি। ৪ঠা জুলাই আমি কলকাতা থেকে বোম্বাই অভিমুখে রওনা হই। যে ট্রেনে আমি যাচ্ছিলাম সে ট্রেনে শরৎচন্দ্র বসুও ছিলেন। যাবার পথে প্রায় প্রতিটি স্টেশনেই বিরাট জনতা সমবেত হয়েছে দেখতে পাই। সমবেত জনতা উচ্চকণ্ঠে দাবী জানাচ্ছিলো, আমাকেই তারা পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে চায়। শরৎবাবু ছিলেন অন্য একটি কামরায়। কিন্তু প্রায় প্রতিটি বড় স্টেশনে আমার কামরায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করছিলেন। জনতার দাবী শুনে তিনি আমার দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করে বলেন, 'জনতা কি চায় শুনুন, এবং আপনি কি করছেন তা ভেবে দেখুন।'

৬ই জুলাই ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসে। সেই সভায় এ. আই. সি. সি.র সামনে যে প্রস্তাব পেশ করা হবে তার খসড়া প্রস্তাব রচিত হয়। প্রথম প্রস্তাবটিতে মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করা হয় এবং সেই প্রস্তাবটি আমাকেই উত্থাপন করতে বলা হয়। প্রস্তাবটি আমাকে উত্থাপন করতে বলার কারণ হলো, ওয়ার্কিং কমিটি মনে করেছিলেন বামপন্থীদের তরফ থেকে উক্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হবে।

এ. আই. সি. সি.র সম্মেলন শুরু হলে আমি জওহরলালকে আমার কাছ থেকে প্রেসিডেন্টের কার্যভার বুঝে নেবার জন্য অনুরোধ করি। এরপর সর্দার প্যাটেল মঞ্চে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তব্য বলতে থাকেন। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসেবে সমস্যাজর্জরিত বৎসরসমূহে আমি যেভাবে কৃতিত্বের সঙ্গে আমার দায়িত্ব পালন করেছি এবং বহুবিধ বিপদের সম্মুখীন হয়েও অকুতোভয়ে এবং সুষ্ঠুভাবে যাবতীয় সমস্যার মোকাবিলা করেছি তার জন্য আমাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সর্দার প্যাটেলের বক্তব্য শেষ হলেই আমি মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনার ব্যাখ্যা-সংবলিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করে সমগ্র বিষয়টি সংক্ষেপে বিবৃত করি। সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থী মহল থেকে তীব্রভাবে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়। এই ব্যাপারে কংগ্রেস সোসালিস্ট দলই অগ্রণী ভূমিকা নেন। কংগ্রেসের ভেতর থেকে কংগ্রেসের সরকারী প্রস্তাবের বিরোধিতা করলে সভায় জনপ্রিয়তা অর্জন করা যায়। সোসালিস্টরা এই পথই অনুসরণ করেছিলেন। তাঁদের চালচলনও ছিলো অস্বাভাবিক এবং নাটকীয়তায় পূর্ণ। ইউসুফ মেহেরালী তখন গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু অসুস্থ অবস্থাতেই তাঁকে স্ট্রেচারে করেসভাস্থলে নিয়ে আসা হয়। উদ্দেশ্য হলো, সদস্যদের সহানুভূতি অর্জন। ইউসুফ মেহেরালী স্ট্রেচারে শায়িত অবস্থাতেই মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনাকে

বিরোধিতা করে তাঁর বক্তব্য রাখেন।

তখন সদস্যদের কাছে পরিকল্পনাটি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে আমি এই অভিমত প্রকাশ করি, কংগ্রেসের পক্ষে এটা একটা বিরাট জয়। ভারতের এই স্বাধীনতার স্বীকৃতিকে আমি রক্তপাতহীন নীরব বিপ্লব বলে আখ্যাত করি। অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের জাতীয় দাবীকে ইংরেজ কর্তৃক মেনে নেবার এই ঘটনাকে পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব বিষয় বলে আমি উল্লেখ করি। চল্লিশ কোটি লোকের এক বিরাট জাতি আজ সশস্ত্র যুদ্ধকে পরিহার করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত বিরোধের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীন হতে চলেছে। শুধুমাত্র এই বিষয়টি বিবেচনা করলেও বুঝতে পারা যাবে এই বিজয়কে ছোট করে দেখা অথবা এর বিরোধিতা করা পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। আমি আরো বলি, মন্ত্রিমিশনের এই পরিকল্পনায় কংগ্রেসের সব দাবীই স্বীকৃত হয়েছে। কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বাধীনতা চায় এবং সবরকম বিভেদের বিরোধিতা করে। সুতরাং কংগ্রেস সোসালিস্ট দল কেন যে একে জয় বলে স্বীকার না করে পরাজয়রূপে অভিহিত করছেন তা আমি বুঝতে পারি না।

আমার এই বক্তৃতা মন্ত্রশক্তির মতো কাজ করে। শ্রোতৃবর্গ পরিকল্পনার সারবত্তা ভালোভাবেই বুঝতে পারেন। এরপর প্রস্তাবটি সম্পর্কে ভোট নেওয়া হলে দেখা যায় বিপুল ভোটাধিক্যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে। ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা মেনে নেবার ঘটনাকে এইভাবেই কংগ্রেসের অনুমোদন লাভ করে।

কয়েকদিন পরে লর্ড পেথিক লরেন্স এবং স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের কাছ থেকে আমি দুটি তারবার্তা পাই। তারবার্তায় ওঁরা আমাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এ. আই. সি. সি.র সভায় মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমার ব্যাখ্যা এবং সেই ব্যাখ্যার ফলে আমার প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়েছে জেনে ওঁরা দুজনেই আনন্দিত হন।

সাংবাদিক সম্মেলনে জওহরলালের বিবৃতি

এর কয়েকদিন পরেই এমন একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে যাতে ইতিহাসের ধারা ভিন্নপথে চলতে থাকে। ১০ই জুলাই জওহরলাল বোম্বাইতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একটি বিবৃতি দেন। অন্য সময় হলে তাঁর সেই

বিবৃতিটি তেমন কোনো আলোড়নের সৃষ্টি করতো না। কিন্তু তৎকালীন অবিশ্বাস, সন্দেহ আর হীনম্মন্যতার আবহাওয়ায় এটা অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মতো কাজ করে। কয়েকজন সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেন, এ. আই. সি. সি. কর্তৃক প্রস্তাবটি অনুমোদনের অর্থ কি এই নয়, কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার বিষয়সহ সমগ্র পরকল্পনাটিই গ্রহণ করেছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে জওহরলাল বলেন, কংগ্রেস গণপরিষদে অংশগ্রহণ করবে স্বাধীনভাবে, কোনোরকম বাধ্যবাধকতার জন্য নয়। এবং সেখানে যে পরিস্থিতিরই উদ্ভব হোক না কেন, তার মোকাবিলাও করবে স্বাধীনভাবে। বিষয়টি সুস্পষ্ট করবার জন্য সাংবাদিকরা আবার তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'এতে কি এই কথাই বোঝাচ্ছে মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনার হেরফের করা যাবে?'

এর উত্তরে জওহরলাল জোর দিয়ে বলেন, কংগ্রেস উক্ত পরিষদে যোগ দেবে এটাই শুধু স্বীকার করেছে। সুতরাং প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনার হেরফের করবার স্বাধীনতা তার নিশ্চয়ই আছে।

এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, জওহরলালের এই বিবৃতিটি ছিলো ভ্রান্ত। এটি আদৌ সঠিক নয় যে কংগ্রেস ইচ্ছা করলে মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনার হেরফের করতে পারে। কংগ্রেস প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রে ফেডারেল সরকার হবে বলে স্বীকার করে নিয়েছিলো। আরো স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিলো, তিনটি বিষয় বাধ্যতামূলকভাবে এবং অপর কয়েকটি বিষয় প্রদেশগুলোর ইচ্ছাক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকবে। আমরা আরো স্বীকার করে নিয়েছিলাম, প্রদেশগুলোকে ক, খ এবং গ এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হবে। এসব স্বীকৃত বিষয় কিছুতেই কংগ্রেস তার নিজের ইচ্ছামতো পরিবর্তন করতে পারে না। পরিবর্তন করতে হলে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী এবং দলিলে স্বাক্ষরকারী অন্যান্য দলের মতামতও প্রয়োজন।

মুসলিম লীগ মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনাটি মেনে নিয়েছিলো, কারণ ইংরেজ সরকার এর থেকে আর বেশিদূর অগ্রসর হতে সম্মত ছিলেন না। লীগ কাউন্সিলের সামনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মিঃ জিন্না একথাটি স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই পরিকল্পনা তিনি মেনে নিতে বলছেন কারণ এর চেয়ে ভালো কিছু আদায় করা সম্ভব ছিলো না।

আলোচনার পরিসমাপ্তি যেভাবে হয় তাতে মিঃ জিন্না মোটেই খুশি হতে পারেননি, কিন্তু এর কোনো বিকল্প না থাকার জন্যই তিনি নিজেকে এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। জওহরলালের বিবৃতিটি তাঁর কাছে

একটা বোমার মতো হাজির হয়। তিনি তাই সঙ্গে সঙ্গে এক পাল্টা বিবৃতি প্রচার করে বলেন, কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র বিষয়টিকে আবার নতুন করে বিচার-বিবেচনা করতে হবে। তিনি লিয়াকত আলীকে অবিলম্বে লীগ কাউন্সিলের সভা আহ্বান করতে বলেন এবং আর একটি বিবৃতির মাধ্যমে এই অভিমত ব্যক্ত করেন, মুসলিম লীগ কাউন্সিল দিল্লীতে মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা মেনে নিয়েছিলেন কারণ তাঁদের বলা হয়েছিলো কংগ্রেস এই পরিকল্পনা সর্বতোভাবে মেনে নিয়েছে এবং এই পরিকল্পনা অনুসারেই ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচিত হবে। কিন্তু এখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট যখন ঘোষণা করেছেন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে কংগ্রেস তার ইচ্ছামতো এই পরিকল্পনাকে অদল-বদল করতে পারবে, তার ফলে এই কথাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সংখ্যালঘুদের সব সময় এবং সব ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠদের কাছে দয়ার পাত্র হয়ে থাকতে হবে। মিঃ জিন্না আরো বলেন, কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের ঘোষণায় যখন সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যাচ্ছে কংগ্রেস মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করেছে, সে অবস্থায় ভাইসরয়ের উচিত হবে মুসলিম লীগকে আহ্বান করে সরকার গঠনের দায়িত্ব তার ওপর ছেড়ে দেওয়া, কারণ মুসলিম লীগ পরিকল্পনাটি মেনে নিয়েছে।

২৭শে জুলাই বোম্বাইতে মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সভা বসে। উক্ত সভায় প্রারম্ভিক বক্তৃতায় মিঃ জিন্না পুনরায় পাকিস্তানের কথা ব্যক্ত করে বলেন, মুসলিম লীগের সামনে এইটিই হলো একমাত্র পথ। তিনদিন আলোচনার, পরে মুসলিম লীগ কাউন্সিল মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবে আরো বলা হয়, অতঃপর পাকিস্তান কায়েম করবার জন্য মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করবে।

পরিস্থিতি এইভাবে মোড় নেওয়ায় আমি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, যে পরিকল্পনা নিয়ে আমি এতদিন অক্লান্তভাবে কাজ করে এসেছি তা আমাদেরই অবিমৃষ্যতার ফলে বানচাল হবার অবস্থায় এসে পড়েছে। আমি তাই মনে করি, পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার জন্য এবং সমগ্র বিষয়টি নিয়ে নতুন করে বিচার-বিবেচনা করবার জন্য অবিলম্বে ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহ্বান করা দরকার। আমার অনুরোধে ৮ই আগস্ট ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসে। উক্ত সভায় আমি এই অভিমত জ্ঞাপন করি, আমরা যদি বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে চাই তাহলে আমাদের এখন পুনরায় সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করতে হবে, এ. আই. সি. সি. কর্তৃক

গৃহীত প্রস্তাবে কংগ্রেসের অভিমত ব্যক্ত হয়েছে, সুতরাং কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট অথবা যে-কোনো ব্যক্তি তা পরিবর্তন করতে পারেন না।

এ ব্যাপারে ওয়ার্কিং কমিটি এক মহাসমস্যার মধ্যে পড়ে। ব্যাপারটা এমন এক পর্যায়ে এসেছে যে একদিকে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের সম্মান ব্যাহত হতে চলেছে, অপরদিকে এতোদিনের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে যে সমাধানের পথ পাওয়া গেছে তা এক বিপজ্জনক অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের বিবৃতিকে নস্যাৎ করা হলে তা সামগ্রিকভাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করবে, আবার মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করলে দেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হবে এইসব কথা বিবেচনা করে অবশেষে আমরা একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরি করি যাতে জওহরলালের সাংবাদিক সম্মেলনের কথা উল্লেখ না করে শুধু এ. আই. সি. সি.র সিদ্ধান্তকেই কংগ্রেসের একমাত্র গৃহীত সিদ্ধান্ত বলে পুনরুল্লেখ করা হয়।

ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব

ওয়ার্কিং কমিটি এ বিষয়ে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলো তার পূর্ণ বয়ান নীচে দেওয়া হলো :

> ওয়ার্কিং কমিটি দুঃখের সঙ্গে ব্যক্ত করছে, সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিল তাদের পূর্বসিদ্ধান্ত বাতিল করে এক নতুন প্রস্তাব মারফত ঘোষণা করেছে, তারা সংযুক্ত পরিষদে অংশগ্রহণ করবে না। দ্রুত-পরিবর্তনশীল বর্তমান সময়ে যখন বিদেশী শক্তির অধীনতা-পাশ থেকে মুক্ত হয়ে দেশ পূর্ণ স্বাধীনতালাভ করতে চলেছে এবং যে সময়ে উক্ত পরিবর্তনকে দেশবাসীর সামগ্রিক কল্যাণে নিয়োজিত করবার সুযোগ দেখা দিয়েছে এবং জনগণের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য জনগণের প্রতিনিধিদের আহ্বান করা হয়েছে ঠিক সেই সময়েই মুসলিম লীগ কাউন্সিল এইরকম একটি প্রস্তাব গ্রহণ করলো। ওয়ার্কিং কমিটি এখন সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু তবুও দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে এবং ভারতবাসীর স্বাধীনতার কথা চিন্তা করে ওয়ার্কিং কমিটি দেশের স্বাধীনতাকামী প্রতিটি ব্যক্তির কাছে আবেদন করছে

তাঁদের সামগ্রিক সহযোগিতায় যাতে ভারতের সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান করা যায় তার জন্য তাঁরা যেন সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসেন।

মুসলিম লীগ সমগ্র বিষয়টিকে যেভাবে সমালোচনা করেছে, তা হলো, ১৬ই মে যে প্রস্তাবটি মেনে নেওয়া হয়েছিলো কংগ্রেস তা গ্রহণ করেনি। তাদের এই সমালোচনার উত্তরে কমিটি সুস্পষ্টভাবে বলছে, যদিও কংগ্রেস উক্ত পরিকল্পনার সমগ্র বিষয়ের সঙ্গে একমত হতে পারেনি তবুও তারা সামগ্রিকভাবেই প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছিলো। কংগ্রেস মনে করেছিলো, পরিকল্পনায় যেসব বিষয় স্থানলাভ করেছে সেগুলো অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে মতানৈক্য বিদূরিত করা যাবে। কংগ্রেস প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারকে একটি মৌলিক ব্যবস্থা হিসেবে মেনে নিয়েছিলো এবং প্রদেশগুলোর পক্ষে কোনো গ্রুপে যোগ দেওয়া বা না-দেওয়ার স্বাধীনতাও তারা মেনে নিয়েছিলো। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে যদি কোনোরকম গোলমাল দেখা দেয় বা এ বিষয়ে যদি কোনোরকম মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয় তাহলে পরিকল্পনার অঙ্গীভূত প্রস্তাবসমূহ অনুসরণ করেই তার সমাধান করা যাবে এবং সংযুক্ত পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যদের প্রতি কংগ্রেস এইরকম নির্দেশই দেবে।

কমিটি সংযুক্ত পরিষদের পূর্ণ ক্ষমতার ওপরে জোর দিয়ে এই কথা বলছে, বাইরের কোনো শক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়াই তারা ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা করবে এবং এ বিষয়ে তাদের পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে। কিন্তু পরিষদের ভেতরে যেসব বাধা-বিপত্তি রয়েছে বা থাকবে সেগুলো মেনে নিয়েই সদস্যদের কাজ করতে হবে এবং সব ব্যাপারে সকলের কাছে থেকে সহযোগিতা নিয়ে স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র এমনভাবে রচনা করবে যাতে দলমতনির্বিশেষে প্রত্যেক শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের স্বার্থ সমভাবে এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে সুরক্ষিত হয়। এই উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সংযুক্ত পরিষদে অংশগ্রহণ করে তাকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যই ওয়ার্কিং কমিটি তাদের ২৬শে জুনের (১৯৪৬) প্রস্তাব পাস করেছিলো এবং সে প্রস্তাব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকর্তৃক ৭ই জুলাই অনুমোদিত হয়েছিলো। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতি ওয়ার্কিং কমিটি পুনরায় তাদের আনুগত্য প্রকাশ করে ঘোষণা করছে, সংযুক্ত পরিষদের কাজ কংগ্রেসের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত অনুসারেই চলবে।

কমিটি আশা করে, মুসলিম লীগ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দলগুলো তাদের নিজ নিজ স্বার্থে এবং দেশের বৃহত্তম স্বার্থে এই কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে।

আমরা আশা করেছিলাম, ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাব দ্বারা সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াকে রোধ করা যাবে ; কারণ, এই প্রস্তাব পাস করার ফলে মন্ত্রি-মিশনের পরিকল্পনাটা যে সামগ্রিকভাবেই মেনে নেওয়া হয়েছিলো সে সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহই থাকবার কথা নয়। মুসলিম লীগ যদি আমাদের এই প্রস্তাবটি মেনে নিতো তাহলে সম্মান বজায় রেখেই পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া যেতো। কিন্তু মিঃ জিন্না এ প্রস্তাব মেনে নেন না। তিনি জওহরলালের অভি-মতই কংগ্রেসের আসল অভিমত বলে মনে করেন। তিনি বলেন, ইংরেজরা এদেশে উপস্থিত থাকাকালেই এবং ক্ষমতা তাঁদের হাতে থাকাকালেই যখন কংগ্রেস বার বার তার মত পরিবর্তন করছে, তাহলে ইংরেজরা চলে যাবার পর কংগ্রেস যে জওহরলালের অভিমত অনুযায়ী পুনরায় মত পরিবর্তন করবে না তার নিশ্চয়তা কোথায় ?

ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে এ কথা আবার বলা হয়, কংগ্রেস মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব সমগ্রভাবেই গ্রহণ করেছে। এর ফলে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাবও স্বীকার করে নেওয়া হয়। কংগ্রেস কর্তৃক মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব এইরকম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মেনে নেবার আশু ফল দেখতে পাওয়া যায় ভাইসরয়ের মতিগতিতে। ১২ই আগস্ট তিনি জওহর-লালকে আহ্বান করে নিম্নবর্ণিত শর্ত অনুসারে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করতে বলেন :

> মহান সম্রাটের সরকারের অনুমোদনক্রমে মহামান্য রাজপ্রতিনিধি ভারতবর্ষে অবিলম্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন ও দাখিল করবার জন্য কংগ্রেস সভাপতিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং কংগ্রেস সভাপতি উক্ত আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। পণ্ডিত জওহর-লাল নেহরু মহামান্য রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে এই প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্য শীগগিরই নূতন দিল্লীতে আসছেন।

একই দিনে মিঃ জিন্না এক বিবৃতি প্রচার করেন। উক্ত বিবৃতিতে তিনি বলেন, '১০ই আগস্ট ওয়ার্ধায় গৃহীত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সর্বশেষ প্রস্তাবে কোনোই নূতনত্ব নেই, এটা কংগ্রেসের পূর্ববর্তী প্রস্তাবেরই পুনরাবৃত্তি

ছাড়া আর কিছু নয়।' অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ব্যাপারে সহযোগিতা করবার জন্য জওহরলাল তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু সে আমন্ত্রণ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। পরে ১৫ই আগস্ট জওহরলাল মিঃ জিন্নার বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন, কিন্তু সে আলোচনা ফলপ্রসূ তো হয়ই না, উপরন্তু পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে পড়ে।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস

জুলাই মাসের শেষদিকে লীগ কাউন্সিলের সভায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং এ বিষয়ে যথাকর্তব্য করার জন্য মিঃ জিন্নার ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। মিঃ জিন্না ১৬ই আগস্ট দিনটিকে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচী সম্বন্ধে কোনো কথাই তিনি বলেন না। সাধারণভাবে মনে করা গিয়েছিলো, ওই দিন লীগ কাউন্সিলের আর একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং সেই সভায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচী স্থির করা হবে ; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হলো না। উপরন্তু আমি লক্ষ্য করলাম, কলকাতায় এক অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর অবস্থা দ্রুতগতিতে প্রসারিত হচ্ছে। অতীতে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের বিশেষ দিনগুলোতে হরতাল ডাকতো, মিছিল বের করতো এবং জায়গায় জায়গায় জনসভা করতো। কিন্তু কলকাতায় মুসলমানদের যে মনোভাব আমি লক্ষ্য করলাম তাতে বোঝা গেলো, ১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগপন্থী মুসলমানরা কংগ্রেসীদের আক্রমণ করবে এবং তাদের ধনসম্পত্তি লুঠ করবে। বাংলা সরকার ১৬ই আগস্টকে সরকারী ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করায় পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠলো এবং জনসাধারণ বেশ কিছুটা ভীত হয়ে পড়লো। আইন সভায় কংগ্রেস দল সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু সরকারপক্ষ তাঁদের প্রতিবাদে কর্ণপাত না করায় সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তাঁরা সভাকক্ষ পরিত্যাগ করেন এবং এইভাবে সরকারী সিদ্ধান্তকে একটিমাত্র দলের সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখাতে চান। তাঁরা দেখাতে চান, সরকারের শাসনযন্ত্রের সহায়তায় শাসকদল তাঁদের অন্যায় সিদ্ধান্তকে সরকারী সিদ্ধান্ত হিসেবে চালিয়ে দিয়েছেন। আগে থেকেই কলকাতায় একটা ভীতির মনোভাব জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিলো. সেই মনোভাবটি এর ফলে আরো বেশী করে দেখা দিলো। বাংলায় মুসলিম লীগ সরকার থাকার জন্য এবং লীগের অন্যতম

নেতা মিঃ এইচ. এস. সুরাবর্দী সেই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বলেই জনগণের মধ্যে এই ভীতির ভাবটা আরো বেশী প্রকটিত হয়।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ৯ই আগস্ট একটি পার্লামেন্টারী সাব-কমিটি নিযুক্ত করেন। উক্ত সাব-কমিটিতে সদস্য হিসেবে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং আমাকে সদস্য হিসেবে নেওয়া হয়। ১৩ই আগস্ট আমরা এক সভায় মিলিত হয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন সম্বন্ধে ভাইসরয়ের কাছে কি প্রস্তাব দাখিল করা হবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করি। এরপর জওহরলাল ১৭ই আগস্ট পার্লামেন্টারী কমিটির একটি সভা আহ্বান করেন। উক্ত সভায় অংশ গ্রহণের জন্য আমি ১৬ই আগস্ট বিমানযোগে কলকাতা থেকে দিল্লী অভিমুখে রওনা হই।

১৬ই আগস্ট দিনটি ভারতের ইতিহাসে এক মসীলিপ্ত দিন। ওই দিন কলকাতা শহরে যেরকম পাইকারী নরহত্যা ও রক্তপাতের ঘটনা ঘটে তার কোনো পূর্ব-নজীর নেই। শত শত লোক নিহত হয়, হাজার হাজার লোক গুরুতরভাবে আহত হয়। এছাড়া বহু কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি ধ্বংস হয়। ওই দিন মুসলিম লীগ যে মিছিল বের করে সেই মিছিলে অংশগ্রহণকারী লোকেরা লুঠ এবং অগ্নিসংযোগ করতে করতে এগুতে থাকে। এর ফলে সমগ্র কলকাতা শহর উভয় সম্প্রদায়ের গুণ্ডাদের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়ে।

বাংলা কংগ্রেসের নেতা শরৎচন্দ্র বোস গভর্নরের সঙ্গে দেখা করে পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনবার জন্য অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন। গভর্নরকে তিনি আরো বলেন, তাঁকে এবং আমাকে (লেখককে) কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগদানের জন্য দিল্লী যেতে হচ্ছে। গভর্নর তাঁকে বলেন, আমাদের দুজনকে নিরাপদে বিমানবন্দরে নিয়ে যাবার জন্য তিনি আমাদের সঙ্গে মিলিটারী রক্ষীদল পাঠাবেন। আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করি, কিন্তু আমাকে নিয়ে যাবার জন্য কেউ আসে না। আমি তখন একাই রওনা হয়ে যাই। শহরের রাস্তাগুলো তখন খাঁ খাঁ করছে এবং সারা শহরটি যেন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে বলে বোধ হয়। আমি যখন স্ট্র্যাণ্ড রোড দিয়ে যাচ্ছিলাম সেই সময় আমি লক্ষ্য করি, একদল গাড়োয়ান এবং দরোয়ান লাঠিসোটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা আমার গাড়িকে আক্রমণ করতে চেষ্টা করে। আমার ড্রাইভার তখন চিৎকার করে বলতে থাকে, এটা কংগ্রেস সভাপতির গাড়ি; কিন্তু জনতা তার কথায় কান দেয় না। অবশেষে অনেক কষ্টে প্লেন ছাড়বার কয়েক মিনিট আগে আমি দমদম বিমানবন্দরে আসি।

ওখানে আমি সেনাবিভাগের এক বিরাট কোম্পানিকে দেখতে পাই। তারা মিলিটারী ট্রাকে অবস্থান করছিলো। আমি যখন তাদের জিজ্ঞেস করি, অবস্থার মোকাবিলা করবার জন্য তারা কিছু করছে না কেন, তার উত্তরে তারা আমাকে জানায় যে তাদের শুধু দাঁড়িয়ে থাকতে বলা হয়েছে। আর কিছু করতে বলা হয়নি। সারা কলকাতা শহরেই এই অবস্থা দেখা যায়; সব জায়গাতেই মিলিটারী আর পুলিসকে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। চোখের সামনে নির্দোষ নরনারীকে নিহত হতে দেখেও তারা স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

১৬ই আগস্ট দিনটি যে শুধু কলকাতার জন্যই 'কালো দিবস', তাই নয়, সারা ভারতেই ও-দিনটি 'কালো দিবস'। ঘটনাবলী যেভাবে মোড় নিয়েছিলো, তাতে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে তার মোকাবিলা করা সম্ভব ছিলো না। ভারতের ইতিহাসে এটা একটা মহা দুঃখজনক ঘটনা। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, মুসলিম লীগকে তার রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য পুনরায় সুযোগ দেবার ফলেই এইরকম একটি মহা অনর্থের সৃষ্টি হতে পেরেছিলো। মিঃ জিন্না এই ভুলের পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিলেন এবং এই সুযোগের ফলেই তিনি মন্ত্রি-মিশনের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

জওহরলাল আমার ঘনিষ্ঠতম প্রিয় বন্ধুদের একজন এবং ভারতের জাতীয় জীবনে তাঁর অবদানও অসীম। ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি নিরলসভাবে কাজ করেছেন এবং বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন, এবং স্বাধীনতা লাভের পরে তিনি জাতীয় ঐক্য এবং অগ্রগতির প্রতীক হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। কিন্তু আমি দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, সময় সময় তিনি হৃদয়াবেগ দ্বারা চালিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, সময় সময় তিনি তাত্ত্বিক দিকের প্রতি বেশী করে জোর দেওয়ার ফলে আসল পরিস্থিতিকেও ছোট করে দেখেছেন।

সংযুক্ত পরিষদ সম্বন্ধে তাঁর বিবৃতিও তাঁর এই ধরনের ধারণার ফলেই প্রদত্ত হয়েছিলো। একই ধারণার ফলে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দেও তিনি একটা বিরাট ভুল করেছিলেন। এটা হয়েছিলো ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রথম নির্বাচনের প্রাক্কালে। উক্ত নির্বাচনে শুধু বোম্বাই এবং উত্তরপ্রদেশ ছাড়া আর সব প্রদেশেই মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়েছিলো। বাংলার গভর্নর সেখানে লীগ সরকার গঠনের জন্য নানাভাবে লীগকে মদত দিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, মুসলিম লীগই নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন

করবে। কিন্তু কৃষক প্রজা পার্টি বিজয়ের ফলে তাঁর সে আশা একেবারেই ধূলিসাৎ হয়ে যায়। অন্যান্য মুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলোতেও, অর্থাৎ পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও মুসলিম লীগ পরাজয়ের গ্লানি বহন করে। বোম্বাইতে মুসলিম লীগ কোনোরকমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তবে উত্তরপ্রদেশে তারা বিরাটভাবে জয়ী হয়। ওখানে জমিয়ৎ-উল-উলেমা-ই-হিন্দ মুসলিম লীগের সঙ্গে সহযোগিতা করার ফলেই এটা সম্ভব হয়। জমিয়ৎ এই কথা ভেবে মুসলিম লীগকে সমর্থন করেছিলো নির্বাচনের শেষে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করবে এবং একসঙ্গে কাজ করবে।

উত্তরপ্রদেশের মুসলিম লীগের নেতা তখন চৌধুরী খালিকুজ্জমান এবং নবাব ইসমাইল খান। আমি যখন সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলাম তখন তাঁদের উভয়ের সঙ্গেই আলোচনা করেছিলাম। তাঁরা আমাকে কথা দিয়েছিলেন, তাঁরা শুধু কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করেই তাঁদের কর্তব্য শেষ করবেন না, কংগ্রেসের কার্যসূচী রূপায়ণেও তাঁরা সর্বতোভাবে সহায়তা করবেন। তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই আশা করেছিলেন, মুসলিম লীগ নতুন সরকারের অংশীদার হবে। স্থানীয় পরিস্থিতি তখন এমন আকার ধারণ করেছিলো যে তাঁদের দুজনের মধ্যে কারো পক্ষেই এককভাবে সরকারে ঢোকা সম্ভব ছিলো না। এই পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে আমি তাঁদের আশা দিই তাঁদের দুজনকেই সরকারের মধ্যে নেওয়া হবে। মন্ত্রিসভা যদি সাতজন মন্ত্রী নিয়ে গঠিত হয় তাহলে দুজনকে মুসলিম লীগ থেকে এবং বাকি সবাইকে কংগ্রেস থেকে নেওয়া হবে। আবার মন্ত্রিসভা যদি নজন মন্ত্রী নিয়ে গঠিত হয় তাহলে কংগ্রেসী মন্ত্রীর সংখ্যা আরো বেশি হবে। আমার সঙ্গে আলোচনার পরে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি (note) তৈরি হয়, যাতে বলা হয়: মুসলিম লীগ দল কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে কাজ করবে এবং কংগ্রেসের কার্যসূচী মেনে নেবে। নবাব ইসমাইল খান এবং চৌধুরী খালিকুজ্জমান উভয়েই সেই বিবৃতিতে সই দেন। এরপর আমি লক্ষ্ণৌ থেকে পাটনা অভিমুখে রওনা হয়ে যাই। কারণ বিহারে মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে সেখানে আমার উপস্থিতি বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো।

কয়েকদিন পরে আমি এলাহাবাদে ফিরে আসি। ওখানে এসে দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করি জওহরলাল ইতিমধ্যে এক অঘটন ঘটিয়ে বসেছেন। তিনি চৌধুরী খালিকুজ্জমান এবং নবাব ইসমাইল খানকে লিখেছেন, মন্ত্রিসভায় তাঁদের মধ্যে একজনকেই শুধু নেওয়া হবে। চিঠিতে তিনি আরো লেখেন, তাঁদের

মধ্যে কাকে মন্ত্রিসভায় পাঠানো হবে তা মুসলিম লীগই স্থির করবেন। আমি আগেই বলেছি তাঁদের একজনের পক্ষে মন্ত্রিসভায় যাওয়া সম্ভব ছিলো না। তাঁরা তাই দুঃখের সঙ্গে জানিয়ে দেন জওহরলালের প্রস্তাব মেনে নেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এটি সত্যিই একটি দুঃখজনক ঘটনা। উত্তরপ্রদেশ মুসলিম লীগের সহযোগিতার প্রস্তাবটি যদি তখন মেনে নেওয়া হতো তাহলে সমস্ত কার্যকরী ব্যবস্থাতেই মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিত হতে হতো। জওহরলালের কাজের ফলে উত্তরপ্রদেশের মুসলিম লীগের মধ্যে এক নতুন প্রাণবন্যার সৃষ্টি হয়। রাজনীতি নিয়ে যাঁরা বিচার-বিবেচনা করে থাকেন তাঁরা সবাই জানেন, উত্তরপ্রদেশেই মুসলিম লীগ পুনরুজ্জীবিত হয়েছিলো। মিঃ জিন্না এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন এবং এমনভাবে কংগ্রেসের বিরোধিতা শুরু করেন যার ফলে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান কায়েম হয়।

আমি দেখতে পাই, পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন এই ব্যাপারে কিছুটা নেতৃত্ব নিয়েছেন এবং তিনিই জওহরলালের বিচারবোধকে প্রভাবিত করেছেন। ট্যাণ্ডনের রাজনৈতিক অভিমতের প্রতি আমার আদৌ কোনোরকম উচ্চ ধারণা ছিলো না, সুতরাং আমি জওহরলালকে তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে বলি। আমি তাঁকে বলি, মুসলিম লীগকে মন্ত্রিসভায় না এনে তিনি এক বিরাট ভুল করেছেন। আমি তাঁকে আরো বলি, তাঁর এই কাজের ফলে লীগের মধ্যে নতুন জীবন সঞ্চারিত হবে, যার ফলে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে পদে পদে বাধার সৃষ্টি হবে। কিন্তু জওহরলাল আমার সঙ্গে একমত হতে পারেন না। তিনি বলেন, তাঁর বিচারই সঠিক। তিনি আমার সঙ্গে এই বলে তর্ক জুড়ে দেন, মাত্র ছাব্বিশজন সদস্য নিয়ে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভায় একটার বেশি আসন দাবি করতে পারে না। আমি যখন দেখতে পাই, জওহরলাল এ বিষয়ে তাঁর পূর্ব-অভিমত থেকে একচুলও বিচ্যুত হতে প্রস্তুত নন, তখন আমি ওয়ার্ধায় গিয়ে এ ব্যাপারে গান্ধীজীর পরামর্শ চাই। আমি যখন সমস্ত বিষয় তাঁর কাছে খুলে বলি তখন তিনি আমার সঙ্গে একমত হয়ে বলেন, জওহরলালকে তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য তিনি পরামর্শ দেবেন। কিন্তু জওহরলাল যখন বিষয়টি গান্ধীজীর কাছে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেন তিনি তখন তাঁর কথাই মেনে নেন এবং এ ব্যাপারে আর কোনো উচ্চবাচ্য করেন না। ফলে উত্তরপ্রদেশে কোনোরকম সমাধানই সম্ভব হয় না। মিঃ জিন্না এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন এবং সমগ্র মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের

বিরোধী করে তোলেন। নির্বাচনের পরে মিঃ জিন্নার অনেক সমর্থকই তাঁকে পরিত্যাগ করবার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু জওহরলালের কাজের ফলে তিনি পুনরায় সেই সব সমর্থককে দলে টানতে সক্ষম হন।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জওহরলালের সেই ভুলটি নিশ্চয়ই খারাপ অবস্থা ডেকে এনেছিলো। কিন্তু ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যে ভুলটি করলেন তার ফল হলো আরো মারাত্মক। জওহরলালের স্বপক্ষে কেউ কেউ হয়তো বলতে পারেন, মুসলিম লীগ যে ওইভাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করবে তা তিনি ভাবতেই পারেননি। মিঃ জিন্না কখনো গণআন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন না। আমিও তাই মিঃ জিন্নার এই মতি পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করি। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, মুসলিম লীগ কর্তৃক মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যাত হলে ইংরেজ সরকার আবার নতুন করে প্রশ্নটি উত্থাপন করবেন এবং আবার নতুনভাবে আলোচনা শুরু হবে। নিজে একজন আইন ব্যবসায়ী হওয়ায় তিনি হয়তো ভেবেছিলেন আবার যদি আলোচনা শুরু হয় তাহলে তিনি তাঁর দাবীকে পুনরুত্থাপন করে আরো কিছু সুযোগ-সুবিধে আদায় করে নিতে পারবেন। কিন্তু তাঁর সেই গণনা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। ইংরেজ সরকার মিঃ জিন্নাকে খুশি করবার জন্য নতুন করে আলোচনার সুযোগ তাঁকে দেন না।

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস প্রথম থেকেই এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন। আমি তাঁকে লিখি, মন্ত্রিমিশন দীর্ঘ দু মাস যাবৎ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সঙ্গে আলোচনা করে যে পরিকল্পনা রচনা করেন তা উভয় দলই মেনে নিয়েছিলো। কিন্তু এটা একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যে পরবর্তীকালে মুসলীম লীগ তার পূর্বসিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে যায়। এর যাবতীয় দায়িত্ব মুসলিম লীগের। সুতরাং নতুন করে আলোচনা শুরু করবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এটা যদি করা হয় তাহলে বুঝতে হবে ইংরেজের সঙ্গে আমাদের আলোচনা কখনো শেষ হবে না এবং এর ফলে জনগণের মনে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে এবং নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে। আমার চিঠির উত্তরে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস লেখেন, তিনি এ বিষয়ে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তিনি আরো লেখেন, সরকারের মনোভাবও এইরকমই হওয়া উচিত। আমি যা আশা করেছিলাম সেইভাবেই ঘটনাস্রোত প্রবাহিত হতে থাকে। আগেই বলেছি, ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট ভাইসরয় এক ঘোষণা প্রচার করে জওহরলালকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্য আহ্বান করেন।

আমরা দিল্লীতে এসে মিলিত হই ১৭ই আগস্ট। এদিকে কলকাতা এবং অন্যান্য জায়গায় তখন চলছে ধ্বংস, নরহত্যা আর লুঠতরাজ। সারা দেশে যখন কালো ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে সেই অবস্থাতেই আমরা দিল্লীতে মিলিত হই। আমরা জানতাম, মিঃ জিন্না সরকার গঠনের ব্যাপারে জওহরলালের আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন না। প্রকৃতপক্ষে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে তিনি যে চিঠিটি লেখেন তা ১৬ই আগস্ট আমাদের হস্তগত হয়। জওহরলাল পুনরায় তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, মুসলিম লীগের জন্য সব সময়ই দরজা খোলা রইলো। কিন্তু ঘটনাবলী তখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে সম্পূর্ণভাবে সমস্যার সমাধান আর সম্ভব ছিলো না।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

আমি আগেই বলেছি, কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের দায়িত্ব পার্লামেন্টারী কমিটির ওপর অর্পণ করেছিলো। কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে জওহরলাল, প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ আর আমি ১৭ই আগস্ট দিল্লীতে এক ঘরোয়া সভায় মিলিত হই। আমার সহকর্মীরা আমাকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদান করবার জন্য বিশেষভাবে চাপ দেন। গান্ধীজীও তাঁদের বক্তব্যই সমর্থন করেন। আমার কাছে এটি ছিলো একটি বিশেষ প্রশ্ন, কিন্তু বিশেষভাবে চিন্তা করবার পর অবশেষে আমি সরকারের বাইরে থাকবো বলেই স্থির করি। আমি তাই আমার পরিবর্তে আসফ আলীকে মন্ত্রিসভায় নিতে বলি। আসফ আলী এ কথা শুনবার পর তিনিও আমাকে সরকারে যোগদানের জন্য চাপ দিতে থাকেন, কিন্তু আমি তাতে সম্মত হইনি। আমার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই তখন বলতে থাকেন, আমার সিদ্ধান্তটি ভুল। এখনো তাঁরা এই কথাই বলছেন। তাঁদের মতে দেশের স্বার্থে এবং বিশেষ করে যে-রকম বাধা-বিঘ্নের ভেতর দিয়ে আমরা এখন চলেছি তাতে আমার সরকারে আসাটা অত্যন্ত বেশী প্রয়োজন। বিষয়টি নিয়ে তখনো আমি চিন্তা করেছি এবং এখনো করছি, কিন্তু আমার সেদিনের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিলো, না ভ্রান্ত ছিলো, সেকথা আমি ঠিকমতো বুঝতে পারিনি। আমি যদি সরকারে যোগ দিতাম তাহলে হয়তো আমি আরো বেশী করে দেশকে সেবা করতে পারতাম। কিন্তু তখন আমার এই কথাই মনে হয়েছিলো, সরকারের বাইরে থাকলেই বেশী করে জনগণকে সেবা করতে পারবো। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারছি,

সরকারে যোগদান করলেই দেশের এবং দশের সেবা করবার বেশী সুযোগ আমি পেতাম।

সিমলা সম্মেলনের মন্ত্রিসভায় পার্শীকে স্থান দেবার বিশেষভাবে চাপ দিয়েছিলাম। এখন কংগ্রেস যখন সরকার গঠন করতে চলেছে, সেই সময় আবার আমি আমার সেই পূর্ব-অভিমতের পুনরাবৃত্তি করি। আমার সহকর্মীরা তখন কিছুক্ষণ আলোচনা করে এতে সম্মত হন। কিন্তু পার্শী সম্প্রদায় যেহেতু বোম্বাই শহরেই সীমাবদ্ধ ছিলো, সেইহেতু আমরা মনে করি পার্শীদের ভেতর থেকে মন্ত্রিসভায় কাকে নেওয়া হবে তা সর্দার প্যাটেলই ভালোভাবে বলতে পারবেন। এই কথা মনে করে সর্দার প্যাটেলের ওপরেই ও ব্যাপারে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরে তিনি মিঃ সি. এইচ. ভাবার নাম প্রস্তাব করেন। পরে আমরা জানতে পারি, মিঃ ভাবা ছিলেন সর্দার প্যাটেলের ছেলের বন্ধু। আমরা আরো জানতে পারি, তিনি পার্শী সম্প্রদায়ের নেতা তো ছিলেনই না, এমন কি ওই সম্প্রদায়ের প্রকৃত প্রতিনিধিও তিনি ছিলেন না। সুতরাং আমাদের সেই নির্বাচন সঠিক হয়নি। কিছুদিন পরেই মিঃ ভাবা সরকার থেকে বেরিয়ে যান।

আমরা আরো স্থির করেছিলাম, অর্থ বিভাগের প্রথম সদস্য হিসেবে একজন অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদকে নিতে হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা ডঃ জন মাথাইকে মনোনীত করি। এখানে উল্লেখ করা দরকার, ডঃ মাথাই কোনোভাবেই কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তবে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যে শুধুমাত্র দলীয় প্রতিনিধিদের নিতে হবে এমনও কোনো বাধ্য-বাধকতা তখন ছিলো না।

এই ব্যাপারে মুসলিম লীগ রীতিমতো হতাশ এবং রুষ্ট হয়ে পড়ে। লীগ মনে করে, ইংরেজরাই তাদের ওইভাবে কোণঠাসা করেছে। লীগ তাই দিল্লী শহরে এবং আরো কয়েক জায়গায় প্রতিবাদ মিছিল বের করতে চেষ্টা করে কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা বিফল হয়। উপরন্তু এর ফলে সারা দেশব্যাপী তিক্ততা এবং নানারকম ঝামেলার সৃষ্টি হয়। লর্ড ওয়াভেল মনে করেন, লীগকে সরকারে অংশগ্রহণের জন্য তিনি আর একবার চেষ্টা করবেন। এই কথা মনে করে তিনি মিঃ জিন্নাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য ডেকে পাঠান। মিঃ জিন্না তখন দিল্লীতে এসে কয়েকবার তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন। অবশেষে ১৫ই অক্টোবর মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দেবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়।

আমিও এই সময় কয়েকবার লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমাকে বলেন, মুসলিম লীগ সরকারে অংশগ্রহণ না করলে মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা ঠিকমতো রূপায়িত হবে না। তিনি আরো বলেন, দেশের মধ্যে যেভাবে সাম্প্রদায়িক হানাহানি চলছে মুসলিম লীগ সরকারের মধ্যে না আসা অবধি তা চলতেই থাকবে। আমি তাঁকে বলি, সরকারে লীগের যোগদানের ব্যাপারে কংগ্রেসের তরফ থেকে কোনো সময়ই কোনো আপত্তি ছিলো না। প্রকৃতপক্ষে আমি বার বার এই অভিমত প্রকাশ করেছি, মুসলিম লীগের সরকারে আসা দরকার। জওহরলালও এই অভিমতই পোষণ করেন। তাই তিনি সরকারে প্রবেশ করবার আগে এবং পরে মিঃ জিন্নার কাছে সহযোগিতার জন্য আবেদন করেছেন।

এই সময় আমি আর একটি বিবৃতি প্রচার করি। সেই বিবৃতিতে আমি বলি, মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবে মুসলিম লীগের সবরকম ভীতিরই নিরসন করা হয়েছে। যুক্ত পরিষদে অংশগ্রহণ করে লীগের নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করবার পূর্ণ স্বাধীনতাও মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবে দেওয়া হয়েছে। অতএব লীগ কর্তৃক পরিষদকে বয়কট করবার কোনোই কারণ নেই। এরপর আমি যখন লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে দেখা করি তখন আমাকে তিনি বলেন, আমার এই বিবৃতি পড়ে তিনি খুবই খুশি হয়েছেন। তিনি আরো বলেন, আমার বিবৃতির একটি কপি তিনি মিঃ জিন্নাকে দেখাবার জন্য লিয়াকত আলীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

এখানে আমি, মিঃ জিন্না যাঁদের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসেবে মনোনীত করেছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধে কিছু বলছি। মুসলিম লীগের মধ্যে লিয়াকত আলী নিঃসন্দেহে ছিলেন সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। এছাড়া আরো যে দুজন অভিজ্ঞ নেতা ছিলেন তাঁরা হলেন বাংলার খাজা নাজিমুদ্দিন এবং উত্তর-প্রদেশের নবাব ইসমাইল খান। সুতরাং আগে থেকেই আমরা ধরে নিয়েছিলাম, মুসলিম লীগ মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা মেনে নিলে লীগ-প্রতিনিধি হিসেবে এই তিনজন ব্যক্তি অবশ্যই মনোনীত হবেন। সিমলা সম্মেলনের সময়ও বার বার এই তিনজনের নাম উল্লেখিত হয়েছিলো। কিন্তু এবারে লীগ যখন ব্যবস্থাপক সভায় অংশগ্রহণ করবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন মিঃ জিন্নার মতিগতি বিস্ময়করভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। খাজা নাজিমুদ্দিন এবং নবাব ইসমাইল খান কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের মতবিরোধের ব্যাপারে কখনই উগ্র মনোভাব দেখাননি। এর ফলে মিঃ জিন্না তাঁদের ওপরে মোটেই

খুশি ছিলেন না। তিনি মনে করেছিলেন ওঁরা দুজন তাঁর 'জো হুকুম' পর্যায়ে কখনোই আসবেন না, সুতরাং প্রতিনিধির তালিকায় ওঁদের দুজনের নাম বাদ গেলো। এটা যদি আগে থেকে জানা যেতো তাহলে লীগ কাউন্সিলের ভেতরে নিশ্চয়ই একটা সোরগোল উঠতো। তিনি তাই লীগ কাউন্সিলকে দিয়ে এইভাবে একটি প্রস্তাব পাস করিয়ে নেন যে প্রতিনিধি নির্বাচনের পূর্ণ ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হলো।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে লীগ প্রতিনিধি

লর্ড ওয়াভেলের কাছে তিনি যে লীগ প্রতিনিধিদের নামের তালিকা পেশ করেন তাঁরা হলেন লিয়াকত আলী, আই. আই. চুন্দ্রিগর, আবদুর রব নিস্তার, গজনফর আলী এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। এই জে. এন. মণ্ডল সম্বন্ধে আমি আলাদাভাবে বলছি। অপর যে তিনজনকে পাঠানো হয়েছিলো তাঁরা সবাই ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ওই তিনটি কালো ঘোড়া সম্বন্ধে লীগের সদস্যরাও বিশেষ কিছু জানতেন না। তবে একথা অনস্বীকার্য, লীগ কখনো রাজনৈতিক আন্দোলনে নামেনি অথবা কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণও করেনি। সুতরাং খুব কমসংখ্যক নেতাই সর্বজনপরিচিত ছিলেন। কিন্তু খাজা নাজিমুদ্দিন এবং নবাব ইসমাইল খান সম্বন্ধে এরকম কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ ওঁরা দুজনেই সারা ভারতে সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু মিঃ জিন্নার ওই তিনজন হুকুম বরদারের জন্য তাঁদের নাম বাদ গেলো।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জন্য মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের নাম ঘোষিত হয় ২৫শে অক্টোবর। এর কিছুদিন আগে থেকেই খাজা নাজিমুদ্দিন, নবাব ইসমাইল খান এবং আরো কয়েকজন লীগ নেতা উক্ত ঘোষণার জন্য অধীরভাবে ইম্পিরিয়াল হোটেলে অবস্থান করছিলেন। তাঁরা দৃঢ়নিশ্চয় ছিলেন নামের তালিকায় তাঁদের নাম অবশ্যই দেখতে পাওয়া যাবে। এই রকম অনুমান করে বহুসংখ্যক লীগ সদস্য ফুলের মালা এবং তোড়া নিয়ে সেখানে এসে সমবেত হয়েছিলেন। এরপর যখন নামের তালিকা ঘোষিত হলো এবং দেখা গেলো যে ওঁরা দুজনেই বাদ পড়েছেন, তখন সমবেত জনতা কি রকম হতাশ এবং রাগান্বিত হয়েছিলেন সে কথা যে-কোনো লোকই অনুমান করতে পারবেন। মিঃ জিন্না তাঁদের আশার ওপরে বরফ-জল ঢেলে দিলেন।

লীগের আর একটি অপকর্ম হলো প্রতিনিধি তালিকায় মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নাম অন্তর্ভুক্ত করা। ইতিপূর্বে মিঃ জিন্না নানাভাবে চেষ্টা করেছিলেন কংগ্রেস শুধু হিন্দুদেরই প্রতিনিধি হিসেবে পাঠাতে পারবে। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কংগ্রেস যখন হিন্দু, শিখ, পার্শী, তপশিলী সম্প্রদায় এবং খ্রীষ্টানদের ভেতর থেকে প্রতিনিধি মনোনয়ন করলো তখন মিঃ জিন্না মনে করলেন তিনিও এবার দেখিয়ে দেবেন মুসলিম লীগ শুধু মুসলমানদেরই প্রতিনিধিত্ব করে না, অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বও সে করে। এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি একজন অ-মুসলমানকে লীগের প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করবেন বলে স্থির করেন। এই কারণেই তিনি মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে মনোনীত করেন। তাঁকে মনোনীত করবার সময় মিঃ জিন্না তাঁর নিজের দাবীর কথাও ভুলে গেলেন। আগে তিনি দাবী তুলেছিলেন, কংগ্রেস শুধু হিন্দু প্রতিনিধি এবং মুসলিম লীগ শুধু মুসলমান প্রতিনিধি পাঠাবে। ও কথা বাদ দিলেও দেখা যায় মিঃ জিন্নার এই বিশেষ কাজটির ফলে লীগ মহলে হাসি-তামাসা এবং রাগের সঞ্চার হয়। মিঃ সুরাবর্দী যখন বাংলায় লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন তখন তিনি তাঁর সেই মন্ত্রিসভায় একমাত্র অমুসলমান সদস্য হিসেবে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে নিয়েছিলেন। ওই ভদ্রলোক তখন বাংলাদেশে একেবারেই অপরিচিত ছিলেন এবং সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর কোনো স্থানই ছিলো না। কিন্তু যেহেতু তিনি মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতিনিধি সেই-হেতু কোনো একটি বিভাগের দায়িত্বও তাঁকে দিতে হবে। এই কারণে তাঁকে আইন বিভাগের সদস্য হিসেবে নেওয়া হয়। সে সময় বেশির ভাগ সেক্রেটারিই ছিলেন ইংরেজ। মিঃ মণ্ডলের বিভাগেও ইংরেজ সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি প্রায় প্রতিদিনই অভিযোগ জানাতে লাগলেন মিঃ মণ্ডলের মতো একজন সদস্যের সঙ্গে কাজ করা অসম্ভব।

এবার লীগ সরকারে যোগদান করতে সম্মত হওয়ায় কংগ্রেসকে বিভিন্ন বিভাগ পুনর্বিন্যাস করে লীগ প্রতিনিধিদের জন্য স্থান করে দেবার প্রয়োজন অনুভূত হলো। লীগ প্রতিনিধিদের স্থান দেবার জন্য তিনজন কংগ্রেসীর পদত্যাগ করা দরকার। আমরা তাই স্থির করলাম, মিঃ শরৎচন্দ্র বোস, স্যার সাফাৎ আহমদ খান এবং সৈয়দ আলী জাহির সরকার থেকে পদত্যাগ করবেন। এরপরেই ওঠে বিভাগ বণ্টনের কথা। লর্ড ওয়াভেল বলেন, গুরুত্ব-পূর্ণ একটি বিভাগ লীগ প্রতিনিধিকে দিতে হবে। তিনি প্রস্তাব করেন, স্বরাষ্ট্র বিভাগ লীগকে দেওয়া হোক। এই বিভাগের সদস্য ছিলেন সর্দার

প্যাটেল। তিনি তীব্রভাবে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। আমার মতে আইন ও শৃঙ্খলা ছিলো একান্তভাবেই প্রদেশগুলোর এক্তিয়ারে। মন্ত্রি-মিশনের পরিকল্পনাতেও বলা হয়েছিলো, আইন ও শৃঙ্খলার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ কিছু করণীয় ছিলো না। সুতরাং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগটি তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ছিলো না। আমি তাই লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবটি মেনে নিতে বলি, কিন্তু সর্দার প্যাটেল এ ব্যাপারে রীতিমতো এক-গুঁয়ে মনোভাব প্রকাশ করেন। তিনি এমন কথাও বলেন, স্বরাষ্ট্র বিভাগ ছাড়তে হলে তিনি সরকার থেকে বেরিয়ে যাবেন।

লিয়াকত আলীর হাতে অর্থবিভাগ

আমরা তখন বিকল্প ব্যবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করতে থাকি। এই সময় রফি আমেদ কিদোয়াই বলেন, অর্থবিভাগটি মুসলিম লীগকে দেওয়া হোক। অর্থ-বিভাগ নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। কিন্তু ওটি এমনই একটি বিভাগ যা চালাতে হলে বিশেষ ধরনের টেকনিক্যাল জ্ঞান থাকা দরকার। লীগ প্রতিনিধিদের মধ্যে অর্থবিভাগ পরিচালনা করবার মতো কেউ ছিলেন না। কিদোয়াই ভেবেছিলেন, লীগ হয়তো অর্থবিভাগের দায়িত্ব নিতে চাইবেন না। তা যদি হতো তাহলে কংগ্রেসকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগই হারাতে হতো না। আবার লীগের কোনো প্রতিনিধি যদি অর্থবিভাগের দায়িত্ব নেনই, তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে বেকুব হয়ে সরে আসতে হবে। তিনি তাই ভেবে নিয়েছিলেন, গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিভাগই কংগ্রেসকে ছাড়তে হবে না।

সর্দার প্যাটেল লাফিয়ে উঠে এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেন। আমি তখন তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করি, অর্থবিভাগ যদি লীগের হাতে যায় তাহলে তাঁরা নানাভাবে অসুবিধের সৃষ্টি করতে পারবেন। সর্দার প্যাটেল বলেন, লীগ কিছুতেই অর্থবিভাগ চালাতে পারবে না, সুতরাং তাঁরা এ প্রস্তাব গ্রহণ করবেন না। আমি কিন্তু এতে খুশি হতে পারিনি। কিন্তু সবাই যখন এ প্রস্তাব মেনে নিলেন তখন বাধ্য হয়েই আমাকেও এটা মেনে নিতে হলো। এরপর ভাইসরয়কে জানিয়ে দেওয়া হলো কংগ্রেস অর্থবিভাগটি মুসলিম লীগকে ছেড়ে দিতে চায়।

লর্ড ওয়াভেল যখন এই সংবাদটি মিঃ জিন্নাকে জানালেন তখন মিঃ জিন্না তাঁকে বললেন, এ সম্পর্কে তাঁর উত্তর পরের দিন জানানো হবে। মনে হয়,

প্রথমদিকে মিঃ জিন্নার মনে এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছুটা অনিশ্চিত ভাব ছিলো। তিনি চেয়েছিলেন, মন্ত্রিসভায় লীগের তরফ থেকে লিয়াকত আলীই হবেন মুখপাত্র। কিন্তু তিনি অর্থবিভাগের ভার নিয়ে সুষ্ঠুভাবে ওই বিভাগটি চালাতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে তাঁর মনে সন্দেহ ছিলো। এদিকে এই খবরটা যখন অর্থবিভাগের চৌধুরী মহম্মদ আলী জানতে পারেন তখন তিনি অবিলম্বে মিঃ জিন্নার সঙ্গে দেখা করে বলেন, কংগ্রেসের এই প্রস্তাব লীগের সামনে মহা সুযোগ এনে দিয়েছে। তিনি আরো বলেন, কংগ্রেস যে অর্থবিভাগটি ছেড়ে দিতে চাইবে এটা তিনি ভাবতেও পারেননি। এই বিভাগের ভার লীগের হাতে থাকার ফলে সরকারের প্রতিটি বিভাগের ওপরেই লীগ তার কর্তৃত্ব খাটাতে পারবে। তিনি তাই মিঃ জিন্নাকে বলেন, এ ব্যাপারে তাঁর চিন্তিত হবার কোনোই কারণ নেই। মিঃ লিয়াকত আলী যাতে সমস্ত বিষয় সুষ্ঠুভাবে চালাতে পারেন তার জন্য তিনি তাঁর সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবেন। মিঃ জিন্না তখন প্রস্তাবটি মেনে নেন এবং লিয়াকত আলী অর্থ-বিভাগের ভার নেন। কিছুদিনের মধ্যেই কংগ্রেস বুঝতে পারে, লীগের হাতে অর্থবিভাগ ছেড়ে দিয়ে মহা ভুল করেছে।

সব দেশেই সরকারের চাবিকাঠি থাকে অর্থমন্ত্রীর হাতে। ভারতবর্ষে এটি আরো গুরুত্বপূর্ণ; কারণ ইংরেজ সরকার অর্থবিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্যকে সরকারের স্বার্থরক্ষক বলে মনে করেন। এই বিভাগের ভার চিরদিনই কোনো-না-কোনো ইংরেজের হাতে রাখা হয়েছে, অর্থবিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য সরকারের প্রতিটি বিভাগের ওপরেই খবর্দারী করতে পারতেন এবং এই কারণে সরকারী নীতি নির্ধারণের ব্যাপারেও তাঁর বিরাট প্রভাব ছিলো। সুতরাং লিয়াকত আলী যখন অর্থবিভাগের সদস্য হলো, তখন স্বাভাবিক-ভাবেই সরকারের চাবিকাঠি তাঁর হাতে গিয়ে পড়ে। সরকারের যে-কোনো বিভাগের যে-কোনো প্রস্তাবই অর্থবিভাগের বিবেচনাধীন ছিলো। এ ব্যাপারে অর্থবিভাগের সদস্যের হাতে প্রকৃতপক্ষে ভেটো ক্ষমতা বিদ্যমান ছিলো। তাঁর বিভাগের অনুমোদন ছাড়া একজন চাপরাশী নিযুক্ত করাও সম্ভব ছিলো না।

সর্দার প্যাটেল স্বরাষ্ট্র বিভাগটি তাঁর নিজের হাতে রাখতে অতিমাত্রায় আগ্রহান্বিত ছিলেন। এবার তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলেন লীগকে অর্থ-বিভাগ ছেড়ে দিয়ে তিনি লীগের হাতে গিয়ে পড়েছেন। তিনি যখনই কোনো প্রস্তাব করেছেন, সে প্রস্তাব লিয়াকত আলী হয় বাতিল করেছেন অথবা এমনভাবে সংশোধন করেছেন যাতে প্রস্তাবটি একেবারেই ভিন্ন রূপ ধারণ

করেছে। তাঁর এই ধরনের কাজের ফলে কংগ্রেস সদস্যরা কোনো কাজই সুষ্ঠুভাবে করতে পারছিলেন না। ফলে, সরকারের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয় এবং সে মতবিরোধ উত্তরোত্তর বেড়েই চলতে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এমন এক আবহাওয়ার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলো যখন কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে সন্দেহ আর অবিশ্বাস একেবারে তুঙ্গে উঠেছিলো। সরকারে যোগদানের আগেও লীগ কংগ্রেসকে অবিশ্বাস করতো এবং নতুন ব্যবস্থাপক সভা গঠনের ব্যাপারেও এই অবিশ্বাসই তাদের প্রভাবিত করেছিলো। ১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বর মাসে যখন সর্বপ্রথম লীগ কাউন্সিল গঠিত হয়েছিলো তখনই তাদের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছিলো, প্রতিরক্ষা বিভাগের দায়িত্ব কার ওপরে থাকবে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্যই ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিলো। কংগ্রেস চেয়েছিলো প্রতিরক্ষা বিভাগটি তাদের বিশ্বাসভাজন কোনো ব্যক্তির হাতে থাকবে। কিন্তু লর্ড ওয়াভেল বলেন, এর ফলে নানারকম অসুবিধে দেখা দেবে। তাঁর মতে প্রতিরক্ষা বিভাগকে রাজনীতির আওতা থেকে বাইরে রাখা উচিত। প্রতিরক্ষা বিভাগটি যদি কোনো কংগ্রেস সদস্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে লীগ সব সময় ভিত্তিহীন অভিযোগ পেশ করতে থাকবে। তিনি আরো বলেন, লীগ যদি সরকারে অংশ গ্রহণ করে তাহলেও তিনি প্রতিরক্ষা বিভাগটি কোনো লীগ সদস্যের হাতে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নন। তিনি প্রস্তাব করেন, প্রতিরক্ষা বিভাগের দায়িত্ব কোনো হিন্দু অথবা মুসলমানকে দেওয়া ঠিক হবে না। সেই সময় শিখ সম্প্রদায়ের ভেতর থেকে সর্দার বলদেও সিংকে মন্ত্রিসভায় নেওয়া হয়েছিলো'। লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবক্রমে তাঁর ওপরেই প্রতিরক্ষা বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করা হলো।

মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের মনে কি ধরনের সন্দেহ আর অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিলো সে সম্বন্ধে এখানে একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করছি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হবার পরে সদস্যরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির করেছিলেন, সদস্যরা সরকারীভাবে কোনো সভায় সমবেত হবার আগে বে-সরকারীভাবে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে নেবেন। এই ভাবে পূর্বাহ্ণে আলোচনা করবার ফলে পরে সরকারীভাবে আলোচনার সুবিধে হবে। মনে করা গিয়েছিলো, এইভাবে প্রাক্-আলোচনার ফলে এমন একটি নজির সৃষ্টি হবে যে ভাইসরয়ই সরকারের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। এই সব আলোচনা-সভা বিভিন্ন সদস্যের ঘরে পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হতো।

জওহরলাল প্রায়ই সদস্যদের চা-চক্রে যোগদানের জন্য আহ্বান করতেন। সাধারণত এই নিমন্ত্রণ জানানো হতো জওহরলালের একান্ত সচিবের মধ্যেমে। মুসলিম লীগ সরকারে আসবার পরেও এই পদ্ধতিটি অনুসৃত হতে থাকে। এ ব্যাপারে লিয়াকত আলী বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হন। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন, জওহরলালের একান্ত সচিব কর্তৃক এইভাবে নিমন্ত্রণপত্র প্রেরণ তাঁর পক্ষে অসম্মানজনক। তিনি আরো মনে করেন, পরিষদের ভাইস প্রেসিডেন্টরূপে জওহরলালের এমন কোনো ক্ষমতা নেই যাতে তিনি এইভাবে বেসরকারী আলোচনা সভায় সদস্যদের আহ্বান করতে পারেন। জওহরলালের ক্ষমতা অস্বীকার করলেও দেখা যায়, লিয়াকত আলী নিজেও এইরকম সভা আহ্বান করতে লাগলেন। ঘটনাটি সামান্যই। কিন্তু এই সামান্য ঘটনা থেকেই মুসলিম লীগ প্রতিনিধিদের কংগ্রেসের সঙ্গে অসহযোগিতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অক্টোবরের শেষ দিকে জওহরলাল এমন একটি অকাজ করে বসেন যার ফলে আমি প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হই। প্রকৃতিগতভাবে তিনি প্রায়ই হৃদয়াবেগ দ্বারা চালিত হন। এতে সময় সময় ভুল-ভ্রান্তিরও সৃষ্টি হতো। কিন্তু পরে যখন বিষয়টা তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হতো তখন তিনি অকপটেই ত্রুটি স্বীকার করতেন। তবে সময় সময় তিনি ঘটনাবলীকে সম্যকভাবে বিবেচনা না করেই কোনো-না-কোনো কাজ করে বসতেন। এবং একবার এই রকম একটা কাজ করে ফেললে সেই কাজটি তিনি সমর্থন করবার জন্য অনেকদূর অগ্রসর হতেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলমানরা ছিলেন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত ওখানকার মন্ত্রিসভা কংগ্রেসই নিয়ন্ত্রণ করেছে। এটা সম্ভব হয়েছিলো খান আবদুল গফ্‌ফর খান এবং তাঁর খোদাই খিদমতগার দলের কার্যকলাপের ফলে। প্রকৃতপক্ষে সীমান্ত প্রদেশের যাবতীয় বিষয়ের জন্যই আমরা খান আবদুল গফ্‌ফর খান এবং তাঁর ভাই ডাঃ খান সাহেবের ওপর নির্ভর করতাম।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হবার অব্যবহিত পরেই দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের অধিবাসীদের ওপরে বোমাবর্ষণ নিষিদ্ধ করে এক হুকুমনামা জারি করা হয়েছিলো। ইতিমধ্যে জওহরলালের কাছে নানা সূত্র থেকে খবর আসতে থাকে, সীমান্ত প্রদেশের বিপুল সংখ্যক অধিবাসী কংগ্রেস তথা খান-ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরোধী। স্থানীয় আমলারা বার বার এই অভিমত জ্ঞাপন করে,

স্থানীয় জনসাধারণ কংগ্রেস অপেক্ষা মুসলিম লীগের দিকেই বেশি করে ঝুঁকেছে। জওহরলাল মনে করেন, আমলাদের এই অভিমত সত্যি নয়। ইংরেজ কর্মচারীরাই এই রকম একটা ধারণার সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়েছে। কারণ তারা কংগ্রেসকে কখনো সুনজরে দেখতো না। লর্ড ওয়াভেল এ ব্যাপারে জওহরলালের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তবে রিপোর্টটিকে পুরোপুরিভাবেও তিনি মেনে নেননি। তিনি মনে করতেন সীমান্ত প্রদেশের জনগণ দু ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একভাগ খান-ভ্রাতৃদ্বয়কে সমর্থন করছে এবং অপরভাগ মুসলিম লীগকে সমর্থন করছে। কংগ্রেস মহলের ধারণা ছিলো, জনগণের বৃহত্তর অংশই খান-ভ্রাতাদের সমর্থক। জওহরলাল বলেন, তিনি সীমান্ত প্রদেশ সফর করে প্রকৃত অবস্থাটা জানতে চেষ্টা করবেন।

জওহরলালের এই সিদ্ধান্তের কথা আমি যখন জানতে পারি তখন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলি, এ ব্যাপারে এখনই কিছু করা ঠিক হবে না। সীমান্ত প্রদেশের প্রকৃত ঘটনাবলী এখনো সঠিকভাবে জানা যায়নি। সব প্রদেশেই জনগণ দুই অংশে বিভক্ত হয়ে গেছে। সীমান্ত প্রদেশেও এই ব্যাপারই ঘটেছে এবং ওখানেও একদল লোক খান-ভ্রাতাদের বিরোধিতা করছে। কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদান করলেও নিজেদের এখনো শক্তিশালী করতে পারেনি। এই সময়ে তাঁর সীমান্ত প্রদেশ সফর বিরোধীদের মনোভাবকে আরো বিরোধী করে তুলবে। তাছাড়া সরকারী কর্মচারীদের বেশিরভাগ অংশ যেখানে লীগের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, তাতে প্রকাশ্যে কিছু না করলেই গোপনে গোপনে তারা বিরোধীদের মদত দেবে। সুতরাং এই অবস্থায় সীমান্ত সফর বাতিল করাটাই শ্রেয় হবে। গান্ধীজীও আমার অভিমত সমর্থন করেন কিন্তু জওহরলাল বলেন, যাই ঘটুক না কেন, তিনি ওখানে যাবেনই।

খান-ভ্রাতৃদ্বয় সঠিকভাবেই দাবী করতেন, সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে বিরাট-সংখ্যক লোক তাঁদের পেছনে ছিলো। কিন্তু তাঁরা তাঁদের জনপ্রিয়তা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেননি। এটাই স্বাভাবিক, কারণ প্রত্যেকেই তাঁর নিজের শক্তি সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। হয়তো ওঁরা আমাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন, অন্যান্য প্রদেশে জনগণের মধ্যে বিরোধ থাকলেও সীমান্ত প্রদেশ সব সময়ই কংগ্রেসের সঙ্গে আছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো, জনগণের একটি শক্তিশালী অংশ খান-ভ্রাতাদের বিরোধী ছিলো। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ডাঃ খান সাহেবের কার্যকলাপের ফলেই এইভাবে

বিরোধী দলের সৃষ্টি হয়েছিলো। সারা প্রদেশের ওপরে নিজের প্রাধান্য সৃষ্টি করবার সুযোগ তাঁর থাকলেও তাঁর কিছু কাজের ফলে বিরোধী দল শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো।

এইসব ত্রুটির মধ্যে কিছু ছিলো ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং কিছু ছিলো সামাজিক ব্যাপার। সীমান্তের পাঠানরা তাঁদের আতিথেয়তার জন্য খ্যাত ছিলেন। বাড়িতে কোনো অতিথি এলে শেষ রুটিখানাও তাঁর সঙ্গে সমভাবে ভাগ করে নিয়ে তাঁরা আহার করতেন। অপরের কাছ থেকেও তাঁরা এই রকম আতিথেয়তাই আশা করতেন। এ ব্যাপারে কারো কাছ থেকে তাঁরা কৃপণতা এবং সহৃদয়তার অভাব দেখলে অত্যন্ত বিরক্ত হতেন। এই ব্যাপারে খান-ভ্রাতৃদ্বয়ের কাজকর্ম মোটেই ভালো ছিলো না। সুতরাং তাঁদের সমর্থকরা ক্রমশ তাঁদের ওপরে বিরক্ত হয়ে পড়ছিলেন।

খান-ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন খানদানি পরিবারের লোক। কিন্তু স্বভাবের দিক থেকে তাঁরা অতিথিপরায়ণ ছিলেন না। ডাঃ খান সাহেব মুখ্যমন্ত্রী হবার পরে কোনো লোককেই তাঁরা তাঁদের বাড়িতে আহারের নিমন্ত্রণ করেননি। কোনো লোক যদি চা-পানের সময় অথবা ডিনারের সময় তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন তখন তাঁকে ওঁরা খেতে বলতেন না। তাঁদের এই কৃপণ স্বভাবের জন্য জনসাধারণের অর্থও তাঁরা সঠিকভাবে ব্যয় করতেন না। সাধারণ নির্বাচনের সময় কংগ্রেস বিরাট অঙ্কের টাকা তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন কিন্তু খান-ভ্রাতৃদ্বয় সে টাকার অল্পই ব্যয় করেছিলেন। সময়মতো অর্থ সাহায্য না পেয়ে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ না পেয়ে অনেক প্রার্থীই নির্বাচনে হেরে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁরা যখন জানতে পারেন হাতে যথেষ্ট টাকা থাকা সত্ত্বেও সে টাকা ব্যয় করা হয়নি, তখন তাঁরা ওঁদের শত্রু হয়ে পড়েন।

এই রকম একটি ঘটনার ফলে পেশোয়ার থেকে কিছুসংখ্যক লোক কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন। তখন চা-পানের সময় হয়েছিলো বলে আমি তাঁদের চা আর বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়িত করি। প্রতিনিধিদের মধ্যে কয়েকজন লোক তখন বিস্মিতভাবে বিস্কুটগুলোর দিকে তাকান। একজন একখানা বিস্কুট হাতে তুলে নিয়ে তার নাম জানতে চান। তাঁরা খুশি মনেই বিস্কুটগুলো খান। খেতে খেতে তাঁরা বলেন, এই রকম বিস্কুট তাঁরা ডাঃ খান সাহেবের বাড়িতেও দেখেছেন। কিন্তু তিনি কখনো আমাদের চা-বিস্কুট খেতে দেননি।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে পরিস্থিতি এমন অবস্থায় আসে যে সীমান্ত প্রদেশে খান-ভ্রাতৃদ্বয়ের জনপ্রিয়তা রীতিমতো কমে গিয়েছিলো।

অশুভ সময়ে জওহরলালের সীমান্তপ্রদেশ সফর

জওহরলাল যখন পেশোয়ারে পদার্পণ করেন তখন সেখানকার পরিস্থিতি দেখে তিনি রীতিমতো মর্মাহত হয়ে পড়েন। সীমান্তপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তখন ডাঃ খান সাহেব। মন্ত্রিসভাও কংগ্রেসী সদস্যদের নিয়েই গঠিত হয়েছিলো। আমি আগেই বলেছি, ওখানকার ইংরেজ অফিসাররা কংগ্রেস-বিরোধী ছিলেন। তাঁরা জনসাধারণকে নানাভাবে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছিলেন। জওহরলাল বিমান-বন্দরে অবতরণ করেই দেখতে পান হাজার হাজার পাঠান কালো পতাকা হাতে নিয়ে সেখানে সমবেত হয়েছেন। জওহরলালকে দেখতে পেয়েই তাঁরা কংগ্রেস-বিরোধী ধ্বনি দিতে শুরু করেন। ডাঃ খান সাহেব এবং আরো কয়েকজন মন্ত্রী জওহরলালকে স্বাগত জানাবার জন্য বিমান-বন্দরে এসেছিলেন। তাঁদের অবস্থা তখন রীতিমতো গুরুতর হয়ে পড়েছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে তাঁরা তখন পুলিসের রক্ষণাধীনে রয়েছেন। সুতরাং ওখানকার পরিস্থিতির মোকাবিলা করা তাঁদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। জওহরলাল মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই জনতা মুহুর্মুহু 'জওহরলাল মুর্দাবাদ' ধ্বনি দিতে দিতে তাঁর গাড়ির দিকে ছুটে আসতে থাকে। ব্যাপার দেখে ডাঃ খান সাহেব এতোই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন যে তিনি তাঁর রিভলবার বের করে জনতার ওপরে গুলি করতে চেষ্টা করেন। রিভলবার দেখে জনতা কিছুটা দূরে সরে যায়। এরপর পুলিস কর্ডন করে জওহরলালকে গাড়িতে তুলে দেয় এবং পুলিসের রক্ষণাধীনেই গাড়ি এগিয়ে যেতে থাকে।

পরদিন জওহরলাল উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকা পরিদর্শন করবার উদ্দেশ্যে পেশোয়ার পরিত্যাগ করেন। কিন্তু যেখানেই তিনি যান সেখানেই বিশাল জনতা সমবেত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে। ওয়াজিরি প্রদেশের মালিক সম্প্রদায়ই এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হয়েছিলো। কোনো কোনো জায়গায় তারা জওহরলালের গাড়ি লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুঁড়েছিলো। এই সময় তাদের নিক্ষিপ্ত একটি ইটের টুকরো এসে জওহরলালের কপালে আঘাত

করে। জওহরলাল বুঝতে পারেন উপজাতীয় মুসলমানদের ওপরে ডাঃ খান সাহেবের আদৌ কোনো প্রভাব নেই; তিনি তাই নিজেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবেন বলে স্থির করেন এবং সাহসের সঙ্গে বিরোধীদের সম্মুখীন হন।

জওহরলাল পাঠানদের হৃদয় জয় করেন

পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার জন্য জওহরলাল যে রকম সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেন তাতে পাঠানরা তাঁদের ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা জওহরলালের প্রতি আনুরক্তি প্রকাশ করেন। জওহরলাল দিল্লীতে ফিরে আসবার পরে লর্ড ওয়াভেল তাঁর কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, তিনি এ বিষয়ে একটি তদন্তের ব্যবস্থা করছেন। কারণ তিনি বুঝতে পারছেন যে সরকারী কর্মচারীদের প্ররোচনার ফলেই সীমান্তপ্রদেশের জনসাধারণ জওহরলালের ওপরে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছিলো। জওহরলাল কিন্তু এ প্রস্তাবে সম্মত হননি। তাঁর এই মনোভাব দেখে লর্ড ওয়াভেল খুবই খুশি হন। আমিও এ ব্যাপারে জওহর-লালকে সমর্থন করি।

কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়েই মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা মেনে নিয়েছিলো। কংগ্রেস তখনই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করে চলেছিলো। তাদের তরফ থেকে একমাত্র যে বাধাটা এসেছিলো, তা হলো আসামের কয়েকজন কংগ্রেস নেতা 'গ' শ্রেণীর প্রাদেশিক বিভাগকে মেনে নিতে পারছিলেন না। বাংলাকে তাঁরা ভীতির চোখে দেখছিলেন। তাঁরা বলছিলেন, বাংলা আর আসামকে যদি একই এলাকাভুক্ত করা হয় তাহলে পুরো এলাকাটাই মুসলমানদের অধীনে গিয়ে পড়বে। মন্ত্রিমিশনের এই পরিকল্পনা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আসামের নেতারা এ বিষয়ে তাঁদের আপত্তি উত্থাপন করেন। প্রথম দিকে গান্ধীজী মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা সমর্থন করে বলেন, এই পরিকল্পনার ফলে দুঃখকষ্টের দিন শেষ হয়ে নতুন এক সুখ ও সমৃদ্ধির দিন আসবে। 'হরিজন' পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখে তিনি আরো বলেন, মন্ত্রিমিশন এবং ভাইসরয় কর্তৃক প্রস্তাবিত সরকারী কাগজপত্র চার-দিন যাবৎ পরীক্ষা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, ইংরেজ সরকার এর চেয়ে ভালো কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারতেন না।

আসামের মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈ তাঁর বিরোধিতা পরিত্যাগ করেন না। মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব অনুসারে বাংলা আর আসামকে একটি এলাকার অধীনে আনার বিরুদ্ধে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে একটি স্মারক-লিপি দাখিল করেন। ওয়ার্কিং কমিটির সভায় আমরা তাই স্থির করি যে এলাকা-ভিত্তিক পুনর্বিন্যাসের প্রশ্নটি আর নতুন করে তোলা হবে না। তবে আসামের সহকর্মীদের আপত্তির আংশিক সমাধানের জন্য আমরা ব্যবস্থাপক সভায় ইংরেজদের অংশ গ্রহণের প্রশ্নটা তুলি। আমি ভাইসরয়কে লিখি, বাংলা ও আসামের বিধানসভায় ইংরেজ সদস্যরা যদি ভোট বা মনোনয়নের মাধ্যমে ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন তাহলে কংগ্রেস হয়তো মন্ত্রি-মিশনের প্রস্তাব পুরোপুরিভাবে অগ্রাহ্য করবে। এই আপত্তি গৃহীত হয় এবং বাংলার বিধানসভার ইংরেজ সদস্যরা ঘোষণা করেন তাঁরা ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না। ইতিমধ্যে গান্ধীজীর মনোভাবে পরিবর্তন দেখা যায়। তিনি বরদলৈ-এর প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। জওহরলাল কিন্তু এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হন যে আসামের নেতাদের আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক। তিনি তাই আসামের নেতাদের মন থেকে তা দূর করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁরা জওহরলাল এবং আমার কথা মানতে চান না। গান্ধীজী তাঁদের সমর্থন করেছেন বলেই তাঁরা এইরকম মনোভাব গ্রহণ করেন। জওহরলাল তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সর্বতোভাবে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে থাকেন।

আমি আগেই বলেছি, লীগ মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করায় আমরা বিশেষভাবে চিন্তিত হয়েই পড়েছিলাম। লীগের সেই আপত্তি খণ্ডন করবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি যে পন্থা গ্রহণ করেছিলো, সে কথাও আমি উল্লেখ করেছি। এটি করা হয়েছিলো ১০ই আগস্ট একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। ওই প্রস্তাবে সুষ্ঠুভাবে বলা হয়েছিলো, মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনার কোনো কোনো প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি থাকলেও পরিকল্পনাটিকে আমরা পুরোপুরিভাবেই গ্রহণ করেছিলাম। মিঃ জিন্না এতে খুশি হন না। তাঁর বক্তব্য সম্বন্ধে আমি আগে যা বলেছি তাছাড়া তিনি আরো বলেন, মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনায় প্রদেশসমূহকে যে এলাকাভিত্তিক পুনর্বিন্যাসের কথা বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কোনো কথাই বলেনি। এই বিশেষ ব্যাপারটিতে ইংরেজ সরকার এবং লর্ড ওয়াভেল লীগের বক্তব্যকেই সমর্থন করেন।

আমি সব সময়ই আলোচনার মাধ্যমে সমস্তরকম বিরোধের মীমাংসা করতে চেষ্টা করছিলাম। এ ব্যাপারে লর্ড ওয়াভেল সর্বতোভাবে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করছিলেন। এই কারণেই তিনি মুসলিম লীগকে সরকারের ভেতরে আনবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। তিনি তাই এ সম্বন্ধে আমার বিবৃতিকে স্বাগত জানালেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারতের সমস্যা সমাধানের জন্য মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনাই সর্বোত্তম উপায়। তিনি একাধিকবার আমাকে বলেন, মুসলিম লীগের মনোভাবের দিক থেকেও এর চেয়ে কোনো ভালো সমাধান সম্ভব নয়। এখানে উল্লেখযোগ্য, মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনাটি আমার ১৫ই এপ্রিলের বিবৃতির ভিত্তিতেই রচিত হয়েছিলো বলে স্বাভাবিক কারণেই আমি তাঁর সঙ্গে একমত হই।

এটলী কর্তৃক ভাইসরয় এবং দলীয় নেতাদের আমন্ত্রণ

মিঃ এটলী ভারতীয় অগ্রগতির সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে সবকিছু লক্ষ্য রাখছিলেন। ২৬শে নভেম্বর তিনি লর্ড ওয়াভেল এবং কংগ্রেস ও লীগ প্রতিনিধিদের ইংল্যাণ্ডে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। অচলাবস্থার অবসান ঘটাবার জন্যই এই আমন্ত্রণ। কংগ্রেস প্রথমদিকে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করবে না বলে স্থির করে। জওহরলাল লর্ড ওয়াভেলকে বলেন, এ বিষয়ে নতুন করে আলোচনার জন্য ইংল্যাণ্ডে যাবার মতো কোনো কারণ তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। এ ব্যাপারে বহুবার বহুভাবে আলোচনা হয়েছে সুতরাং নতুন করে আলোচনা শুরু করলে লাভের চেয়ে লোকসানই হবে বেশী।

লর্ড ওয়াভেল জওহরলালের এই অভিমত মেনে নিতে পারেন না। তিনি তাই এ বিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, মুসলিম লীগের বর্তমান মনোভাব যদি চলতে থাকে তাহলে শুধু যে সরকার পরিচালনার ব্যাপারেই অসুবিধের সৃষ্টি হবে তাই নয়, শান্তিপূর্ণভাবে ভারতীয় সমস্যার সমাধানের ব্যাপারেও এর ফলে নতুন নতুন বাধার সৃষ্টি হবে। তিনি আরো বলেন, লণ্ডনে গিয়ে আলোচনা করলে নেতৃবৃন্দ সমগ্র বিষয় সঠিকভাবে বিচার-বিবেচনা করবার সুযোগ পাবেন। তাঁদের ওপরে কোনোরকম চাপ সৃষ্টি করা হবে না এবং ভারত থেকে বহু দূরে থাকার ফলে দলের লোকেরাও

তাঁদের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। ওয়াভেল বেশ জোর দিয়েই বলেন, মিঃ এটলী ভারতের একজন অকৃত্রিম বন্ধু, সুতরাং আলোচনার সময় তাঁর উপস্থিতি সবদিক থেকেই মঙ্গলজনক হবে।

লর্ড ওয়াভেলের এই যুক্তিসঙ্গত বক্তব্য আমি মেনে নিই এবং আমার সহকর্মীদেরও তাতে সম্মত করতে সক্ষম হই। তখন স্থির হয়, জওহরলাল কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করবেন। লীগের প্রতিনিধিত্ব করবেন মিঃ জিন্না ও লিয়াকত আলী। বলদেও সিং যাবেন শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে। ৩রা থেকে ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আলোচনা চলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তই গৃহীত হয় না।

আলোচনার সময় প্রদেশসমূহকে বিভিন্ন এলাকায় ভাগ করার প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দেয়। মিঃ জিন্না এই অভিমত প্রকাশ করেন, পরিকল্পনার কাঠামোতে কোনোরকম অদলবদল করবার ক্ষমতা ব্যবস্থাপক সভার থাকতে পারে না। এলাকাভিত্তিক পুনর্বিন্যাসের বিষয় মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনার একটি অপরিহার্য অঙ্গ, সুতরাং এ ব্যাপারে কোনোরকম অদলবদল করা হলে পরিকল্পনার মূল ভিত্তিই পরিবর্তিত হয়ে যাবে। পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, এলাকাগুলো তাদের শাসনতন্ত্র রচনা করবার পরে কোনো প্রদেশ ইচ্ছা করলে বেরিয়ে যেতে পারবে। মিঃ জিন্নার মতে প্রদেশগুলোর পক্ষে এটাই হবে রক্ষাকবচ, কারণ যে-কোনো প্রদেশ তার এলাকা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু আসামের কংগ্রেস নেতারা মনে করেন, যে-কোনো প্রদেশ প্রথম থেকেই বাইরে থাকতে পারে। যে-কোনো প্রদেশ তার ইচ্ছানুসারে এলাকার বাইরে থেকে তার নিজের জন্য শাসনতন্ত্র রচনা করতে পারে। মিঃ জিন্না এ ব্যাপারে ভিন্ন অভিমত পোষণ করেন। তাঁর বক্তব্য হলো, প্রদেশগুলো আগে তাদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় যোগ দেবে, পরে ইচ্ছা হলে এলাকা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু আসামের কংগ্রেস নেতাদের অভিমত হলো, প্রথম থেকেই যে-কোনো প্রদেশ আলাদাভাবে থাকতে পারবে। পরে ইচ্ছা হলে তারা তাদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় যোগদান করতে পারবে। মন্ত্রিমিশন মনে করেন, এ ব্যাপারে মিঃ জিন্নার বক্তব্যই সঠিক। মিঃ জিন্না সওয়াল করেন যে এই ভিত্তিতেই কেন্দ্র, প্রদেশসমূহ এবং এলাকাসমূহের ভেতরে ক্ষমতা বণ্টিত হবে বলে স্থির হয়েছে এবং এই ভিত্তির ওপরে আস্থা রেখেই তিনি লীগকে মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা মেনে নেওয়াতে পেরেছেন। আসামের কংগ্রেস নেতারা এতে সম্মত হন না। এদিকে সামান্য

কিছু দ্বিধার পরে গান্ধীজী আসামের নেতাদের বক্তব্যকেই সমর্থন করেন। এখানে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, এ ব্যাপারে মিঃ জিন্নার বক্তব্যই ছিলো জোরালো।

৬ই ডিসেম্বর ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রিসভা এক বিবৃতি প্রচার করে এলাকাভিত্তিক পুনর্বিন্যাসের ব্যাপারে মুসলিম লীগের বক্তব্যই সমর্থন করেন। এর ফলে কংগ্রেস এবং লীগের ভেতরের বিরোধের কোনোই অবসান হয় না।

ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর। প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে সভাপতি কে হবেন। জওহরলাল এবং সর্দার প্যাটেল উভয়েই বলেন, গভর্নমেন্টের বাইরে যাঁরা আছেন তাঁদের ভেতর থেকেই কাউকে সভাপতি নির্বাচিত করা হবে। ওঁরা দুজনেই আমাকে এই পদ গ্রহণ করবার জন্য চাপ দেন। কিন্তু আমি এতে সম্মত হইনি। এরপর আরো অনেকের নাম প্রস্তাবিত হয়। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না। অবশেষে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে নির্বাচিত করা হয়। তিনি গভর্নমেন্টের ভেতরে থাকা সত্ত্বেও তাঁকেই নির্বাচিত করা হয়। এই নির্বাচন খুবই সঙ্গত হয়েছিলো, কারণ পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছে, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সুষ্ঠুভাবে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বহুবিধ সমস্যা ও বিরোধের ক্ষেত্রে মূল্যবান অভিমত দিয়ে সমস্যাবলীর সমাধান করেছেন।

আমি আগেই বলেছি, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হবার সময় গান্ধীজী এবং আমার সহকর্মীরা আমাকে উক্ত সরকারে যোগ দেবার জন্য চাপ দেন। আমি তখন মনে করি, কংগ্রেসের কোনো একজন প্রবীণ নেতাকে সরকারের বাইরে রাখা দরকার। আমি আরো মনে করি, এর ফলে আমি সমগ্র বিষয় নিরপেক্ষভাবে দেখবার সুযোগ পাবো। এইজন্যই আমি আসফ আলীকে সরকারের ভেতরে পাঠাই। লীগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দেবার পর একজিকিউটিভ কাউন্সিলে নতুন অসুবিধে দেখা দেয়। এই অসুবিধে দূরীকরণের জন্য আবারও আমাকে সরকারের ভেতরে নেবার কথা ওঠে। এ ব্যাপারে গান্ধীজী আগের চেয়েও বেশী জোর দিয়ে আমাকে সরকারের ভেতরে যেতে বলেন। তিনি আমাকে খোলাখুলিভাবে বলেন, আমার ব্যক্তিগত মতামত যাই হোক না কেন, দেশের স্বার্থের জন্য আমার সরকারে যোগ দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, আমি বাইরে থাকায় ক্ষতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। জওহরলালও একই অভিমত জ্ঞাপন করেন।

গান্ধীজী বলেন, শিক্ষাবিভাগই হবে আমার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত দপ্তর ;

জাতীয় স্বার্থের দিক থেকেও এর প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। তিনি বলেন, শিক্ষাই হলো স্বাধীন ভারতের মৌলিক প্রশ্ন। গান্ধীজীর অনুরোধে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী আমি শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্যরূপে সরকারে যোগ দিই। আমার আগে এই দপ্তরটি ছিলো শ্রীরাজাগোপালাচারীর হাতে।

শিক্ষাদপ্তরের দায়িত্ব নেবার পরে শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে আমি যেসব নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলাম সেগুলো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। ও-ব্যাপারে আমি যেসব অভিমত পোষণ করেছি সেগুলো সংগ্রহ করে আলাদা-ভাবে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং এখানে ও সম্বন্ধে কিছু বলা হচ্ছে না। এখানে আমি শুধু দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধেই আলোচনা করবো। দেশের সাধারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের মতানৈক্যের ফলে উত্তরোত্তর খারাপের দিকেই চলেছিলো।

পরিষদের লীগ সদস্যরা কিভাবে প্রতি পদক্ষেপে আমাদের সামনে বাধার সৃষ্টি করে চলেছিলেন সে কথাও আমি আগেই বলেছি। তারা সরকারের ভেতরে থেকেও সরকারের বিরোধিতা করছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের কাজ ছিলো আমাদের প্রতিটি কাজকে বানচাল করা। অর্থবিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্যের হাতে বিশেষ ক্ষমতা থাকার ফলেই এ ব্যাপারে তাঁদের সামনে সুযোগ এনে দিয়েছিলো। অবস্থা চরমে পৌঁছয় লিয়াকত আলী যখন পরবর্তী বছরের জন্য বাজেট পেশ করেন।

কংগ্রেসের ঘোষিত নীতি ছিলো, সমাজ থেকে অর্থনৈতিক অসাম্য বিদূরিত করে ধনবাদী সমাজব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে সমাজবাদী প্যাটার্নের দিকে নিয়ে আসা। নির্বাচনী ইস্তাহারেও কংগ্রেস এই কথাই বলেছিলো। উপরন্তু জওহরলাল এবং আমি আলাদা আলাদা বিবৃতি মারফত যুদ্ধের সময় শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীরা যে বিপুল পরিমাণ মুনাফা অর্জন করেছেন সে সম্বন্ধে আমাদের অভিমত ব্যক্ত করেছিলাম। প্রত্যেকেই জানেন, এই বিপুল আয়ের একটা বড় অংশ কালো বাজারের অন্ধকারে আত্মগোপন করে, এবং সরকার সেই আয়ের ওপরের আয়কর থেকে বঞ্চিত হন। এর অর্থ হলো, বিপুল পরিমাণ ধনসম্পত্তির কথা সরকারের কাছে গোপন করা হয়। আমরা তাই ভেবে রেখেছিলাম, সরকার এ ব্যাপারে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ী কর আদায় করবেন।

লিয়াকত আলী বাজেট পেশ করলেন

লিয়াকত আলী যে বাজেট তৈরি করলেন সেটি আপাতদৃষ্টিতে কংগ্রেসের ঘোষিত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিলো কংগ্রেসকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করবার এক চাতুর্যপূর্ণ কৌশল। এটি তিনি করেছিলেন কংগ্রেসের দাবীকে নস্যাৎ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। বাজেটে কর ধার্য করবার যে প্রস্তাবটি তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন সমস্ত ধনিকশ্রেণীকে দরিদ্রে পরিণত করবার এবং শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে পঙ্গু করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অনাদায়ী কর কি-ভাবে আদায় করা যায় তার উপায় নির্ধারণের জন্য একটি কমিশন নিয়োগের প্রস্তাবও তিনি রেখেছিলেন।

ধনসম্পদ যাতে ধনী ও দরিদ্রের ভেতর সমভাবে বণ্টিত হয় এবং কর ফাঁকি দেনেওয়ালাদের বিরুদ্ধে যাতে আরো বেশী কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, এটাই আমরা চেয়েছিলাম এবং সুষ্ঠু উপায়ে এইসব ব্যবস্থা কি করে করা যায় তার জন্য আমরা (অর্থাৎ কংগ্রেসীরা) সবাই উদ্বিগ্ন ছিলাম। সুতরাং নীতিগত দিক থেকে লিয়াকত আলীর প্রস্তাবসমূহের বিরোধী ছিলাম না। লিয়াকত আলী যখন মন্ত্রিসভার সামনে বিষয়গুলো উত্থাপন করেন তখন তিনি খোলাখুলিভাবেই বলেন, কংগ্রেসের দায়িত্বশীল নেতাদের ঘোষণাবলীকে ভিত্তি করেই তিনি তাঁর প্রস্তাবসমূহ রচনা করেছেন। তিনি আরো বলেছিলেন, জওহরলাল যদি এই সব কথা না বলতেন তাহলে এসব কথা তিনি চিন্তাও করতেন না। কিন্তু সে সময় তিনি তাঁর প্রস্তাবসমূহ বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করেননি। সুতরাং নীতিসংক্রান্ত ব্যাপারে আমরা সাধারণ-ভাবে তাঁর প্রস্তাবসমূহ (অর্থাৎ প্রস্তাবসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ) মেনে নিয়েছিলাম। এবং এইভাবে আমাদের সম্মতি আদায় করে নিয়ে তিনি তাঁর বাজেট প্রস্তাবসমূহকে এমনভাবে তৈরি করেছিলেন যাকে বলা চলে জাতীয় অর্থনীতির ওপরে এক চরম আঘাত।

লিয়াকত আলীর প্রস্তাবসমূহ আমাদের কিছু-সংখ্যক সহকর্মীর মনে রীতিমতো বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলো। তাঁদের মধ্যে এমন কয়েকজন ছিলেন যাঁরা শিল্পপতিদের প্রতি গোপনে সহানুভূতিশীল ছিলেন। এছাড়া আরো কয়েকজন ছিলেন যাঁরা মনে করেছিলেন যে, লিয়াকত আলীর প্রস্তাবসমূহে

অর্থনৈতিক বিচার-বিবেচনার পরিবর্তে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের পন্থাই অনুসৃত হয়েছে। সর্দার প্যাটেল এবং বিশেষ করে শ্রীরাজাগোপালাচারী তাঁর এই বাজেটের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁদের মতে, লিয়াকত আলীর বাজেট প্রস্তাব দেশের স্বার্থের পরিপন্থী ; এটা শুধু শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের জব্দ করবার উদ্দেশ্যেই তৈরি হয়েছে। তাঁরা আরো মনে করেন, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে আঘাত হানবার পেছনে লিয়াকত আলীর যে আসল মতলবটি প্রকটিত হয়েছে তা হলো সম্পত্তিপন্ন হিন্দুদের জব্দ করা, কারণ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই সর্বাধিক। কেবিনেটের সামনে রাজাজী খোলাখুলিভাবেই তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, তিনি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছেন তার কারণ হলো, এ সব প্রস্তাব রচিত হয়েছে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে। আমি তখন আমার সহকর্মীদের বলি, আপাত-দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে বাজেট প্রস্তাবে কংগ্রেসের ঘোষিত নীতিই প্রতিফলিত হয়েছে ; সুতরাং আগে থেকেই একে বাতিল না করে আমাদের উচিত হবে প্রস্তাবগুলোকে ভালোভাবে বিচার-বিবেচনা করা এবং যদি দেখতে পাওয়া যায় এগুলো আমাদের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে একে মেনে নেওয়া।

আমি আগেই বলেছি, তখনকার পরিস্থিতি খুবই ঘোরালো ছিলো। মুসলিম লীগ প্রথমে মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা মেনে নিলেও পরে তাকে অগ্রাহ্য করে। তখন ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন চলছিলো, কিন্তু সমগ্র দেশ একতাবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার জন্য দাবী জানালেও লীগ সে অধিবেশন বর্জন করে। তখন একদিকে দেশবাসীরা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অধৈর্য হয়ে পড়েছেন, আবার অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য কোনো পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনায় এ সমস্যা সমাধানের জন্য যে একমাত্র উপায়ের কথা বর্ণিত হয়েছিলো সে পথও আমরা গ্রহণ করতে পারছিলাম না আমাদের ভেতরের মতানৈক্যের জন্য।

এটলী ইংরেজদের ভারত ত্যাগের তারিখ নির্দিষ্ট করে দিতে চান

ব্রিটেনের শ্রমিক সরকার বুঝতে পারছিলেন যে তাঁরা এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁরা কি এই অবস্থাই চলতে দেবেন, অথবা নিজেদের

তরফ থেকেই এ ব্যাপারে কিছু করবার জন্য এগিয়ে আসবেন? মিঃ এটলী এই অভিমত পোষণ করছিলেন, পরিস্থিতি এমন এক স্তরে এসে উপস্থিত হয়েছে যা সবদিক থেকেই অনভিপ্রেত। এবং সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার জন্য অবিলম্বে একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেবার দরকার হয়ে পড়েছে। তিনি তাই সিদ্ধান্ত নেন, ইংরেজ শক্তিকে ভারত পরিত্যাগ করে চলে আসবার জন্য একটি নির্দিষ্ট তারিখ স্থির করে দিতে হবে। তাই তারিখ ঘোষণা বিষয়টি লর্ড ওয়াভেল মেনে নিতে পারেন না। তিনি মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনাকেই কর্যকর করতে চান, কারণ তিনি মনে করতেন ওই পথেই ভারতীয় সমস্যার সমাধান করা যাবে। তিনি আরো মনে করতেন, ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের আগেই যদি ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হয় তাহলে ইংরেজ সরকার তাঁদের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবেন। ভারতীয়দের মনোভাব তখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁচেছে যে অত্যন্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তিরাও তখন ভাবাবেগ দ্বারা চালিত হচ্ছেন। লর্ড ওয়াভেলের মতে, এইরকম আবহাওয়ার মধ্যে যদি ইংরেজরা ভারত পরিত্যাগ করেন তাহলে সারা দেশ জুড়ে প্রচণ্ড রকম হানাহানি শুরু হয়ে যাবে। তিনি তাই পরামর্শ দেন, স্থিতাবস্থা বজায় রেখে দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের বিরোধের মীমাংসা করতে চেষ্টা করা হোক। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, এই সময়, অর্থাৎ কংগ্রেস এবং লাগের মধ্যে একটা সমঝোতা হবার আগেই যদি ইংরেজরা ভারত ত্যাগ করেন তাহলে তার ফল হবে অত্যন্ত গুরুতর এবং সাংঘাতিক।

মিঃ এটলী কিন্তু তা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, নির্দিষ্ট তারিখসীমা স্থিরীকৃত হলে সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব ভারতীয়দের ওপরেই বর্তাবে, সুতরাং এটা যদি না করা হয় (অর্থাৎ ইংরেজ শক্তিকে ভারত পরিত্যাগ করবার নির্দিষ্ট তারিখ যদি ঘোষণা না করা হয়) তাহলে কোনোদিনই সমস্যার সমাধান হবে না। মিঃ এটলী মনে করেন, যদি স্থিতাবস্থা চলতে দেওয়া হয় তাহলে ভারতীয়রা ইংরেজ সরকারের ওপরে আর বিশ্বাস রাখতে পারবে না। ভারতের পরিস্থিতি তখন এমন অবস্থায় এসে পড়েছিলো যার ফলে নতুন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ইংরেজ রাজশক্তির পক্ষে ভারতে অবস্থান করা সম্ভব ছিলো না। কিন্তু ইংলণ্ডের জনসাধারণ এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। এই অবস্থায় একমাত্র যে বিকল্প পন্থা ছিলো, তা হলো, দৃঢ় হাতে দমননীতি প্রয়োগ করে সমস্ত রকম হানাহানি দমিত করে দেওয়া, অথবা ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া। ইংরেজ সরকার

অবশ্য ভারতে তাঁদের শাসন চালিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু তাতে ব্রিটেনের পুনর্গঠনের কাজে বাধার সৃষ্টি হতো। আর একটি বিকল্প পন্থা ছিলো, ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য একটি নির্দিষ্ট তারিখ স্থির করে দেওয়া এবং এইভাবে যাবতীয় দায়িত্ব ভারতীয়দের স্কন্ধে তুলে দেওয়া।

লর্ড ওয়াভেল এতে সম্মত হতে পারেন না। তিনি তখনো বলতে থাকেন, ভারতের সাম্প্রদায়িক অসুবিধেগুলো যদি হিংসার পথে চলে যায় তাহলে ইতিহাস কখনো ইংরেজদের ক্ষমা করবে না। ইংরেজরা একশো বছরেরও বেশী ভারতবর্ষকে শাসন করেছেন, সুতরাং ইংরেজদের ভারত পরিত্যাগের ফলে যদি সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও হিংসা শুরু হয় তার জন্য তাঁরাই হবেন দায়ী। কিন্তু তিনি যখন দেখতে পান মিঃ এটলীকে তিনি কোনো-রকমেই বোঝাতে পারছেন না তখন তিনি পদত্যাগপত্র দাখিল করেন।

আজ দশ বছর পরে সেই পুরনো ঘটনার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে আমার মনে এক সন্দেহের সৃষ্টি হচ্ছে। ওঁদের মধ্যে কে অভ্রান্ত ছিলেন। ঘটনাবলী এমনই জটিল ছিলো এবং পরিস্থিতি এমন এক অবস্থায় ছিলো যাতে এ ব্যাপারে কোনোরকম সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। মিঃ এটলী চাই-ছিলেন, ভারতের স্বাধীনতার দাবী যেভাবেই হোক মেটাতে হবে এবং এই রকম মনোভাব নিয়ে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। ওই সময় সামান্যতম সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবাপন্ন যে-কোনো ব্যক্তিই ভারতের দুর্বলতার সুযোগ নিতে পারতেন। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ সরকার চিরদিনই হিন্দু-মুসল-মানের বিরোধকে নিজেদের সুবিধেমতো কাজে লাগিয়ে এসেছেন। ভারতকে স্বাধীনতা না দেবার জন্যও এটাই ছিলো তাঁদের কাছে প্রধান হাতিয়ার। মিঃ এটলী কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, শ্রমিক সরকার এমন কোনো নীতি গ্রহণ করবেন না যাতে তাঁদের ওপরে এই ধরনের অভিযোগ আনা যায়।

এই প্রসঙ্গে আমরা অবশ্যই স্বীকার করবো যে তাঁর উদ্দেশ্য এবং মনোভাব যদি খাঁটি না হতো এবং তিনি যদি কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের বিরোধকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে পোষণ করতেন, তাহলে অতি সহজেই তিনি তা করতে পারতেন। সে অবস্থায় আমাদের বাধা সত্ত্বেও ইংরেজরা আরো এক যুগ এদেশের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারতেন। তবে সে অবস্থায় সাম্প্রদায়িক হানাহানিও চলতে থাকতো। ভারতীয়দের মনোভাব তখন এমন এক পর্যায়ে এসে গিয়েছিলো, প্রতিপদক্ষেপে তাঁরা ইংরেজ শাসনকে বাধা দিতেন। অপরপক্ষে, ইংরেজরা যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে ভারতীয়দের

অন্তর্বিরোধের সুযোগ নিয়ে আরো কয়েক বছর তাঁদের শাসনব্যবস্থা চালিয়ে যেতে পারতেন। আমাদের একথা ভুলে গেলে চলবে না, ফরাসীরা ইংরেজদের চেয়ে কম শক্তিসম্পন্ন হয়েও প্রায় দশ বছর তাঁরা ইন্দোচীনে টিকে থাকতে পেরেছিলেন। সুতরাং শ্রমিক সরকারকে তাঁদের মনোভাবের জন্য আমরা অবশ্যই সাধুবাদ জানাবো। ওঁরা ভারতবর্ষের দুর্বলতার সুযোগ নিতে চাননি। তাঁদের এই মহান সিদ্ধান্তের জন্য ইতিহাস তাঁদের সম্মান জানাবে; এবং আমরাও আমাদের মনের মধ্যে কোনোরকম দ্বিধা না রেখে এই ঘটনাকে স্বীকার করে নেবো।

অপরপক্ষে লর্ড ওয়াভেল যে ভ্রান্ত ছিলেন সে কথাও কেউ জোর দিয়ে বলতে পারবেন না। তিনি যে বিপদের সম্ভাবনাকে মনশ্চক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তা অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। এতেই বুঝতে পারা যায়, তিনি যেভাবে পরিস্থিতিকে অনুধাবন করেছিলেন তা মোটেই ভ্রান্ত ছিলো না। সুতরাং ওঁদের মধ্যে কার অভিমত ভ্রান্ত এবং কার অভিমত অভ্রান্ত ছিলো তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব যদি মেনে নেওয়া হতো এবং ভারতীয় সমস্যার সমাধান যদি আরো এক বছর বা দু বছর পিছিয়ে দেওয়া হতো, তাহলে মুসলিম লীগ হয়তো তাদের বিরোধিতার ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়তো। আবার লীগ যদি কোনোরকম ইতিবাচক মনোভাব না নিতো, তাহলেও ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় মুসলিম লীগের সেই নেতিবাচক মনোভাবকে হয়তো আর মেনে নিতে চাইতেন না। তাছাড়া এমনও হতে পারতো ভারত বিভাগের দুঃখজনক ঘটনাকেও হয়তো পরিহার করা যেতো। এ ব্যাপারে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব না হলেও একটি কথা বলা চলে যে, একটি জাতির ইতিহাসে এক বছর বা দু বছর নিতান্তই নগণ্য। হয়তো ইতিহাস এটা স্বীকার করে নেবে যে লর্ড ওয়াভেলের নীতিকে মেনে নিয়ে তাঁর পরামর্শমতো চললেই হয়তো ভালো হতো।

যখন জানতে পারা গেলো, লর্ড ওয়াভেল বিদায় গ্রহণ করছেন, তখন আমি একটি বিবৃতি মারফত তাঁর সম্বন্ধে আমার অভিমত ব্যক্ত করি। আমি জানতাম জওহরলাল এবং আমার অন্যান্য সহকর্মীরা এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত ছিলেন না। তাঁরা লর্ড ওয়াভেলের বিরোধী ছিলেন; কিন্তু তাঁর অবদান সম্বন্ধে আমার মনোভাব জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করেছিলাম। বিবৃতিতে আমি বলেছিলাম:

ভারত সম্পর্কে মিঃ এটলীর বিবৃতি আমার মনে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। একদিকে আমি আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করি, ১৯৪৫-এর জুন মাসে আমি যেভাবে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেছিলাম, ঘটনার আবর্তনে আমার সেই বিশ্লেষণই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে ; অন্যদিকে লর্ড ওয়াভেল বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন বলে আমি দুঃখিত না হয়ে পারি না, কারণ ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে নতুন সম্পর্কের যে ইতিহাস রচিত হয়েছে সে ইতিহাসের তিনিই স্রষ্টা।

সিমলা সম্মেলনের প্রাক্কালে সকলের মনেই ইংরেজদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ আর অবিশ্বাস বিদ্যমান ছিলো। বলতে বাধা নেই, পূর্ববর্তী তিন বছরের ঘটনাবলীর জন্য আমার মনটাও তিক্ত-বিরক্ত হয়েছিলো। সেই রকম মানসিক অবস্থা নিয়েই আমি প্রস্তাবিত সিমলা সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করতে যাই ; কিন্তু লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে দেখা হবার পরে আমার মানসিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয়। তাঁকে আমি দেখতে পাই একজন বাস্তববাদী সৈনিক হিসেবে। ঘটনার মোকাবিলা করার অথবা বক্তব্য উপস্থাপিত করবার ব্যাপারে তিনি সব সময়ই প্রত্যক্ষ পন্থা অবলম্বন করতেন। রাজনীতিবিদদের মতো তাঁর মনে কোনো ঘোর-প্যাঁচ ছিলো না। তিনি সোজাভাবে যে কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে এমন আন্তরিকভাবে তার মোকাবিলা করতেন যার ফলে তাঁর আন্তরিকতা সম্বন্ধে আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। প্রকৃতপক্ষে এই কারণেই আমি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশবাসীকে গঠনমূলক পন্থা গ্রহণ করবার জন্য উপদেশ দিয়েছিলাম। সে সময় সারাদেশে সন্দেহ আর বিরোধিতার আবহাওয়া বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি উক্ত পন্থা থেকে বিচ্যুত হইনি। সকলেই জানেন প্রথম সিমলা সম্মেলনের পরে কংগ্রেসের ভেতর থেকে এবং এমন কি বাইরে থেকেও কংগ্রেসের ওপরে চাপ আসে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করবার জন্য। চারটি বিভিন্ন ঘটনায় চারবার এই রকম চাপ আসে। কিন্তু ইংরেজ সরকারের সহ-যোগিতাপূর্ণ মনোভাব লক্ষ্য করে ওইরকম কোনো আন্দোলন শুরু করাটা আমি সঠিক বলে মনে করিনি।

আমি তখন আমার যাবতীয় প্রভাব-প্রতিপত্তিকে নিয়োজিত করে কংগ্রেসের অনুসরণীয় পন্থাকে নিয়ন্ত্রণ করি। আজ আমি আনন্দের সঙ্গে বলতে পারি, সে সময় আমি যে পন্থা গ্রহণ করেছিলাম তা কোনোক্রমেই

ভ্রান্ত ছিলো না। সিমলা সম্মেলন বানচাল হয়ে যাবার অব্যবহিত পরেই ইংল্যাণ্ডে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রমিকদল ক্ষমতায় আসেন। ক্ষমতায় আসবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিকদল ঘোষণা করেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁরা পূর্বে যেসব কথা বলেছেন এবার সেগুলোকে কার্যে রূপায়িত করা হবে। ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে তাঁদের সেই ঘোষণা ছিলো যথেষ্ট আন্তরিকতাপূর্ণ।

গত দু-তিন সপ্তাহে লর্ড ওয়াভেল এবং ইংলণ্ডের সরকারের মধ্যে কি ধরনের চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়েছে তা আমি জানি না। তবে এমন কোনো গুরুতর মতানৈক্য অবশ্যই হয়েছে যার ফলে তিনি কার্যভার পরিত্যাগ করছেন। তিনি যেভাবে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেছেন বা ঘটনাবলীকে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেছেন তার সঙ্গে আমাদের ঐক-মত্য না হতে পারে, কিন্তু তাঁর সততা এবং আন্তরিকতায় সন্দেহ করবার মতো কোনোই কারণ নেই। আমি এ কথাই বিস্মৃত হতে পারি না যে ১৯৪৫-এর জুন মাসে তিনি যেরকম সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন তার জন্যই ইঙ্গ-ভারত সম্পর্কের বর্তমান পরিবর্তিত আবহাওয়ার সৃষ্টি হতে পেরেছে। ক্রিপস মিশন বানচাল হবার পরে চার্চিল সরকার ভারতবর্ষের প্রশ্নটিকে যুদ্ধের স্থায়িত্বকাল অবধি হিমঘরে রেখে দেবার মতলব করেছিলেন। ভারতের জনমতও কোনোরকম নতুন পথের সন্ধান পাচ্ছিলো না। ফলে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের পরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো, তার চেয়েও বেশি তিক্ততা দেখা দিয়েছিলো। সেদিনের সেই বন্ধ দরজার অর্গল খোলবার কৃতিত্ব একমাত্র লর্ড ওয়াভেলেরই প্রাপ্য। কোয়ালিশন সরকারের তরফ থেকে বাধা এলেও তিনি তাঁদের ভারতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য নতুন করে প্রস্তাব উত্থাপনের ব্যাপারে সম্মত করতে সক্ষম হন। এর ফলেই অনুষ্ঠিত হয় সিমলা সম্মেলন। সে সম্মেলন যদিও ফলপ্রসূ হয়নি, কিন্তু তার পর থেকে যা যা ঘটেছে তার প্রতি ব্যাপারেই লর্ড ওয়াভেলের সাহসী পদক্ষেপের চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি, লর্ড ওয়াভেলের অবদান ভারত কখনো বিস্মৃত হবে না। ভবিষ্যতে যখন ঐতিহাসিকরা স্বাধীন ভারতের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করবার সময় ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্কের বিষয় আলোচনা করবেন তখন তাঁরা লর্ড ওয়াভেলের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ

করে বলবেন, ইঙ্গ-ভারত সম্পর্কের উন্নতি তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভব হয়েছিলো।

বিদায়ের প্রাক্কালে লর্ড ওয়াভেল ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যদের এক ডিনার পার্টিতে আপ্যায়িত করেন। উক্ত ভোজ-সভায় তিনি তাঁদের সবাইকে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। আমার বিবৃতি তাঁর মনে এমনভাবে রেখাপাত করেছিলো যার ফলে তিনি তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিলেন, 'আমি আনন্দের সঙ্গে বলছি, ভারতে অন্তত একজন লোকও আছেন যিনি আমার মতামত অনুধাবন করতে চেষ্টা করেছেন।'

বিদায়ের আগের দিন লর্ড ওয়াভেল তাঁর আমলের সর্বশেষ কেবিনেট মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করেন। সভা শেষ হলে তিনি এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতির মাধ্যমে আমার প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা গভীর আবেগের সঙ্গে প্রকাশ করেন। লর্ড ওয়াভেল বলেন, 'আমি এক সঙ্কটপূর্ণ সময়ে ভাইসরয় হয়ে আসি এবং আমার সাধ্যানুসারে আমার প্রতি ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে চেষ্টা করে এসেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয় যার ফলে আমি পদত্যাগ করতে বাধ্য হই। এই পদত্যাগের ব্যাপারে আমি সঠিক পন্থা অথবা ভ্রান্ত পন্থা গ্রহণ করেছি সে বিচার করবে ইতিহাস। বিদায়ের পূর্বমুহূর্তে আপনাদের কাছে আমার আবেদন, আপনারা কোনো ব্যাপারে ত্বরিৎ-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। আপনাদের কাছ থেকে আমি যেরকম সহযোগিতা পেয়েছি তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ প্রকাশ করছি।'

এই বক্তৃতার পরেই লর্ড ওয়াভেল তাঁর কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে এতো তাড়াতাড়ি সভাস্থল থেকে বেরিয়ে যান যে আমরা আর কিছু বলারই সুযোগ পাইনি। পরদিনই তিনি দিল্লী পরিত্যাগ করেন।

মাউন্টব্যাটেন মিশন

লর্ড মাউন্টব্যাটেন সর্বপ্রথম খ্যাতি অর্জন করেন যুদ্ধের সময়। সেই সময় তিনি কয়েক মাস ভারতে অবস্থান করেন এবং পরে তাঁর প্রধান কার্যালয় সিংহলে স্থানান্তরিত করেন। যুদ্ধ শেষ হবার পরে তিনি ব্রিটেনে ফিরে যান। কিন্তু লর্ড ওয়াভেল পদত্যাগ করার ফলে তিনি ভারতের ভাইসরয় এবং গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। শ্রমিক সরকারের কাছ থেকে কার্যভার গ্রহণ করবার

পর মিঃ এটলীর কাছ থেকে যে নির্দেশ নিয়ে ভারতে আসেন তা হলো ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুনের আগে অবশ্যই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

২২শে মার্চ তিনি দিল্লীতে আসেন এবং ২৪শে মার্চ ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল রূপে শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পরেই তিনি এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার মাধ্যমে ভারতের সমস্যাবলী আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সমাধান করবার ব্যাপারে জোর দিয়ে তাঁর বক্তব্য রাখেন।

এর কয়েকদিন পরেই আমি লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে সর্বপ্রথম মিলিত হই। সেই প্রথম সাক্ষাতের সময়ই তিনি আমাকে বলেন ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সর্বতোভাবে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন; তবে তার আগে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করা দরকার। তিনি আরো বলেন, তাঁর মতে এ ব্যাপারে এখনই এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হবে যার ফলে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে। তিনি আমার সঙ্গে একমত হন যে কংগ্রেস ও লীগের ভেতরের মতানৈক্য এখন অনেকটা কম হয়ে এসেছে। মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনায় আসাম এবং বাংলাকে একটি এলাকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কংগ্রেস মনে করে জোটভুক্তির ব্যাপারে কোনো প্রদেশকে বাধ্য করা উচিত হবে না এবং প্রত্যেক প্রদেশের পক্ষে সে কোনো জোটভুক্ত হবে কি হবে না তা নির্ধারণ করবার পূর্ণ অধিকার আছে। পক্ষান্তরে লীগের বক্তব্য হলো, সে মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা এই কারণেই মেনে নিয়েছে যে বিভিন্ন দলভুক্ত প্রদেশগুলো শুধুমাত্র দল হিসেবেই ভোট দেবে এবং পরবর্তীকালে কোনো প্রদেশ যদি ইচ্ছে করে তাহলে দল থেকে বেরিয়ে এসে তার নিজস্ব শাসনতন্ত্র রচনা করতে পারবে। লীগ আরো বলে, এই প্রস্তাবের কোনো ব্যত্যয় ঘটানো হলে পুরো পরিকল্পনাটিই অকেজো হয়ে যাবে। লীগ মনে করে কংগ্রেস এখন এটাই চাইছে। এই ভিত্তিতেই লীগ মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করেছে।

এটা কেউই বুঝতে পারে না, আসাম মুসলমান-প্রধান প্রদেশ না হওয়া সত্ত্বেও লীগ আসামের প্রশ্নটির ওপর এতটা গুরুত্ব আরোপ কেন করছে। লীগের নিজস্ব তত্ত্ব অনুসারেও বলা চলে, আসামকে বাংলার সঙ্গে জোর করে যুক্ত করবার মতো কোনো কারণই বিদ্যমান নেই। তবে কারণ যাই হোক না কেন, ঘোষিত ব্যাখ্যা অনুসারে লীগের এই দাবী অভ্রান্ত। যদিও রাজনীতি ও ন্যায়নীতি অনুসারে তার এই দাবী খুবই দুর্বল। লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেনের সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে আমি কয়েকবার আলোচনা করেছি।

আমার মতে কংগ্রেস এবং লীগের ভেতরের মতপার্থক্য এমন এক পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছে যখন উভয়ের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করবার জন্য কোনো তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ দরকার হয়ে পড়েছে। আমার অভিমত হলো, এ বিষয়টি আমরা লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ওপরে ছেড়ে দিতে পারি। অতএব কংগ্রেস এবং লীগ তাঁর সালিসি মেনে নিতে স্বীকার করে তার হাতেই বিষয়টি ছেড়ে দিক। কিন্তু জওহরলাল এবং সর্দার প্যাটেল আমার এই পরামর্শ মেনে নিতে চাইলেন না। সালিসি প্রস্তাবের কথাটা তাঁদের কাছে আদৌ মনঃপূত হলো না। আমি তখন এ বিষয় নিয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্য করলাম না।

ইতিমধ্যে প্রতিদিনই পরিস্থিতির অবনতি ঘটছিলো। কলকাতার দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলশ্রুতি হিসেবে নোয়াখালি এবং বিহারে দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। এরপর বোম্বাইতেও অশান্তি শুরু হয়। যে পাঞ্জাব এতাবৎকাল শান্ত ছিলো সেখানেও জ্বলে ওঠে অশান্তির আগুন। মালিক খিজির হায়াৎ খান ২রা মার্চ তারিখে মুখ্যমন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। লাহোরে পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলন এমনই হিংস্র হয়ে ওঠে, যার ফলে ৪ঠা মার্চ তেরোজন লোক নিহত এবং বহুসংখ্যক লোক আহত হয়। প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে। অমৃতসর, তক্ষশিলা এবং রাওয়ালপিণ্ডিতে গুরুতর রকমের দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়।

সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দ্রুত বিস্তৃতি

একদিকে যেমন সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দ্রুত বিস্তৃতি ঘটছিলো, অন্যদিকে শাসনকর্তৃপক্ষ যেন স্থাণু হয়ে পড়ছিলেন। সরকারী চাকরিতে যে-সব ইয়োরোপীয়ান ছিলেন তাঁরা তখন আর মন দিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করছিলেন না। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, অচিরেই ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হবে। এই কারণেই তাঁরা তখন 'দিনগত পাপক্ষয়' করে চলেছিলেন, কর্তব্য সম্পাদনের ব্যাপারে তাঁদের কোনো আগ্রহই ছিলো না। তাঁরা তখন প্রকাশ্যেই বলতে শুরু করেছেন শাসনের দায়িত্ব আর তাঁরা নেবেন না। তাঁদের এইরকম মনোভাব আর কথাবার্তার ফলে পরিস্থিতির আরো অবনতি হয় এবং জনসাধারণের মনে এক সার্বিক হতাশা দেখা দেয়।

পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে ওঠে যখন একজিকিউটিভ কাউন্সিলের

ভেতরে কংগ্রেস এবং লীগ সদস্যদের মধ্যে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। সদস্যরা যেভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে কাজ করে চলেছিলেন তাতে কেন্দ্রীয় সরকার একেবারেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। লীগের হাতে অর্থদপ্তর থাকায় শাসনব্যবস্থার চাবিকাঠিই ছিলো তাদের হাতে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে সর্দার প্যাটেলের একগুঁয়েমির জন্যই এটি হয়েছিলো। নিজের হাতে স্বরাষ্ট্র দপ্তরটি রাখার জন্যই অর্থদপ্তর মুসলিম লীগকে ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি। অর্থদপ্তরে কয়েকজন প্রবীণ ও সুদক্ষ মুসলমান অফিসার ছিলেন, যাঁরা লিয়াকত আলীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করছিলেন। তাঁদের পরামর্শেই লিয়াকত আলী কংগ্রেসের প্রস্তাবসমূহ বাতিল করছিলেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অহেতুক বিলম্ব করে বাধার সৃষ্টি করছিলেন। সর্দার প্যাটেল এতদিনে বুঝতে পারেন, তিনি নিজে স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য হওয়া সত্ত্বেও লিয়াকত আলীর অনুমোদন ছাড়া তাঁর বিভাগে একটি চাপরাসীর পদও সৃষ্টি করতে পারেন না। এই অবস্থার মধ্যে পড়ে কংগ্রেসী সদস্যরা বুঝেই উঠতে পারছিলেন না তাঁরা কোন্ পথে চলবেন।

কংগ্রেস কর্তৃক অর্থদপ্তরটি লীগকে ছেড়ে দেওয়ার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো তা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। এবং এর ফলে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো তার ফলেই লর্ড মাউন্টব্যাটেন ধীরে ধীরে ভারতবিভাগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। রাজনৈতিক সমস্যার নতুন সমাধান খুঁজে বের করবার কথা বলে তিনি কংগ্রেসকে ভারত বিভাগের প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং একজিকিউটিভ কাউন্সিলের কংগ্রেসী সদস্যদের মানসিক ক্ষেত্রে এমনভাবে বিভেদের বীজ বপন করে চলেছিলেন যার ফলে তাঁদের মনে এর প্রয়োজনীয়তার কথা ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার, ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র সর্দার প্যাটেলই সর্বপ্রথমে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাবে সম্মতি দেন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত পাকিস্তান কথাটি মিঃ জিন্নার দর-কষাকষির একটি হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হতো; কিন্তু পাকিস্তানের জন্য লড়াই করে তিনি তাঁর নিজের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। কাউন্সিলের ভেতরে যেরকম অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো তাতে তিক্ত-বিরক্ত হয়েই সর্দার প্যাটেল শেষ পর্যন্ত ভারতবিভাগের পরিকল্পনার বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মুসলিম লীগকে

অর্থদপ্তর ছেড়ে দেবার দায়িত্বও ছিলো সর্দার প্যাটেলের। লিয়াকত আলীর অসহযোগিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও তাঁকেই বেশী করে করতে হয়েছিলো। সুতরাং লর্ড মাউন্টব্যাটেন যখন পরামর্শ দিলেন যে ভারত-বিভাগ মেনে নিলে অচলাবস্থার অবসান ঘটানো সম্ভব হবে, তখন সর্দার প্যাটেল তাঁর সেই পরামর্শটি লুফে নিলেন। তাঁর মনে তখন দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে গেছে মুসলিম লীগের সঙ্গে একত্রে কাজ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তিনি তখন প্রকাশ্যেই বলতে শুরু করলেন, ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবার জন্য ভারতের একটি অংশ মুসলিম লীগকে ছেড়ে দিতে তিনি প্রস্তুত আছেন।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন ছিলেন অত্যন্ত চালাক লোক। তাঁর ভারতীয় সহকর্মীদের মানসিক অবস্থা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতেও তাঁর বিলম্ব হলো না। যে মুহূর্তে তিনি বুঝতে পারলেন সর্দার প্যাটেল তাঁর পরামর্শটি মেনে নিতে সম্মত হয়েছেন সেই মুহূর্ত থেকেই তিনি তাঁর অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে সর্দার প্যাটেলকে নিজের কব্জায় আনতে সচেষ্ট হন। এবং এই কাজটি করতে গিয়ে তিনি যখন-তখন সর্দারের প্রশংসা করতে থাকেন। সর্দার প্যাটেলের প্রশংসা করতে তিনি যে-সব কথা বলতে থাকেন তা হলো, প্যাটেলের প্রকৃতিটা বাইরে থেকে দেখলে তালের আঁটির মতো কঠিন মনে হলেও সেই কাঠিন্যের অন্তরালে লুকিয়ে আছে সরস ও নরম শাঁসের মতো একটি সহানুভূতিশীল মন।

ভারতবিভাগের পক্ষে প্যাটেল ও নেহরু

সর্দার প্যাটেলকে স্বমতে আনবার পরে লর্ড মাউন্টব্যাটেন জওহরলালের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। প্রথম দিকে জওহরলাল তাঁর প্রস্তাবে আদৌ সম্মতি দেননি; বরং তিনি আরো তীব্রভাবে আপত্তি জানান। কিন্তু লর্ড মাউন্টব্যাটেন এমনভাবে ধাপে ধাপে তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন যার ফলে জওহরলালের সেই তীব্র আপত্তি ক্রমশ ফিকে হয়ে আসতে লাগলো। লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতে আসার পর এক মাসের মধ্যেই দেখা যায়, দেশ বিভাগের প্রবল বিরোধী জওহরলাল নেহরু এই প্রস্তাবটিকে সরাসরি সমর্থন না করলেও নস্যাৎ করছেন না।

জওহরলালের মনকে লর্ড মাউন্টব্যাটেন কিভাবে জয় করেছিলেন সেকথা আমি প্রায়ই চিন্তা করে থাকি। আমি জওহরলালের প্রকৃতিটি ভালো

করেই জানি। মানুষ হিসেবে তিনি তাঁর নিজস্ব নীতির প্রতি আস্থাশীল হলেও সময়'সময় প্রখর ব্যক্তিত্বের সামনে তাঁকে নমনীয় হতে দেখা যেতো। তাছাড়া সর্দার প্যাটেলের অভিমতও হয়তো তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছিলো। কিন্তু প্যাটেলের প্রভাব এমন কিছু প্রখর ছিলো না যার ফলে জওহরলাল তাঁর নিজস্ব নীতি পরিবর্তন করবেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, লর্ড মাউন্টব্যাটেন তাঁকে কিছুটা প্রভাবিত করলেও তাঁর ওপরে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন লেডী মাউন্টব্যাটেন। তিনি যে শুধু প্রখর বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন তাই নয়, তাঁর আকর্ষণীশক্তি এবং চারিত্রিক বিশেষত্বও ছিল অনন্যসাধারণ। তিনি তাঁর স্বামীকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করতেন এবং অনেক সময় স্বামীর চিন্তা-ধারাকে বিরুদ্ধবাদীদের কাছে সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করে তাঁদের বিরোধী মনোভাব দূর করতে চেষ্টা করতেন।

হয়তো আরো একজন ব্যক্তি এ ব্যাপারে জওহরলালকে প্রভাবিত করে-ছিলেন। এই ব্যক্তিটি হলেন কৃষ্ণ মেনন। ইনি জওহরলালের গুণপনার কথা এমনভাবে বলতেন যার ফলে জওহরলাল তাঁকে বিশেষভাবে খাতির করতেন। শুধু খাতিরই করতেন না, তাঁর পরামর্শও মেনে নিতেন। আমি এতে বিশেষ খুশি ছিলাম না। আমার ধারণা, কৃষ্ণ মেনন প্রায়ই জওহর-লালকে ভুল পথে চালিত করতেন। সর্দার প্যাটেলকেও আমি সব সময় সহ্য করতে পারতাম না; এমন কি আমরা একে অপরের চোখের দিকেও তাকাতাম না। কিন্তু আমাদের মধ্যে শত বিরোধ বিদ্যমান থাকলেও কৃষ্ণ মেনন সম্বন্ধে আমরা উভয়েই একই অভিমত পোষণ করতাম। এ বিষয়ে আমার আত্মজীবনীর তৃতীয় খণ্ডে আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে।

আমি যখন বুঝতে পারি লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতবিভাগের কথা চিন্তা করছেন এবং জওহরলাল ও প্যাটেলকে তাঁর স্বমতে আনতে পেরেছেন তখন আমি রীতিমত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। আমি বুঝতে পারি দেশ এক মহা বিপজ্জনক অবস্থার দিকে এগুচ্ছে। ভারতবিভাগ যে শুধু মুসলমানদের পক্ষেই ক্ষতিকর হবে তা-ই নয়, সারা দেশটাই এর ফলে বিপন্ন হয়ে পড়বে। আমি আরো মনে করি, ভারতের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবই ছিলো সবচেয়ে ভালো। ভারতের অখণ্ডতা এবং সংহতিকে বজায় রেখেই উক্ত পরিকল্পনা রচিত হয়েছিলো। শুধু তাই নয়, উক্ত পরিকল্পনায় প্রতিটি সম্প্রদায়কে স্বাধীনভাবে এবং সম্মানের সঙ্গে বিকাশ লাভের সুযোগ দেওয় হয়েছিলো। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও দেখা যায়, মুসল

মানরা ওর চেয়ে ভালো কিছু আশা করতে পারতেন না। যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেসব প্রদেশের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় তাঁরা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভ করতেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারেও তাঁরা যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাতে পারতেন। সুতরাং সাম্প্রদায়িক হীনমন্যতা এবং পারস্পরিক সন্দেহের ব্যাপারেও তাঁদের রক্ষাকবচ থাকতো। আমি মনে করি, উক্ত পরিকল্পনার ভিত্তিতে যদি শাসনতন্ত্র রচিত হতো এবং সেই শাসনতন্ত্র অনুসারে সততার সঙ্গে সরকার পরিচালনা করা হতো তাহলে সাম্প্রদায়িক সন্দেহ এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য অসুবিধেগুলো শীগগিরই বিদূরিত হয়ে যেতো। দেশের আসল সমস্যা হলো অর্থনৈতিক সমস্যা। সাম্প্রদায়িক সমস্যা আসলে কোনো সমস্যাই নয়। জনসাধারণের মধ্যে যা-কিছু ব্যবধান তা হলো শ্রেণী-বৈষম্য, সাম্প্রদায়িক বৈষম্য নয়। সুতরাং দেশ একবার স্বাধীন হতে পারলে হিন্দু মুসলমান শিখ প্রভৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায়ই দেশের আসল সমস্যা বুঝতে পারতো এবং তা বুঝবার পর সেই আসল সমস্যার মোকাবিলা করতো। এবং তা করা হলে সাম্প্রদায়িক বিভেদ অচিরেই দূর হয়ে যেতো।

আমি তাই যথাসাধ্য চেষ্টা করি যাতে আমার সহকর্মীরা ভারত বিভাগের প্রস্তাবের পক্ষে শেষ সিদ্ধান্ত না নেন। আমি সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই, প্যাটেল এ ব্যাপারে এমনই আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েছিলেন যে এর বিরুদ্ধে কোনো কথাই তিনি শুনতে চাইছিলেন না। দু ঘণ্টারও বেশি সময় আমি তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করি। আমি তাঁকে বলি, আমরা যদি দেশ-বিভাগ মেনে নিই তাহলে আমরা দেশের চিরস্থায়ী ক্ষতি করবো। দেশ-বিভাগের দ্বারা সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান কোনোক্রমেই হতে পারে না। আসলে এটা একটা চিরস্থায়ী নজির হয়ে থাকবে। জিন্না দুই জাতির ধুয়া তুলেছেন এ ক্ষেত্রে দেশবিভাগ মেনে নেবার অর্থ হবে তাঁর সেই দাবীকেই স্বীকার করে নেওয়া। কংগ্রেস কি ভাবে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশবিভাগে সম্মত হতে পারে? দেশবিভাগের ফলে সাম্প্রদায়িক প্রীতি চিরতরে বিদায় নেবে এবং তার পরিবর্তে দেখা দেবে সন্দেহ অবিশ্বাস আর বৈরী মনোভাব। সুতরাং এই ভিত্তিতে যদি রাষ্ট্র গঠিত হয় তাহলে ভবিষ্যতে যে কি হবে তা কল্পনাও করা যায় না।

এর উত্তরে প্যাটেল যা বলেন তাতে আমি রীতিমতো দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ে পড়ি। তিনি বলেন, আমরা যাই বলি না কেন, ভারতে দুটি আলাদা জাতি নিশ্চয়ই আছে। তাঁর মতে হিন্দু ও মুসলমান এক জাতি হিসেবে একতা-

বদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না। সুতরাং এই বাস্তব ঘটনাকে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া আর কোনো দ্বিতীয় পন্থা নেই। এবং শুধু এই পথেই আমরা হিন্দু ও মুসলমানদের বিরোধের অবসান ঘটাতে পারি। তিনি আরো বলেন, দুই সহোদর ভাই যদি একসঙ্গে থাকতে না পারে তাহলে তারা নিজ নিজ অংশ বুঝে নিয়ে পৃথক হয়ে যায়। এবং পৃথক হবার পরে আবার তাদের মধ্যে প্রীতির ভাব দেখা দেয়। কিন্তু তাদের যদি একসঙ্গে থাকতে বাধ্য করা যায় তাহলে তাদের মধ্যে প্রতিদিনই বিবাদ চলতে থাকবে। জাতি বা সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সুতরাং প্রতিদিন বিবাদ না করে একবার একটা লড়াই করবার পর আমরা যদি আলাদা হয়ে যাই তাহলে সেটাই হবে সবচেয়ে শ্রেয় ব্যবস্থা।

প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনায় বিফলমনোরথ হয়ে অতঃপর আমি জওহর-লালের সঙ্গে আলোচনা শুরু করি। কিন্তু তাঁর কথাবার্তাও আমাকে হতাশ করে। প্যাটেলের মতো তিনি সরাসরি দেশবিভাগের কথা না বললেও তিনি প্রকারান্তরে প্যাটেলকেই সমর্থন করেন। দেশবিভাগের প্রস্তাবকে ভ্রান্ত পথ বলে স্বীকার করেও তিনি বলেন, একজিকিউটিভ কাউন্সিলে লীগ সদস্যদের আচরণ দেখে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে তাঁদের সঙ্গে একত্রে কোনো কাজ করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে মুসলমান সদস্যরা হিন্দু সদস্যদের চোখের দিকে তাকান না এবং হিন্দু সদস্যরাও তাই করেন। প্রতিদিনই তাঁদের মধ্যে বিবাদবিসংবাদ লেগেই আছে। এইসব কথা উল্লেখ করে তিনি হতাশার সুরে বলেন, এ অবস্থায় দেশবিভাগ মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ আছে কি?

জওহরলাল দুঃখের সঙ্গে প্রশ্নটা তুললেও এর ভেতর দিয়ে তাঁর মনের কথাটাই প্রকাশ পায়। তবে এটাও বুঝতে পারি, খোলা মন নিয়ে সহজ-ভাবে তিনি দেশবিভাগের প্রস্তাবটা মেনে নেননি। এর জন্য নিজের মনের সঙ্গেও তাঁকে লড়াই করতে হয়েছে।

কয়েকদিন পরে জওহরলাল আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এবার তিনি এক বিরাট ভূমিকা ফেঁদে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন তিনি কখনো কোনো অন্যায় কাজ সমর্থন করেন না এবং সবসময় বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর চিন্তাধারাকে চালিত করেন এবং বাস্তব ঘটনাকে স্বীকার করে নিয়ে যা করা দরকার তা থেকেও তিনি পিছিয়ে আসেন না। ভূমিকা শেষ হলে তিনি তাঁর আসল কথাটা ব্যক্ত করেন। আসল কথাটা হলো দেশ-

বিভাগের ব্যাপারে আমি যেন বিরোধিতা না করি। জওহরলালের বক্তব্য হলো, দেশবিভাগ মেনে নেওয়া ছাড়া যেখানে গত্যন্তর নেই সেখানে এর বিরোধিতা করাটা মোটেই বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে না।

আমি কিন্তু তাঁর এই অভিমত মেনে নিতে পারিনি। আমি সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম, আমরা এক ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চলেছি। এবং সেই ভ্রান্ত পথ থেকে সরে আসার পরিবর্তে আমরা আরো গভীর ভ্রান্তির কর্দমে নিমজ্জিত হচ্ছি। মুসলিম লীগ মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করায় ভারতের সমস্যা সমাধানের পথ অনেকটা পরিষ্কারভাবে দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু পরবর্তীকালে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হবার ফলে মিঃ জিন্না মুসলিম লীগের সেই সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দেবার সুযোগ পান।

আমি তাই সওয়াল করে বলি, আমাদের উচিত ছিলো লর্ড ওয়াভেলের পরামর্শ গ্রহণ করে স্বরাষ্ট্র বিভাগটি মুসলিম লীগকে ছেড়ে দেওয়া। এবং তা করা হলে একজিকিউটিভ কাউন্সিলের কাজকর্মে কোনোরকম অসুবিধেই হতো না। কিন্তু তখন সর্দার প্যাটেলের একগুঁয়েমির জন্যই এটা সম্ভব হয়নি। তিনি কিছুতেই স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছেড়ে দিতে সম্মত হননি। আমরা নিজেরাই অর্থদপ্তরের ভার লীগের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। এই পর্যন্ত বলে আমি জওহরলালকে সাবধান করে দিয়ে বলি, আমরা যদি এখন দেশবিভাগ মেনে নিই তাহলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না। ভবিষ্যৎ ইতিহাস এই বলে রায় দেবে ভারতবিভাগের ব্যাপারে মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস তুল্যাংশে দায়ী।

সর্দার প্যাটেল এবং জওহরলাল দেশবিভাগের পক্ষে অভিমত দেওয়ায় আমার একমাত্র ভরসাস্থল হলেন গান্ধীজী। এই সময় তিনি পাটনায় ছিলেন। এর আগে কিছুদিন তিনি নোয়াখালিতে থেকে এসেছেন। সেই সময় নোয়াখালির মুসলমানদের ওপরে তিনি বিরাট প্রভাব বিস্তার করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করে এসেছিলেন। আমরা আশা করেছিলাম, তিনি দিল্লীতে এসে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করবেন। আমাদের এই আশা অনুসারেই কাজ হলো। ৩১শে মার্চ গান্ধীজী দিল্লীতে উপস্থিত হলেন। তিনি ওখানে আসতেই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে এদিকের পরিস্থিতির কথা জানিয়ে দিই। সব কথা শুনে তিনি আমাকে বলেন, 'দেশবিভাগের প্রস্তাব বিরাট এক অভিশাপের মতো উপস্থাপিত হয়েছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি, বল্লভভাই এবং জওহরলালও এ ব্যাপারে আত্মসমর্পণ করেছেন। এখন প্রশ্ন

হলো, আপনি কি করবেন ? আপনি কি আমার সঙ্গে থাকবেন, না আপনিও মত পরিত্যাগ করবেন ?'

আমি বলি, 'আমি আগেও যেরকম দেশবিভাগের বিরুদ্ধে ছিলাম, এখনো ঠিক সেইরকমই আছি। তাছাড়া, সত্যি কথা বলতে কি, আজ আমি যতোটা এর বিরোধী, ততোটা বিরোধী আগে কোনোদিনই ছিলাম না। কিন্তু আমার আজ দুঃখ হচ্ছে সর্দার প্যাটেল আর জওহরলালের কথা ভেবে। ওঁরা দুজনেই পরাজিতের মনোভাব গ্রহণ করেছেন। এখন আমার একমাত্র ভরসা হলেন আপনি। আপনি যদি দেশবিভাগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান তাহলে এখনো আমরা এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারি। কিন্তু আপনি যদি এর বিরোধিতা না করেন তাহলে ভারতের ভাগ্য এক অনিশ্চিত তিমিরগর্ভে নিমজ্জিত হবে।'

আমার কথার উত্তরে গান্ধীজী বললেন, 'এটা কোনো প্রশ্নই নয়। কংগ্রেস যদি দেশবিভাগ করতে চায় তাহলে তা করতে হবে আমার মৃতদেহের ওপরে। আমি যতোদিন জীবিত আছি ততোদিন কিছুতেই ভারতবিভাগ মেনে নেবো না। এবং আমার যদি সাধ্য থাকে তাহলে কংগ্রেসকেও এটা মেনে নিতে দেবো না।'

প্যাটেল গান্ধীজীকে প্রভাবিত করলেন

ওই দিনই বিকেলের দিকে গান্ধীজী লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করলেন। পরদিন এবং ২রা এপ্রিলও তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি প্রথম দিন লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করে ফিরতেই সর্দার প্যাটেল তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। সেদিন তাঁদের ভেতরে কি আলোচনা হয়েছিলো তা আমি জানি না। কিন্তু আমি যখন পুনর্বার গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করি তখন তাঁর কথা শুনে যেরকম আঘাত পেয়েছিলাম সেরকম আঘাত জীবনে আর কোনোদিন পাইনি। আমি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করি তিনি তাঁর পূর্ব-অভিমত পরিবর্তন করেছেন। যদিও তিনি সরাসরি দেশবিভাগ মেনে নেবার কথা বললেন না, কিন্তু আগের মতো এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদও করলেন না। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো, তিনিও সেদিন প্যাটেলের যুক্তিগুলোই আমার কাছে পুনরুত্থাপিত করলেন। দু ঘন্টারও বেশি সময় আমি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করি, কিন্তু সে আলোচনায় বিশেষ কোনো ফল হয় না।

অবশেষে আমি হতাশ হয়ে বলি, 'আপনিও যখন এই মনোভাব পোষণ

করছেন, তখন ভারতের চরম বিপর্যয় প্রত্যাসন্ন হয়ে উঠেছে এবং সে বিপর্যয়কে কিছুতেই রোধ করা যাবে না।'

আমার কথার উত্তরে গান্ধীজী সোজাভাবে কিছু না বলে একটু ঘুরিয়ে বললেন, এখন আমাদের উচিত হবে মিঃ জিন্নাকে সরকার গঠনের সুযোগ দেওয়া এবং মন্ত্রিসভার জন্য মুসলমান সদস্যদের মনোনীত করা। গান্ধীজী বলেন, লর্ড মাউন্টব্যাটেনকেও তিনি এই কথাই বলেছেন এবং তাতে তিনি খুবই খুশি হয়েছেন।

গান্ধীজী লর্ড ওয়াভেলকে কি বলেছেন তা আমি আগেই জানতে পেরেছিলাম। গান্ধীজী তাঁর সঙ্গে দেখা করবার পরে আমি যখন লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করি তখন তিনি আমাকে বলেন, আমরা যদি গান্ধীজীর কথামতো কাজ করি তাহলে হয়তো দেশবিভাগ পরিহার করা যাবে। তিনি আরো বলেন, কংগ্রেস যদি মুসলিম লীগকে এই অনুরোধ করে তাহলে হয়তো মিঃ জিন্নার বিশ্বাস ফিরে আসবে। দুঃখের বিষয়, এ প্রস্তাব আর বেশিদূর অগ্রসর হলো না। কারণ জওহরলাল এবং সর্দার প্যাটেল উভয়েই প্রস্তাবটির তীব্র বিরোধিতা করলেন। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজীকে এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিতে ওঁরা বাধ্য করলেন।

এ কথা গান্ধীজী আমাকে জানিয়ে দিয়ে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশবিভাগ প্রায় অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এখন একমাত্র প্রশ্ন হলো, কি ভাবে এই কাজটি করা হবে।

এরপর শুধু এই প্রশ্ন নিয়েই দিনরাত গান্ধীজীর শিবিরে আলোচনা চলতে লাগলো।

সমগ্র ব্যাপারটি নিয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করি। আমি ভেবেই পাই নে, গান্ধীজী এতো তাড়াতাড়ি কিভাবে তাঁর মত পরিবর্তন করলেন। আমার বিশ্বাস, সর্দার প্যাটেলই তাঁকে এ ব্যাপারে প্রভাবিত করেছিলেন। প্যাটেল তখন প্রকাশ্যেই বলতে শুরু করেন, দেশবিভাগ ছাড়া আর কোনো দ্বিতীয় পথ নেই, কারণ অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে মুসলিম লীগের সঙ্গে একত্রে কাজ করা অসম্ভব। আরো একটা বিষয় হয়তো সর্দার প্যাটেলকে প্রভাবিত করেছিলো। তা হলো লর্ড মাউন্টব্যাটেনের একটি মন্তব্য। তিনি বলেছিলেন, মুসলিম লীগের আপত্তি খণ্ডন করবার জন্যই কংগ্রেস কেন্দ্রে একটি দুর্বল সরকার গঠন করতে সম্মত হয়েছিলো। এবং এই কারণেই প্রদেশগুলোকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার দেবার পরিকল্পনা করা হয়েছিলো।

কিন্তু কোনো দেশকে যদি ভাষা, সম্প্রদায় এবং সংস্কৃতির ভিত্তিতে টুকরো টুকরো করে ভাগ করা হয় তাহলে দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে শাসনকার্য চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। মুসলিম লীগ না থাকলে আমরা একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের পরিকল্পনা করতে পারতাম এবং ভারতের ঐক্য ও সংহতির কথা বিবেচনা করে দেশের জন্য সংবিধান রচনা করতে পারতাম। এই কারণেই লর্ড মাউন্টব্যাটেন পরামর্শ দেন, এ অবস্থায় উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্বের সামান্য কিছু অংশ ছেড়ে দিয়ে শক্তিশালী এবং ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠন করা যাবে। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের এই মন্তব্যে সর্দার প্যাটেল বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তাঁর মনে দৃঢ়প্রত্যয় জন্মে যে মুসলিম লীগের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে গেলে ভারতের ঐক্য এবং শক্তি বিশেষভাবে বিঘ্নিত হবে। আমি আরো বুঝতে পারি, এই প্রস্তাবটি শুধু সর্দার প্যাটেলকে নয়, জওহরলালকেও প্রভাবিত করেছিলো। সর্দার প্যাটেল এবং লর্ড মাউন্টব্যাটেন একই অভিমত ব্যক্ত করবার ফলেই দেশবিভাগের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গান্ধীজী আর আগের মতো সবল প্রতিবাদ জানাতে পারেন না।

আমি মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনার পক্ষেই ওকালতি করি

আমি সর্ব উপায়ে চেষ্টা করে চলেছিলাম যাতে লর্ড মাউন্টব্যাটেন মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনাটি কার্যকর করার জন্য উদ্যোগী হন। গান্ধীজী যতোদিন এর পক্ষে ছিলেন ততোদিন আমি আশা ছাড়িনি। এবার গান্ধীজী তাঁর পূর্ব অভিমত পরিবর্তন করায় আমি বুঝতে পারি, লর্ড মাউন্টব্যাটেন আমার কথায় সম্মত হবেন না। তাছাড়া এমনও হতে পারে, লর্ড মাউন্টব্যাটেন হয়তো মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনাটি আদৌ সুনজরে দেখেননি, কারণ পরিকল্পনাটি তাঁর মাথা থেকে আসেনি। অতএব এটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয় যে উক্ত পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কোনো মহল থেকে তীব্র আপত্তি উত্থাপিত হলে তিনি তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা। অর্থাৎ দেশবিভাগের পরিকল্পনাটি প্রস্তাবাকারে তুলতে পারেন।

এখন দেশবিভাগের পরিকল্পনাটি সাধারণভাবে স্বীকৃত হওয়ায় বাংলা এবং পাঞ্জাবের প্রশ্ন বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন বলেন, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো আলাদা করা হবে বলে স্থিরীকৃত

হওয়ার বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলো আলাদা করতে হবে। তিনি তাই কংগ্রেস নেতাদের এ ব্যাপারে কোনোরকম আপত্তি না তোলার জন্য পরামর্শ দেন। তবে তিনি আমাদের ভরসা দিয়ে বলেন, এদিকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ্য রাখবেন এবং দরকার হলে নিজেই বিষয়টি উত্থাপন করবেন।

গান্ধীজী পাটনা রওনা হবার আগে আমি আর একবার শেষ চেষ্টা করি। আমি তাঁকে বর্তমান অবস্থা আর দু বছর বজায় রাখতে বলি। আমি তাঁকে আরো বলি, প্রকৃত ক্ষমতা ইতিমধ্যেই ভারতীয়দের হাতে এসে গেছে। এখন শুধু আইনানুগভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরই বাকি রয়েছে। সুতরাং এর জন্য দু বছর বা তিন বছর কোনো ক্ষতি তো হবেই না, উপরন্তু এইভাবে কাল-হরণের ফলে লীগ হয়তো আমাদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতেও পারে। কি জন্য তারা সমঝোতায় আসতে পারে সে কথা আমি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিবৃত করেছি। গান্ধীজীও এই ধরনের কথা কয়েক মাস আগে বলেছিলেন। তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম, একটা জাতির ইতিহাসে দুই বা তিন বছর মোটেই দীর্ঘ সময় নয়। আমরা যদি দু-তিন বছর চুপ করে থাকি তাহলে মুসলিম লীগ হয়তো আমাদের সঙ্গে একটা আপসে আসতে চাইবে। আমার মনে হয়েছিলো আমরা যদি তাড়াহুড়ো করে এখনই কোনো সিদ্ধান্ত নিই তাহলে দেশবিভাগকে আর রোখা যাবে না। কিন্তু আমরা যদি এক বছর বা দু বছর অপেক্ষা করি তাহলে হয়তো সমস্যা সমাধানের জন্য কোনো শ্রেয়তর পথের সন্ধান পাওয়া যেতেও পারে। গান্ধীজী কিন্তু আমার এই প্রস্তাবে বিশেষ কোনো উৎসাহ দেখালেন না। তবে উৎসাহ না দেখালেও এর বিরুদ্ধে তিনি আপত্তিও জানালেন না।

ইতিমধ্যে লর্ড মাউন্টব্যাটেন তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে আরো অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন। এখন তিনি চাইছেন, এ ব্যাপারে লণ্ডনে গিয়ে মন্ত্রিসভার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করবেন। তিনি ভালোই জানতেন রক্ষণশীল দল এ ব্যাপারে তাঁকে সমর্থন করবে। রক্ষণশীল দল মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিলেন, কারণ ওতে মুসলিম লীগের বায়না অনুসারে ভারত-বিভাগের প্রস্তাব সন্নিবেশিত ছিলো না। কিন্তু এবার লর্ড মাউন্টব্যাটেন যে পরিকল্পনা করেছেন তাতে উক্ত দাবী পুরোপুরিভাবেই মেনে নেওয়া হয়েছে। এই কারণেই তিনি মনে করেন, মিঃ চার্চিল এ ব্যাপারে তাঁকে নিশ্চয়ই সমর্থন করবেন।

৪ঠা মে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা শেষ হয়। সভা শেষ হবার পর ওই দিনই আমি সিমলা রওনা হই। কয়েকদিন পরে লর্ড মাউন্টব্যাটেনও সিমলায় এসে হাজির হন। লণ্ডনে যাবার আগে কয়েকদিন বিশ্রাম নেবার উদ্দেশ্যেই তিনি সিমলায় এসেছিলেন। তিনি স্থির করেছিলেন, ১৫ই মে দিল্লীতে ফিরে যাবেন এবং সেখানে দু দিন থেকে ১৮ই মে লণ্ডন রওনা হবেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন সিমলায় আসায় আমি মনে মনে স্থির করি, এই সুযোগে তাঁর সঙ্গে দেখা করে মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনাকে পুনরায় উজ্জীবন করবার জন্য শেষবারের মতো চেষ্টা করে দেখবো। এই উদ্দেশ্য নিয়ে ১৪ই মে রাত্রে আমি লাটভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি।

এক ঘণ্টারও বেশি সময় আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়। এই সময় আমি তাঁকে মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনাটি বাতিল না করতে অনুরোধ করি। আমি তাঁকে বলি, আমরা যদি ধৈর্য ধরতে পারি তাহলে হয়তো মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব হবে; কিন্তু আমরা যদি এখনই দেশবিভাগের পরিকল্পনা গ্রহণ করি তাহলে আমরা ভারতবর্ষের অপূরণীয় ক্ষতি করবো। একবার দেশ বিভক্ত হয়ে গেলে ভবিষ্যতে যে কি ঘটবে তা কেউ বলতে পারে না। তাছাড়া, তখন শত চেষ্টা করলেও আর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসা যাবে না।

লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে আমি আরো বলি, মিঃ এটলী এবং তাঁর সহকর্মীরা নিজেদের উদ্যোগে যে পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন তা হয়তো তাঁরা সহজে পরিত্যাগ করবেন না। সুতরাং লর্ড মাউন্টব্যাটেন যদি এ ব্যাপারে একটু জোর দেন তাহলে মন্ত্রিসভা হয়তো কোনোরকম আপত্তি উত্থাপন করবেন না। এতোদিন কংগ্রেস বলে এসেছে, ভারতকে অবিলম্বে স্বাধীনতা দিতে হবে। এখন সেই কংগ্রেসই এ ব্যাপারে দুই বা তিন বছর অপেক্ষা করতে বলছে। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস। যাই হোক, ইংরেজরা যদি কংগ্রেসের এই অনুরোধ মেনে নেন তাহলে কোনো তরফ থেকেই তাঁদের ওপর কেউ কোনোরকম দোষারোপ করবে না। এ ছাড়া আরো একটি বিষয়ের প্রতি আমি লর্ড মাউন্টব্যাটেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, তা হলো, ইংরেজরা যদি এ ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন তাহলে স্বাধীন দেশসমূহের নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকরা স্বাভাবিকভাবেই মনে করবেন, ভারতীয়দের প্রস্তুত হবার সুযোগ না দিয়েই ইংরেজ সরকার তাঁদের ওপর স্বাধীনতা চাপিয়ে দিয়েছে। ভারতীয়দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁদের ওপরে

দেশবিভাগ চাপিয়ে দিলে অনেকেই হয়তো সন্দেহ করবেন ইংরেজদের উদ্দেশ্য শুভ ছিলো না।

মাউন্টব্যাটেনের ঘোষণা

লর্ড মাউন্টব্যাটেন আমাকে ভরসা দিয়ে বলেন, তিনি বিগত দুই মাসে যা দেখেছেন এবং যা শুনেছেন সেসব বিষয় পুরোপুরিভাবেই মন্ত্রিসভার সামনে তুলে ধরবেন। মন্ত্রিসভাকে তিনি একথাও বলবেন কংগ্রেসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভারতের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারটা এক বছর বা দু বছর স্থগিত রাখতে চান। আমার অভিমতও তিনি মিঃ এটলী এবং স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে জানাবেন বলে কথা দেন এবং শেষ পর্যন্ত আমাকে বলেন, তাঁর কাছ থেকে সব কথা শোনবার পর এ ব্যাপারে মন্ত্রিসভাই শেষ সিদ্ধান্ত নেবেন।

এই সময় ভারত-বিভাগের সম্ভাব্য ফলাফলের কথাও আমি লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে বিবেচনা করতে বলি। দেশ বিভক্ত হবার আগেই যখন কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার, বোম্বাই এবং পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে এবং হিন্দুরা মুসলমানদের ও মুসলমানরা হিন্দুদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে তখন দেশ বিভক্ত হলে সেই আবহাওয়ায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রক্তের নদী বয়ে যাবে এবং সেই ঘটনার জন্য ইংরেজরাই দায়ী হবেন।

এর উত্তরে লর্ড মাউন্টব্যাটেন বলেন, 'অন্ততপক্ষে একটা ব্যাপারে আমি আপনাকে পুরোপুরিভাবে আশ্বাস দিতে পারি যে দেশে যাতে রক্তপাত এবং দাঙ্গা না হয় সে বিষয়ে আমি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবো। আমি একজন সৈনিক, একথা আপনাকে স্মরণ রাখতে বলি। আপনি জেনে রাখুন, দেশবিভাগের প্রস্তাব যদি অনুমোদিত হয় তাহলে দেশের কোনো জায়গায় যাতে কোনোরকম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না হয় তার জন্য আমি কড়া নির্দেশ জারী করবো এবং কোথাও যদি কোনো গোলমাল দেখা দেয় তাহলে সেই গোলমালকে অদূরেই বিনাশ করবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। এ ব্যাপারে আমি সেনাবাহিনী নিয়োগ করতে পিছপা হবো না। দরকার হলে ট্যাঙ্ক এবং বিমানবহরও ব্যবহার করবো।

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কথাবার্তা শুনে প্রথম দিকে আমার ধারণা হয়, দেশকে বিভক্ত করাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; এবং শুধু এই উদ্দেশ্য নিয়েই

তিনি লণ্ডনে যাচ্ছেন না। শুধু তাই নয়, আমার আরো মনে হয়, মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনাও তিনি বাতিল করেননি। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলী দেখে আমি আমার এই অভিমত পরিবর্তন করতে বাধ্য হই। পরবর্তীকালে তিনি যেভাবে কাজ করেছিলেন তাতে মনে হয়, দেশবিভাগের ব্যাপারে তিনি আগে থেকেই মনস্থির করে লণ্ডনে গিয়েছিলেন এবং মন্ত্রিসভাকে দিয়ে বিষয়টি অনুমোদন করিয়ে নিয়েছিলেন।

সারা পৃথিবী লক্ষ্য করেছে, লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সেই সাহসী ঘোষণা-বাণীর ফলাফল কি হয়েছিলো। দেশ বিভক্ত হবার পরে দেশের এক বিরাট অংশে রক্তের নদী বয়ে গিয়েছিলো এবং নিরপরাধ নরনারী ও শিশু নির্দয়-ভাবে নিহত হয়েছিলো। ভারতের সেনাবিভাগ বিভক্ত হবার ফলে সৈনিকরাও এ ব্যাপারে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করেনি; তাঁদের চোখের সামনেই নিরপরাধ হিন্দু এবং মুসলমানদের হত্যা করা হলেও তাঁরা তাতে বাধা দেননি বা সেই পাইকিরি নরঘাতন বন্ধ করবার জন্য কোনোরকম চেষ্টাও করেননি। এইজন্যই পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমি বলেছি হয়তো লর্ড ওয়াভেলের অভিমতই সঠিক ছিলো।

একটি স্বপ্নের শেষ হলো

আমার মনে একটি ক্ষীণ আশা ছিলো শ্রমিক সরকার মন্ত্রিমিশনের পরি-কল্পনা বাতিল করার প্রস্তাবে সম্মত হবেন না। এই পরিকল্পনা রচিত হয়ে-ছিলো ইংল্যাণ্ডের তিনজন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতার দ্বারা। এঁরা তিনজনেই শ্রমিক মন্ত্রিসভার প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। যদিও ইতিমধ্যে ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্স পদত্যাগ করে মন্ত্রিসভা থেকে সরে গিয়েছিলেন, কিন্তু স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এবং মিঃ এ. ভি. আলেকজাণ্ডার তখনো মন্ত্রিসভায় ছিলেন। এই কারণেই আমার মনে একটা শেষ আশা ছিলো, তাঁরা হয়তো তাঁদের পরিকল্পনা বাতিল করবেন না। কিন্তু আমার সে আশা ফলবতী হলো না। লর্ড মাউন্টব্যাটেন লণ্ডনে পৌঁছবার পরেই আমি শুনতে পেলাম মন্ত্রিসভা তাঁর প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন।

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সেই পরিকল্পনা অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়নি। আমার ধারণা, ওতে ভারত-বিভাগের কথাই বলা হয়েছিলো। লর্ড মাউন্টব্যাটেন দিল্লীতে ফিরে আসেন ৩০শে মে। এরপর ২রা জুন তিনি কংগ্রেস ও মুসলিম

লীগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। ৩রা জুন একটি শ্বেতপত্রের মাধ্যমে শ্রমিক সরকারের বিবৃতি প্রচার করা হয়। শ্রমিক সরকারের সেই বিবৃতি এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমি শুধু এই কথাই বলতে পারি, আমি যা আশংকা করেছিলাম শেষ পর্যন্ত তাই বাস্তবে পরিণত হলো। স্বাধীনতা পাওয়া গেলো ঠিকই, কিন্তু তা পাওয়া গেলো ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করে দুটি আলাদা রাষ্ট্রে পরিণত করার মূল্যে।

এই বিবৃতি প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অখণ্ডতা এবং একতা বজায় রাখবার সব আশা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেলো। এই প্রথম মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনাকে সরকারীভাবে বাতিল করে ভারত-বিভাগের পরিকল্পনা অনুমোদন করা হলো। শ্রমিক সরকার তাঁদের মতামত কেন পরিবর্তন করলেন সে কথা চিন্তা করে আমি এই সিদ্ধান্তে আসি, এ ব্যাপারে তাঁরা ভারতের স্বার্থের চেয়ে ইংরেজের স্বার্থই বড় করে দেখেছিলেন। শ্রমিক দল সব সময় কংগ্রেস এবং তার নেতাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং বহুবার তাঁরা মুসলিম লীগকে প্রতিক্রিয়াশীল দল বলে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং মুসলিম লীগের দাবির কাছে শ্রমিক দলের নতি স্বীকারের অর্থ, আমার মতে, মুসলিম লীগকে খুশি করবার জন্য নয়, আসলে এটা ইংরেজের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই করা হয়েছিলো। মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা অনুসারে যদি অবিভক্ত ভারত স্বাধীনতা লাভ করতো তাহলে এদেশে ইংরেজদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর স্বার্থরক্ষা তথা ভারতে বসবাসকারী ইংরেজদের অর্থনৈতিক জীবনকে বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়তো। কিন্তু ভারত-বিভাগের ফলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে গঠিত আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হলে সেখানে ইংরেজের স্বার্থ পুরোপুরিভাবে বজায় থাকবে এবং তারা এদেশে খবরদারি করবার সুযোগ পাবে। মুসলিম লীগের কর্তৃত্বাধীন রাষ্ট্রে যে ইংরেজের স্বার্থ চিরস্থায়ীভাবে বজায় থাকবে এটা তাঁরা ভালোভাবেই জানতেন। এবং তা জানতেন বলেই দেশবিভাগের পরিকল্পনা তাঁরা অনুমোদন করেন। তাঁরা আরো জানতেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে ভারতের মতিগতিও প্রভাবিত হতে বাধ্য। পাকিস্তানে ইংরেজের স্বার্থ বজায় থাকার ফলে ভারতেও ইংরেজের স্বার্থ যাতে বিঘ্নিত না হয় সেদিকে ভারত সব সময় নজর দেবে।

অনেকদিন থেকেই সকলের মনে একটা প্রশ্ন ছিলো, স্বাধীনতা পাবার পর

ভারত কমনওয়েলথে থাকবে কিনা। মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনায় এটা স্বাধীন ভারতের ওপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো। আমি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে বলেছিলাম, ভারত হয়তো তার নিজের স্বাধীন ইচ্ছাতেই কমনওয়েলথের মধ্যে থাকবে। কিন্তু ভারত-বিভাগের পরিকল্পনা গৃহীত হবার ফলে এ বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে ইংরেজদের পক্ষেই যায়। মুসলিম লীগের দাবি অনুসারে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠিত হওয়ায় সে রাষ্ট্র অবশ্যই কমনওয়েলথের ভেতরে থাকবে। এবং পাকিস্তান যদি তা করে তাহলে ভারতকেও বাধ্য হয়ে সেই পন্থাই অনুসরণ করতে হবে। এইসব ঘটনাই শ্রমিক সরকারের পক্ষে যাবে। তাঁরা ভারতের স্বাধীনতাকে সমর্থন করবেন বলে ঘোষণা করলেও একথা তাঁরা ভোলেননি যে কংগ্রেস সব সময়ই ইংরেজের বিরোধিতা করেছে এবং মুসলিম লীগ সব সময় তাঁদের সমর্থন করেছে। সুতরাং লর্ড মাউন্টব্যাটেন যখন মুসলিম লীগকে খুশি করবার জন্য ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করলেন তখন শ্রমিক মন্ত্রিসভার অনেক সদস্যই তাঁর প্রস্তাবকে সমর্থন জানালেন।

আমার বিশ্বাস, লর্ড মাউন্টব্যাটেন যখন রক্ষণশীল দলের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তখন তিনি এই বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন। মিঃ চার্চিল কোনো সময়ই মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনাকে সমর্থন করেননি। তাই মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনাকে তাঁর খুবই মনঃপূত হয় এবং তিনি এর ওপরে জোর দেন। শ্রমিক সরকারও রক্ষণশীল দলের মতামতের ওপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কারণ তাঁরা জানতেন, কমন্সসভায় ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ক বিলকে বিনা বাধায় পাস করাতে হলে রক্ষণশীল দলের সমর্থন দরকার হবে।

৩রা জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা হয়। এই সভায় নতুন পরিস্থিতি বিবেচনা করা হয়। সভার আলোচনায় যা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায় তা হলো উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ভবিষ্যৎ। মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনায় সীমান্তের অবস্থা বেশ একটু ঘোরালো হয়ে পড়েছিলো। খান আবদুল গফ্ফর খান এবং তাঁর দল সব সময় কংগ্রেসকে সমর্থন করেছেন এবং মুসলিম লীগের বিরোধিতা করেছেন। লীগ তাই খান ভ্রাতাদের শত্রু বলে মনে করে। লীগের বিরোধিতা সত্ত্বেও খান ভ্রাতারা সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস সরকার গঠন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই সরকার তখনো বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু ভারত-বিভাগের পরিকল্পনা খান ভ্রাতাদের এবং কংগ্রেস দলকে এক

অস্বাভাবিক (awkward) অবস্থার মধ্যে এনে ফেলেছে। প্রকৃতপক্ষে খান ভ্রাতৃদ্বয় এবং তাঁদের খোদাই খিদ্‌মতগার দলকে লীগের দয়ার ওপরে এনে ফেলা হয়েছে

ওয়ার্কিং কমিটির কাছে খান আবদুল গফ্‌ফর খানের আবেদন

আমি আগেই বলেছি, গান্ধীজী কর্তৃক মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনাটি সমর্থিত হওয়ায় আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলাম। এবার তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সভায় দেশবিভাগের পক্ষে বলতে শুরু করলেন। আমি এটা আগেই আঁচ করতে পেরেছিলাম ; তাই তাঁর বক্তব্য শুনে আমি মোটেই বিস্মিত হইনি। কিন্তু খান আবদুল গফ্‌ফর খানের মনের অবস্থা এর ফলে একেবারে শোচনীয় হয়ে পড়ে। গান্ধীজীর বক্তব্য শুনে তিনি এতোই বিস্মিত হন যে কয়েক মিনিট তাঁর মুখ থেকে কোনো কথাই বের হয় না। কিছুক্ষণ পরে তিনি ওয়ার্কিং কমিটিকে স্মরণ করিয়ে দেন তিনি চিরকাল কংগ্রেসকে সমর্থন করে এসেছেন, কিন্তু কংগ্রেস আজ তাঁকে পরিত্যাগ করছে। তিনি আরো বলেন, কংগ্রেস তাঁকে পরিত্যাগ করায় সীমান্তের অবস্থা ভয়াবহ হয়ে উঠবে। শুধু তাই নয়, এখন থেকে তাঁর শত্রুরা তাঁকে উপহাস করবে এবং বন্ধুরা বলবে সীমান্ত প্রদেশ যতোদিন কংগ্রেসের প্রয়োজন ছিলো শুধু ততোদিনই তারা খোদাই খিদ্‌মতগার দলকে সমর্থন করেছে। তিনি আরো অভিযোগ করেন, কংগ্রেস যখন মুসলিম লীগের সঙ্গে সমঝোতায় আসে তখন তাঁর সঙ্গে একবার আলোচনা করবারও দরকার বোধ করেনি। অবশেষে তিনি বলেন, কংগ্রেস যদি খোদাই খিদ্‌মতগারদের নেকড়ের মুখে তুলে দেয় তাহলে সীমান্ত প্রদেশ তাকে চরম বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করবে।

খান আবদুল গফ্‌ফর খানের কথা শুনে গান্ধীজী রীতিমতো বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, বিষয়টিকে তিনি লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কাছে উত্থাপন করবেন। আসলে তিনি তা করেছিলেনও। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করে তিনি বলেছিলেন, মুসলিম লীগ খোদাই 'খিদ্‌মতগারদের প্রতি সুবিচার করবে বলে তিনি যতোদিন না বুঝতে পারছেন ততোদিন তিনি দেশবিভাগে সম্মতি দেবেন না। কংগ্রেসের দুর্দিনে যারা সব সময় তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এবং সব সময় তাকে সমর্থন করেছে, তাদের তিনি কিভাবে

পরিত্যাগ করতে পারেন ?

এর উত্তরে লর্ড মাউন্টব্যাটেন বলেন, এ বিষয় নিয়ে তিনি মিঃ জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করবেন। আলোচনাও তিনি করেছিলেন এবং সেই আলোচনার ফলে মিঃ জিন্না খানআবদুল গফ্ফর খানের সঙ্গে আলোচনা করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু সে আলোচনায় কোনোই ফল হয় না। এটা আদৌ বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। কংগ্রেস যখন একবার দেশবিভাগ মেনে নিয়েছে তখন খান আবদুল গফ্ফর খান এবং তাঁর দলের আর কোন্ ভবিষ্যৎ আছে ? মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনার মূল কথাই ছিলো মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোকে আলাদা করে পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হবে। সীমান্ত প্রদেশে মুসলমানরা বিরাটভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ; সুতরাং ওই প্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকেও সীমান্ত প্রদেশ প্রস্তাবিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যেই পড়ে। এর সঙ্গে ভারতের কোনোরকম যোগাযোগই নেই। লর্ড মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন, প্রদেশগুলোকে নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করবার স্বাধীনতা দেওয়া হবে। এই ঘোষণা অনুসারে তিনি বলেন, সীমান্ত প্রদেশ তার নিজের ভাগ্য নিজে নিয়ন্ত্রণ করবার সুযোগ অবশ্যই পাবে। তিনি আরো বলেন, এ ব্যাপারে দরকার হলে গণভোট নিয়ে প্রদেশবাসীদের ইচ্ছেটা জেনে নেওয়া হবে তারা পাাকস্তানে থাকতে চায়, না ভারতের সঙ্গে থাকতে চায়। এই সময় সীমান্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগদান করেন, লর্ড মাউন্টব্যাটেন তাঁর এই পরিকল্পনার কথা ডাঃ খান সাহেবকে বলেছিলেন এবং এতে তাঁর কোনো আপত্তি আছে কিনা তা জানতে চেয়েছিলেন। ডাঃ খান সাহেব মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বলে এটা ধরে নিতে হবে যে বেশীর ভাগ লোকের সমর্থন তাঁর পেছনে আছে। সুতরাং গণভোটের প্রস্তাবে আপত্তি জানানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু তিনি এক নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি দাবী করেন, গণভোট যদি নিতেই হয় তাহলে সীমান্তের পাঠানরা যাতে পাকতুনিস্তান নামে তাঁদের জন্য এক নতুন রাষ্ট্র গঠন করতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে।

সীমান্ত প্রদেশের ওপর খান ভ্রাতৃদ্বয়ের যতোটা প্রভাব আছে বলে কংগ্রেস মনে করে আসলে ততোটা প্রভাব তাঁদের মোটেই ছিলো না। দেশবিভাগের জন্য আন্দোলন শুরু হবার পর থেকেই তাঁদের প্রভাব কমতে থাকে। এখন পাকিস্তান যখন আর কল্পনার বস্তু নয়, এবং মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ-

গুলোকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গঠন করা হবে বলে স্বীকার করা হয়েছে, তার ফলে সীমান্তের অধিবাসীদের ভাবপ্রবণ মনের এক বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে। মুসলিম লীগের আন্দোলন আরো শক্তিশালী হয়েছিলো ইংরেজ অফিসারদের চালচলনের ফলে। এঁরা প্রকাশ্যভাবেই পাকিস্তান পরিকল্পনাকে সমর্থন করছিলেন এবং উপজাতীয় লোকদের মুসলিম লীগের পাশে দাঁড়াবার জন্য উস্কানি দিচ্ছিলেন। ডাক্তার খান সাহেব তাই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁকে যদি তাঁর নেতৃত্ব রক্ষা করতে হয় তাহলে পাকতুনিস্তানের দাবী তোলা ছাড়া গতি নেই।

পাঠানরা পাকতুনিস্তানের দাবী তুললেন

পাকতুনিস্তান ক্ষুদ্র হলেও বহু পাঠানদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকই এটা চাইবেন কারণ তাঁরা পাঞ্জাবী শাসকদের অধীনস্থ হতে চান না। লর্ড মাউন্টব্যাটেন কিন্তু নতুন কোনো দাবির কথায় কান দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি তাঁর পরিকল্পনাকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব রূপ দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই পাকতুনিস্তানের দাবী নিয়ে বিশেষ কোনো আলোচনাই দিল্লীতে হলো না।

কংগ্রেসের আলোচনা সভায় খান ভ্রাতৃদ্বয়ের এইটিই ছিলো সর্বশেষ অংশগ্রহণ। সুতরাং দেশবিভাগের পূর্বে ও পরে তাঁদের ভাগ্যে কি ঘটেছিলো সে কথা এখানে সংক্ষেপে বলা দরকার বোধ করছি। তাঁরা যখন দেখতে পেলেন কংগ্রেস দেশবিভাগ মেনে নিয়েছে তখন তাঁদের পরবর্তী কর্মপন্থা কি হবে তা তাঁরা বুঝেই উঠতে পারছিলেন না। গণভোটের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করাও তাঁদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিলো না। এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে এটাই মনে করা হবে যে তাঁদের পেছনে গণসমর্থন নেই। তাঁরা তাই পেশোয়ারে ফিরে গিয়ে তাঁদের বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে সীমান্ত প্রদেশের স্বাধীনতার দাবী তোলেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সীমান্ত কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মেনে নেন এবং ওখানকার পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার জন্য যথাবিহিত কাজ করবার জন্য খান আবদুল গফ্ফর খানের ওপরে পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন। সীমান্ত কংগ্রেস তখন স্বাধীন পাঠান রাষ্ট্র গঠনের দাবী তোলে এবং ঐস্লামিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে তার সংবিধান রচনা করতে চায়। এই দাবীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে খান

আবদুল গফ্‌ফর খান বলেন, সীমান্তের পাঠানদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিদ্যমান আছে এবং এই ঐতিহ্য কিছুতেই রক্ষা করা যাবে না যদি তাঁরা তাঁদের নিজস্ব ভাবধারা অনুসারে চলবার স্বাধীনতা না পান। তাঁরা তাই দাবি করেন, গণভোট পাকিস্তান এবং ভারতের ব্যাপারে সীমাবদ্ধ না থেকে ওতে তৃতীয় বিকল্প হিসেবে স্বাধীন পাকতুনিস্তানের কথা থাকবে। একমাত্র এই পথেই গণভোট মারফত জনগণের প্রকৃত ইচ্ছা জানতে পারা যাবে। অন্যথায় এটা একটা অর্থহীন বিষয় হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তাহলে পাকতুনরা পাকিস্তানের অন্যান্য মুসলমানের মতো পাকিস্তানের অধীনস্থ হয়ে পড়বে। এই প্রসঙ্গে বলা চলে, গণভোটের প্রস্তাবে যদি স্বাধীন পাকতুনিস্তানের কথা জুড়ে দেওয়া হতো তাহলে সীমান্ত প্রদেশের বিরাট-সংখ্যক ব্যক্তি এর পক্ষে ভোট দিতেন। পাঞ্জাবীদের অধীনস্থ হয়ে থাকাটা তাঁরা পছন্দ করতেন না এবং এই মনোভাবের ফলে তাঁরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভোট দিতেন।

মিঃ জিন্না এবং লর্ড মাউন্টব্যাটেন এ দাবি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। লর্ড মাউন্টব্যাটেন পরিষ্কারভাবে বলে দিলেন, সীমান্তে কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা যাবে না। সীমান্ত প্রদেশকে পাকিস্তানের ভেতরে কিংবা ভারতের ভেতরে থাকতে হবে। খান ভ্রাতৃদ্বয় তখন ঘোষণা করেন তাঁদের দল গণভোটে অংশ গ্রহণ করবে না। পাঠানদের তাঁরা এই গণভোট বয়কট করতে বলেন। কিন্তু তাঁদের বিরোধিতা কোনো কাজেই এলো না। যথাসময়ে গণভোট নেওয়া হলো এবং জনগণের এক বিরাট অংশ পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিলো। খান ভ্রাতৃদ্বয় যদি গণভোট বয়কট না করতেন এবং তাঁদের সমর্থকরা যদি ঠিকমতো কাজ করতেন তাহলে জানা যেতো পাঠানদের মধ্যে কতোটা অংশ পাকিস্তানের সমর্থক। যাই হোক, গণভোটের ফলাফল মুসলিম লীগের পক্ষেই যায় এবং ইংল্যাণ্ডের সরকার অবিলম্বে এটা মেনে নেন।

দেশবিভাগ হয়ে যাবার পরে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করবার উদ্দেশ্যে তাঁদের মতিগতির কিছুটা পরিবর্তন করেন। পাকতুনিস্তানের দাবী ব্যাখ্যা করে তাঁরা বলেন এটা আলাদা রাষ্ট্র গঠনের দাবি নয়। আসলে এটা হলো পাকিস্তানের ভেতরে থেকেই পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন পাবার দাবি। তাঁরা যা দাবী করছেন তা হলো পাকিস্তানের গঠনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকার হবে ফেডারেল সরকার এবং সেই ফেডারেল সরকারের অধীনে প্রতিটি প্রদেশ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করবে। এর দ্বারা পাঠানরা তাঁদের সামাজিক

ও সাংস্কৃতিক জীবন নিজেদের ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন করতে পারবেন। এইরকম সাংবিধানিক রক্ষাকবচ না থাকলে পাঞ্জাবীরাই সমগ্র পাকিস্তানের ওপর আধিপত্য করবে। তারা হয়তো পাঠানদের এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারও মানতে চাইবে না।

নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে যে-কোনো ব্যক্তিই এটা স্বীকার করবেন খান ভ্রাতৃদ্বয়ের দাবী মোটেই অযৌক্তিক ছিলো না। তাদের এই দাবী মুসলিম লীগের লাহোর-প্রস্তাবের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও মিঃ জিন্না খান ভ্রাতৃদ্বয়কে এই বলে অভিযুক্ত করেন তাঁরা নাকি পাকিস্তানকে ভেঙে বেরিয়ে যেতে চান। প্রকৃতপক্ষে খান আবদুল গফ্ফর খান কয়েকবার করাচিতে গিয়ে মিঃ জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করেন। এই আলোচনার সময় একবার এমনও মনে হয়েছিলো তাঁদের মধ্যে একটা সমঝোতা সৃষ্টি হতে চলেছে। পাকিস্তানের কোনো কোনো পর্যবেক্ষক এমন কথাও বলেন খান আবদুল গফ্ফর খানের সদিচ্ছা দেখে মিঃ জিন্না খুবই খুশি হয়েছেন এবং তিনি নাকি পেশোয়ারে গিয়ে তাঁর এবং তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা করে আরো আলোচনা করতে চান। কিন্তু কার্যকালে আলাদা অবস্থা দেখা যায়। খান ভ্রাতৃদ্বয়ের রাজনৈতিক শত্রুরা মিঃ জিন্নার মনকে তাঁদের প্রতি বিষাক্ত করে তোলে। খান আবদুল কোয়ায়ুম খান (যিনি তখন সীমান্ত প্রদেশে সরকার গঠন করেছেন) স্বভাবতই চাননি মিঃ জিন্নার সঙ্গে খান ভ্রাতৃদ্বয়ের কোনোরকম আপসরফা হয়। সুতরাং তিনি এমনভাবে কাজকর্ম শুরু করলেন যার ফলে কোনোরকম সমঝোতা অসম্ভব হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সরকার সমস্তরকম স্বাধীনতা এবং সুবিচারের পথ পরিত্যাগ করে খোদাই খিদ্‌মতগারদের ওপরে নানাভাবে অত্যাচার চালাতে থাকেন। এ ব্যাপারে তিনি আইন এবং ন্যায়নীতিকেও বিসর্জন দেন। ফলে গণতন্ত্রের সমাধি হয়ে সেখানে পশুশক্তিই প্রধান হয়ে ওঠে। খান আবদুল গফ্ফর খান এবং ডাঃ খান সাহেব সহ খোদাই খিদ্‌মতগার দলের আরো বহুসংখ্যক নেতাকে কারারুদ্ধ করা হয়। প্রায় ছ বছর তাঁরা বিনা বিচারে জেলে পচতে থাকেন। খান আবদুল কোয়ায়ুম খানের প্রতিহিংসামূলক মনোভাব এমনই এক তিক্ত পর্যায়ে এসেছিলো মুসলিম লীগের একটি অংশও তাতে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলো। এই মহল থেকে তখন দাবী ওঠে হয় খান ভ্রাতৃদ্বয়ের বিচার করতে হবে, না হয় তাঁদের মুক্তি দিতে হবে। কিন্তু তাঁদের কথায় কোনো কাজই হয় না। ওখানে যেমন অরাজকতা চলছিলো, তেমনই চলতে থাকে।

১৯৪৭-এর ১৪ই জুন এ. আই.সি.সি.র সভা বসে। এর আগে এ.আই.সি-সি.র অনেক সভাতেই আমি অংশগ্রহণ করেছি কিন্তু এবারের এই সভার মতো দুর্ভাগ্যজনক সভা আর কোনোদিন অনুষ্ঠিত হয়নি। যে কংগ্রেস চিরদিন ভারতের ঐক্য এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে এসেছে সেই কংগ্রেসই এখন আনুষ্ঠানিকভাবে দেশবিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করতে চলেছে। পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং সর্দার প্যাটেল ও জওহরলাল সেই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। পরে গান্ধীজীকেও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হয়।

আমার পক্ষে কংগ্রেসের এই নতি স্বীকারকে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। আমার বক্তৃতায় আমি তাই ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তকে দুর্ভাগ্যজনক বলে অভিহিত করি। দেশবিভাগ ভারতের পক্ষে এক মহাদুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু নয়। এর পক্ষে একমাত্র যা বলা যায় তা হলো এই সিদ্ধান্ত না নেবার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি কিন্তু আমাদের সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। আমাদের ভুললে চলবে না ভারতবাসীরা একই জাতি এবং তাদের সংস্কৃতিও এক এবং অবিভাজ্য। রাজনীতির ব্যাপারে আমরা অকৃতকার্য হয়েছি বলেই আজ আমরা দেশকে বিভক্ত করেছি। আমাদের এই পরাজয়কে আমরা অবশ্যই স্বীকার করে নেবো। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করবো আমাদের সংস্কৃতি কখনো বিভক্ত ছিলো না। জলের মধ্যে একটা কাঠি ঢুকিয়ে দিলে মনে হবে জলটা বিভক্ত হয়ে গেছে কিন্তু যে মুহূর্তে কাঠিটাকে সরিয়ে নেওয়া হবে জলটা পূর্বের মতো একাকার হয়ে যাবে।

সর্দার প্যাটেল আমার এই বক্তৃতা পছন্দ করলেন না। তাই দেখা গেলো তাঁর বক্তৃতার সময় তিনি আমার বক্তব্য খণ্ডন করবার জন্যই বেশি সময় ব্যয় করেন। তাঁর বক্তৃতার সারমর্ম হলো, দেশবিভাগের প্রস্তাব কোনোরকম দুর্বলতা অথবা কোনো মহলের কোনো চাপের ফলে গৃহীত হয়নি। এই প্রস্তাব গ্রহণ করবার কারণ হলো, ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে এটাই হলো একমাত্র সমাধান।

কংগ্রেসের মধ্যে চিরদিনই কিছুসংখ্যক সুবিধাবাদী শ্রেণীর সদস্য ছিলো। এমন কি বর্তমান দুর্ভাগ্যজনক সময়েও এরা আসর জাঁকিয়ে অবস্থান করছিলো। এরা নিজেদের জাতীয়তাবাদী বলে জাহির করতো কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঘোর সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিতো। এরা সব সময় বলে এসেছে, ভারতের সংস্কৃতি কখনো অবিভাজ্য ছিলো না। তারা আরো বলতো, কংগ্রেস

যাই বলুক না কেন, হিন্দু ও মুসলমানদের সামাজিক জীবন সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হলো, এরা হঠাৎ আসরে নেমে তারস্বরে ভারতীয় ঐক্যের কথা বলতে শুরু করলো।

এরা প্রচণ্ডভাবে দেশবিভাগের প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে থাকে। এবার এরা বলতে শুরু করেছে, ভারতের সংস্কৃতি এবং জাতীয় ঐক্যকে কোনোমতেই বিনষ্ট করা চলবে না। এ ব্যাপারে আমি মোটামুটিভাবে তাদের সঙ্গে একমত হই। কিন্তু হঠাৎ এরা ভোল পাল্টালো কেন তা আমি বুঝে উঠতে পারিনি।

কংগ্রেস দেশবিভাগের পক্ষে বক্তব্য রাখলো

প্রথম দিনের আলোচনার পর ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা গেলো। পণ্ডিত পন্থ এবং সর্দার প্যাটেলের বক্তৃতাও সদস্যদের মনোভাবকে প্রভাবিত করতে পারলো না। কি করেই বা পারবে? জন্মকাল থেকে কংগ্রেস যে নীতির কথা বহুবার ঘোষণা করে এসেছে, কংগ্রেসের সেই বহু-বিঘোষিত নীতির মূলেই কুঠারাঘাত করেছে ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাব। ব্যাপার গুরুতর দেখে শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীকে অবতীর্ণ হতে হলো। তিনি ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবকে মেনে নেবার জন্য সদস্যদের কাছে আবেদন জানালেন। তিনি বলেন, তিনি আগাগোড়াই দেশবিভাগের বিরোধিতা করেছেন, কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি যেরকম জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্যই মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনাকে গ্রহণ করতে হয়েছে বলে ব্যাখ্যা করে তিনি পণ্ডিত পন্থের উত্থাপিত প্রস্তাব অনুমোদন করবার জন্য সদস্যদের কাছে আবেদন জানান।

প্রস্তাবটি যখন ভোটে দেওয়া হয় তখন দেখা যায় ২৯জন প্রস্তাবের পক্ষে এবং ১৫জন বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন। গান্ধীজীর আবেদন সত্ত্বেও বেশীসংখ্যক সদস্য দেশবিভাগের পক্ষে ভোট দিলেন না।

প্রস্তাবটি পাস হলো ঠিকই, কিন্তু সদস্যদের মনের অবস্থা কি এর পক্ষে ছিলো? দেশবিভাগের প্রশ্নে প্রত্যেক সদস্যের মনই তখন ভার হয়ে পড়েছে। সুতরাং খোলা মন নিয়ে তাঁরা প্রস্তাবটি অনুমোদন করেননি। এমন কি, প্রস্তাবের পক্ষে যাঁরা ভোট দিয়েছিলেন তাঁদের মনও এর বিপক্ষে ছিলো।

এটা একটা খারাপ ব্যাপার। কিন্তু এর চেয়েও খারাপ ব্যাপার হলো সাম্প্রদায়িকতার প্রচার—যা তখন রীতিমতো সোচ্চার হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন মহল থেকে তখন প্রকাশ্যেই বলা শুরু হয়েছে পাকিস্তানের হিন্দুদের ভয় করবার কিছু নেই, কারণ ভারতে সাড়ে চার কোটি মুসলমান থাকবে। সুতরাং পাকিস্তানের হিন্দুদের ওপরে যদি কোনোরকম অত্যাচার হয় তাহলে ভারতের মুসলমানদের ওপরে তার প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

এ. আই. সি. সি.র সভায় সিন্ধুর প্রতিনিধিরা তীব্রভাবে প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন। তাঁদের তখন নানারকম স্তোকবাক্য দিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়। প্রকাশ্য সভায় কিছু না বলেও তাঁদের নিয়ে গোপনে আলোচনা সভা করে. তাঁদের কাছে এমন কথাও বলা হয় পাকিস্তানে তাঁদের ওপর কোনোরকম অত্যাচার করা হলে ভারতের মুসলমানদের ওপরে তার প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

আমি যখন একথা শুনতে পাই তখন আমি বিশেষভাবে মানসিক আঘাত পাই। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারি এ এক সাংঘাতিক মনোভাব এবং এর ফলে এক সুদূরপ্রসারী এবং দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। এবং আশা করা হলো, ভারত পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রেই সংখ্যালঘুদের অপর রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের স্বার্থে জামিন হিসেবে গণ্য করা হবে। এক রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের স্বার্থে অপর রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদেরওপরে প্রতিশোধ নেবার এই মনোবৃত্তিকে আমি বর্বর মনোবৃত্তি বলে মনে করি। আমার কথাটা যে কতোখানি সত্যি তা পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। দেশবিভাগের পরে উভয় রাষ্ট্রে যে রক্তের নদী প্রবাহিত হয় সেটা এই মনোবৃত্তির ফলেই সংঘটিত হয়েছিলো।

কংগ্রেসের কোনো কোনো সদস্য এই তত্ত্বের ভয়াবহ দিকটা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। এ ব্যাপারে বাংলার কংগ্রেস নেতা কিরণশঙ্কর রায়ের নাম আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে। তিনিই প্রথমে এ কথাটা আমাকে বলেন। তিনি তৎকালীন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আচার্য কৃপালনিকেও এই সম্ভাব্য বিপদের কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে এটি ছিলো একটি সাংঘাতিক তত্ত্ব। এইরকম মনোবৃত্তি যদি একবার গড়ে ওঠে তাহলে পাকিস্তানে হিন্দুরা এবং ভারতে মুসলমানরা পাইকিরিভাবে নিহত হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিরণশঙ্কর রায়ের উপরোক্ত কথায় কেউ কোনোরকম গুরুত্ব তো দিলেনই না, উপরন্তু অনেকে তাঁকে উপহাসও করলেন। এই সব ব্যক্তি তাঁকে এমন

কথাও বলেন যে ভারত বিভক্ত হবার পর জামিনের তত্ত্বই অনুসৃত হবে। তাঁরা আরো বললেন একমাত্র এই পথেই পাকিস্তানের হিন্দুদের রক্ষা করা যাবে। কিরণশঙ্কর রায় তাঁদের কথায় খুশি হতে না পেরে প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে আমার কাছে এসে তাঁর আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন কয়েকজন নেতা যে পদ্ধতির কথা তাঁকে বলেছেন তার ওপর তিনি আস্থা রাখতে পারছেন না।

ইংরেজ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রথমে পনেরো মাস সময় নির্ধারিত করেছিলেন। ১৯৪৭-এর ২০শে ফেব্রুয়ারী মিঃ এটলী সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন, তাঁর ইচ্ছা ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যেই দায়িত্বশীল ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবেন। ২০শে ফেব্রুয়ারী এবং ৩রা জুনের মধ্যে অনেক ঘটনা সংঘটিত হয়। এখন দেশবিভাগের পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ায় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা করেন পরিকল্পনাটি যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব কার্যে রূপায়িত করা হবে। তাঁর মতিগতি মিশ্র ধরনের ছিলো। প্রথমত তিনি ইচ্ছা করেছিলেন ইংরেজরা যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। দ্বিতীয়ত তিনি হয়তো ভেবেছিলেন এ ব্যাপারে দেরি করা হলে আবার হয়তো নতুন ধরনের ফ্যাকড়া উঠে পরিকল্পনাটা কার্যকর করার পথে বাধা উপস্থিত হবে। মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা উদ্ভাবিত হবার পরে তাকে কার্যকর করার বিলম্ব হবার জন্যই পরবর্তীকালে নানা ফ্যাকড়া উঠে পরিকল্পনাটির সমাধি হয়েছিলো বলেই তাঁর মনে এই চিন্তাধারা স্থান পেয়েছিলো।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারত-বিভাগের জন্য তিন মাস সময় নির্ধারণ করেন। তিনি স্থির করেন এই সময়ের মধ্যেই দেশবিভাগের কাজ তিনি সম্পন্ন করবেন। এটা খুব সহজ কাজ ছিলো না। আমি তাই প্রকাশ্যেই আমার সন্দেহ ব্যক্ত করেছিলাম যে এতো অল্প সময়ের মধ্যে এই বিশাল কর্মকাণ্ড সমাধা করা হয়তো সম্ভব হবে না। কিন্তু লর্ড মাউন্টব্যাটেন যেরকম দ্রুততার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে এই কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন তার জন্য আমি অবশ্যই তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবো। সমগ্র বিষয়ের ওপরে তাঁর এমনই দখল (mastery) ছিলো এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার এমন ক্ষমতা তাঁর ছিলো যার ফলে তিন মাসের আগেই তিনি সমস্ত সমস্যার সমাধান করেন এবং ১৯৪৭-এর ১৪ই আগস্ট ভারতবর্ষ দু ভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি আলাদা রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন কি রকম দ্রুততার সঙ্গে এই জটিল সমস্যার সমাধান করে দুটি রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে তাঁর ঘোষণাকে কার্যকর করেছিলেন সে সম্পর্কে দু-একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হচ্ছে। যখনই জানা গেলো ভারতবর্ষ বিভক্ত হতে চলেছে, তখন হিন্দু ও মুসলমানরা নানারকম দাবী তুলতে শুরু করলেন। এছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দাঙ্গাহাঙ্গামাও দেখা দিলো। ১৯৪৬-এ কলকাতার বিরাট হত্যাকাণ্ডের পরে নোয়াখালি এবং বিহারে তার প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়লো। মার্চ মাসে পাঞ্জাবেও দাঙ্গা শুরু হলো। প্রথমে লাহোর শহরে দাঙ্গা শুরু হলেও পরবর্তীকালে তা ব্যাপক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। রাওয়ালপিণ্ডি শহরই সবচেয়ে বেশী উপদ্রুত হয়। লাহোর শহর তো রীতিমতো যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে এবং হিন্দু ও মুসলমানরা সেখানে রীতিমতো যুদ্ধ শুরু করেছে। হিন্দু শিখরা কংগ্রেসকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন যে লাহোরকে ভারতের মধ্যেই রাখতে হবে। তাঁরা বলেন, পাঞ্জাবের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন লাহোরেই কেন্দ্রীভূত এবং এই শহরটি যদি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে পাঞ্জাব চিরদিনের মতো পঙ্গু হয়ে যাবে। অতএব অনেকেই চাপ দিতে লাগলেন যে লাহোরকে ভারতের মধ্যে রাখার জন্য কংগ্রেস তার প্রভাব বিস্তার করবে। কিন্তু কংগ্রেস তাঁদের কথায় কর্ণপাত করে না। কংগ্রেসের বক্তব্য হলো, এই প্রশ্ন ওখানকার অধিবাসীদের ইচ্ছানুসারেই সমাধান হবে।

মুসলমান, হিন্দু এবং শিখদের কোনো কোনো অংশ মনে করেন হিংস্র পদ্ধতিতেই লাহোরের প্রশ্নটির সমাধান করতে হবে। আসল ব্যাপার হলো, হিন্দুরাই ছিলো লাহোর এবং তার নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহের বেশির ভাগ সম্পত্তির মালিক। মুসলমানরা মনে করে হিন্দুদের সম্পত্তি ধ্বংস করলে অর্থনৈতিক দিকে হিন্দুদের ওপরে চরম আঘাত করা যাবে। তারা তাই অমুসলমানদের কলকারখানা এবং বাড়িঘর পোড়াতে শুরু করে এবং যথেচ্ছভাবে তাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করতে থাকে। এর প্রতিশোধ নেবার জন্য হিন্দুরা শুরু করে মুসলমান নিধন। তাদের হাতে যথেষ্ট টাকা থাকায় তারা ভাবে টাকার জোরেই তারা মুসলমানদের ওপরে আক্রমণ সংগঠিত করে তাদের লাহোর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ওখানে হিন্দুপ্রাধান্য স্থাপন করতে পারবে। এবং একথা ওখানে প্রকাশ্যেই বলা হতে থাকে। যেখানে একপক্ষ সম্পত্তি ধ্বংসে মেতে উঠেছে এবং অন্যপক্ষ হত্যাকাণ্ডে মেতে উঠেছে—সেখানে সাম্প্রদায়িক নেতারা সকলেই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে

এই ব্যাপারে অংশগ্রহণ করতে থাকে। সুতরাং সর্বত্র এই কথা প্রচারিত হতে থাকে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক নেতারা হিন্দুদের ওপরে আক্রমণ সংগঠিত করছেন। অন্যদিকে হিন্দুমহাসভার নেতাদের ওপরেও মুসলমানদের আক্রমণ করবার জন্য হিন্দুদের উস্কানি দেবার কথা প্রচারিত হতে থাকে।

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের নৈপুণ্য ও কর্মতৎপরতা

প্রায় অনুরূপ পরিস্থিতি কলকাতায় দেখা দেয়। মুসলিম লীগের সমর্থকরা দাবি করতে থাকেন কলকাতাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আবার লীগ-বিরোধীরা চাইছিলেন কলকাতা শহর ভারতের মধ্যেই থাকবে।

এই রকম দাবি আর পাল্টা দাবির মধ্যেই লর্ড মাউন্টব্যাটেন পাঞ্জাব আর বাংলা বিভক্ত করবার কাজে হাতে দেন। এই সম্পর্কে স্থির হয়, প্রাদেশিক আইনসভায় ভোটের মাধ্যমে স্থির হবে প্রদেশ দুটিকে বিভক্ত করা হবে না তারা পুরোপুরিভাবে ভারতের পক্ষে অথবা পাকিস্তানের পক্ষে যোগদান করবে। উভয় প্রদেশই বিভাগের পক্ষে ভোট দেয়। এরপর প্রশ্ন দাঁড়ায় নতুন প্রদেশ দুটির সীমানা কি হবে। সীমানা নির্ধারণের ব্যাপারে লর্ড মাউন্টব্যাটেন একটি সীমানা কমিশন নিযুক্ত করেন এবং মিঃ র‍্যাডক্লিফকে সেই কমিশনের ভার নিতে বলেন। মিঃ র‍্যাডক্লিফ তখন সিমলায় ছিলেন। তিনি এই নিয়োগ মেনে নিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু তিনি বলেন জরিপের কাজ তিনি শুরু করবেন জুলাই মাসের প্রথম দিকে। তিনি আরো বলেন, জুনের প্রচণ্ড গরমে পাঞ্জাবে জরিপ করা প্রায় অসম্ভব। জুলাই মাসে যদি কাজটি করা হয় তাতেও তিন-চার সপ্তাহের বেশি দেরি হবে না। লর্ড মাউন্টব্যাটেন তাঁকে বলেন তিনি-এ ব্যাপারে একদিনও দেরি করতে চান না; সুতরাং তিন-চার সপ্তাহের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর নির্দেশ যথারীতি পালিত হয়। এ থেকেই বুঝতে পারা যায় কতো তাড়াতাড়ি তিনি তাঁর আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করেছিলেন।

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সামনে দ্বিতীয় সমস্যা দাঁড়ায় ভারত সরকারের সদর দপ্তর এবং সম্পত্তি ভাগ করার বিষয়। যেসব প্রদেশ ভারত অথবা পাকি-

স্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো তাদের দলিলপত্র ভাগ করাটা খুবই অসুবিধেজনক হয়ে দাঁড়ায়। যেসব প্রদেশ পাকিস্তানের ভাগে পড়েছে সেগুলোর কাগজ-পত্র আলাদা করে পাকিস্তানে পাঠাতে হবে। এর চেয়েও কঠিন কাজ হলো যেসব প্রদেশ বিভক্ত হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে। কিন্তু লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কর্মকুশলতার ফলে নিতান্ত জটিল কাজও সহজেই সুসম্পন্ন হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এইসব কাজ তিনি নিজেই তদারক করেছিলেন। তিনি যে কমিটি নিযুক্ত করেছিলেন সেই কমিটি প্রত্যেকটি সমস্যাই যথাসময়ে সমাধান করে-ছিলেন।

এর চেয়েও কঠিন সমস্যা দেখা দিয়েছিলো অর্থদপ্তর এবং সেনাবাহিনী বিভক্ত করা নিয়ে। কিন্তু লর্ড মাউন্টব্যাটেনের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে কোনো সমস্যাই তাঁর কাছে কঠিন বলে বিবেচিত হয়নি। সবচেয়ে জটিল বলে বিবেচিত অর্থদপ্তর ভাগ করার কাজটিও নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছিলো।

সেনাবাহিনী ভাগ করার ব্যাপারে স্থির হয় পাকিস্তানের ভাগে এক-তৃতীয়াংশ এবং ভারতের ভাগে দুই-তৃতীয়াংশ যাবে। এ ব্যাপারে প্রশ্ন ওঠে সেনাবাহিনীকে অবিলম্বে বিভক্ত করা হবে, না, দু-তিন বছর স্থিতাবস্থায় রেখে দেওয়া হবে? সেনানায়করা অভিমত দেন সাধারণ সৈনিকদের একই কমাণ্ডের অধীনে রাখা উচিত। তাঁদের এই অভিমত আমাকে খুবই খুশি করে। আমি তাই সর্বান্তঃকরণে তাঁদের এই অভিমতকে সমর্থন জানাই। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের অভিমত ছাড়াও এ ব্যাপারে আমার একটি নিজস্ব অভিমত ছিলো। আমি এই আশঙ্কা পোষণ করতাম দেশ বিভক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ জুড়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়ে যাবে। এবং তা যদি হয় তাহলে অবিভক্ত সেনাবাহিনী সুষ্ঠুভাবেই দেশকে রক্ষা করতে পারবে। আমার মতে সৈনিকদের মধ্যে কোনোরকম সাম্প্রদায়িকতার আমদানি করা অসঙ্গত হবে। তখন পর্যন্ত সৈনিকদের মধ্যে কোনোরকম সাম্প্রদায়িক মনোভাব বিদ্যমান ছিলো না। সৈনিকদের যদি রাজনীতি থেকে বাইরে রাখা যায় তাহলেই শুধু তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও নিরপেক্ষতা বজায় থাকবে। আমি তাই সেনা-বিভাগকে অবিভক্ত রাখার জন্যই চাপ দিই। লর্ড মাউন্টব্যাটেনও এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হন। আজও আমি বিশ্বাস করি সে সময় যদি সেনা-বাহিনীকে অখণ্ড রাখা হতো তাহলে স্বাধীনতার পরে সারা দেশময় রক্তের নদী প্রবাহিত হতো না।

সেনাবাহিনী বিভক্ত হলো

আমি দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি আমার সহকর্মীরা এ ব্যাপারে আমার বিরোধিতা করেন। আমি সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য হয়েছিলাম ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের বিরোধিতায়। তিনি ছিলেন শান্তিবাদী এবং অহিংসার একনিষ্ঠ পূজারী। কিন্তু সেই অহিংসার পূজারীই হঠাৎ উঠে পড়ে লেগে গেলেন সেনাবাহিনীকে ভাগ করার জন্য। তাঁর বক্তব্য হলো, ভারতবর্ষ যদি বিভক্ত হয় তাহলে সেনাবাহিনীকে অবিভক্ত রাখা কিছুতেই চলবে না।

আমার মতে এটা একটা সাংঘাতিক মনোভাব। কিন্তু এই মনোভাবই দেখা গেলো আমার সহকর্মীদের মধ্যে। এবং এই মনোভাব নিয়েই তাঁরা সেনাবাহিনীকে বিভক্ত করবার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেনাবাহিনী সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত হলো। গোটা বাহিনীর এক-চতুর্থাংশ গেলো পাকিস্তানে এবং তিন-চতুর্থাংশ রইলো ভারতে। বেশীর ভাগ মুসলিম ইউনিট পাকিস্তানের ভাগে পড়লো। হিন্দু ও শিখ ইউনিটগুলো পুরোপুরিভাবে ভারতেই রয়ে গেলো। এর পর থেকেই সেনাবাহিনীর মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করলো। সেনাবাহিনীর ভেতরে কিভাবে সাম্প্রদায়িকতা দ্রুত বিস্তৃত হয়েছিলো তা বুঝতে পারা গেলো ১৫ই আগস্টের পরে। সীমান্তের উভয় দিকে যখন রক্তের বন্যা বইতে লাগলো, সৈনিকেরা তখন কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে সেই অমানুষিক দৃশ্য দেখতে লাগলো। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণও করলো।

সেই সময়কার অবস্থা দেখে লর্ড মাউন্টব্যাটেন আমার কাছে দুঃখ করে বলেছিলেন, হিন্দু সৈনিকরা পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলমানদের হত্যা করতে সচেষ্ট হয়েছিলো, কিন্তু ইংরেজ অফিসাররা অনেক চেষ্টায় তাদের নিরস্ত করে রাখতে সমর্থ হন। এটা কিন্তু লর্ড মাউন্টব্যাটেন ইংরেজ অফিসারদের প্রশংসা করলেও আমি তাঁর কথা ধ্রুবসত্য বলে মেনে নিতে পারিনি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যে সেনাবাহিনী অবিভক্ত থাকাকালেও তার কিছু কিছু অংশ পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখদের এবং ভারতে মুসলমানদের হত্যা করেছিলো এবং সে কাজ তারা করেছিলো ইংরেজ অফিসারদের জ্ঞাতসারেই। ভারতীয় বাহিনীর গৌরবময় ঐতিহ্য এইভাবেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিলো এবং কিছুদিন আগে পর্যন্ত সৈনিকদের মধ্যে যে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব বিদ্যমান

ছিলো, সাম্প্রদায়িকতার বিষে তা জর্জরিত হয়ে গিয়েছিলো।

আমি তখন আরো বলেছিলাম যে রাজনৈতিক কারণে আমরা দেশ-বিভাগ মেনে নিতে বাধ্য হলেও সরকারী কর্মচারীদের বিশেষ করে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের তাঁদের নিজ নিজ অঞ্চল থেকে সরিয়ে আনবার কোনো কারণ নেই। আমার মতে তাঁদের নিজ নিজ প্রদেশে রাখাই উচিত ছিলো। অর্থাৎ পশ্চিম পাঞ্জাব, হিন্দু অথবা পূর্ববঙ্গের অফিসাররা যে সম্প্রদায়ের লোকই হোন না কেন, তাঁদের পাকিস্তানেই রাখা উচিত এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অফিসাররা হিন্দু অথবা মুসলমান যাই হোন না কেন, তাঁদের ভারতেই রাখা উচিত। আমি এই অভিমত পোষণ করতাম কারণ তাঁরা যদি নিদেনপক্ষে সরকারী কর্মচারীদেরও সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত রাখতে পারতেন তাহলে উভয় রাষ্ট্রেই অসাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার সৃষ্টি হতো। কিন্তু দুঃখের কথা এই আমার কথামতো কাজ হয়নি। এ ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তা হলো সরকারী কর্মচারীরা কোন্ রাষ্ট্রে থাকবেন তা তাঁরা নিজেরাই স্থির করবেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে হিন্দু এবং শিখ কর্মচারীরা ভারতে আসতে চাইলেন এবং মুসলমান কর্মচারীরা পাকিস্তানে যেতে চাইলেন।

এই বিষয় নিয়ে আমি তখন লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গেও আলোচনা করেছিলাম। সেনাবাহিনী ও সরকারী কর্মচারীদের সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত করলে তার ফলাফল যে বিপজ্জনক হতে পারে সে কথাও তাঁকে বলেছিলাম। লর্ড মাউন্টব্যাটেনও এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত হন এবং আমার কথামতো কাজ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু সেনাবাহিনীর ব্যাপারে তিনি কিছুই করতে পারেননি। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের হস্তক্ষেপে অসামরিক কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পূর্ব-গৃহীত সিদ্ধান্তের কিছু পরিবর্তন করা হয়। স্থির হয় যে সরকারী কর্মচারীরা কোনো রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে অথবা অস্থায়ী-ভাবে থাকতে চাইলে তাঁদের অভিমত কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়ে দেবেন। স্থায়ীভাবে যাঁরা থাকতে চান তাঁদের সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু যাঁরা অস্থায়ীভাবে থাকার সিদ্ধান্ত জানাবেন তাঁদের সম্বন্ধে স্থির হয় ছ মাস পরে তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারবেন। উভয় রাষ্ট্রই স্বীকার করে নেয় পরবর্তীকালে যেসব কর্মচারী তাঁদের কর্মস্থল পরিবর্তন করে অপর রাষ্ট্রে যেতে চাইবেন তাঁদের সে সুযোগ দেওয়া হবে এবং পূর্বে তাঁরা যে যে পদে এবং যত বেতনে নিযুক্ত ছিলেন সেই সেই পদে অথবা তার অনু-রূপ পদে সেই সেই বেতনেই নিযুক্ত করা হবে এবং তাঁদের চাকরির ধারা-

বাহিকতাও রক্ষা করা হবে। কিন্তু এইসব কর্মচারীদের তখন এ কথা বলা হলেও পরবর্তীকালে (অর্থাৎ এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে গেলে) তাঁদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা হয়নি।

এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সরকারী কর্মচারীদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারেও মুসলিম লীগ মূর্খের মতো এবং অন্ধভাবে কাজ করে। লীগের নেতারা সমস্ত মুসলমান কর্মচারীকে ভারত ত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে যাবার জন্য উস্কানি দেন। সে সময় কেন্দ্রীয় সরকারের সদরদপ্তরে অনেক মুসলমান কর্মচারী গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন মুসলিম লীগ তাঁদের সবাইকে পাকিস্তানে চলে যাবার জন্য চাপ দেয়। লীগের এই চাপ সত্ত্বেও যেসব মুসলমান অফিসার তাঁদের নিজ নিজ পদে থাকতে চান তাঁদের এই বলে ভয় দেখানো হয় কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে তাঁদের অবস্থা রীতিমতো সঙ্গীন হয়ে পড়বে। মুসলিম অফিসারদের মধ্যে এই ধরনের গুজব সৃষ্টি হয়েছে জানতে পেরে আমি ভারত সরকারকে এ ব্যাপারে তার বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে বলবার জন্য চাপ দিই। লর্ড মাউন্টব্যাটেন এবং জওহরলাল উভয়েই আমার কথা মেনে নেন এবং একটি সার্কুলার জারি করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত কর্মচারীদের আশ্বাস দেন তাঁরা যদি ভারতে থাকতে চান তাহলে তাঁদের পদ ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং সর্বদা তাঁদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা হবে।

এই সার্কুলার প্রচারিত হবার ফলে কেন্দ্রীয় দপ্তরের মুসলমান অফিসারদের মনে নিরাপত্তার ভাব জেগে ওঠে এবং অনেক অফিসারই তখন ভারতে থাকবেন বলে স্থির করেন। এদিকে মুসলিম লীগের নেতারা যখন এই বিষয়টি জানতে পারেন তখন তাঁরা সেইসব মুসলমান অফিসারদের মনে নানাভাবে ভীতির সঞ্চার করতে শুরু করেন। এই অফিসারেরা আগে থেকেই তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছিলেন। এবার তাঁদের এই বলে ভয় দেখানো হতে লাগলো তাঁরা যদি ভারতে থাকেন তাহলে মুসলিম লীগ এবং পাকিস্তান সরকার তাঁদের শত্রু হিসেবে গণ্য করে শত্রুর মতো ব্যবহার করবে।

এইসব অফিসারদের মধ্যে এমনও অনেকে ছিলেন যাঁদের পৈতৃক বাসস্থান পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাঁরা যখন বুঝতে পারলেন মুসলিম লীগের পাণ্ডারা তাঁদের পাকিস্তানের ধনসম্পত্তি এবং আত্মীয়স্বজনের ওপরে প্রতিশোধ নিতে পারে তখন তাঁরা রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। আমার নিজের মন্ত্রকেও কয়েকজন উচ্চপদস্থ মুসলমান অফিসার ছিলেন। তাঁরা

আমার কথায় নিশ্চিন্ত হয়ে ভারতে থাকবেন বলে স্থির করেছিলেন। কিন্তু মুসলিম লীগ তাঁদের পাকিস্তানের সম্পত্তি এবং আত্মীয়স্বজনদের ওপর প্রতিশোধ নেবে বুঝতে পেরে রীতিমতো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন আমার কাছে এসে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, আমরা ভারতে থাকবো বলেই স্থির করেছিলাম কিন্তু মুসলিম লীগ এখন যেভাবে ভীতি প্রদর্শন করছে তাতে এখানে থাকা আর সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের পরিবার এবং আত্মীয়স্বজন রয়েছে পশ্চিম পাঞ্জাবে। আমরা তাদের অত্যাচারিত হতে দিতে পারি না। সুতরাং বাধ্য হয়ে আমাদের এখন পূর্ব-সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে পাকিস্তানে যাবার জন্য নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে।

মুসলিম লীগ কর্তৃক মুসলমান অফিসারদের এইভাবে ভারত থেকে তাড়িয়ে পাকিস্তানে নিয়ে যাবার কাজটি শুধু মূর্খের মতোই ছিল না, এটা বিপজ্জনকও ছিলো। প্রকৃতপক্ষে ভারতের মুসলমানদেরই এতে বিপদাপন্ন করা হয়েছিলো। দেশবিভাগ যখন মেনে নেওয়া হয়েছে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে তখন নবগঠিত রাষ্ট্রে মুসলমানরাও যে সব রকম সুযোগ-সুবিধে পাবেন তাতে কোনোই সন্দেহ থাকার কথা নয়। এর ওপর যদি কিছুসংখ্যক মুসলমান সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত থাকেন তাহলে তাঁরা যে শুধু ব্যক্তিগতভাবেই সুযোগ-সুবিধে ভোগ করবেন তাই নয়, সরকারী দপ্তরে তাঁদের পদাধিকারের কল্যাণে সামগ্রিকভাবে মুসলমান সমাজও নিরাপদ বোধ করবেন এবং তাঁদের মন থেকে ভীতি দূর হবে। মুসলিম লীগ কিরকম মূর্খের মতো দেশবিভাগের জন্য বায়না ধরেছিলো সে কথা আগেই বলেছি। এবার মুসলমান অফিসারদের প্রতি লীগ যেরকম ব্যবহার করছে তাতে তাদের মূর্খামি আর একবার প্রকটিত হলো।

আমরা লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে মনোনীত করলাম

আলোচনায় স্থির হয়, ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট ভারত ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হবে। মুসলিম লীগ সিদ্ধান্ত নেয়, পাকিস্তান ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হবে একদিন আগে অর্থাৎ ১৪ই আগস্ট তারিখে। এই বিষয়েও দুঃখজনক একটি ঘটনা ঘটে। ব্রিটিশ কমনওয়েলথে এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিলো যে ডোমিনিয়নগুলো তাদের নিজস্ব গভর্নর জেনারেল মনোনীত করতে পারবে। এই পদ্ধতি অনুসারে

আমরা একজন ভারতীয়কে গভর্নর জেনারেল মনোনীত করতে পারতাম। কিন্তু আমরা স্থির করি, এ ব্যাপারে হঠাৎ কোনোরকম পরিবর্তন ঘটানো ঠিক হবে না। আমরা মনে করি, লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে যদি এই পদে আরো কিছুদিন রাখা যায় তাহলে তিনি সুষ্ঠুভাবে সরকারী নীতি প্রয়োগ করে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারবেন। আমরা আরো মনে করি, প্রাথমিক স্তরে উভয় ডোমিনিয়নে একই ব্যক্তি গভর্নর জেনারেল থাকলে ভালো হয়। এ ব্যাপারে পরিবর্তন যদি কিছু করতেই হয় তা করা যাবে পরবর্তীকালে। আমরা মনে করেছিলাম পাকিস্তানও এ প্রস্তাব মেনে নেবে।

আমরা তাই লর্ড মাউন্টব্যাটেনকেই ভারত ডোমিনিয়নের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসেবে মেনে নিই ও সেইভাবেই ঘোষণা প্রচার করি। আমরা আশা করেছিলাম মুসলিম লীগও এইরকম সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে লীগ আমাদের বিস্মিত করে ঘোষণা করে মিঃ জিন্না হবেন পাকিস্তান ডোমিনিয়নের প্রথম গভর্নর জেনারেল। লর্ড মাউন্টব্যাটেন যখন লীগের এই সিদ্ধান্তের কথা জানতে পারেন তখন তিনি আমাদের বলেন লীগের সিদ্ধান্তের ফলে সমগ্র পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়ে গেছে; সুতরাং আমরাও যেন আমাদের পূর্ব-সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে একজন ভারতীয়কে গভর্নর জেনারেল মনোনীত করি। আমরা এর কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনি। সুতরাং আমরা আর একবার ঘোষণা করি, লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেনই হবেন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল।

বিভক্ত ভারত

এবার কাহিনীর শেষ অধ্যায়ে এসে পড়েছি। ১৯৪৭-এর ১৪ই আগস্ট লর্ড মাউন্টব্যাটেন পাকিস্তান ডোমিনিয়নের উদ্বোধন করতে করাচিতে যান। করাচি থেকে তিনি ফিরে আসেন পরদিন বেলা বারোটায়। ওই দিনই অর্থাৎ ১৫ই আগস্ট রাত বারোটায় ভারত ডোমিনিয়ন জন্মলাভ করে।

দেশ স্বাধীন হলো। কিন্তু স্বাধীনতার আনন্দ ও জয়ের গৌরব উপভোগ করবার আগেই জনসাধারণ ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেলো নবলব্ধ স্বাধীনতা তাদের মাথায় এক বিরাট দুঃখের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। একই কথা আমাদেরও মনে হয়। আমরাও বুঝতে পারি, স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ

করবার আগে আমাদের সুদীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হবে।

কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়েই দেশবিভাগ মেনে নিয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয়, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে দেশের সমগ্র জনসাধারণই এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছে। কংগ্রেস সমগ্র জাতির প্রতিনিধি এবং মুসলিম লীগের পেছনেও বিরাট-সংখ্যক মুসলমানের সমর্থন ছিলো। এই কারণেই ধরে নেওয়া হয়েছিলো, দেশের জনসাধারণ দেশবিভাগ মেনে নিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ছিলো সম্পূর্ণ আলাদা। দেশবিভাগের অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে আমরা যখন দেশের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করি তখনই আমরা বুঝতে পারি, এটা শুধু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবের মধ্যে এবং মুসলিম লীগের খাতাপত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে, ভারতের জনসাধারণ দেশবিভাগ সমর্থন করেনি। প্রকৃত ব্যাপার হলো, জনগণের হৃদয় ও মন এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। আগেই বলেছি, মুসলিম লীগ ভারতের বিরাটসংখ্যক মুসলমানের সমর্থন লাভ করেছিলো। কিন্তু মুসলমান-দের মধ্যে আরো একটি বড় অংশ প্রথম থেকেই লীগের বিরোধিতা করে এসেছে। দেশবিভাগের সিদ্ধান্তের ফলে এঁদের অবস্থা রীতিমতো গুরুতর হয়ে ওঠে। হিন্দু এবং শিখরা প্রথম থেকেই দেশবিভাগের বিরুদ্ধে ছিলো। কংগ্রেস দেশবিভাগ মেনে নিলেও তাদের মন থেকে বিরোধিতা দূর হয়নি। এবার যখন দেশবিভাগ বাস্তব ঘটনায় পরিণত হয়েছে তখন এর চেহারা দেখে মুসলিম লীগের কট্টর সমর্থকরাও ভীত হয়ে ওঠেন। তাঁরা তখন প্রকাশ্যেই বলতে থাকেন, এরকম দেশবিভাগ তো আমরা চাইনি।

আজ দশ বছর বাদে সে সময়কার সেই পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে বসে আমি দেখতে পাচ্ছি, সে সময় আমি যে কথা বলেছিলাম সেই কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমি তখন সুস্পষ্টভাবেই বুঝতে পেরেছিলাম কংগ্রেসের নেতারা খোলা মন নিয়ে দেশবিভাগ মেনে নেননি। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ রাগের বশে এবং কেউ কেউ হতাশার মনোভাব নিয়ে এই ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছিলেন। লোকে যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে অথবা উত্ত্যক্ত কিংবা ভীত হয়ে কোনো কাজ করে তখন তারা সে কাজের ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্বন্ধে সঠিকভাবে বিচার-বিবেচনা করতে পারে না। সুতরাং যাঁরা সেদিন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে দেশবিভাগের কথা বলেছিলেন, তাঁরা তখন এর ভবিষ্যৎ ফলাফলের কথা অনুধাবন করতে সক্ষম হননি।

কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে দেশবিভাগের সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিলেন

সর্দার প্যাটেল। কিন্তু তিনিও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন না যে এর দ্বারা ভারতের সব সমস্যার সমাধান হবে। তিনি দেশবিভাগের কথা বলেছিলেন চরম উত্ত্যক্ত হয়ে এবং আত্মসম্মানে আঘাত পেয়ে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে তাঁর প্রতিটি কাজে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ভেটো প্রয়োগ করায় তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিলো। তিনি তাই ক্রোধান্বিত হয়ে মনে করেছিলেন দেশবিভাগ মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। তিনি আরো মনে করেছিলেন পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলেও তা বেশিদিন টিকতে পারবে না। সুতরাং দেশবিভাগ মেনে নিলে তার বিষক্রিয়া মুসলিম লীগ হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে যাবে। তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিলো যে অল্পদিনের মধ্যেই পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাবে এবং যেসব প্রদেশ পাকিস্তানে যাবে সেগুলো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়বে।

দেশবিভাগের ব্যাপারে জনসাধারণের মনোভাব কিরকম ছিলো তা বুঝতে পারা যায় ১৪ই আগস্ট। সেদিনটি ছিলো পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্বোধন দিবস। জনসাধারণ যদি খুশি মনে দেশবিভাগ মেনে নিতো তাহলে পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ এবং বাংলার হিন্দু ও শিখরা মুসলমানদের মতোই আনন্দিত হতেন। কিন্তু ওইসব প্রদেশ থেকে যেসব খবর আমাদের কাছে আসতে থাকে তা থেকে আমরা বুঝতে পারি জনসাধারণ দেশবিভাগ মেনে নিয়েছে বলে কংগ্রেস যা ধরে নিয়েছিলো তা নিতান্তই ভিত্তিহীন।

১৪ই আগস্ট তারিখটি পাকিস্তানের মুসলমানদের আনন্দের দিন হলেও হিন্দু ও শিখদের কাছে ওটি ছিলো শোকের দিন। এই মনোভাব শুধু যে সাধারণ মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো তাই নয়, কংগ্রেসের অনেক নেতাও এই মনোভাবই পোষণ করতেন। সে সময় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন আচার্য কৃপালনী। তিনি ছিলেন সিন্ধু প্রদেশের অধিবাসী। ১৪ই আগস্ট তিনি এক বিবৃতি প্রচার করে বলেন, ওই দিনটি হলো ভারত ধ্বংস-কারী শোক-দিবস। পাকিস্তানের হিন্দু ও শিখরাও প্রকাশ্যেই এইরকম মনো-ভাব ব্যক্ত করতেন। এটা একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি। কারণ ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান দেশবিভাগ মেনে নিলেও সমগ্র জাতি এতে শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো।

এই প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, দেশবিভাগ যদি দেশের জন-সাধারণের মনে এতোই ক্রোধ ও ক্ষোভের সঞ্চার করেছিলো তাহলে তাঁরা

কেন তা মেনে নিলেন ? কেন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়নি ? তাছাড়া যে বিষয়কে সবাই অন্যায় বলে মনে করেছিলো তা গ্রহণ করবার জন্য তাড়াহুড়োই বা কেন করা হয়েছিলো ? ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ বিভক্ত হবে এবং স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আগেই ঘোষণা করা হয়েছিলো। সুতরাং তা যদি প্রকৃত সমস্যার সমাধান করতে পারবে না বলে বিবেচিত হয়েছিলো তাহলে সেই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত কেন নেওয়া হয়েছিলো এবং কেনই বা পরবর্তীকালে তা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছিলো ? আমি বারবার বলেছি, প্রকৃত সমাধানের পথ খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন ছিলো। এবং সেজন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টারও ক্রটি করিনি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার সহকর্মী ও বন্ধুরা তখন আমাকে আদৌ সমর্থন করেননি। কেন তাঁরা বাস্তব ঘটনাবলীর প্রতি অন্ধ হয়ে ছিলেন তার একমাত্র ব্যাখ্যা হলো ক্রোধ এবং হতাশা তাঁদের দৃষ্টিশক্তিকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। তাছাড়া ভারতের স্বাধীনতার জন্য ১৫ই আগস্ট তারিখটি নির্দিষ্ট হবার ফলে তাঁদের মনে যে আনন্দের সঞ্চার হয়েছিলো তার ফলে তাঁরা একেবারে মন্ত্রমুগ্ধের মতো হয়ে পড়েছিলেন। এবং এই কারণেই তাঁরা লর্ড মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন।

ব্যাপারটি যেন মিলনান্ত এবং বিয়োগান্ত ঘটনার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ হিসেবে দেখা দিয়েছিলো। দেশবিভাগের পরে মুসলিম লীগের যেসব নেতা ভারতে থেকে যেতে বাধ্য হলেন তাঁদের অবস্থা রীতিমতো হাস্যাস্পদ হয়ে পড়ে। জিন্না সাহেব করাচি চলে যান এবং ভারত ত্যাগের প্রাক্‌কালে তাঁর ভারতীয় অনুগামীদের প্রতি এক ফতোয়া জারি করে যান যে এখন থেকে তাঁরা যেন ভারতের সু-নাগরিক হিসেবে ভারতেই বসবাস করেন। জিন্না সাহেবের এই বিদায়-বাণী তাঁদের মনে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। এঁদের মধ্যে অনেকে ১৪ই আগস্টের পরে আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং ক্রোধ ও ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, জিন্না বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁদের গভীর গাড্ডায় ফেলে রেখে গেছেন।

জিন্নার প্রতি তাঁদের ক্রোধের কারণ প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি। জিন্না কিভাবে তাঁদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন সে কথাও আমি বুঝতে পারিনি। তিনি তো প্রকাশ্যেই দেশবিভাগের দাবি তুলেছিলেন, এবং এ কথাও প্রকাশ্যেই বলেছিলেন যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো নিয়েই পাকিস্তান গঠন করা হবে, সুতরাং ওই ভদ্রলোকদের বক্তব্য আমাকে

রীতিমতো বিস্মিত করে। এবারে যখন দেশবিভাগের পরিকল্পনাটি বাস্তবে পরিণত হয়েছে এবং পাকিস্তান গঠিত হয়েছে তখন মুসলিম লীগের এইসব পাণ্ডারা হঠাৎ জিন্না সাহেবকে বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করছেন। ব্যাপারটি সত্যিই হতবুদ্ধিকর।

কিন্তু তাঁদের সঙ্গে কথা বলে আমি তাঁদের এই মনোভাবের কারণ বুঝতে পারি। ওইসব লীগপন্থী নেতারা মনে মনে পাকিস্তানের যে চিত্র এঁকেছিলেন বাস্তবক্ষেত্রে তা না হওয়াতেই তাঁদের এই ক্ষোভ। পাকিস্তানের আসল চিত্র এবং পাকিস্তান গঠিত হলে যেসব অসুবিধে দেখা দেবে তা তাঁরা আগে ভাবতেই চাননি। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হলে যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেগুলো যে ভারতেই থেকে যাবে এ তো জানা কথা। উত্তর প্রদেশে এবং বিহারে মুসলমানরা সংখ্যালঘু, সুতরাং এও জানা কথা দেশবিভাগের পরে ও দুটি প্রদেশ ভারতেই থেকে যাবে। কিন্তু তা সত্বেও লীগের ওইসব পাণ্ডা মূর্খের মতো ভেবে নিয়েছিলেন পাকিস্তান কায়েম হলে সমগ্র মুসলমান সমাজ একটা আলাদা জাতি হিসাবে গণ্য হবেন এবং নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করবেন। এরপর যখন মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলো ভারতের বাইরে চলে গেলো, বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত হলো এবং জিন্না সাহেব করাচিতে চলে গেলেন তখন ওই-সব নেতৃস্থানীয় লীগপন্থীরা দেখতে পেলেন তাঁদের পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে গেছে। এই কারণেই জিন্না সাহেবের বিদায়বাণীকে তাঁরা গোদের ওপর বিষফোঁড়া হিসেবে মনে করলেন। ওঁরা আরো বুঝতে পারলেন দেশবিভাগের ফলে ওঁরা আগের চেয়েও দুর্বল হয়ে পড়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের আগেকার কাজকর্মের ফলে হিন্দু সমাজকেও তাঁরা শত্রু করেছেন।

মুসলিম লীগের ওইসব নেতা তখন বার বার বলতে থাকেন তাঁরা এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুসমাজের দয়ার পাত্র হয়ে পড়েছেন। আগে তাঁরা যেভাবে হিন্দুদের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন তার ফলে এখন তাঁদের অবস্থা রীতিমতো গুরুতর হয়ে পড়েছে। আমি তখন মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেছিলাম সেই কথা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিই। ১৯৪৬ সনের ১৫ই এপ্রিল এক বিবৃতির মাধ্যমে আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভারতীয় মুসলমানদের সাবধান করে বলেছিলাম পাকিস্তান যদি সত্যিই গঠিত হয় তাহলে তাঁরা ঘুম ভেঙে দেখতে পাবেন বেশির ভাগ মুসলমান পাকিস্তানে

চলে গেলেও ভারতে যাঁরা থেকে যাবেন তাঁদের থাকতে হবে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে।

১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট

স্বাধীনতা উৎসব যাতে যথোপযুক্তভাবে অনুষ্ঠিত হয় সেই উদ্দেশ্যে ১৫ই আগস্টের জন্য এক বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। কথা হয় যে ওইদিন গভীর রাত্রে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে এবং সেই অধিবেশনেই ভারতকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হবে। পরদিন সকাল নটায় আবার পরিষদের অধিবেশন বসবে এবং সে অধিবেশনে লর্ড মাউন্টব্যাটেন উদ্বোধনী ভাষণ দেবেন। বলা বাহুল্য, এই পরিকল্পনা অনুসারেই কাজ হয়। সারা শহর সেদিন আনন্দে এমনই উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলো যে জনসাধারণ দেশবিভাগজনিত শোকও সাময়িকভাবে বিস্মৃত হয়েছিলেন। শহর এবং শহরতলী থেকে লক্ষ লক্ষ নরনারী স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দেবার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হয়েছিলেন। কথা হয়েছিলো বেলা চারটের সময় স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। তাই প্রচণ্ড দাবদাহ অগ্রাহ্য করে লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছিলেন। জনতা এতো বিশাল ছিলো যে লর্ড মাউন্টব্যাটেন তাঁর গাড়ি থেকে নামতেই পারেননি। গাড়ির ওপর দাঁড়িয়েই তিনি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন।

সেদিন জনগণের আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রায় বিকারের পর্যায়ে এসে গিয়েছিলো। কিন্তু সে আনন্দ আটচল্লিশ ঘণ্টাও স্থায়ী হলো না। ঠিক তার পরদিনই বিভিন্ন স্থানে হানাহানির সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় রাজধানীর বুকে বিষাদের ছায়া নেমে এলো। শহরের বুকে ছড়িয়ে পড়লো হত্যা, মৃত্যু এবং নৃশংসতার হৃদয়-বিদারক সংবাদ। সংবাদে জানা গেলো, পূর্ব পাঞ্জাবে হিন্দু ও শিখরা দল-বদ্ধভাবে মুসলমান মহল্লাগুলোর ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। তারা বহুসংখ্যক গৃহে অগ্নিসংযোগ করেছে এবং শত শত নিরপরাধ নরনারী ও শিশুকে হত্যা করেছে। পশ্চিম পাঞ্জাব থেকেও একই ধরনের সংবাদ পাওয়া গেলো। সেখানে মুসলমানরা নির্বিচারে হিন্দু ও শিখ নরনারী ও শিশুদের হত্যা করেছে। পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় পাঞ্জাবেই পাইকিরি হারে ধ্বংস এবং হত্যা-কাণ্ড চলছে। ব্যাপার গুরুতর দেখে পূর্ব পাঞ্জাব থেকে একের পর এক মন্ত্রী

দিল্লীতে ছুটে আসছেন। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস নেতারাও আসতে লাগলেন। ঘটনার ভয়াবহতা দেখে তাঁরা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। চরম হতাশা প্রকাশ করে তাঁরা বলেছিলেন এই হত্যাকাণ্ড কিছুতেই থামানো যাবে না। আমরা তাঁদের বলি তাঁরা সেনাবাহিনীকে আহ্বান করেননি কেন? আমাদের প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বলেন পূর্ব পাঞ্জাবে যে সেনাবাহিনী রয়েছে তার ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করা যাচ্ছে না এবং তাদের কাছ থেকে কোনোরকম সাহায্য পাবার কথাও চিন্তা করা যায় না। তাঁরা দিল্লী থেকে সেনাবাহিনী পাঠাবার কথা বলেন।

প্রথম দিকে দিল্লীতে কোনো দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়নি; কিন্তু সারা দেশ জুড়ে যেভাবে দাঙ্গা শুরু হয়েছিলো তাতে দিল্লীতেও যে-কোনো সময়ে দাঙ্গা শুরু হয়ে যেতে পারে। সুতরাং দিল্লীতে যে ক্ষুদ্রায়তন রিজার্ভ বাহিনী ছিলো সে বাহিনীকে দিল্লীর বাইরে পাঠানো যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হয়নি। আমরা তাই অন্য প্রদেশ থেকে সেনাবাহিনী এনে পূর্ব পাঞ্জাবে পাঠাবো বলে স্থির করি। কিন্তু সেই বাহিনী পৌঁছবার আগেই রাজধানীতে দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আগত হৃতসর্বস্ব উদ্বাস্তু নরনারীর কাছ থেকে সেখানকার মর্মন্তুদ ঘটনাবলীর সংবাদ দিল্লীর হিন্দুদের মধ্যে প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লী শহরেও হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে যায়। দিল্লীর সেই দাঙ্গা শুধু উদ্বাস্তু এবং সাধারণ মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না; সরকারী কর্মচারীদের বাসভবনগুলোও আক্রান্ত হতে থাকে। পশ্চিম পাঞ্জাবের গণ-হত্যার সংবাদ দিল্লীতে প্রচারিত হবার পরেই দিল্লীর গুণ্ডাশ্রেণীর লোকেরা মুসলমানদের মহল্লাগুলোতে আক্রমণ শুরু করে। দিল্লীর সেই হত্যালীলার নেতৃত্ব দেয় কিছুসংখ্যক শিখ।

এক রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের জামীন হিসাবে বিবেচনা করবার মারাত্মক মনোবৃত্তির কথা জেনে আমি কতোটা উদ্বেগ বোধ করেছিলাম সেকথা আগেই বলেছি। দিল্লীতে এবার সেই মনোবৃত্তিই নগ্নভাবে প্রকটিত হলো। পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলমানরা যদি ওখানকার হিন্দু ও শিখদের ওপরে নির্যাতন করে থাকে তার জন্য দিল্লীর নিরীহ মুসলমানদের দায়ী করা হবে কেন, এবং তাদের ওপরে প্রতিশোধই বা নেওয়া হবে কেন? এই তত্ত্বটি এমনই মারাত্মক ও সাংঘাতিক যে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কোনো ব্যক্তিই তা মেনে নিতে পারে না।

সেনাবাহিনীর মতিগতিও রীতিমতো দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে। দেশ-

বিভাগের আগে সেনাবাহিনীর সভ্যদের মধ্যে কোনোরকম সাম্প্রদায়িক মনোভাব বিদ্যমান ছিলো না। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশ এবং সেনাবাহিনী বিভক্ত হবার পরে সেনাবাহিনীর ভেতরেও সাম্প্রদায়িক মনো-ভাব ছড়িয়ে পড়ে। দিল্লীতে তখন যে সেনাবাহিনী উপস্থিত ছিলো তার বেশির ভাগ সৈনিকই ছিলো হিন্দু ও শিখ। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারা গেলো দিল্লীর আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ওদের হাতে ছেড়ে দেওয়া চলবে না। আমরা তাই দক্ষিণ ভারত থেকে সেনাবাহিনী আমদানি করবো বলে স্থির করি। দেশবিভাগের ফলে দক্ষিণ ভারতে কোনোরকম প্রতিক্রিয়া হয়নি, এবং সেই কারণে ওখানকার সেনাবাহিনীর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করেনি। তাই দক্ষিণ ভারতের সেনাবাহিনীকে যখন দিল্লীতে নিয়ে আসা হয় তখন তারা খুব ভালোভাবেই রাজধানীর পরিস্থিতির মোকা-বিলা করে।

দিল্লীর মূল শহরাঞ্চল বাদে কেরলবাগ, লোদী কলোনী, সব্জীমণ্ডি এবং সদর বাজার প্রভৃতি উপকণ্ঠ অঞ্চলগুলোতে বহুসংখ্যক মুসলমান বাস করতেন। ওইসব অঞ্চলে জীবন ও ধনসম্পত্তি মোটেই নিরাপদ ছিলো না। কিন্তু তৎকালীন অবস্থায় সেনাবাহিনীর সাহায্যে তাঁদের রক্ষা করবার মতো ব্যবস্থা অবলম্বন করাও সম্ভব ছিলো না। ওখানে তখন এমন এক অবস্থা বিরাজ করছিলো যে মুসলমানরা রাত্রে ঘুমোবার সময় পরদিন জীবিত অবস্থায় শয্যাত্যাগ করতে পারবেন কিনা সে বিষয়েও তাঁরা সন্দিহান ছিলেন।

সেই অগ্নিকাণ্ড, নরহত্যা এবং দাঙ্গার সময় আমি সামরিক অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে দিল্লীর বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করি। আমি লক্ষ্য করি, মুসল-মানরা তাঁদের মনোবল হারিয়ে চরম হতাশার মধ্যে বাস করছিলেন। বহু মুসলমান আমার বাড়িতে আশ্রয় চান। তাঁদের মধ্যে ধনী এবং খ্যাত-নামা লোকও অনেক ছিলেন। কিন্তু তাঁদের তখন পরনের জামা-কাপড় ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না। কেউ কেউ আবার দিনের আলোয় ঘর থেকে বেরুতেই সাহস পাচ্ছিলেন না। তাঁদের সেনাবাহিনীর প্রহরায় গভীর রাত্রে অথবা পরদিন ভোরে আমার বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছিলো। দেখতে দেখতে আমার বাড়িটা সর্বহারা উদ্বাস্তুতে ভরতি হয়ে গেলো। কিন্তু তখনো সবাইকে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব হয়নি। ব্যাপার দেখে আমি আমার বাড়ির কম্পাউণ্ডে অনেকগুলো তাঁবু খাটিয়ে দিই। ধনী দরিদ্র, যুবক বৃদ্ধ, নরনারী

নির্বিশেষে বহুসংখ্যক মানুষ প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পশুর মতো বসবাস করতে বাধ্য হন।

শীগগিরই বুঝতে পারা যায় শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে বেশ কিছুদিন বিলম্ব হবে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় ইতস্তত-বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত বাড়িগুলো রক্ষা করাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এক অঞ্চলে রক্ষী মোতায়েন করলে অন্য অঞ্চলে হাঙ্গামা শুরু হতে থাকে। আমরা তাই স্থির করি মুসলমানদের কয়েকটি সুরক্ষিত জায়গায় আশ্রয় দিতে হবে। একটি আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করা হয় পুরনো কিল্লায়। ওখানে তখন কোনো দালান ছিলো না। থাকার মধ্যে ছিলো আস্তাবলের মতো কয়েকটা বস্তিঘর। সেগুলোও ভরতি হয়ে গেলো। বিপুলসংখ্যক মুসলমান সারাটা শীতকাল সেই বস্তিতে কাটাতে বাধ্য হন।

শান্তি ফিরিয়ে আনতে এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দিল্লীতে তখন কয়েকজন স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়। আজ আমি দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, ওইসব ম্যাজিস্ট্রেটের মনোনয়ন সর্বক্ষেত্রে সুষ্ঠু হয়নি। ওঁদের মধ্যে কয়েকজন যথাযথভাবে কর্তব্য পালন করেননি। একজনের কথা আজও আমার মনে আছে। কংগ্রেসের একজন হিন্দু সদস্য তাঁর কাছে মুসলমানদের তরফ থেকে সাহায্য চাইতে এসেছিলেন। তিনি ওই ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেন, একটা মুসলিম মহল্লা আক্রান্ত হবার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় ওখানকার মুসলমান পরিবারগুলো মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে তাঁর কাছে সাহায্য চাইছে। ম্যাজিস্ট্রেট তখন কোনোরকম ব্যবস্থা তো করলেনই না, উপরন্তু সেই কংগ্রেস সদস্যকে তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির জন্য উপহাস করেন। তিনি বলেন, একজন হিন্দু তাঁর কাছে মুসলমানদের পক্ষে ওকালতি করতে এসেছেন দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছেন।

এই ঘটনা থেকেই সে সময়ের অবস্থাটা বুঝতে পারা যায়। কিন্তু কয়েকজন ম্যাজিস্ট্রেট এবং কিছুসংখ্যক কংগ্রেস সদস্য কর্তব্যকার্যে অবহেলা করলেও কয়েকজন ম্যাজিস্ট্রেট এবং বেশীর ভাগ কংগ্রেস সদস্য তখন খুব ভালোভাবেই কাজ করেছিলেন। কংগ্রেসের হিন্দু এবং শিখ সদস্যরা জাতীয়তাবাদী মনোভাব নিয়ে দৃঢ়ভাবে বিপদের মোকাবিলা করবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। নানা মহল থেকে ওঁদের ওপর বিদ্রূপ বর্ষিত হলেও ওঁরা তাতে ভ্রূক্ষেপ করেননি।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন দেশবিভাগের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

বলে আগে আমি তাঁর সমালোচনা করেছি। কিন্তু এবার তিনি যেভাবে দেশের সেই বিপজ্জনক পরিস্থিতির মোকাবিলা করছিলেন তার জন্য এবার আমি তাঁকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাচ্ছি। দেশবিভাগের সময় তিনি অসীম ধৈর্য এবং অদম্য কর্মশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন এবং দ্রুততার সঙ্গে যাবতীয় জটিল সমস্যার সমাধান করেছিলেন। এবার তিনি আরো বেশী ধৈর্য ও কর্মশক্তি নিয়ে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পুনঃসংস্থাপনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সৈনিকের শিক্ষা এ ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করে। সে সময় তাঁর নেতৃত্ব এবং সেনাবিভাগের অভিজ্ঞতা ছাড়া আমরা সেই কঠিন সমস্যার সমাধান করতে পারতাম কিনা সন্দেহ। তিনি সে সময়কার পরিস্থিতিকে যুদ্ধকালীন অবস্থা হিসেবে ধরে নিয়ে কাজে নেমেছিলেন এবং যুদ্ধের সময় যেমন সব কাজ ঘড়ির কাঁটার মতো চলে সেইভাবেই সমস্যাগুলোর সমাধান করেছিলেন। কাজে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি একটি কার্যকরী পরিষদ গঠন করেছিলেন। স্থির হয়েছিলো যে সেই পরিষদ প্রতিটি ঘটনা বিবেচনা করে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কার্যকরী পরিষদ বাদে একটি জরুরী পর্ষদও গঠন করা হয়েছিলো। সেই পর্ষদের সদস্য ছিলেন মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ সামরিক ও অসামরিক কর্মচারী। প্রতিদিন সকালে মন্ত্রি-সভার কক্ষে পর্ষদের অধিবেশন বসতো। সভাপতিত্ব করতেন লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেন স্বয়ং। অধিবেশনে বিগত চব্বিশ ঘন্টার ঘটনাবলী সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। শান্তি স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত সেই পর্ষদ নিয়মিতভাবে কাজ করেছিলো। পর্ষদের কাছে যেসব খবর আসতো তা থেকে পরিস্থিতি কোন্‌দিকে যাচ্ছে তা বুঝতে পারা যেতো।

শাসক হিসাবে জওহরলালের ভূমিকা

প্রকৃত শাসকের একটি প্রধান গুণ হলো তাঁর নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার উর্ধ্বে থেকে দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষার গ্যারান্টি দেওয়া। ১৯৪৬-৪৭-এর বিপজ্জনক দিনগুলোতে জওহরলাল যেভাবে কাজ করেছিলেন তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে প্রকৃত শাসকের যাবতীয় গুণাবলীই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। প্রথম যেদিন তিনি সরকারে যোগদান করেন সেই দিনই তিনি বুঝতে পারেন, রাষ্ট্র শাসনের ব্যাপারে হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীষ্টান পার্শী বৌদ্ধ নির্বিশেষে প্রতিটি ভারতবাসীকেই

সমদৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং আইনের চোখে সবাই সমান অধিকার ও সমান সুযোগ-সুবিধে পাবে।

শাসক হিসেবে জওহরলালের গুণাবলীর পরিচয় সর্বপ্রথম পাওয়া যায় ১৯৪৬ সনে। কলকাতার হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই নোয়াখালিতে দাঙ্গা শুরু হয়। ওখানে হিন্দুরা বিরাটভাবে অত্যাচারিত হতে থাকেন। নোয়াখালির প্রতিশোধ নেওয়া হয় বিহারের মুসলমানদের ওপরে। বিহারের হিন্দুরা ওখানকার মুসলমানদের ওপরে আক্রমণ চালাতে থাকে। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ায় বিহারের প্রাদেশিক সরকার পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সক্ষম না হওয়ায় ভারত সরকারকে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। আমি সে সময় প্রায় দু সপ্তাহ পাটনায় ছিলাম। সেই সময় জওহরলাল যেভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছিলেন এবং বিহারের মুসলমানদের ধনপ্রাণ রক্ষা করেছিলেন তা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমরা প্রত্যেকেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছিলাম কিন্তু এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে আমাদের মধ্যে জওহরলালই সবচেয়ে ভালোভাবে কাজ করেছিলেন।

এই সময় গান্ধীজী অত্যন্ত মানসিক অশান্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। মুসলমানদের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষার জন্য এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের এবং ক্ষোভের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করেন তাঁর প্রচেষ্টা সফল হচ্ছে না। প্রায়শই তিনি জওহরলাল, সর্দার প্যাটেল এবং আমাকে ডেকে পাঠাতেন এবং আমাদের কাছ থেকে শহরের ঘটনাবলীর বিবরণ জানতে চাইতেন। এই সময় তিনি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে আমাদের ভেতরে মতবিরোধ রয়েছে। মতবিরোধ আসলে আমার আর জওহরলালের সঙ্গে সর্দার প্যাটেলের। এর ফলে স্থানীয় শাসনব্যবস্থার ওপরেও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা দু দলে বিভক্ত হয়ে যায় এবং বড় দলটি সর্দার প্যাটেলকে খুশি করবার জন্য তাঁর নির্দেশমতোই কাজ করতে থাকে। সেই দলটি বাদে একটি ক্ষুদ্রতর দল আমার এবং জওহরলালের দিকে তাকিয়ে থাকে। দিল্লীর চীফ কমিশনার খুরশেদ আহ্‌মেদ ছিলেন সাহেবজাদা আফতাব আহ্‌মেদের পুত্র। তিনি কড়া লোক ছিলেন না। তাছাড়া তিনি এমন আশঙ্কাও করতেন, তিনি যদি কোনোরকম কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহলে তাঁকে হয়তো মুসল-

মানতোষণকারী হিসেবে গণ্য করা হবে। এই আশঙ্কার জন্য তিনি শুধু 'দিন-গত পাপক্ষয়' করে চলেন এবং শহরের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার ডেপুটি কমিশনারের ওপরে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন। চীফ কমিশনারের এই-রকম নিষ্ক্রিয়তার ফলে ডেপুটি কমিশনার নিজের ইচ্ছামতো কাজ করতেন। ইনি ছিলেন শিখ সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু শিখ হলেও ইনি মাথায় লম্বা চুল রাখতেন না এবং দাড়ি কামিয়ে ফেলতেন। এর জন্য শিখ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে বিশেষ সুনজরে দেখতেন না। দেশবিভাগের আগে থেকেই তিনি দিল্লীর ডেপুটি কমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৫ই আগস্টের কয়েকদিন আগে কথা উঠেছিলো তাঁকে পূর্ব পাঞ্জাবে বদলি করা হবে। কিন্তু দিল্লীর বহুসংখ্যক নাগরিক এবং বিশেষ করে বহু মুসলমান তাঁকে দিল্লীতে রাখবার জন্য আমাদের কাছে অনুরোধ করেন। তাঁরা বলেন, ইনি একজন নিরপেক্ষ এবং কড়া অফিসার, সুতরাং তৎকালীন পরিস্থিতিতে ওঁকে বদলি করাটা উচিত হবে না।

অতএব ডেপুটি কমিশনারকে দিল্লীতেই রেখে দেওয়া হয়। কিন্তু পাঞ্জাবের ঘটনাবলীর ফলে দিল্লীতেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিস্তারলাভ করায় তিনি আর পূর্বের মতো কড়া মনোভাব এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারছিলেন না। আমার কাছে এমন সব খবর আসতে থাকে যে ইনি সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না। এক বছর আগে তাঁকে দিল্লীতে রাখবার জন্য যেসব মুসলমান তাঁর পক্ষে ওকালতি করতে এসেছিলেন, তাঁরাই আবার আমার কাছে এসে অভিযোগ জানাতে থাকেন দিল্লীর মুসলমান নাগরিকদের রক্ষার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন না। বিষয়টি সর্দার প্যাটেলকে জানানো হয়, কিন্তু তিনি সে কথায় কানই দেন না। সর্দার প্যাটেল ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সুতরাং দিল্লীর শাসনব্যবস্থা সরাসরি তাঁর অধীনেই ছিলো। নরহত্যা এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা বেড়ে চলতে থাকায় গান্ধীজী তাঁকে ডেকে পাঠান এবং পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার জন্য তিনি কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা জানতে চান। সর্দার প্যাটেল তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, তাঁর কাছে যেসব খবর আসছে সেগুলো বিরাটভাবে অতিরঞ্জিত। তিনি এমন কথাও বলেন, মুসলমানদের অভিযোগ করবার মতো কোনো কারণই নেই। একদিনের কথা আমার সুস্পষ্টভাবে মনে আছে। সেদিন আমরা তিনজনে গান্ধীজীর সামনে বসে-ছিলাম। জওহরলাল দুঃখের সঙ্গে বলেন, দিল্লীতে মুসলমানদের যেভাবে

বিড়াল-কুকুরের মতো হত্যা করা হচ্ছে তা তিনি সহ্য করতে পারছেন না। তাদের প্রাণরক্ষা করতে না পেরে তিনি নিজেকে অসহায় এবং উপহাস্যাস্পদ বলে মনে করছেন। দিল্লীতে যেসব হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটছে সে সম্বন্ধে জনসাধারণ তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি তাঁদের কি উত্তর দেবেন! জওহরলাল বার বার বলেন, পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে ওঠায় তিনি মানসিক অশান্তি ভোগ করছেন।

এই সময় সর্দার প্যাটেলের মনোভাব দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই। দিল্লী শহরে যখন প্রকাশ্য দিবালোকে মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছে সেই সময় তিনি অবলীলাক্রমে গান্ধীজীকে বলেন, জওহরলালের অভিযোগগুলোর কোনো ভিত্তি নেই ; এখানে-সেখানে হয়তো দু-চারটে ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু সেগুলো যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে মুসলমানদের ধনপ্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করেছে ; এর চেয়ে বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। আসলে তিনি যা বলতে চান তা হলো, জওহরলাল নিজে প্রধানমন্ত্রী হয়ে নিজের সরকারের বিরুদ্ধেই বিষোদ্গার করছেন।

সর্দার প্যাটেলের কথা শুনে জওহরলাল কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে থাকেন। পরে তিনি হতাশভাবে গান্ধীজীর দিকে তাকিয়ে বলেন, এই যদি সর্দার প্যাটেলের অভিমত হয় তাহলে তাঁর আর কিছু বলবার নেই।

সর্দার প্যাটেলের মন তখন কিভাবে কাজ করছিলো তা আরো একটি ঘটনা থেকে বুঝতে পারা যায়। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন মুসলমানদের ওপরে দিনের পর দিন যেভাবে আক্রমণ চলছে তার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক আজব তত্ত্বের অবতারণা করে বলেন, শহরের মুসলমান মহল্লা থেকে বহুসংখ্যক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে। তাঁর বক্তব্য হলো দিল্লীর মুসলমানরা হিন্দু ও শিখদের ওপরে আক্রমণ চালাবার মতলবেই ওইসব অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছিলো সুতরাং হিন্দু ও শিখরা যদি আগে থেকেই আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করতো তাহলে মুসলমানরা তাদের সমূলে ধ্বংস করে ফেলতো। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পুলিস কেরলবাগ এবং সব্জীমণ্ডি থেকে কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে এনেছিলো। সর্দার প্যাটেলের নির্দেশে সেইসব অস্ত্রশস্ত্র মন্ত্রীদের সভাকক্ষের পাশের ঘরে সাজিয়ে রাখা হয়েছিলো। আমরা যখন দৈনন্দিন সম্মেলনে যোগদান করবার উদ্দেশ্যে সভাকক্ষে যাচ্ছিলাম তখন সর্দার প্যাটেল আমাদের বলেন, সভাকক্ষে যাবার আগে আমরা যেন পাশের ঘরে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্রগুলো

দেখে আসি। সেখানে গিয়ে আমরা দেখতে পাই, অস্ত্রগুলো একটা টেবিলের ওপরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। অস্ত্রগুলো লক্ষ্য করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই, ওখানে কয়েক ডজন রান্নাঘরের উপযোগী মরচে-পড়া ছুরি, কিছু পকেট-ছুরি এবং কিছুসংখ্যক পেনসিল কাটবার ছুরি রয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলোর আবার বাঁট ছিলো না। এগুলো ছাড়া আরো যেসব জিনিস ছিলো সেগুলো হলো কিছুসংখ্যক লোহার গজাল—যেগুলো বেড়া দেবার কাজে দরকার হয় এবং কয়েকটা ঢালাই লোহার জলের পাইপ। সর্দার প্যাটেলের কথায় ওগুলোই হলো মুসলমানদের সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্র যা হিন্দু ও শিখদের সমূলে ধ্বংস করবার জন্য যোগাড় করে রাখা হয়েছিলো। লর্ড মাউন্টব্যাটেন খান-দুয়েক ছুরি হাতে তুলে নিয়ে শ্লেষের সুরে বলেন, এইসব অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যেই তারা দিল্লী শহর দখল করবার মতলব করেছিলো। যুদ্ধের ব্যাপারে তাদের আশ্চর্য উদ্ভাবনী শক্তি দেখা যাচ্ছে।

আগেই বলেছি, শহরের বিরাটসংখ্যক মুসলমান পুরনো কেল্লায় বাস করছিলেন। শীত এসে পড়ায় তাঁদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিলো। তাঁদের মাথার ওপরে কোনোরকম আচ্ছাদন ছিলো না। এর চেয়েও নিদারুণ অবস্থা হলো শৌচাগারের অভাব। একদিন সকালে ডঃ জাকির হোসেন পর্ষদের সামনে সাক্ষ্য দিতে এসে পুরনো কিল্লার অব্যবস্থার কথা বর্ণনা করেন। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেন, হতভাগ্য মানুষদের মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে এনে জীবিত অবস্থায় কবর দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথা শুনে পর্ষদ আমাকে পুরনো কিল্লা পরিদর্শন করে সেখানকার অবস্থা সম্বন্ধে সব কথা জানাতে বলেন। আমি সেইদিনই ওখানে গিয়ে সরেজমিনে সব কিছু দেখে আসি। পরবর্তী বৈঠকের দিন পর্ষদ অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। সেনাবিভাগকে যতগুলো সম্ভব তাঁবু ধার হিসেবে দিতে বলা হয়, যাতে হতভাগ্য মানুষগুলো অন্তত ছাউনির নিচে মাথা গুঁজে থাকতে পারে।

গান্ধীজী অনশনের সিদ্ধান্ত নিলেন

গান্ধীজীর মানসিক অশান্তি দিনের পর দিন বেড়েই চলেছিলো। একসময় তাঁর সামান্যতম ইচ্ছাকে পূরণ করবার জন্যও সমগ্র জাতি উন্মুখ হয়ে থাকতো কিন্তু এখন তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধেও কেউ কর্ণপাত করছিলো না। ব্যাপারটি

অসহনীয় হয়ে উঠলে তিনি আমাকে ডেকে পাঠান। আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, এখন তাঁর সামনে একটিমাত্র পথই খোলা আছে এবং তা হলো অনশন। দিল্লীতে শান্তি স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি অনশন করার কথা ভাবছেন। আমার কাছ থেকে এই খবর জানতে পেরে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এতোদিন যাঁরা নিশ্চেষ্ট হয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই কাজে নেমে পড়েন। তাঁরা বুঝতে পারেন, গান্ধীজীর তৎকালীন শারীরিক অবস্থায় যেমন করেই হোক তাঁকে অনশনের সংকল্প থেকে প্রতিনিবৃত্ত করা দরকার। তাঁরা তখন গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে অনশনের সংকল্প পরিত্যাগ করবার জন্য অনুরোধ করেন। গান্ধীজী তাঁদের কথা মেনে নিতে সম্মত হন না। অনশনের সংকল্পে তিনি অটল থাকেন।

গান্ধীজী সবচেয়ে বেশি বিচলিত হয়েছিলেন সর্দার প্যাটেলের মতিগতি লক্ষ্য করে। সর্দার প্যাটেল ছিলেন গান্ধীজীর একান্ত বিশ্বস্ত এবং প্রিয় সহচর। সর্দার প্যাটেলের যা কিছু উন্নতি তার সবই হয়েছিলো গান্ধীজীর সাহায্যে। কংগ্রেসের বেশির ভাগ নেতারই আগে থেকে কিছু কিছু রাজনৈতিক ঐতিহ্য ছিলো। কিন্তু সর্দার প্যাটেল এবং ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের তেমন কোনো ঐতিহ্য ছিলো না। এই দুজন নেতাকে গান্ধীজীই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। গান্ধীজী যখন আমেদাবাদে ছিলেন সেই সময় তিনি সর্দার প্যাটেলকে রাজনীতিতে আনেন এবং ধাপে ধাপে তাঁকে ওপরে তুলে দেন। প্যাটেলও সর্বতোভাবে গান্ধীজীকে সমর্থন করতে থাকেন। তিনি কিভাবে গান্ধীজীর কথার প্রতিধ্বনি করতেন সে কথা আমি আগেই বলেছি। গান্ধীজীই প্যাটেলকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য করেন এবং গান্ধীজীর সাহায্যেই প্যাটেল ১৯৩১ সনে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হন। এ হেন প্যাটেল যখন গান্ধীজীর নীতির বিরোধিতা করতে থাকেন তখন স্বাভাবিকভাবেই গান্ধীজী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

গান্ধীজী বলেন, তাঁর চোখের সামনেই দিল্লীর মুসলমানদের হত্যা করা হয়েছে এবং এই কাজটি হচ্ছে যখন তাঁর প্রিয় বল্লভভাই ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে রাজধানীর আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত। প্যাটেল যে শুধু মুসলমানদের ধনপ্রাণ রক্ষা করতেই অক্ষম হয়েছেন তাই নয়, তিনি বাস্তব ঘটনাকে লঘুভাবে চিত্রিত করে যাবতীয় অভিযোগকে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। এই কারণেই গান্ধীজী বলেন, এখন তাঁর হাতে শুধু তাঁর শেষ অস্ত্র, অর্থাৎ অনশন ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। তিনি তাই ১৯৪৮ সনের

১২ই জানুয়ারী থেকে অনশন শুরু করেন। একদিক থেকে বিবেচনা করলে তাঁর এই সর্দার প্যাটেলের ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। এবং প্যাটেলও সে কথা ভালো করেই জানতেন।

গান্ধীজীকে অনশনের সংকল্প থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। আমাদের অনুরোধে কর্ণপাত না করে তিনি অনশন শুরু করেন। অনশনের প্রথম দিন সন্ধ্যার সময় জওহরলাল, সর্দার প্যাটেল এবং আমি তাঁর পাশে বসেছিলাম। পরদিন সকালে সর্দার প্যাটেলের বোম্বাই যাবার কথা। তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে গতানুগতিকভাবে কথা বলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে গান্ধীজী অকারণেই অনশন করছেন। তিনি আরো বলেন, গান্ধীজীর এবারের অনশন জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে তাঁর বিরুদ্ধে। তিনি বেশ কিছুটা তিক্ত কণ্ঠে বলেন, গান্ধীজী এমনভাবে কাজ করছেন যেন মুসলমানদের হত্যা করার জন্য তিনিই দায়ী।

গান্ধীজী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মৃদুস্বরে বলেন, 'আমি তো চীনদেশে অবস্থান করছি না। আমি এখন দিল্লীতেই রয়েছি। তাছাড়া আমি আমার চোখ এবং কানও হারাইনি। আপনি যদি আমার নিজের চোখ ও কানকে অবিশ্বাস করে এই কথা মেনে নিতে বলেন যে মুসলমানদের অভিযোগের কোনো কারণই নেই, তাহলে আমি আপনাকে বুঝতে পারবো না, অথবা আপনিও আমাকে বুঝতে পারবেন না। হিন্দু ও শিখরা আমার ভাই, তাঁরা আমার নিজের রক্তমাংসের মতো। তাঁরা যদি ক্রোধে অন্ধ হয়ে থাকেন তাহলে আমি তাঁদের ওপর দোষারোপ করবো না। আমি আশা করবো আমার অনশনের ফলে তাঁদের মনে শুভবুদ্ধি ফিরে আসবে।'

সর্দার প্যাটেল একটি কথাও না বলে দাঁড়িয়ে উঠলেন। তাঁর হাবভাব দেখে মনে হলো, তিনি ওখান থেকে চলে যাচ্ছেন। আমি তখন তাঁকে বাধা দিয়ে বলি, বর্তমান অবস্থায় তাঁর বোম্বাই যাওয়া বন্ধ করে দিল্লীতেই থাকা উচিত। কারণ তাঁর অনুপস্থিতিতে গান্ধীজীর অবস্থা কিরকম দাঁড়াবে তা কেউ বলতে পারে না।

আমার কথার উত্তরে প্যাটেল প্রায় চিৎকার করে বলেন, 'এখানে থেকে কি করবো? গান্ধীজী আমার কথা শুনতেই প্রস্তুত নন। তিনি বিশ্ববাসীর সামনে হিন্দুদের মুখে কলঙ্কের কালি লেপে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এই যেখানে তাঁর

মনোভাব সেখানে আমার থাকা না-থাকা সমান। আমি আমার পরিকল্পনা বদলাতে পারি না ; কালই আমি বোম্বাই রওনা হবো।'

সর্দার প্যাটেলের কথাগুলো এবং বিশেষ করে তাঁর উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনে আমি রীতিমতো মর্মাহত হই। গান্ধীজীর মনেও তাঁর এই কথাগুলো যে কি রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে সে কথাটা মনে করে আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই। আমরা তাই মনে করি এরপর সর্দার প্যাটেলকে আর কিছু বলা নিরর্থক। একটু পরেই প্যাটেল ওখান থেকে চলে যান।

গান্ধীজীর অনশনের প্রতিক্রিয়া

সর্দার প্যাটেল গান্ধীজীর ওপরে বিরূপ হলেও দিল্লীর অধিবাসীরা মোটেই বিরূপ ছিলেন না। গান্ধীজীর অনশনের সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীসহ সমগ্র ভারতবর্ষ বিচলিত হয়ে ওঠে। দিল্লী শহরে এটি বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো কাজ করে। যেসব লোক সেদিন পর্যন্ত গান্ধীজীর বিরোধিতা করে এসেছেন তাঁরা দলে দলে আমাদের কাছে এসে বলেন গান্ধীজীর জীবন-রক্ষার জন্য তাঁরা সবকিছু করতে প্রস্তুত আছেন।

অনেকে গান্ধীজীর সঙ্গেও দেখা করেন এবং তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেন, দিল্লীতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। গান্ধীজী তাঁদের কথায় বিশেষ কোনো গুরুত্ব দেন না। দুদিন অরভাবের মধ্যে কেটে যায়। তৃতীয় দিন দিল্লীতে একটি জনসভা আহ্বান করা হয়। গান্ধীজীর অনশন বন্ধ করবার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তা স্থির করবার জন্যই উক্ত জনসভা আহূত হয়।

সভায় যাবার পথে আমি গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করি এবং জনসভার কথা তাঁকে জানিয়ে দিই। আমি তাঁকে আরো বলি, কি কি শর্তে তিনি অনশন ত্যাগ করতে পারেন তা যদি আমাকে জানিয়ে দেন তাহলে আমি সেগুলো জনগণের সামনে দাখিল করতে পারি এবং সভায় উপস্থিত জনগণকে বলতে পারি যে সেইসব শর্ত পালিত হবে বলে গান্ধীজী যদি নিঃসন্দেহ হন তাহলে তিনি অনশন ভঙ্গ করতে পারেন।

গান্ধীজী বলেন, 'এটা একটা কথার মতো কথা বটে। যাই হোক, আমার প্রথম শর্ত হলো, হিন্দু ও শিখদের আক্রমণের ফলে যেসব মুসলমান দিল্লী পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁদের সবাইকে ফিরিয়ে এনে তাঁদের নিজ

নিজ বাড়িতে পুনর্বসতি দিতে হবে।'

গান্ধীজীর এই প্রস্তাব তাঁর সদিচ্ছার অভিব্যক্তি হলেও বাস্তবক্ষেত্রে একে কার্যকর করা নানা কারণে সম্ভব ছিলো না। দেশবিভাগের ফলে লক্ষাধিক হিন্দু ও শিখ হৃতসর্বস্ব অবস্থায় ভারতে চলে এসেছেন। আবার লক্ষাধিক মুসলমান পূর্ব পাঞ্জাব থেকে পাকিস্তানে চলে গেছেন। দিল্লী থেকেও হাজার হাজার মুসলমান পাকিস্তানে চলে গেছেন। আবার পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে সমসংখ্যক বা তার চেয়েও বেশী হিন্দু ও শিখ দিল্লীতে এসে মুসলমানদের পরিত্যক্ত বাড়িগুলোতে আশ্রয় নিয়েছেন। এটা যদি দু-চার শো লোকের ব্যাপার হতো তাহলে হয়তো গান্ধীজীর এই শর্ত পালন করা সম্ভব হতো। কিন্তু তা যখন হাজার হাজার নরনারীর ব্যাপার তখন এই শর্ত পালন করতে হলে নতুন সমস্যার উদ্ভব হবে। যেসব হিন্দু ও শিখ বাস্তুহারা হয়ে পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে দিল্লীতে এসে কোনোরকমে মাথা গোঁজবার মতো আশ্রয় পেয়েছেন তাঁদের যদি বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করা হয় তাহলে তাঁরা কোথায় যাবেন? তাছাড়া যেসব মুসলমান দিল্লী পরিত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে গেছেন তাঁরা হয়তো পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছেন। এ অবস্থায় তাঁদের কেমন করে খুঁজে বের করা যাবে? মুসলমানদেরও ফিরিয়ে আনা যাবে না এবং হিন্দু ও শিখদের নতুন করে আশ্রয়হীন করা যাবে না। তা করতে হলে মুসলমানদের যেভাবে প্রথমে বিতাড়িত করা হয়েছে প্রায় সেইভাবেই হিন্দু ও শিখদেরও আর একবার বিতাড়িত করতে হবে।

আমি গান্ধীজীর হাত দুটি ধরে বলি, তিনি যেন এই শর্তটি পরিত্যাগ করেন, কারণ মুসলমানদের খুঁজে বের করে ফিরিয়ে আনা যাবে না এবং যে-সব হিন্দু ও শিখ কোনোরকমে মাথা গুঁজে থাকবার মতো আশ্রয় পেয়েছে তাদের দ্বিতীয়বার আশ্রয়হীন করা যাবে না। আমি তাই গান্ধীজীর কাছে আবেদন জানাই তিনি যেন এই শর্তটির ওপরে জোর না দিয়ে নরহত্যা ও গৃহদাহ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে বলে প্রথম শর্ত দেন। এই সম্পর্কে তিনি আরো একটি শর্ত জুড়ে দিতে পারেন, এখনো যেসব মুসলমান ভারতে রয়েছেন তাঁরা যাতে শান্তিতে এবং সম্মানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে বাস করতে পারেন তার জন্য অবিলম্বে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। প্রথমে গান্ধীজী এতে সম্মত হননি এবং তাঁর প্রথম শর্তের ওপরেই জোর দিতে থাকেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার কাছ থেকে অসুবিধেগুলোর কথা শোনবার পর তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হন। আমি তখন গান্ধীজীকে আন্তরিক ধন্যবাদ

জানিয়ে তাঁর পরবর্তী শর্তসমূহ জানাতে বলি।

আমার কথার উত্তরে গান্ধীজী বলেন, মুসলমানদের যেসব মসজিদ ও ধর্মস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলোকে অবিলম্বে মেরামত করতে হবে। ওই-সব ধর্মস্থান অমুসলমানদের দ্বারা অধিকৃত থাকায় মুসলমানরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে আছেন। গান্ধীজী বলেন, ওইসব জায়গা থেকে অমুসলমানদের অবিলম্বে সরিয়ে দিতে হবে এবং ভবিষ্যতে আর কোনোদিন যাতে ধর্মস্থানের ওপরে আক্রমণ না করা হয় তার জন্য নিশ্চয়তা দিতে হবে।

এরপর গান্ধীজী নিম্নলিখিত শর্তগুলো দেন:

১। হিন্দু ও শিখরা অবিলম্বে মুসলমানদের ওপরে আক্রমণ বন্ধ করবে এবং মুসলমানদের এই বলে নিশ্চয়তা দেবে যে তারা ভাইয়ের মতো একসঙ্গে বাস করবে।

২। হিন্দু এবং শিখরা এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করবে যাতে একজন মুসলমানও প্রাণভয়ে ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য না হয়।

৩। চলন্ত ট্রেনে মুসলমানদের ওপরে যেভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং যেসব হিন্দু ও শিখ ট্রেনে আক্রমণ চালাচ্ছে তাদের প্রতিনিবৃত্ত করতে হবে।

৪। যেসব মুসলমান বিভিন্ন ধর্মস্থানের নিকটে বাস করছেন (যেমন নিজামুদ্দিন আউলিয়া, খাজা কুতুবউদ্দীন বকতিয়ার, নাসিরুদ্দিন চিরাগ দেলভী) এবং তাঁদের বাড়িঘর পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁদের সবাইকে তাঁদের নিজ নিজ বাড়িতে পুনর্বসতি দিতে হবে।

৫। দরগা কুতুবউদ্দীন বকতিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই দরগা এবং ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য ধর্মস্থান সরকার কর্তৃক সহজেই মেরামত হতে পারে। কিন্তু গান্ধীজী চান ওইসব মেরামতের কাজ হিন্দু ও শিখদের করতে হবে, কারণ এতে তাদের সদিচ্ছার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

৬। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্তটি হলো হৃদয়ের পরিবর্তন। অন্যান্য শর্ত পালন করবার আগে এটাই সবচেয়ে বেশি দরকার। অতএব হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের নেতাদের গান্ধীজীর কাছে এসে জানাতে হবে যে তাদের মনে আর কোনোরকম বিদ্বেষ বা বিক্ষোভ নেই।

এইসব শর্ত পালন করা হলে এবং পালন করা হবে বলে নিশ্চয়তা দেওয়া হলে গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করতে পারেন।

আমি গান্ধীজীকে কথা দিই, তাঁর প্রতিটি শর্তই পালিত হবে।

গান্ধীজীর ইচ্ছানুসারে কাজ হলো

বেলা দুটোর সময় আমি সভায় উপস্থিত হই এবং গান্ধীজীর শর্তগুলো শ্রোতাদের কাছে পেশ করি। আমি তাদের আরো বলি, গতানুগতিকভাবে প্রস্তাব পাস করলে তিনি খুশি হবেন না। তিনি যেসব শর্ত দিয়েছেন সেগুলো পালন করা হবে বলে তাঁকে নিশ্চয়তা দিতে হবে। আমি তাই আপনাদের মতামত জানবার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি। গান্ধীজীর শর্তগুলো পালন করা হবে বলে নিশ্চয়তা দিতে আপনারা প্রস্তুত আছেন কি না, সে কথা আপনারা আমাকে এখনই জানিয়ে দিন।

সভায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার নরনারী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা একবাক্যে জানালেন, 'আমরা অক্ষরে অক্ষরে গান্ধীজীর শর্তগুলো পালন করবো। এর জন্য যদি প্রাণ দিতে হয় তবুও আমরা পিছপা হবো না।'

আমি যখন বক্তৃতা করছিলাম সে সময় অনেকে গান্ধীজীর শর্তগুলো কাগজে লিখে নিয়ে সেইসব কাগজের ওপরে শ্রোতাদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করছিলেন। সভা শেষ হবার আগেই হাজার হাজার লোক সেইসব কাগজে স্বাক্ষর করলেন। দিল্লীর ডেপুটি কমিশনার একদল হিন্দু ও শিখ নেতাকে সঙ্গে নিয়ে তখনই বেরিয়ে পড়লেন খাজা কুতুবউদ্দীন দরগাটিকে মেরামত করবার জন্য। একই সঙ্গে দিল্লীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতারা ঘোষণা করলেন, গান্ধীজীর শর্তগুলো যাতে যথাযথভাবে পালিত হয় তার দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করেছেন। দিল্লীর বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং দল থেকে প্রতিনিধিরা আমার কাছে এসে জানিয়ে গেলেন, গান্ধীজীর শর্তগুলো তাঁরা মেনে নিয়েছেন। তাঁরা আমাকে অনুরোধ করলেন, আমি যেন গান্ধীজীকে তাঁদের কথা জানিয়ে দিই এবং তাঁর অনশন ত্যাগের জন্য অনুরোধ করি।

পরদিন সকালে দিল্লীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আমি একটি ঘরোয়া সভায় মিলিত হই। উক্ত সভায় গান্ধীজীর শর্তগুলো নিয়ে আর একবার আলোচনা করা হয়। এই আলোচনার ফলে স্থির হয় আমরা বিড়লা ভবনে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বক্তব্য পেশ করবো। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আমি বেলা দশটায় বিড়লা ভবনে গিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে বলি, আমি এখন পুরোপুরিভাবে নিঃসন্দেহ হয়েছি যে তাঁর প্রতিটি শর্তই যথাযথভাবে পালিত হবে। আমি আরো বলি, তাঁর অনশন হাজার হাজার

মানুষের হৃদয় পরিবর্তন করেছে এবং তাদের মনে শুভবুদ্ধি ফিরে এসেছে। হাজার হাজার লোক এই বলে শপথ নিয়েছে, এখন থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনই হবে তাদের প্রথম কাজ। এই কথা জানিয়ে দিয়ে আমি গান্ধীজীর কাছে আবেদন জানাই, তিনি যেন অবিলম্বে অনশন ভঙ্গ করে লক্ষ লক্ষ মানুষের উৎকণ্ঠা দূর করেন।

আমার কথা শুনে গান্ধীজী খুশী হলেও তখনই অনশন ভঙ্গ করতে সম্মত হলেন না। সে দিনটি আলোচনা এবং মতবিনিময়ের মধ্যেই কেটে গেলো। তাঁর দৈহিক শক্তি কমে এসেছিলো এবং শরীরের ওজনও যথেষ্ট হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছিলো। তিনি তাই বিছানায় শুয়েই সমাগত জনপ্রতিনিধিদের বক্তব্য শুনছিলেন এবং সত্যিই তাঁদের হৃদয়ের পরিবর্তন হয়েছে কিনা তা বুঝতে চেষ্টা করছিলেন। অবশেষে দীর্ঘ আলোচনা এবং মতবিনিময়ের পরে তিনি জানান, পরের দিন তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করবেন।

পরদিন সকাল দশটায় আবার আমরা তাঁর কাছে উপস্থিত হই। জওহরলাল আগে থেকেই তাঁর কাছে বসে ছিলেন। ডঃ জাকির হোসেন এবং পাকিস্তানের হাই কমিশনারও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। হাই কমিশনারকে পাঠানো হয়েছিলো গান্ধীজীর অবস্থা জানবার জন্য। ভদ্রলোক বাইরে অপেক্ষা করছেন শুনে গান্ধীজী তাঁকে ডেকে পাঠান। গান্ধীজীর ঘরে তখন সর্দার প্যাটেল ছাড়া মন্ত্রিসভার প্রত্যেক সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। গান্ধীজী তখন ইশারায় বুঝিয়ে দেন, যাঁরা শপথ নিতে চান তাঁরা এবার তা করতে পারেন। হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের পনেরজন্ নেতা একে একে এগিয়ে এসে এই বলে শপথ বাক্য উচ্চারণ করেন যে তাঁরা গান্ধীজীর শর্তগুলো বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করবেন। শপথ গ্রহণের কাজ শেষ হলে গান্ধীজী আর একবার ইশারা করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ মহলের নরনারীরা রামধুন গান গাইতে শুরু করেন। এই সময় তাঁর পৌত্রী এক গ্লাস লেবুর রস নিয়ে ওখানে আসেন। গান্ধীজী ইশারা করে গ্লাসটিকে আমার হাতে দিতে বলেন। আমি তখন গ্লাসটি নিয়ে তাঁর মুখে তুলে দিই। গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করেন।

গান্ধীজী অনশন শুরু করবার পরে স্টেটসম্যান পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক মিঃ আর্থার মুরও অনশন শুরু করেন। তিনি অনশন করছিলেন ইম্পিরিয়াল হোটেলে। হিন্দু-মুসলমানদের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা তাঁকে গভীরভাবে বিচলিত করেছিলো। তাঁর অনশনের খবর পেয়ে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে

আমাকে তিনি বলেছিলেন, এই দাঙ্গাহাঙ্গামার অবসান না হলে তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করবেন। বহুদিন যাবৎ তিনি ভারতে বাস করছিলেন এবং এ দেশকে নিজের দেশ হিসেবেই মেনে নিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলেন, একজন ভারতবাসী হিসেবে এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ড বন্ধ করাকে তিনি তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেন। তিনি আরো বলেন, ভারতে যেসব ঘটনা ঘটছে তার দর্শক হবার চেয়ে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়। এখন আমি তাঁর কাছে খবর পাঠালাম গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করেছেন, সুতরাং তিনিও যেন আর অনশন না চালিয়ে যান।

গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করলেও তাঁর দৈহিক শক্তি ফিরে আসতে বেশ কয়েকদিন সময় লেগে যায়। ইতিমধ্যে প্যাটেলও বোম্বাই থেকে ফিরে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের সাক্ষাৎকারের সময় আমিও উপস্থিত ছিলাম। সেদিন আমি আর একবার গান্ধীজীর মহানুভবতার প্রমাণ পাই। প্যাটেল তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি আন্তরিকভাবেই তাঁকে গ্রহণ করেন। তাঁর মনে তখন ক্রোধ বা ক্ষোভের লেশমাত্র ছিলো না। প্যাটেল এতে বেশ কিছুটা অসুবিধের মধ্যে পড়েন। কিন্তু তখনো তিনি শুকনো শিষ্টাচারের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। গান্ধীজীর প্রতি তিনি খুশি ছিলেন না। তাছাড়া, মুসলমানদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য তিনি যা করেছেন তাও তিনি খুশিমনে মেনে নিতে পারেননি।

গান্ধীজীর বিরুদ্ধাচারীদের মধ্যে প্যাটেল ছাড়া আরো কিছুসংখ্যক নেতৃস্থানীয় হিন্দু ছিলেন। গান্ধীজীর প্রার্থনাসভার শুরু থেকেই এঁরা গান্ধীজীর বিরোধিতা করতে শুরু করেন। এঁরা প্রকাশ্যেই অভিযোগ আনেন যে গান্ধীজী হিন্দুদের স্বার্থকে বলি দিচ্ছেন। ব্যাপারটা তখন শুধু দিল্লীতেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। হিন্দুমহাসভা এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের নেতৃত্বে হিন্দুদের একটি অংশ প্রকাশ্যেই বলতে থাকেন, গান্ধীজী হিন্দুদের স্বার্থ বলি দিয়ে মুসলমানদের সাহায্য করছেন। এঁদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক গান্ধীজীর প্রার্থনাসভাতেও ঝামেলা শুরু করেন। প্রার্থনাসভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ থেকে কিছু কিছু অংশ পাঠ করা হতো। এইসব ধর্মগ্রন্থের ভেতর বাইবেল এবং কোরাণও ছিলো। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মহাসভা ও আর. এস. এস.-পন্থী ব্যক্তিরা সোচ্চার হয়ে ওঠেন। তাঁদের বক্তব্য হলো, প্রার্থনাসভায় কোরাণ এবং বাইবেল পড়া চলবে না। এই ব্যাপারে হ্যাণ্ডবিল এবং পুস্তিকাও বিতরণ করা হয়। এই ধরনের প্রচারের ফলে অনেকেই

গান্ধীজীর ওপরে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং তাঁকে হিন্দুসমাজের শত্রু হিসেবে মনে করতে থাকেন। একটি ইস্তাহারে এমন কথাও লেখা হয় যে তিনি যদি তাঁর কর্মপন্থা পরিত্যাগ না করেন তাহলে তাঁকে নীরব করে দেবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

গান্ধীজীর ওপরে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের আক্রমণ

গান্ধীজীর অনশন তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের আরো বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এবার এরা গান্ধীজীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে বলে স্থির করে। গান্ধীজী তাঁর প্রার্থনাসভা পুনরায় শুরু করবার কয়েকদিন পরেই তাঁকে লক্ষ্য করে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। সৌভাগ্যক্রমে তাতে কেউ আহত হয়নি। কিন্তু সারা ভারতের জনসাধারণ এই খবর জেনে মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন। গান্ধীজীর ওপরে কেউ যে বোমা নিক্ষেপ করতে পারে তা তাঁরা কল্পনাও করতে পারতেন না। কিন্তু সেই অকল্পনীয় কাজটিই হতে দেখা গেলো। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই দেশবাসী এতে বিচলিত হয়ে পড়েন। এ ব্যাপারে পুলিসের ভূমিকা ছিলো হতাশাব্যঞ্জক। পুলিস গতানুগতিকভাবে একটা তদন্ত করলেও আসামীকে তারা খুঁজে বের করতে পারে না। বিড়লা ভবনের মতো সুরক্ষিত প্রাসাদে কিভাবে আততায়ী বোমা নিয়ে প্রাচীর-ঘেরা বাগানে ঢুকতে পারে অথবা এই পরিকল্পনার পেছনে কারা ছিলো সে কথাও পুলিস জানতে পারেনি। আরো বিস্ময়ের কথা হলো, এই বোমা নিক্ষেপের পরেও গান্ধীজীর জীবনরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি। এই আক্রমণের ফলে স্পষ্টতই বুঝতে পারা গিয়েছিলো, একদল লোক গান্ধীজীকে হত্যা করতে কৃতসংকল্প হয়েছিলো। সুতরাং এটা আশা করা মোটেই অসঙ্গত ছিলো না যে দিল্লীর পুলিস এবং সি. আই. ডি. গান্ধীজীর জীবনরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। কিন্তু চরম লজ্জা এবং দুঃখের কথা এই, পূর্বোক্ত ঘটনার পরেও বিশেষ কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি।

আরো কয়েকদিন পরের কথা। গান্ধীজী তখন আবার তাঁর দৈহিক শক্তি ফিরে পেয়েছেন। এবং আবার তিনি প্রার্থনান্তিক ভাষণ দিতে শুরু করেছেন। হাজার হাজার নরনারী গান্ধীজীর প্রার্থনাসভায় আসতেন। গান্ধীজীতাই মনে করতেন প্রার্থনাশেষে ভাষণ দিলে সমাগত ব্যক্তিদের কাছে

তাঁর নীতিকে পৌঁছে দেওয়া যাবে।

১৯৪৮-এর ৩০শে জানুয়ারী। সেদিন বিকেল আড়াইটের সময় আমি বিড়লা ভবনে গিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করি। তাঁর সঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জন্যই আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। প্রায় দেড় ঘন্টা আলোচনা করে আমি বাড়িতে ফিরে যাই। কিন্তু বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় হঠাৎ আমার মনে পড়ে যায়, আরো কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়নি। আমি তাই আবারও বিড়লা ভবনে যাই। কিন্তু ফটকের সামনে উপস্থিত হতেই আমি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি ফটক বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ফটকের বাইরের ময়দানে তখন হাজার হাজার মানুষ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিলো। তাদের চোখে মুখে আমি উৎকণ্ঠার চিহ্ন দেখতে পাই। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে আমি গাড়ি থেকে নেমে ফটকের সামনে এগিয়ে যাই। আমাকে দেখতে পেয়ে দ্বাররক্ষী ফটক খুলে আমায় ভেতরে আসতে দেয়। ভেতরে ঢুকে আমি সোজা এগিয়ে যাই বাড়ির সদর দরজার দিকে। দরজার ফোকর দিয়ে আমাকে দেখতে পেয়ে বাড়ির একজন অধিবাসী দরজা খুলে আমাকে ভেতরে নিয়ে যায়। আমি যখন ভেতরে ঢুকছিলাম সেই সময় একজন লোক অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে, 'গান্ধীজী পিস্তলের গুলিতে আহত হয়েছেন। তিনি এখন অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছেন।'

খবরটা এতোই আকস্মিক এবং শোকাবহ যে আমি একেবারে স্থাণুর মতো হয়ে যাই। আমি তখন এক অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় গান্ধীজীর কক্ষে প্রবেশ করি। সেখানে যেতেই দেখি গান্ধীজী মেঝের ওপরে পড়ে আছেন। তাঁর মুখটা অস্বাভাবিক রকমে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলো এবং তাঁর চোখ দুটি নিমীলিত ছিলো। তাঁর দুই পৌত্র তাঁর পা দুটি ধরে বসে ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছিলো। আমি যেন স্বপ্নের ঘোরে শুনতে পেলাম "গান্ধীজী আর নেই"।

উপসংহার

গান্ধীজীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটি যুগের অবসান হয়ে গেলো। আজও আমি আমাদের অকর্মণ্যতার কথা ভুলতে পারছি না। ভারতের এই যুগ-পুরুষের জীবনরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে আমরা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিলাম। গান্ধীজীর ওপরে বোমা নিক্ষেপের পর স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে করা উচিত ছিলো আবারও তাঁর ওপরে আক্রমণ হতে পারে। এমন আশা করাও অসঙ্গত ছিলো না যে দিল্লীর পুলিস এবং সি. আই. ডি. এটাকে সাবধানবাণী হিসেবে গ্রহণ করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। একজন সাধারণ নাগরিককে হত্যা করার চেষ্টা করা হলেও পুলিস-বিভাগ বিশেষভাবে তৎপর হয়ে ওঠে। এমনকি কোনো লোক যদি ভীতিপ্রদর্শনমূলক কোনো চিঠি পায় তাহলেও পুলিসী তৎপরতা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু গান্ধীজীর প্রাণহরণের হুমকি দিয়ে ইস্তাহার প্রচার করা হলেও এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষিপ্ত হলো কোনোরকম সাবধানতা অবলম্বন করা হয়নি। অথচ সাবধানতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা মোটেই কঠিন ছিলো না। প্রার্থনাসভা খোলা মাঠে অনুষ্ঠিত হতো না। সভা অনুষ্ঠিত হতো বিড়লা ভবনের প্রাচীর-ঘেরা বাগানে। সুতরাং ফটক দিয়ে প্রবেশ করা ছাড়া কারো পক্ষে সেখানে উপস্থিত হওয়া সম্ভব ছিলো না। সুতরাং পুলিস ইচ্ছে করলে সহজেই আগন্তুকদের যাতায়াতের সময় তাদের তল্লাসী করতে পারতো।

দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পর দর্শকদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, হত্যাকারী নিতান্ত সন্দেহজনকভাবে ভেতরে ঢুকেছিলো। তার চালচলন এবং কথাবার্তা এতোই সন্দেহজনক ছিলো যে সি. আই. ডি.র লোকেরা সহজেই তার ওপরে নজর রাখতে পারতো। পুলিস যদি তৎপর হতো তাহলে তাকে ঠিকই ধরতে পারতো এবং তার কাছ থেকে রিভলবারও কেড়ে নিতে পারতো। লোকটি রিভলবার সঙ্গে নিয়ে বিনা বাধায় ভেতরে ঢুকেছিলো। গান্ধীজী যখন প্রার্থনা-সভায় উপস্থিত হন তখন সে তাঁর সামনে এগিয়ে এসে বলে, 'আজ আপনি দেরি করে এসেছেন।' এর উত্তরে গান্ধীজী বলেন, 'হ্যাঁ।' এরপর তিনি আর দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ করবার সুযোগ পান না। লোকটি তড়িৎগতিতে রিভলবার বের করে গান্ধীজীকে লক্ষ্য করে পর পর তিনবার গুলিবর্ষণ করে। সঙ্গে সঙ্গে

গান্ধীজী মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনার পরে ভারতের জনসাধারণ ক্রোধে একেবারে ফেটে পড়েন। কেউ কেউ তো প্রকাশ্যেই সর্দার প্যাটেলকে দায়ী করেন। এঁদের মধ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে তিনি এই বক্তব্যটি জনগণের সামনে তুলে ধরেন। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তিনি গান্ধীজীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে বলেন, গান্ধীজীর হত্যার ব্যাপারে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তাঁর দায়িত্ব স্খালন করতে পারেন না। তিনি সর্দার প্যাটেলের কাছ থেকে এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য দাবি করেন। সেই জনসভায় তিনি যে অভিযোগ তোলেন তা হলো, গান্ধীজীকে হত্যা করা হবে বলে ইস্তাহার প্রচারিত হবার পরেও তাঁর প্রাণরক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি কেন?

কলকাতার ডঃ প্রফুল্ল ঘোষও প্রায় একই অভিযোগ করেন। তিনি গান্ধীজীর প্রাণরক্ষায় অক্ষম হবার জন্য ভারত সরকারকে দায়ী করেন। তিনি আরো বলেন, সর্দার প্যাটেল একজন শক্ত লোক হিসেবে পরিচিত। কিন্তু স্বরাষ্ট্র বিভাগ তাঁর হাতে থাকা সত্ত্বেও গান্ধীজীর জীবনরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কেন গ্রহণ করা হয়নি? তাঁর এই প্রশ্নের উত্তরও তিনি সর্দার প্যাটেলের কাছে দাবি করেন।

সর্দার প্যাটেল তাঁর চিরাচরিত পন্থায়ই এইসব অভিযোগের মোকাবিলা করেন। তিনি প্রকাশ্যেই এইসব অভিযোগের প্রতিবাদ করেন। তবে প্রতিবাদ জানালেও বিষয়টি যে তাঁর মনের ওপর গভীরভাবে আঘাত করেছিলো তাতে কোনোই ভুল নেই। নিজের দায়িত্ব স্খালনের জন্য তিনি কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় বলেছিলেন, কংগ্রেসের শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে কংগ্রেসকে ভাঙতে চেষ্টা করছে। তিনি গান্ধীজীর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, গান্ধীজীর মৃত্যুর ফলে যে বিপজ্জনক এবং ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং শত্রুপক্ষ যার সুযোগ গ্রহণ করবার চেষ্টা করছে, সে সম্বন্ধে আমাদের সবাইকে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে এবং তার মোকাবিলা করবার জন্য একতাবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে। পার্টির অনেক সদস্যই তাঁর বক্তব্য মেনে নেন।

দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত কতকগুলো ঘটনা থেকে জানতে পারা যায়, সে সময় সাম্প্রদায়িকতার বিষ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিলো। গান্ধীজীর হত্যাকাণ্ডের ফলে সমগ্র দেশ বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত

হলেও কোনো কোনো শহরে আনন্দোৎসবও পালিত হয়েছিলো। এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিলো গোয়ালিয়র ও উজ্জয়িনী শহরে। আমি খবর পেয়েছিলাম, ওই দুটি শহরের অধিবাসীরা প্রকাশ্যেই তাদের আনন্দ জ্ঞাপন করেছিলো এবং বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করেছিলো। কিন্তু তাদের সেই আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সারা দেশে জনগণের ক্রোধ এমনভাবে ফেটে পড়েছিলো যাতে গান্ধীজীর শত্রুরা ভীষণভাবে ভীত হয়ে পড়েছিলো। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিলো গান্ধীজীর মৃত্যুর পরে দু-তিন সপ্তাহ হিন্দুমহাসভা এবং আর. এস. এস-এর নেতারা ভয়ে বাড়ি থেকে বের হতেই পারেননি। তখন হিন্দুমহাসভার প্রেসিডেন্ট ছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। তিনি তখন ভারত সরকারের একজন মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তিনিও তাঁর বাসস্থান থেকে বাইরে আসতে সাহস পাননি। কিছুদিন পরে তিনি মহাসভার প্রেসিডেন্ট পদে ইস্তফা দিয়ে দল থেকে সরে আসেন। এরপর ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হতে থাকে এবং জনসাধারণও ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে।

হত্যাকারী গডসেকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছিলো। কিন্তু তার বিরুদ্ধে মামলা খাড়া করতে অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটেছিলো। পুলিসের ধারণা গান্ধীজীর হত্যাকাণ্ডের পেছনে একটি বড়রকম ষড়যন্ত্র ছিলো। এবং সেই ষড়যন্ত্রের উৎস বের করবার জন্যই তদন্তকার্যে মাসের পর মাস অতিবাহিত হয়েছিলো। গডসের গ্রেপ্তারে জনগণের একটা ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিলো। এরা সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত হয়ে পড়েছিলো, যদিও বিরাট-সংখ্যক ভারতীয় গডসের কাজকে জঘন্যতম অপরাধ বলে বর্ণনা করেছিলেন এবং তাকে জুডাসের (যীশুখ্রীষ্টের হত্যাকারী) সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, তবুও কয়েকজন ধনী পরিবারের মহিলারা গডসের জন্য সোয়েটার বুনে তার কাছে পাঠিয়েছিলেন। গডসের মুক্তির জন্যও আন্দোলন হয়েছিলো। আন্দোলনকারীরা প্রকাশ্যে তার অপকর্মকে সমর্থন করতে না পেরে ভিন্ন পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা যে বক্তব্য উত্থাপন করেছিলেন তা হলো গান্ধীজী যেহেতু অহিংসায় বিশ্বাসী ছিলেন সেইহেতু তাঁর হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া উচিত হবে না। জওহরলালের কাছে এবং আমার কাছে বহু লোক টেলিগ্রাম করে এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, গডসেকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হলে তা হবে গান্ধীজীর নীতির বিরোধী। কিন্তু আইন তার নিজের পথ ধরেই চলে। হাইকোর্ট তার প্রাণদণ্ড বহাল রাখে।

গান্ধীজীর মৃত্যুর পর দু বছর পার না হতেই সর্দার প্যাটেল হৃদরোগে

আক্রান্ত হন। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, গান্ধীজীর হত্যাকাণ্ডের ফলে তাঁর মনের ওপর যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিলো তার ফলেই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। গান্ধীজীর জীবনের শেষদিকে প্যাটেল তাঁর ওপরে বিরূপ হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে জনসাধারণ যখন তাঁকে কর্তব্য-চ্যুতির দায়ে অভিযুক্ত করতে শুরু করে তখন তিনি প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পান। তাছাড়া তিনি ভুলতে পারছিলেন না যে রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর উত্থান এবং প্রতিষ্ঠার মূলেই ছিলেন গান্ধীজী। তাঁর ওপরে গান্ধীজী চিরদিনই স্নেহ-শীল ছিলেন এবং সেই স্নেহ সময় সময় মাত্রা ছাড়িয়ে যেতেও দেখা গেছে। এইসব কথা তাঁর মনের ওপর যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিলো তার ফলেই তিনি থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এরপর তিনি মাত্র বছর চারেক জীবিত ছিলেন। কিন্তু হৃতস্বাস্থ্য আর তিনি ফিরে পাননি।

এইভাবেই ভারত তার একতা বিসর্জন দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছে। পাকিস্তান নামক নতুন রাষ্ট্রটিও সৃষ্টি হয়েছিলো ভারতবাসীর একতাকে বিসর্জন দিয়ে। পাকিস্তানের সৃষ্টিকর্তা হলো মুসলিম লীগ; সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই পাকিস্তানের শাসনভার মুসলিম লীগের ওপরেই বর্তায়। মুসলিম লীগ কিভাবে কংগ্রেসের বিরোধিতা করবার জন্য স্থাপিত হয়েছিলো সেকথা আমি আগেই বলেছি। লীগের মধ্যে এমন সদস্য খুব কমই ছিলেন যাঁরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এঁদের না ছিলো কোনো ত্যাগ আর না ছিলো কোনো সংগ্রামী ঐতিহ্য। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ভূতপূর্ব সরকারী কর্মচারী অথবা ইংরেজের প্রসাদভোজী ব্যক্তি। ইংরেজের অনুগ্রহে এবং তাঁদের পরোক্ষ সহায়তার জন্যই এঁরা নেতা হয়েছিলেন। সুতরাং পাকিস্তান রাষ্ট্র যখন প্রতিষ্ঠিত হলো তখন এঁরাই এসে আসর জমিয়ে বসলেন। এঁরা ছিলেন একাধারে স্বার্থপর এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদী।

আরো একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার। পাকিস্তান রাষ্ট্রের যাঁরা কর্ণধার হয়ে বসলেন তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং বোম্বাইয়ের অধিবাসী। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে, পাকিস্তানের ভাষাও তাঁরা ঠিকমতো বলতে পারতেন না। ওখানে তাই শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিলো এক বিরাট ব্যবধান। এইসব স্বয়ম্ভু নেতা আশঙ্কা করতেন যে অবাধ নির্বাচন হলে তাঁদের মধ্যে অনেকেই বাদ পড়ে যাবেন। এঁরা তাই চেষ্টা করতে থাকেন যতোদিন সম্ভব নির্বাচন

ঠেকিয়ে রাখতে এবং সেই সুযোগে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে। আজ দশ বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু আজও ওখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। এই তো মাত্র কিছুদিন আগে ওখানে একটা সংবিধান খাড়া করা হয়েছে। এটাও শেষ সংবিধান নয়, কারণ যখন-তখন সংবিধানের ধারাগুলোকে পরিবর্জন করবার কথা উঠছে। সুতরাং সংবিধান একটা খাড়া হলেও সে সংবিধান কবে চালু হবে অথবা আদৌ হবে কিনা সে কথা কেউ বলতে পারে না।

পাকিস্তান গঠনের সভ্য ফল যা দেখা গেলো তা হলো ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের অবস্থাকে ভয়াবহভাবে জটিল করে তোলা। ভারতে যে সাড়ে চার কোটি মুসলমান বাস করছেন তাঁরা এখন নিতান্তই দুর্বল হয়ে পড়েছেন। উপরন্তু এখনও এমন কোনো চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না যাতে পাকিস্তানে একটি শক্তিশালী সরকার গঠিত হতে পারে। মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থের দিক থেকেও কেউ যদি বিষয়টি নিয়ে বিচার-বিবেচনা করেন তাহলে তাঁকে বলতেই হবে, পাকিস্তান গঠিত হলেও কোনো সমস্যারই সমাধান হয়নি। আমি এই বিষয় নিয়ে যতোই চিন্তা করেছি ততোই আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে, পাকিস্তান কোনো সমস্যারই সমাধান করতে পারেনি। কেউ কেউ হয়তো বলবেন, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যেরকম বিরোধিতার সৃষ্টি হয়েছিলো তাতে দেশকে বিভক্ত করা ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। মুসলিম লীগের বেশির ভাগ সমর্থকই এই অভিমত পোষণ করতেন। এখানে আরো একটি কথা বলা দরকার, দেশবিভাগের পরে বহুসংখ্যক কংগ্রেস নেতাও এই অভিমত পোষণ করতে থাকেন। এই বিষয় নিয়ে যখনই আমি জওহরলাল ও সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা করেছি তখনই তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু আমরা যদি সুস্থ মস্তিষ্কে বিষয়টি নিয়ে বিচার-বিবেচনা করি তাহলে দেখতে পাবো, তাঁদের বিশ্লেষণ মোটেই সঠিক ছিলো না। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, মন্ত্রিমিশনের আমলে আমি যে পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছিলাম এবং যে পরিকল্পনা মন্ত্রিমিশনও মেনে নিয়েছিলেন, তা গ্রহণ করলে এর চেয়ে অনেক ভালো সমাধান হতে পারতো। আমরা যদি দৃঢ় মনোভাব নিয়ে দেশবিভাগের বিরোধিতা করতাম তাহলে আমার বিশ্বাস, অনেক ভালো ফল পাওয়া যেতো।

একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলেও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয়নি। বরং তা আরো বেশি জটিল এবং

আরো ক্ষতিকর হয়েছে। এইরকম হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ দেশবিভাগের মূল তত্ত্বই ছিলো হিন্দু ও মুসলমানদের শত্রুতার ওপরে ভিত্তি করে।

সবশেষ চিন্তাধারা

পাকিস্তান রাষ্ট্র একটি স্থায়ী রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করলেও সমস্যাগুলোর সমাধানের পথ আরো জটিল হয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হলো, ভারতীয় উপমহাদেশ দুটি আলাদা রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে এবং এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রকে ঘৃণা আর ভয়ের চোখে দেখছে। পাকিস্তান বিশ্বাস করে, ভারত তাদের শান্তিতে থাকতে দেবে না এবং সুযোগ পেলেই সে তাকে ধ্বংস করবে। একইভাবে ভারত মনে করে, পাকিস্তান সুযোগ পেলেই ভারতের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং তাকে আক্রমণ করবে। এই চিন্তাধারার ফলে উভয় রাষ্ট্রই দেশরক্ষা খাতে ব্যয় বাড়াতে থাকে। লর্ড ওয়াভেল এক সময় বলেছিলেন, সশস্ত্রবাহিনীর তিনটি শাখার জন্য একশো কোটি টাকাই যথেষ্ট। ভারতের সশস্ত্রবাহিনীর এক-চতুর্থাংশ পাকিস্তানে যায়। কিন্তু তবুও ভারত তার সশস্ত্রবাহিনীর জন্য বছরে দুশো কোটি টাকা ব্যয় করছে। ভারত সরকারের মোট বার্ষিক আয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই দেশরক্ষা খাতে ব্যয় করা হচ্ছে। পাকিস্তানের অবস্থা আরো খারাপ। অবিভক্ত ভারতের সশস্ত্র-বাহিনীর মাত্র এক-চতুর্থাংশ তার ভাগে পড়লেও সে কমপক্ষে বছরে একশো কোটি টাকা দেশরক্ষা খাতে ব্যয় করছে। এর ওপর আমেরিকার কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্রের মূল্যও বড় কম নয়। আমরা যদি ধীরভাবে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করি তাহলে সহজেই বুঝতে পারবো কি বিপুল পরিমাণ অর্থ এইভাবে বরবাদ হয়ে যাচ্ছে! এই অর্থ যদি আমরা উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করতে পারতাম তাহলে দেশের অগ্রগতির কাজ বিরাটভাবে এগিয়ে যেতো।

মিঃ জিন্না এবং তাঁর অনুগামীরা বুঝতেই চাননি পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান তাঁদের বিরুদ্ধে যাবে। অবিভক্ত ভারতে মুসলমানরা এমন-ভাবে ছড়িয়ে ছিলেন যে সেইসব অঞ্চলকে একত্র করে একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করা অসম্ভব ব্যাপার। মুসলিমপ্রধান অঞ্চলগুলো ছিলো ভারতের উত্তর-পশ্চিমে এবং উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এই দুটি অঞ্চলের ব্যবধান এতো বেশি যে উভয় অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে একমাত্র ধর্ম ব্যতীত আর

কোনো ব্যাপারেই মিল নেই। যদি বলা হয়, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধান সত্ত্বেও এবং উভয় অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতি আলাদা হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র সমধর্মাবলম্বী বলেই উভয় অংশের অধিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করা যাবে তাহলে তা হবে একটা বিরাট ধাপ্পা। প্রথমদিকে ইসলাম এমনি একটি রাষ্ট্র গঠন করতে সচেষ্ট হয়েছিলো, কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, শত চেষ্টা করেও ইসলাম সব দেশের মুসলমানদের একই রাষ্ট্রের অধীনে আনতে পারেনি।

এই অবস্থা আগেও ছিলো এবং এখনো আছে। কোনো লোকই এমন আশা করতে পারেন না পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরা তাঁদের সমস্ত ব্যবধান ভুলে গিয়ে এক জাতিতে পরিণত হবেন। আবার পশ্চিম-পাকিস্তানেও সিন্ধু, পাঞ্জাব এবং সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে এবং ওইসব অঞ্চলের মুসলমানেরা বিভিন্ন উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন স্বার্থ নিয়ে কাজ করছেন। কিন্তু পাশা যখন উল্টেই গেছে এবং নবগঠিত পাকিস্তান যখন একটি বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে তখন ভারত এবং পাকিস্তান উভয়েরই উচিত হবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে যাতে পাশাপাশি থাকা যায় তার ব্যবস্থা করা। অন্য কিছু করা করা হলে তার ফল মোটেই ভালো হবে না। অনেকে মনে করেন যা ঘটেছে তা অন্যায় এবং তাকে পরিহার করা যেতো। আজও আমরা বলতে পারি না কোন্‌টি সঠিক এবং কোন্‌টি বেঠিক। ভবিষ্যৎ ইতিহাসই স্থির করবে দেশবিভাগ মেনে নিয়ে আমরা বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছি কি না।

পরিশিষ্ট

ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের তরফ থেকে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস নিম্নলিখিত ঘোষণা-বাণীর খসড়া উপস্থাপিত করেন :

মহামান্য ইংল্যাণ্ডেশ্বরের গভর্নমেন্ট, এই দেশে (অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডে) এবং ভারতবর্ষে যেরকম উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে এবং ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যেসব আশ্বাস দেওয়া হয়েছে সেসব বিষয় বিবেচনা করে ভারতবর্ষকে অবিলম্বে স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রদান করা সম্পর্কে যে ব্যবস্থা গৃহীত হবে বলে মনস্থ করেছেন তা সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র নামে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠন করা, যে রাষ্ট্রটি ইংল্যাণ্ডের যুক্তরাজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের মতো ইংল্যাণ্ডের রাজমুকুটের অধীনে থেকে অন্যান্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সমান ক্ষমতার ভিত্তিতে কাজ করবে, তবে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র বিষয়ে কোনোক্রমেই কারো অধীনস্থ হবে না।

মহামান্য ইংল্যাণ্ডেশ্বরের গভর্নমেন্ট এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ঘোষণাবাণী প্রচার করছেন :

(ক) যুদ্ধ শেষ হবার অব্যবহিত পরে ভারতবর্ষের জন্য একটি নতুন শাসনতন্ত্র রচনা করার উদ্দেশ্যে ভারতের জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত একটি প্রতিনিধিমণ্ডলী গঠন করা হবে।

(খ) ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলোও যাতে উক্ত শাসনতন্ত্র রচনার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

(গ) যে শাসনতন্ত্র রচিত হবে তা নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে মহামান্য ইংল্যাণ্ডেশ্বরের গভর্নমেন্ট মেনে নেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।—

(১) ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের যেসব প্রদেশ উক্ত শাসনতন্ত্র গ্রহণ করতে সম্মত হবে না সেসব প্রদেশ যাতে ভবিষ্যতে তাদের ইচ্ছানুসারে কাজ করতে পারে, অর্থাৎ নতুন শাসনতন্ত্র মেনে নিয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে অথবা না দিতে পারে তার জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। যেসব প্রদেশ ভারতীয় যুক্তরাজ্যে যোগ দিতে চাইবে না, তারা ইচ্ছা করলে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে তাদের জন্য একটি নতুন শাসনতন্ত্র রচনা করতে পারবে।

(২) মহামান্য ইংল্যাণ্ডেশ্বরের গভর্নমেণ্ট এবং উক্ত শাসনতন্ত্র রচনাকারী সংস্থার মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। এই চুক্তিতে ভারতীয়দের হাতে পুরোপুরিভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় উল্লেখিত থাকবে; বিভিন্ন সম্প্রদায়কে এবং বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য মহামান্য ইংল্যাণ্ডেশ্বরের গভর্নমেণ্ট যেসব আশ্বাস দিয়েছেন সেগুলো যাতে পুরোপুরিভাবে রক্ষিত হয় সে কথাও উক্ত চুক্তিতে উল্লেখিত থাকবে; তবে এর দ্বারা ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারণের ব্যাপারে কোনোরকম বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হবে না।

ভারতের কোনো দেশীয় রাজ্য যদি নতুন শাসনতন্ত্র মেনে নিতে চায়, অথবা না চায় তাহলে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে তাদের যে সন্ধি রয়েছে তার শর্তগুলি নতুন ব্যবস্থা অনুসারে পরিবর্তন করার প্রয়োজন হতে পারে।

(ঘ) ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দ যদি যুদ্ধ শেষ হবার আগে বা পরে অন্য কোনোরকম ব্যবস্থা না চান তাহলে শাসনতন্ত্র রচনাকারী সংস্থা নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে গঠিত হবে:

যুদ্ধ শেষ হলে প্রাদেশিক স্তরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের বিধানসভার নিম্নতর কক্ষের সদস্যরা একটি ইলেকটোরাল কলেজ গঠন করবে এবং নিজ নিজ প্রদেশের প্রতিনিধিদের শতকরা সংখ্যা অনুসারে শাসনতন্ত্র রচনাকারী সংস্থা গঠনের জন্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে। ইলেকটোরাল কলেজের সদস্যসংখ্যার এক-দশমাংশ নিয়ে এই নতুন সংস্থা গঠিত হবে।

ব্রিটিশ ভারতের মতো ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলোকেও তাদের নিজ নিজ রাজ্যের জনসংখ্যা অনুপাতে প্রতিনিধি পাঠাবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। এইসব প্রতিনিধির ক্ষমতা ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধিদের চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন হবে না।

(ঙ) ভারতবর্ষে এখন যেরকম অনিশ্চিত অবস্থা বিরাজ করছে সেই অনিশ্চিত কাল এবং নতুন শাসনতন্ত্র রচিত না হওয়া পর্যন্ত মহামান্য ইংল্যাণ্ডেশ্বরের গভর্নমেণ্ট ভারতের শাসনব্যবস্থার এবং বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপারে তাঁদের দায়িত্ব অনুসারে ভারতের প্রতিরক্ষার যাবতীয় দায়িত্ব পূর্বের মতোই নিজের হাতে রাখবেন। মহামান্য ইংল্যাণ্ডেশ্বরের গভর্নমেণ্ট ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দকে অবিলম্বে এগিয়ে আসতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন এবং আশা করছেন যে উক্ত নেতৃবৃন্দ তাঁদের দেশ, কমনওয়েলথ

এবং মিত্র জাতিসমূহের স্বার্থে একযোগে কাজ করবেন। এবং এইভাবে তাঁরা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার পথ সুগম করবার জন্য কার্যকরী এবং গঠন-মূলক সাহায্য দেবেন।

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সঙ্গে পত্রালাপ

বিড়লা পার্ক

নয়া দিল্লী, এপ্রিল ১০, ১৯৪২

প্রিয় স্যার স্ট্যাফোর্ড,

২রা এপ্রিল আমি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবটি আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম। উক্ত প্রস্তাবে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের খসড়া ঘোষণাবাণী (যা আপনার মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে) সম্পর্কে কমিটি তার মতামত ব্যক্ত করেছে। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে আমরা ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি জ্ঞাপন করেছি। আপত্তি-কর বিষয়গুলো নিয়ে পরে আমরা আরো বিচার-বিবেচনা করেছি। এবং তার ফলে এই দৃঢ় প্রত্যয়ে এসেছি যে আমাদের আপত্তি সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং আমরা আবার বলছি, ঘোষণাবাণীর উক্ত অংশ যেভাবে ঘোষণাবাণীতে স্থান পেয়েছে সেভাবে আমরা গ্রহণ করতে পারি না। ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে আমাদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তই প্রকাশ করা হয়েছে।

উক্ত প্রস্তাবে বর্তমান পরিস্থিতির ওপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে, বর্তমান ব্যবস্থার সম্ভাব্য পরিবর্তনের ওপরেই আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। আমাদের তথা সমগ্র ভারতবাসীর সামনে যে সমস্যাটা সর্বপ্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে তা হলো শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। সুতরাং পরবর্তী কয়েক মাসে অথবা কয়েক বছরে কি ঘটবে বা ঘটতে পারে তার ওপরেই আমাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নির্ভর করবে। তবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো নিশ্চয়তা না পেলেও আমরা এখন এই আশা নিয়ে কাজে এগোতে চাই যে দেশরক্ষার জন্য আত্মত্যাগ করেই আমরা ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করতে সক্ষম হবো। এবং এই কারণেই আমরা বর্তমান ব্যবস্থার ওপরে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছি।

ঘোষণাবাণীর 'ঙ' ধারায় যে কথা বলা হয়েছে তা অসম্পূর্ণ এবং অর্থহীন।

ওতে আসল কথা সম্বন্ধে যে বিষয় পরিষ্কার করে বলা হয়েছে তা হলো, ভারতের শাসন ব্যবস্থা এবং প্রতিরক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের হাতেই ন্যস্ত থাকবে। আমাদের শুধু বলা হয়েছে, ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার জন্য ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে। স্বাধীনতা সম্পর্কে ওখানে কিছুই বলা হয়নি ; ওটা ভবিষ্যতের জন্য সিকেয় তুলে রাখা হয়েছে। তাছাড়া, বর্তমানে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে অথবা সরকার গঠন সম্পর্কে কিংবা কোনোরকম পরিবর্তন সম্বন্ধেও উক্ত 'ঙ' ধারায় কিছুই বলা হয়নি। আমরা যখন এই অসম্পূর্ণতা এবং অর্থহীনতার কথা আপনার সামনে তুলে ধরেছিলাম তখন আপনি আমাদের বলেছিলেন, ওটি ইচ্ছাকৃতভাবেই করা হয়েছে, কারণ এর দ্বারা আপনি বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে পারবেন। আলোচনার সময় আপনি আমাদের আরো বলেছিলেন, একমাত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থাই পরিচালনা করবে জাতীয় সরকার।

প্রতিরক্ষা সব সময়ই এবং বিশেষ করে যুদ্ধের সময় নিঃসন্দেহে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং কোনো জাতীয় সরকারই এটি বাদ দিয়ে কাজ করতে পারে না। এই বিষয় ছাড়া আপনি আরো যে বিষয়ের ওপরে জোর দিয়েছিলেন তা হলো শত্রুকর্তৃক ভারত আক্রমণের সম্ভাব্য বিপদ। জাতীয় সরকারের প্রধানতম কর্তব্যই হলো দেশের জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতার মাধ্যমে সর্ববিধ উপায়ে দেশের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করে আক্রমণকারীর মোকাবিলা করা। এ কাজ একমাত্র জাতীয় সরকারই সুষ্ঠুভাবে করতে পারে। প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করবার জন্য জাতীয় পটভূমি থাকা দরকার। কারণ তার দ্বারা সামরিক-অসামরিক-নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষই বুঝতে পারে সে তার দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় নেতাদের নেতৃত্বে যুদ্ধ করছে।

এই প্রশ্ন শুধু জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের উদ্দেশ্যেই তোলা হয়েছে তাই নয়, সুষ্ঠুভাবে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য এবং ভারতের মাটিতে পদার্পণকারী শত্রুর মোকাবিলা করবার জন্যও এর প্রয়োজন আছে। এ ব্যাপারে সর্বত্র যে সাধারণ নীতি প্রচলিত আছে তা হলো যে-কোনো সরকার তার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতির মাধ্যমে তার সমগ্র বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করে। ভারতের জাতীয় সরকারেরও এই পদ্ধতি অনুসারেই কাজ করা উচিত। আমরা সুস্পষ্টভাবে বলেছি, প্রধান সেনাপতিই সশস্ত্রবাহিনী পরিচালনা

করবেন এবং আক্রমণ প্রতিআক্রমণ ইত্যাদি ব্যাপারে যাবতীয় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবেন। এ ব্যাপারে ঐকমত্যে আসবার জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর ক্ষমতাকে সীমিত করতেও আমরা সম্মত হয়েছিলাম। যুদ্ধের বর্তমান অবস্থায় সশস্ত্রবাহিনীতে সামান্যতম রদবদল করার বাসনাও আমাদের নেই। আমরা আরো স্বীকার করেছিলাম, যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যবস্থার ভার ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার হাতেই থাকবে। তবে সেখানে একজন ভারতীয় সদস্য রাখতে হবে। আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরো বেশি কার্যকর এবং আরো বেশি সুদৃঢ় করা এবং তার জন্য জনগণের সহযোগিতা লাভ করা। যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কিত যান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপরে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করবার ইচ্ছা আমাদের নেই। সুতরাং এই বিষয়ে একটি সর্বসম্মত পন্থা বের করতে কোনোরকম অসুবিধে হবার কথা নয়। কারণ এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে আদৌ কোনো মতবিরোধ নেই।

প্রতিরক্ষার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করে আপনি ও সম্পর্কে যে মূলনীতি নির্ধারণ করেছিলেন তা আপনি আপনার ৭ই এপ্রিলের পত্রে আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। উক্ত পত্রে আপনি বলেছিলেন, 'যুদ্ধ চলাকালে ওয়ার্কিং কমিটির অভিমত অনুসারে বর্তমান ব্যবস্থার কোনোরকম পরিবর্তন করা যাবে না।'[২] এ ব্যাপারে ওয়ার্কিং কমিটির মনোভাব সম্পর্কে আপনার মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং আমি পুনর্বার বিষয়টি পরিষ্কার করে বলার দরকার বোধ করছি। যুদ্ধের সময় শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন অসম্ভব বলে কমিটি মনে করে না। যুদ্ধব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে চালিত করবার জন্য যা যা করণীয় তা অবশ্যই করতে হবে। এবং এইভাবেই জয়কে সুনিশ্চিত করা যাবে। এর জন্য কোনোরকম জটিল আইন প্রণয়নেরও দরকার হবে না। ইচ্ছে থাকলে ভারতের স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সহজেই স্বীকার করে নেওয়া যায়। এর জন্য শাসনব্যবস্থার অল্পস্বল্প পরিবর্তনের প্রয়োজন হলেও তার জন্য কোনোরকম অসুবিধে হবার কথা নয়। বাকি বিষয়গুলো ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেওয়া যেতে পারে। এই সম্পর্কে আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ফ্রান্সের পতনের অব্যবহিত পূর্বে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্স এবং ইংল্যাণ্ডের সংযুক্তির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোনো পরিবর্তনের কথা চিন্তাও করা যায় না। এই প্রস্তাব করা হয়েছিলো যুদ্ধে যখন প্রচণ্ডতম ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছিল ঠিক সেই সময়েই। যুদ্ধ এমনই একটি ব্যাপার যে প্রচলিত আইনকানুনকে অগ্রাহ্য করেই প্রয়োজনের

তাগিদে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন স্বীকার করে নেওয়া হয়।

আপনি প্রতিরক্ষা সম্পর্কে যে মূলনীতি আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন তা আমরা বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা করেছি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে কি কি বিষয় থাকবে তার একটি তালিকাও আপনি পাঠিয়েছিলেন। উক্ত তালিকাও আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি। তালিকাটি দেখে বুঝতে পারা গেছে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর হাতে যেসব বিষয় থাকবে সেগুলোর কোনোই গুরুত্ব নেই। এ আমরা মেনে নিতে পারিনি এবং সে কথা আপনাকে জানিয়েও দিয়েছি।

পরবর্তীকালে এ ব্যাপারে একটি নতুন পরিকল্পনা আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিলো। কিন্তু তার সঙ্গে কোনো তালিকা ছিলো না। এই পরিকল্পনা আমাদের কাছে অনেকটা ভালো বলে বিবেচিত হয়। আমরা তাই ওতে অল্পস্বল্প পরিবর্তন দরকার হবে বলে আপনাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম। তখনো আমরা বলেছিলাম, প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর অধীনে যেসব বিষয় থাকবে তার তালিকার ওপরেই আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে।

এরপর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আরো একটি সংশোধিত পরিকল্পনা আমাদের কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু তার সঙ্গেও কোনো তালিকা ছিলো না। এই পরিকল্পনায় সামরিক বিভাগের কাজকর্ম সম্বন্ধেই বিশেষ করে বলা হয়।

পরিকল্পনাটি এমন জটিল ও ব্যাপকভাবে তৈরি করা হয়েছে যে ও থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে কোন্ কোন্ বিষয় থাকবে এবং সমর-বিভাগের অধীনে কোন্ কোন্ বিষয় থাকবে তা বুঝতেই পারা যায় না। এই কারণেই আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা আপনার কাছ থেকে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে রকম কোনো তালিকা এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে পাঠানো হয়নি।

আপনার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকারের সময় এই নতুন পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছিলাম এবং এ সম্বন্ধে আমাদের মতামত আপনাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম। সুতরাং এখানে নতুন করে ও সম্বন্ধে কিছু বলা হচ্ছে না। পরিকল্পনার শব্দবিন্যাস যেরকমই হোক না কেন, তাতে বিশেষ কিছু আসে-যায় না। তবে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় যদি বাদ পড়ে গিয়ে থাকে তো আলাদা কথা। কিন্তু এই শব্দবিন্যাসের পেছনে এমন একটি মতলব দেখা যাচ্ছে যা দেখে আমরা রীতিমতো বিস্ময়বোধ করছি। কারণ ও থেকে বোঝা যাচ্ছে এতোদিন আমরা আলেয়ার পেছনে ঘুরেছি।

আমরা যখন আপনাকে উভয় বিভাগের অধীনস্থ বিষয়গুলোর পূর্ণাঙ্গ তালিকা দিতে বলেছিলাম তখন আপনি সেই পুরনো তালিকার কথাই পুনরুল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু আপনি ভালোভাবেই জানেন ওই তালিকা আমরা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। আপনি অবশ্য এ সম্বন্ধে আরো একটি কথা জুড়ে দিয়েছিলেন, আরো কিছু নতুন বিষয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানিয়ে দিয়েছিলেন, নতুন তালিকার সঙ্গে পুরনো তালিকার তেমন কিছু পার্থক্য থাকবে না। সুতরাং আমরা যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম আবার সেখানেই ফিরে যেতে হচ্ছে। নতুন পরিকল্পনায় শব্দবিন্যাসে কিছু নতুনত্ব থাকলেও ওতে পুরনো জিনিসই রয়ে গেছে। আমাদের মধ্যে আলোচনার সময় আরো অনেক বিষয় সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিলো; তবে সমস্ত ব্যাখ্যাই আমাদের বিপক্ষে গিয়েছিলো। আপনি ব্যক্তিগতভাবে এবং প্রকাশ্য বিবৃতির মাধ্যমে জাতীয় সরকার এবং মন্ত্রিবর্গ-সমন্বিত কেবিনেটের কথা বলেছিলেন। আপনার সেইসব কথা শুনে আমরা মনে করেছিলাম নতুন সরকার কেবিনেট গভর্নমেন্টের মতোই কাজ করবে এবং সেখানে ভাইসরয় থাকবেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে; কিন্তু এখন আপনি যে চিত্রটি আমাদের সামনে তুলে ধরছেন তার সঙ্গে আগের চিত্রের বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই। যেটুকু পার্থক্য আছে তা শুধু নামে। এবার আপনি নতুন সরকারের যে চিত্রটি দিয়েছেন সে সরকারকে কোনোমতেই জাতীয় সরকার বলা চলে না। তাছাড়া জাতীয় সরকারের মতো কাজও এ সরকার করতে পারবে না। ওতে একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সর্বেসর্বা হিসেবে ভাইসরয়ই হবেন সর্বক্ষমতার অধিকারী। আমরা কোনোরকম আইনগত পরিবর্তন দাবি না করলেও আপনার কাছ থেকে সুস্পষ্টভাবে জানতে চেয়েছিলাম নতুন সরকার একটি স্বাধীন সরকারের মতো কাজ করবে এবং তার সদস্যরা সাংবিধানিক সরকারের কেবিনেটের মতো কাজ করবার সুযোগ পাবে। আমরা আরো বলেছিলাম, যুদ্ধ পরিচালনা এবং যুদ্ধসম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের ভার প্রধান সেনাপতির ওপরেই থাকবে এবং তিনি সমর-মন্ত্রীর মতো কাজ করবেন।

আমাদের জানানো হয়েছে, ভাইসরয়ের কাজ এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে বর্তমান স্তরে আর বেশি কিছু বলা সম্ভব হবে না। এর অর্থ এই দাঁড়ায়, ভাইসরয়ের সঙ্গে কাউন্সিলের সদস্যদের মতবিরোধ হলে সদস্যদের পদত্যাগ করতে হবে।

এ একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা, কারণ এতে পদত্যাগের কথা আগে থেকেই মেনে নিয়ে নতুন সরকার গঠনের জন্য আমাদের এগিয়ে আসতে হবে।

এই কারণেই আমরা বলছি, নতুন পরিকল্পনার সঙ্গে পুরনো ব্যবস্থার বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। আমাদের মতে, এবং হয়তো আপনার মতেও। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রস্তাবটি ভারতীয়দের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাবার জন্যই উত্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ ভারতের জনসাধারণ যাতে নবগঠিত সরকারকে তাদের সরকার বলে মনে করে এবং সঙ্গে সঙ্গে এও মনে করে যে তারা তাদের নবলব্ধ স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই যুদ্ধ করছে, এই উদ্দেশ্যেই প্রস্তাবটি আনা হয়েছে। কিন্তু জনসাধারণ যখন দেখতে পাবে, নতুন সরকার আগের দিনের পুরনো সরকারের প্রতিমূর্তি ছাড়া আর কিছু নয়, তখন তারা প্রচণ্ডভাবে হতাশ হয়ে পড়বে। যে ইণ্ডিয়া অফিস আমাদের কাছে এক বিরাট অন্যায় ব্যবস্থার প্রতীকরূপে বিরাজ করছে তার যথাপূর্ব অবস্থিতিও এই ধারণারই পরিপোষণ করবে। কিছুকাল আগে থেকে জনগণের মনে এমন একটি ধারণার সৃষ্টি হয়েছিলো, ইণ্ডিয়া অফিস শীগগিরই বিলুপ্ত হবে কিন্তু এখন আমাদের বলা হচ্ছে, ওটি আগের মতোই বিরাজমান থাকবে।

সুতরাং আপনার প্রস্তাবিত এই সরকারের মধ্যে আমাদের নিজেদের খাপ খাওয়ানো সম্ভব নয়। সাধারণভাবে এই বিষয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের বিলম্ব হবার কথা নয়; কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের প্রতিরক্ষার কথা চিন্তা করে আমরা যে-কোনো সুষ্ঠু প্রস্তাবই বিবেচনা করতে সম্মত আছি। যে বিপদ আজ ভারতের দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হয়েছে সে বিপদ বিদেশীর অপেক্ষা আমাদের ওপরেই বেশি করে চেপেছে। সুতরাং সঙ্গতভাবেই আমরা সেই বিপদের মোকাবিলা করবার জন্য আগ্রহান্বিত। কিন্তু স্বাধিকার এবং ক্ষমতা না পেলে পুরনো ব্যবস্থার মধ্যে থেকে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করার দায়িত্ব নিতে পারি না।

আপনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলে রাখছি, ভারতে যদি একটি জাতীয় সরকার গঠিত হয় তাহলে এখনও আমরা দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত আছি। ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের সুনির্দিষ্ট অভিমত থাকলেও এখনই আমরা সেসব সম্বন্ধে কোনোরকম প্রশ্ন তুলবো না। তবে আমাদের বুঝতে দিতে হবে, নবগঠিত সরকার প্রকৃতই একটি জাতীয় সরকার হবে এবং সে সরকারে ভাইসরয় নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে থাকলেও ভারতীয় সদস্যরা কেবিনেটের মতো কাজ করবে। প্রতিরক্ষা

ব্যাপারে আমরা আমাদের অভিমত আগেই জানিয়ে দিয়েছি। আমরা মনে করি, প্রতিরক্ষার ব্যাপারে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য ও সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং সেজন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে।

এই বক্তব্যকে শুধু আমাদের বক্তব্য বলে বিবেচনা না করে একে ভারতের জনসাধারণের সামগ্রিক বক্তব্য হিসেবে মনে করতে হবে। এ ব্যাপারে কোনো দল অথবা সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনোই মতদ্বৈধ নেই; মতানৈক্য যা কিছু আছে তা ভারতের জনসাধারণ এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মধ্যে। ভারতে যে মতবৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে তা হলো ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে। সর্বাধিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এবং সুষ্ঠুভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য এই বিষয়কে আমরা কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখতেও সম্মত আছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, ভারতে এ ব্যাপারে পূর্ণ মতৈক্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ব্রিটেনের সরকার ভারতে জাতীয় সরকার গঠনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং এই সঙ্কটজনক সময়ে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ নিদারুণ দুঃখকষ্ট ভোগ করছে এবং প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে তখনো জাতীয় সরকার গঠন করা হচ্ছে না।

ভবদীয় গুণমুগ্ধ
স্বাঃ আবুল কালাম আজাদ

দি রাইট অনারেবল স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস,
৩, কুইন ভিক্টোরিয়া রোড,
নয়া দিল্লী।

১১ই এপ্রিল ক্রিপস আমাকে নিম্নলিখিত উত্তর দেন :

৩, কুইন ভিক্টোরিয়া রোড,
নয়া দিল্লী, ১১ই এপ্রিল, ১৯৪২

প্রিয় মৌলানা সাহেব,

আপনার ১০ই এপ্রিলের পত্রে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক মহামান্য ইংল্যাণ্ডেশ্বরের গভর্নমেন্টের খসড়া ঘোষণাটি প্রত্যাখ্যানের কথা জেনে মর্মাহত হলাম।

কমিটি তার প্রস্তাবে যেসব বিষয় উত্থাপন করেছে এবং যে প্রস্তাব আপনি আমার কাছে পাঠিয়েছেন সেসব বিষয় সম্পর্কে এখন আমি কোনো প্রশ্ন তুলছি না। কারণ ওগুলো স্পষ্টতই আপনাদের এই সিদ্ধান্তের মূল কারণ নয়।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতির মধ্যে কার হাতে কি কি দায়িত্ব থাকবে সে সম্বন্ধেও আপনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন; সুতরাং ও ব্যাপারেও আমি কোনো প্রশ্ন তুলছি না।

দায়িত্বের এই বিভাগ অনুসারে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর হাতে যেসব বিষয় থাকবে তা হলো, প্রধান সেনাপতির এক্তিয়ারভুক্ত সেনাবাহিনীর প্রধান কার্যালয়, নৌবাহিনীর প্রধান কার্যালয় এবং বিমানবাহিনীর প্রধান কার্যালয় ছাড়া প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়। এইসব বিষয়ের বাইরে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে আরো কিছু সীমিত বিষয় থাকবে। যথা :—

স্বরাষ্ট্র বিভাগ—আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, পুলিস, উদ্বাস্তু ইত্যাদি।

অর্থ বিভাগ—যুদ্ধসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়।

যোগাযোগ বিভাগ—রেলওয়ে, সড়ক পরিবহন, মাল পরিবহন ইত্যাদি।

সরবরাহ বিভাগ—সেনাবাহিনীর জন্য যাবতীয় দ্রব্য এবং গুলি-বারুদ।

তথ্য ও বেতার বিভাগ—প্রচার ইত্যাদি।

অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ—বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (এ. আর. পি.) এবং অন্যান্য যাবতীয় অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

আইন বিভাগ—আইনগত নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশ।

শ্রম বিভাগ—জনশক্তি।

প্রতিরক্ষা বিভাগ—দপ্তর পরিচালনা এবং ভারতীয় কর্মচারী ইত্যাদি।

এইসব কাজ একজিকিউটিভ কাউন্সিলের বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্যদের হাতে ন্যস্ত থাকবে।

এইসব বিষয় ছাড়া প্রতিরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্যের হাতে আর কোনো ক্ষমতা দেওয়া যাবে না। কারণ তাতে প্রধান সেনাপতির এক্তিয়ারকে খর্ব করা হবে এবং যুদ্ধপ্রচেষ্টার ক্ষতি হবে। আপনারা জানেন, যুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধ পরিচালনার যাবতীয় দায় এবং দায়িত্ব মহামান্য ইংল্যাণ্ডেশ্বরের সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকবে।

জাতীয় সরকারে অংশ গ্রহণ করা সম্বন্ধে আপনাদের প্রধান আপত্তি

হলো এই, আপনাদের ইচ্ছা অনুসারে সরকার গঠন করা হচ্ছে না।

আপনি দুটি বিষয়ের কথা বলেছিলেন। প্রথমটি হলো, এখনই শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করতে হবে। এ সম্পর্কে আমি বলতে চাই, আমার প্রস্তাব তিন সপ্তাহ আগে আপনাদের কাছে উত্থাপিত হলেও এ প্রশ্ন মাত্র গতরাত্রে তোলা হয়েছে। এ সম্পর্কে আমি আরো বলতে চাই, ইতিমধ্যে অন্যান্য দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমি যেসব আলোচনা করেছি তাতে প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন, বর্তমান অবস্থায় কোনোরকম আইনগত পরিবর্তন সম্ভব নয়।

আপনার দ্বিতীয় বক্তব্য হলো, 'একটি প্রকৃত জাতীয়সরকার' গঠন করতে হবে—যে সরকার কেবিনেট সরকারের মতো পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন হবে।

এ সম্পর্ক আমার বক্তব্য হলো, শাসনতান্ত্রিক কাঠামোকে ঢেলে সাজা না হলে এ সম্ভব নয়—যা আপনারাও বোঝেন।

যেখানে প্রচলিত ব্যবস্থা অনুসারে এই পদ্ধতি অনুসৃত হবে সেখানে নির্বাচিত কেবিনেট (সম্ভবত প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর দ্বারা নির্বাচিত) তাদের নিজেদের কাছে ছাড়া আর কারো কাছে দায়ী থাকবে না। এ সম্ভব নয়, কারণ এর দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

এই প্রস্তাব ভারতের প্রতিটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ই মেনে নিতে চাইবে না। কারণ, এর ফলে তারা চিরদিনের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের পদানত হয়ে থাকবে। তাছাড়া মহামান্য ইংল্যাণ্ডেশ্বরের গভর্নমেন্ট সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে যেসব গ্যারান্টি দিয়েছেন, সেসব গ্যারান্টি রক্ষা করাও এর ফলে সম্ভব হবে না।

ভারতের মতো একটি দেশে, যেখানে সাম্প্রদায়িক বিভাগ এখনো এতো গভীর, সেখানে সংখ্যালঘুদের প্রতি দায়িত্ববিহীন সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার গঠন করা সম্ভব নয়।

এছাড়া ভারতের জনসাধারণ কর্তৃক নতুন শাসনতন্ত্র রচিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় জনগণের এক বিরাট অংশের প্রতি মহামান্য ইংল্যাণ্ডেশ্বরের গভর্নমেন্টের যে কর্তব্য রয়েছে এবং সরকার তাঁদের যেসব কথা দিয়েছে, তা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।

মহামান্য ইংল্যাণ্ডেশ্বরের গভর্নমেন্ট যে প্রস্তাব দিয়েছেন তাতে অবিলম্বে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ছাড়া যতোটা সম্ভব ক্ষমতা দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা রয়েছে এবং বর্তমান পরিস্থিতির বিবেচনায় এটি সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য ইংল্যাণ্ডেশ্বরের গভর্নমেণ্ট এবং আমি ওয়ার্কিং কমিটির সদিচ্ছা, অর্থাৎ সর্ববিধ উপায়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ইচ্ছার কথা অনুধাবন করলেও দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আপনার ওয়ার্কিং কমিটির যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করবার মতো কোনো পন্থা বের করতে পারিনি। যদিও আমাদের এই আন্তরিক প্রস্তাব মেনে নেওয়া হলে ভারতীয় জনগণের বিভিন্ন অংশকে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একতাবদ্ধ করা যেতো।

ভবদীয় গুণমুগ্ধ
স্বাঃ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস

আমি এই উত্তরটা সাধারণ্যে প্রচার করার প্রস্তাব রাখছি।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ,
বিড়লা ভবন,
নয়া দিল্লী।

আমি সেই দিনই তাঁর চিঠির উত্তর দিই।

বিড়লা ভবন
আলবুকার্ক রোড
নয়া দিল্লী
এপ্রিল ১১, ১৯৪২

প্রিয় স্যার স্ট্যাফোর্ড,

এইমাত্র আপনার ১০ই এপ্রিলের চিঠিটি আমার হস্তগত হয়েছে। বলতে বাধা নেই পত্রটি পড়ে আমার সহকর্মীরা এবং আমি রীতিমতো বিস্মিত হয়েছি। আমি এখনই আপনার পত্রের উত্তর দিচ্ছি এবং আপনার উত্থাপিত কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের মতামত ব্যক্ত করছি।

আমাদের মূল প্রস্তাবে যেসব কথা বলা হয়েছে সে সবই আমার কমিটির সুচিন্তিত প্রস্তাব এবং তাতে সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের প্রস্তাব সম্পর্কে আমাদের অভিমত প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা আপনাকে বলেছিলাম ভারতের এই দুর্দিনে ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থার বিষয়টি মুলতুবি রেখেও আমরা প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নেবার জন্য ব্যগ্র, তবে সে দায়িত্ব নিতে পারি, যদি তা প্রকৃত দায়িত্ব হয় এবং দায়িত্ব পালনের জন্য আমাদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং সমর মন্ত্রীর কাজকর্মের বিভাগ সম্পর্কে আপনি কোনো বিস্তারিত তালিকা দেননি। এ ব্যাপারে আপনি শুধু পূর্ববর্তী তালিকার কথাই পুনরুল্লেখ করেছেন। কিন্তু আপনি ভালো করেই জানেন, আমরা ওটিকে প্রত্যাখ্যান করেছি। আপনার পত্রে আপনি এমন কতগুলো বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলো প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও অন্যান্য বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। সুতরাং বুঝতে পারা যাচ্ছে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর ক্ষমতা হবে খুবই সীমিত এবং তা আপনার প্রদত্ত পূর্ববর্তী তালিকার মতোই হবে।

প্রধান সেনাপতির স্বাভাবিক ক্ষমতাকে খর্ব করার কথা কখনো কেউ বলেনি। আমরা বরং তাঁকে আরো বেশি ক্ষমতা দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু একটা বিষয় সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি, প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে আমাদের ধারণার সঙ্গে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ধারণার আকাশপাতাল প্রভেদ রয়েছে। আমাদের মতে এর প্রকৃতি হলো সত্যিকারের জাতীয় প্রকৃতি এবং ভারতের প্রতিটি নরনারীকে এর সামিল হতে হবে। এর অর্থ হলো, আমাদের নিজেদের লোকের ওপরে আস্থা রেখে এই বিরাট ব্যাপারে তাদের পূর্ণ সহ-যোগিতা লাভ করা ; কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের যে মতিগতি দেখা যাচ্ছে তা হলো ভারতীয়দের ওপরে তারা বিশ্বাস রাখতে পারছে না এবং তাদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা অর্পণ করতেও তারা নারাজ। আপনি প্রতিরক্ষার ব্যাপারে মহামান্য ইংল্যাণ্ডেশ্বরের সরকারের কর্তব্য এবং দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু ভারতীয়দের হাতে যদি ক্ষমতা না দেওয়া হয় এবং তারা একে নিজেদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব বলে মনে না করে, তাহলে এই কর্তব্য এবং দায়িত্ব যথা-যথভাবে পালন করা সম্ভব হবে না। কিন্তু জনগণের সদিচ্ছা ও সক্রিয় সহ-যোগিতার কথাটা ভারত সরকার আদৌ অনুধাবন করছে না।

আপনি বলেছেন, তিন সপ্তাহ বাদে আমরা সর্বপ্রথমে শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের কথা উত্থাপন করেছি। এটি সত্যের অপলাপ। আমাদের মধ্যে আলোচনার সময় এ সম্বন্ধে আমরা কথা তুলেছিলাম। তবে এটা সত্যি, প্রথমদিকে এ ব্যাপারে আমরা বিশেষ জোর দিইনি। এর কারণ হলো, নতুন কোনো বিষয় আমরা তখন উত্থাপন করতে চাইনি। কিন্তু আপনি যখন সুস্পষ্ট ভাষায় আপনার পত্রে আমাদের জানালেন যে যুদ্ধের সময় শাসনতন্ত্রের কোনো-রকম পরিবর্তন আমরা চাইনি, তখন সে কথা আমরা অস্বীকার করেছি এবং আপনার এই ধারণাকে বদলাতে চাইছি।

আপনার পত্রের শেষ অংশটি আমাদের বিশেষভাবে বিস্মিত এবং দুঃখিত করেছে। আপনার পত্রের সুর এবং বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যাচ্ছে, আলোচনা শুরু হবার পর থেকে যতোই এগিয়ে গেছে ততোই আপনার তথা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মতিগতি ভিন্ন পথে চলেছে। আলোচনার প্রাথমিক অবস্থায় আপনি যে কথা বলেছিলেন এখন আপনি তা থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন এবং শেষ পর্যন্ত আপনার আগের কথা পুরোপুরিভাবে অস্বীকার করেছেন। আপনি আমাকে বলেছিলেন, ভারতে একটি জাতীয় সরকার গঠিত হবে এবং সে সরকার ভাইসরয়কে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে রেখে কেবিনেট সরকারের মতো কাজ করবে। আপনি আরো বলেছিলেন, ভাইসরয়ের অবস্থা হবে অনেকটা ইংল্যাণ্ডের রাজার মতো। ইণ্ডিয়া অফিসের কাজ সম্পর্কে আপনি আমাকে বলেছিলেন, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্বন্ধে এযাবৎ কেউ কোনো প্রশ্ন না তোলায় আপনি বিস্মিত হয়েছেন। আপনার মতে ওটা হওয়া উচিত ডোমিনিয়ন অফিসের কাজ।

এই চিত্রটিই আপনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন এবং এখন আপনি তা থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে এসেছেন। অর্থাৎ প্রথমে আপনি যেসব কথা বলে-ছিলেন এখন তা অস্বীকার করছেন।

আপনার পত্রে এবার এমন একটি নতুন বিষয়ের অবতারণা করেছেন, যে বিষয়টি আমাদের আলোচনার সময় এর আগে কোনোদিনই আপনি বলেননি। এবার আপনি সংখ্যাগরিষ্ঠের একনায়কত্বের কথা তুলেছেন। এটি সত্যিই বিস্ময়কর যে এ' সম্পর্কে ঠিক এই সময়েই প্রশ্নটি তোলা হয়েছে। জরুরী সময়ে যখন একটি মিশ্র মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তখন এ অসুবিধে থাকেই, কিন্তু নানা উপায়ে এর প্রতিবিধানও করা যায়। আপনি যদি আগে এ প্রশ্ন তুলতেন তাহলে এর একটা সন্তোষজনক সমাধান আমরা বের করতাম। কিন্তু এ বিষয়ে আগে যা কিছু আলোচনা হয়েছে তা হলো: একটি মিশ্র মন্ত্রিসভা গঠিত হবে, যে মন্ত্রিসভা নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করবে। আমরাও তা মেনে নিয়েছিলাম। আমরা এমন কথা কখনও বলিনি কংগ্রেসই সর্বক্ষমতা গ্রাস করবে। আমাদের বক্তব্য ছিলো স্বাধীনতা দিতে হবে ভারতবাসীকে এবং রাষ্ট্রপরিচালনক্ষমতাও ভারতবাসীর হাতে ন্যস্ত করতে হবে। কিভাবে মন্ত্রিসভা গঠিত হবে এবং কিভাবে তারা কাজ করবে সে সম্বন্ধে কথা হয়েছিলো ওটি স্থির হবে মূল প্রশ্নটির উত্তর পাবার পরে, অর্থাৎ ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতীয়দের হাতে কতটা ক্ষমতা ছেড়ে

দিতে প্রস্তুত আছেন তা জানবার পরে। এই কারণেই আমরা আপনার সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে আগে আলোচনা করিনি অথবা এ প্রশ্ন উত্থাপনও করিনি। আমাদের মতে আপনার পত্রে এই বিষয়ের অবতারণা করে আপনি মূল বিষয়টির পাশ কাটাতে চেয়েছেন।

আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, আমার সঙ্গে আপনার প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় আপনি বলেছিলেন, সাম্প্রদায়িক বা অনুরূপ আর কোনো প্রশ্ন বর্তমান স্তরে আসতে পারে না। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যখন ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা ও দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন বলে স্থির করবেন, সেই সময় অন্যান্য প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধানের ব্যবস্থা করা যাবে। আপনি আমাকে বুঝতে দিয়েছিলেন ওতে আপনার সম্মতি আছে।

আমরা এ বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চিত, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যদি বিভেদের নীতি গ্রহণ না করে তাহলে সমস্ত দল-মত-নির্বিশেষে আমরা একসঙ্গে বসে এর একটা সাধারণ সমাধান বের করবো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমানের এই বিপজ্জনক সময়েও ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তার ভেদনীতি পরিত্যাগ করতে চাইছে না। আমরা তাই মনে করতে বাধ্য হচ্ছি, তারা ভারতের ওপর তাদের শাসনব্যবস্থাকে যতো বেশিদিন সম্ভব বজায় রাখতে চাইছে এবং এই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়েই শত্রুর আক্রমণের সম্ভাব্য বিপদের সময়েও বিভেদের সৃষ্টি করে চলেছে। আমাদের তথা প্রতিটি ভারতীয়ের কাছে ভারতের প্রতিরক্ষাই হলো প্রধান বিবেচ্য বিষয় এবং সেই পরীক্ষাকেই আমরা প্রধান পরীক্ষা হিসেবে গণ্য করি।

আপনি লিখেছেন, আমার কাছে লেখা আপনার পত্রটি আপনি সাধারণ্যে প্রচার করতে চান। আমার বক্তব্য হলো, এ সম্পর্কে আমাদের মধ্যে যেসব চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হয়েছে, অর্থাৎ আপনার কাছে প্রেরিত আমাদের মূল প্রস্তাব, তার উত্তরে আপনার পত্র এবং আপনার কাছে লেখা আমাদের পত্র যদি আমরা প্রকাশ করি তাতে আপনার আপত্তি হবে না।

স্বাঃ আবুল কালাম আজাদ

দি রাইট অনারেবল স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস,
৩, কুইন ভিক্টোরিয়া রোড,
নয়া দিল্লী।

ভারত ছাড়ো

ওয়ার্কিং কমিটির ১৯৪২ সনের ১৪ই জুলাইয়ের প্রস্তাব এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলী, যুদ্ধের পরিস্থিতি, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের একজন দায়িত্বশীল মুখ-পাত্রের বক্তব্য এবং ভারতে ও বহির্বিশ্বে যেসব আলোচনা ও সমালোচনা হয়েছে সেসব বিষয় সম্পর্কে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা করে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবটি অনুমোদন ও সমর্থন করছে। এই প্রস্তাব এবং পরবর্তী ঘটনাবলীর ফলে কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করছে, ভারতের ওপরে ইংরেজের আধিপত্যের আশু অবসান প্রয়োজন। এখনো যদি ভারতে ইংরেজ শাসন চলতে থাকে তাহলে বিশ্বের স্বাধীনতার জন্য ভারত তার কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হবে না এবং নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারবে না।

কমিটি হতাশার সঙ্গে লক্ষ্য করেছে, রাশিয়া এবং চীনের অবস্থাও জটিল হয়ে উঠেছে। ওই দুটি দেশের জনসাধারণ যেভাবে বীরত্বের সঙ্গে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করছেন তার দরুণ কমিটি তাঁদের অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান বিপদজাল প্রতিটি স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিকে এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যাঁরা যুদ্ধ করছেন তাঁদের প্রত্যেককে ভেবে দেখতে বলছে মিত্র জাতি-সমূহের মূল নীতি সঠিক পথে চলেছে কিনা, কারণ প্রতি পদক্ষেপেই তাদের বিপর্যয় ঘটছে।

বর্তমানে যে নীতি অনুসৃত হচ্ছে তাতে বিপর্যয়কে কোনোমতেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না এবং তাতে সাফল্য অর্জন করাও যাবে না। কারণ অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে এই নীতির মধ্যেই নিহিত আছে বিফলতার বীজ। এইসব নীতি স্বাধীনতার ভিত্তিতে রচিত হয়নি। এগুলো রচিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি এবং অধিকার কায়েম রাখবার মনোবৃত্তিকে ভিত্তি করে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এই নীতি সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীকে জোরদার করার পরিবর্তে তাদের দুর্বল করে ফেলেছে এবং শেষ পর্যন্ত এটা একটা অভিশাপরূপে দেখা দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃষ্ট নিদর্শন হলো ভারতবর্ষ এবং এই কারণে সেখানে এই প্রশ্নটি তীব্রভাবে প্রকটিত হয়েছে, কারণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নেই ব্রিটেন এবং মিত্র জাতিসমূহের উদ্দেশ্য সম্যকভাবে বুঝতে পারা যাবে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার জনসাধারণের

মনে আশা ও উৎসাহ সঞ্জীবীত হবে। সুতরাং এদেশে ইংরেজ শাসনের আশু অবসান প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, কারণ এর ওপরেই যুদ্ধের ভবিষ্যৎ এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করছে। স্বাধীন ভারত তার বিপুল সম্পদকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে নিয়োজিত করে সাফল্যকে ত্বরান্বিত করতে পারে এবং নাৎসীবাদ, ফ্যাসীবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা করতে পারে। এতে শুধু যুদ্ধের ভবিষ্যৎই নির্ধারিত হবে না; উপরন্তু সমগ্র শোষিত জনগণকে মিত্র জাতিসমূহের পক্ষভক্ত করবে এবং এইসব জাতির অন্যতম হওয়ায় ভারত তাদের মানসিক ও আর্থিক নেতৃত্ব দিতে পারবে। কিন্তু ভারত যদি পরাধীন থাকে তাহলে সেখানকার দখলদার ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ একতাবদ্ধ সমস্ত জাতির ভাগ্যের ওপরে আঘাত হানবে।

অতএব বর্তমানের বিপদের অবসানের জন্যও ভারতের বুক থেকে ইংরেজ শাসনের অবসান হওয়া প্রয়োজন। ভবিষ্যতের জন্য কোনো রকম বাচনিক সংকল্প ব্যক্ত করে এ বিপদকে পরিহার করা যাবে না, কারণ তাতে ভারতের জনসাধারণ মোটেই উৎসাহিত হবে না। একমাত্র স্বাধীনতার আলোক-শিখাই কোটি কোটি ভারতবাসীর মনে আশা ও উৎসাহের প্রদীপ জ্বেলে দিতে পারে এবং অনতিবিলম্বে যুদ্ধের চেহারাকে বদলে দিতে পারে।

এ.আই. সি. সি. তাই পুনরায় এই দাবি জানাচ্ছে, ইংরেজ শক্তিকে ভারত থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হলে একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করা হবে এবং স্বাধীন ভারত ঐক্যবদ্ধ জাতি-সমূহের সরিক হয়ে তাদের সঙ্গে একযোগে সমস্ত ব্যাপারে অংশগ্রহণ করবে। এখানে যে অস্থায়ী সরকারের কথা বলা হলো সে সরকার এ দেশের প্রধান প্রধান দলগুলোর সহয়োগিতার ভিত্তিতে গঠিত হবে। এতএব এটা হবে এমন একটি সরকার যার পেছনে ভারতের প্রতিটি দল ও সম্প্রদায়ের সমর্থন থাকবে। এই সরকারের প্রাথমিক কাজ হবে ভারতের প্রতিরক্ষার জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা এবং সশস্ত্র ও অহিংস শক্তির সাহায্যে যে-কোনো আক্রমণের প্রতিরোধ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে মিত্রশক্তিগুলোর সরিক হয়ে কৃষিক্ষেত্রে, কলকারখানায় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রগতির সৃষ্টি করা, কারণ তাদের হাতেই রয়েছে সমস্ত ক্ষমতার মূলাধার। অস্থায়ী সরকারের অন্যতম কাজ হবে ভারতের জন্য সর্বজনগ্রাহ্য একটি সংবিধান বা শাসনতন্ত্র রচনাকারী সংস্থা গঠন করা। এই সংস্থা ভারতের জন্য একটি সর্বজনগ্রাহ্য শাসনতন্ত্র রচনা করবে। কংগ্রেসের মতে এই শাসনতন্ত্র হবে ফেডারেল ধরনের। এই ফেডারেল

সরকারের অধীনে যেসব অঞ্চল বা প্রদেশ থাকবে তাদের হাতে যতোটা সম্ভব ক্ষমতা এবং পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার দেওয়া হবে। মিত্র জাতিসমূহের সঙ্গে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কিরকম হবে তা স্থির করা হবে ভারতের এবং মিত্র জাতিগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। আলোচনার মাধ্যমেই স্থির হবে কিভাবে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আক্রমণকারীর মোকাবিলা করবে; এবং একমাত্র স্বাধীনতাই ভারতকে তার কর্তব্যপালনে সাহায্য করবে; ভারতীয়দের পেছনে তখন থাকবে তাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি।

ভারতের স্বাধীনতা অবশ্যই এশিয়ার অন্যান্য পরাধীন জাতিসমূহের স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক হিসেবে গণ্য হবে। ব্রহ্মদেশ, মালয়, ইন্দোচীন, ডাচ ইণ্ডিজ, ইরান এবং ইরাকও অবশ্যই স্বাধীনতা অর্জন করবে। এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এইসব দেশের মধ্যে যেগুলো এখন জাপানীদের অধীনে রয়েছে ভবিষ্যতে (অর্থাৎ যুদ্ধে জয়লাভের পরে) সেগুলোকে কোনোক্রমেই ঔপনিবেশিক শক্তির অধীনে ছেড়ে দেওয়া চলবে না।

এ. আই. সি. সি. যদিও ভারতের স্বাধীনতা এবং ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যাপারেই বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট তবুও তারা মনে করে, ভবিষ্যৎ শান্তি ও নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করবার জন্য স্বাধীন জাতিসমূহের দ্বারা একটি বিশ্ব-সংস্থা গঠন করা দরকার—অন্য কোনো উপায়ে বিশ্বের সমস্যাবলীর সমাধান করা যাবে না। এইরকম একটি বিশ্বসংস্থা তার সদস্য জাতিসমূহের স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করবে। আগ্রাসনকে রুখবে, এক জাতি কর্তৃক অপর জাতিকে শোষণ করা বন্ধ করবে, সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা করবে, পশ্চাৎপদ জাতিসমূহের অগ্রগতিতে সাহায্য করবে এবং বিশ্বের সম্পদরাশি বিশ্ববাসীর সাধারণ উন্নয়নকল্পে ব্যয় করার জন্য সংগ্রহ করবে। এই রকম একটি বিশ্বসংস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে সমস্ত দেশে অস্ত্রসজ্জা বন্ধ করা সম্ভব হবে। বিভিন্ন দেশের জাতীয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীরও তখন আর প্রয়োজন হবে না—তখন সমগ্র বিশ্বের জন্য এক সম্মিলিত প্রতিরক্ষাবাহিনী গঠিত হবে এবং সেই সম্মিলিত বাহিনী বিশ্বের শান্তিরক্ষা করবে এবং সবরকম আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করবে।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে সে আনন্দের সঙ্গে এই ধরনের বিশ্বসংস্থায় যোগদান করবে এবং অন্যান্য জাতিসমূহের সঙ্গে সমঅধিকারের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য সর্ব-উপায়ে সহযোগিতা করবে।

এই ধরনের বিশ্বসংস্থায় যে-কোনো জাতিই যোগদান করতে পারবে। তবে যোগদানের প্রধান শর্ত হবে উক্ত সংস্থার মূলনীতিসমূহ মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দান। যুদ্ধ চলাকালে প্রথমদিকে শুধুমাত্র মিত্রপক্ষের জাতিসমূহ নিয়েই এই সংস্থা গঠিত হবে। এই পদ্ধতি গৃহীত হলে (অর্থাৎ এইরকম একটি বিশ্বসংস্থা গঠিত হলে) অক্ষশক্তিগুলোকে প্রচণ্ডভাবে বাধা দেওয়া যাবে এবং ভবিষ্যতের শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা যাবে।

কমিটি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছে, যুদ্ধে প্রচণ্ড রকম ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে দেখেও এবং সমগ্র বিশ্ব এক মহা বিপদের সম্মুখীন হয়েছে জেনেও কোনো কোনো দেশের সরকার এখনো এইরকম একটি বিশ্বসংস্থা গঠনের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করছে না। এ ব্যাপারে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রতিক্রিয়া এবং বিদেশের পত্রিকাগুলোর বিরূপ সমালোচনার ফলে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নটি উপেক্ষিত হচ্ছে এবং এর দ্বারা ভারতকে তার নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এবং রাশিয়া ও চীনকে তাদের প্রয়োজনের সময় সাহায্য করতে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। কমিটি কখনো এমন কিছু চায় না যাতে চীন অথবা রাশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কোনোরকম বাধার সৃষ্টি হয়। কারণ-আক্রমণকারীদের উপযুক্তভাবে মোকাবিলা করতে হলে এই দুটি দেশের স্বাধীনতার মূল্য অশেষ, সুতরাং যেমন করেই হোক এদের স্বাধীনতা রক্ষা করতেই হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ভারত এবং এই দুটি দেশের ওপরে বিপদের মেঘ ঘনীভূত হয়েছে—এই অবস্থায় ভারতকে বিদেশী শক্তির অধীনস্থ করে রাখার অর্থ হলো আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তার প্রতিরোধ-ক্ষমতাকে খর্ব করে রাখা। এর দ্বারা মিত্র জাতিসমূহের স্বার্থকেই উপেক্ষা করা হচ্ছে। ইংরেজ সরকারের কাছে এবং মিত্র জাতিসমূহের কাছে ওয়ার্কিং কমিটির আন্তরিক আবেদনে আজও পর্যন্ত কোনো ফল তো হয়ইনি, উপরন্তু বিদেশে এমন সব বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছে যাতে ভারতের স্বাধীনতা যে বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন সে বিষয়ে অজ্ঞতাই প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো মহলে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে শত্রুতামূলক মনোভাবও দেখা গেছে—এর দ্বারা ভারতের বুকে বিদেশী শাসনকে কায়েম রাখার এবং বর্ণগত শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাবই প্রকটিত হয়েছে। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এবং নিজের শক্তি ও সম্পদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন কোনো জাতিই এইরকম হীনতা সহ্য করতে পারে না।

এ. আই. সি. সি. এই শেষ মুহূর্তে আরো একবার বিশ্বের স্বাধীনতার জন্য

ব্রিটেন এবং মিত্র জাতিসমূহের কাছে আবেদন জানাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে কমিটি আরো মনে করে, ভারতকে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শক্তির অধীনে রেখে সমগ্র মানবজাতির স্বার্থকে উপেক্ষা করা কোনোক্রমেই উচিত হবে না। ভারতের স্বাধীনতার জন্য কমিটি তাই অহিংস পদ্ধতিতে এক প্রবল গণ-আন্দোলন সংগঠনের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করছে। বিগত বাইশ বছরে দেশ যে অহিংস শক্তি সঞ্চয় করেছে, আসন্ন সংগ্রামে সেই শক্তিকে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করা হবে। এই সংগ্রাম অবশ্যই গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত হবে, সুতরাং কমিটি তাঁকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে কমিটি দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়ে বলছে, তাঁরা যেন সাহস, উৎসাহ আর উদ্দীপনার সঙ্গে সমস্ত রকম বিপদের মোকাবিলা করে শৃঙ্খলাবদ্ধ সেনাবাহিনীর মতো স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁদের যেসব নির্দেশ দেওয়া হবে সেগুলো সৈনিকের মতোই মেনে চলেন। তবে তাঁদের সব সময় মনে রাখতে হবে, অহিংসাই হবে এই সংগ্রামের মূলমন্ত্র। এমন সময় আসতে পারে যখন জনগণের কাছে নির্দেশ পৌঁছে দেওয়া হয়তো সম্ভব হবে না এবং কোনো কংগ্রেস কমিটিও কাজ করতে পারবে না। এইরকম অবস্থায় ভারতের প্রতিটি পুরুষ এবং প্রতিটি নারী সংগ্রাম সম্বন্ধে সাধারণ নির্দেশ মেনে তাঁদের নিজ নিজ বিবেচনা অনুসারে কাজ করবেন। এবং এইভাবেই স্বাধীনতার লক্ষ্যপথে অগ্রসর হবেন।

এ. আই. সি. সি. ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের সরকার সম্বন্ধে তার অভিমত ব্যক্ত করলেও এখানে সুস্পষ্টভাবে বলে রাখা হচ্ছে, গণসংগ্রামের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা অর্জিত হবে এবং সরকার গঠিত হবে, সে সরকার শুধু কংগ্রেসী সরকার হবে না, তা হবে জনগণের সরকার এবং যাবতীয় ক্ষমতা জনগণের হাতেই ন্যস্ত থাকবে।

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ৩রা জুনের বিবৃতি

১। ২০শে ফেব্রুয়ারী মহামান্য ইংল্যাণ্ডেশ্বরের গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করেছিলো, ১৯৪৮ সনের জুন মাসের মধ্যে ভারতের শাসনভার ভারতীয়দের হাতে হস্তান্তরিত হবে। গভর্নমেণ্ট তখন আশা করেছিলো, ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবে এবং ১৯৪৬-এর ১৬ই জুনের মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনাকে কার্যকর করে ভারতের জন্য সর্বজনগ্রাহ্য

একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। কিন্তু সে আশা ফলবতী হয়নি।

২। মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, আসাম, উড়িষ্যা এবং উত্তর-পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশের বেশির ভাগ প্রতিনিধি এবং দিল্লী, আজমীর, মারোয়াড়া ও কুর্গের প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যেই নতুন শাসনতন্ত্র রচনার কাজে হাত দিয়েছেন। কিন্তু মুসলিম লীগ দল এবং তার সহযোগী বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধুর বেশির ভাগ প্রতিনিধি এবং ব্রিটিশ বেলুচিস্তানের প্রতিনিধিরা উপরোক্ত ব্যাপারে অংশগ্রহণ করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

৩। মহামান্য ইংল্যাণ্ডেশ্বরের গভর্নমেণ্টের সব সময়ই বাসনা, ভারতীয় জনগণের ইচ্ছানুসারে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। ভারতের রাজনৈতিক দল-গুলোর মধ্যে যদি ঐকমত্য থাকতো তাহলে এই উদ্দেশ্যকে সফল করা যেতো; কিন্তু তা না থাকায় ভারতীয় জনগণের ইচ্ছানুযায়ী একটি বিকল্প সরকার গঠনের দায়িত্ব ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ওপরে বর্তেছে। গভর্নমেণ্ট তাই ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে বলে স্থির করেছে। এই সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সুস্পষ্টভাবে বলে রাখছে, ভারতের জন্য শাসনতন্ত্র রচনা করবার উদ্দেশ্য তার নেই; এ কাজটি ভারতীয়রাই করবেন। তাছাড়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আলাপ-আলোচনার কোনোরকম বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কববার ইচ্ছাও গভর্নমেণ্টের নেই।

৪। শাসনতন্ত্র রচনার জন্য বর্তমানে যে সংস্থাটি কাজ করছে তার কাজে বাধা দেবার ইচ্ছাও গভর্নমেণ্টের নেই। বর্তমানে নিম্নবর্ণিত প্রদেশগুলো সম্পর্কে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তাতে গভর্নমেণ্ট বিশ্বাস করে, এই ঘোষণাবাণীর পরিপ্রেক্ষিতে ওইসব প্রদেশের মুসলিম লীগ প্রতিনিধিরা (যাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি আগে থেকেই এই মতবাদ পোষণ করতেন) এগিয়ে আসবেন এবং এই পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। এই প্রসঙ্গে আরো বলা হচ্ছে, শাসনতন্ত্র রচনাকারী সংস্থা যেরকম শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করুন না কেন তা কোনোক্রমেই অনিচ্ছুক প্রদেশগুলোর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না। মহামান্য ইংল্যাণ্ডেশ্বরের গভর্নমেণ্ট আরো বিশ্বাস করে, নিচে যে পদ্ধতির কথা বলা হচ্ছে তা ওইসব অঞ্চলের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সার্থকভাবে রূপদান করেছে এবং তাঁরা যাতে নিজেদের শাসনতন্ত্র নিজেরাই রচনা করতে পারেন তার ব্যবস্থা করেছে। যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তা হলো :

(ক) বর্তমান গণপরিষদ বা শাসনতন্ত্র রচনাকারী সংস্থা সমস্ত প্রদেশের জন্য শাসনতন্ত্র রচনা করবে, অথবা

(খ) যেসব প্রদেশ বর্তমান গণপরিষদে অংশগ্রহণ করতে অনিচ্ছুক তাদের প্রতিনিধিরা একটি পৃথক সংস্থা গঠন করবে।

এর ফলে কোন্ সংস্থা অথবা কোন্ কোন্ সংস্থার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে তা নির্ধারণ করা সহজ হবে।

৫। বাংলা ও পাঞ্জাবের আইনসভার সদস্যগণ (ইংরেজ সদস্য ব্যতীত) উভয় অঞ্চলে বৈঠকে মিলিত হবেন। উভয় বিধানসভার মুসলমান ও অমুসলমান সদস্যরা পৃথক পৃথক ভাবে নিজেদের মধ্যে বৈঠক করবেন। প্রতিনিধিদের সংখ্যা নির্ধারিত হবে জনসংখ্যার অনুপাত অনুসারে। জনসংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ১৯৪১-এর আদমসুমারির রিপোর্টকে গ্রহণ করতে হবে। উপরোক্ত প্রদেশ দুটির মুসলমানপ্রধান জেলাগুলোর নাম এই বিবৃতির শেষে পরিশিষ্ট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

৬। উভয় প্রদেশের আইনসভার সদস্যরা পৃথক পৃথক ভাবে বসে প্রদেশ দুটিকে বিভক্ত করা হবে বা হবে না তা ভোটের মাধ্যমে স্থির করবেন। কোনো তরফে যদি প্রদেশ বিভাগের পক্ষে সামান্যতম সংখ্যাগরিষ্ঠতাও দেখা যায় তাহলে প্রদেশ দুটি অবশ্যই বিভক্ত হবে এবং সেই অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭। প্রদেশ বিভাগের জন্য সিদ্ধান্ত নেবার আগে উভয় প্রদেশের প্রতিনিধিদের জেনে নিতে হবে, প্রদেশ দুটি কোন্ গণপরিষদের অধীনে থাকতে চায়—প্রদেশগুলো একতাবদ্ধ থাকতে চাইলেই শুধু এই ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে। প্রদেশ দুটি যদি একতাবদ্ধ থাকতে চায়, অর্থাৎ বিভক্ত হতে না চায়, তাহলে আইনসভার সকল সদস্য (ইংরেজ সদস্য ব্যতীত) একসঙ্গে বসে স্থির করবেন কোন্ গণপরিষদের অধীনে প্রদেশ দুটি থাকতে চায়।

৮। আঞ্চলিক বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে উভয় আইনসভার প্রতিটি অংশ তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের জন্য উপরিউক্ত ৪নং ধারায় যে বিকল্প ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে সেইভাবে কাজ করতে হবে।

৯। অঞ্চল বিভাগের আশু প্রয়োজনে বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলমানপ্রধান জেলাগুলোর প্রতিনিধিরা এবং অমুসলমানপ্রধান জেলাগুলোর প্রতিনিধিরা পৃথক পৃথক ভাবে বসে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এটা হবে প্রাথমিক ও সাময়িক ব্যবস্থা। কারণ প্রদেশ দুটিকে সুষ্ঠুভাবে বিভক্ত করতে হলে সীমানা নির্ধারণ প্রভৃতি নানা ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রদেশ বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পরে গভর্নর-জেনারেল

উভয় প্রদেশের জন্য দুটি পৃথক সীমানা কমিশন নিযুক্ত করবেন। এই কমিশনের সদস্য হিসেবে কে কে থাকবেন তা তিনি স্থির করবেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করে। পাঞ্জাবের জন্য যে কমিশন নিযুক্ত করা হবে সেই কমিশনকে মুসলমান অধ্যুষিত এবং অমুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল অনুসারে সীমানা নির্ধারণ করতে নির্দেশ দেওয়া হবে ; সঙ্গে সঙ্গে অঞ্চলগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান এবং আরো নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কেও বিবেচনা করতে বলা হবে। বাংলার সীমানা নির্ধারণের ব্যাপারেও একই রকম নির্দেশ দেওয়া হবে। যতদিন সীমানা কমিশনের রিপোর্ট হস্তগত এবং গৃহীত না হবে ততদিন পরিশিষ্ট অংশে যে সাময়িক সীমানার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই অনুসারে কাজ হবে।

১০। সিন্ধু প্রদেশের আইনসভার সদস্যরা (ইংরেজ সদস্য ব্যতীত) একটি বিশেষ বৈঠকে মিলিত হয়ে উপরিউক্ত ৪নং ধারা অনুসারে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করবেন।

১১। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অবস্থাটা বিশেষ ধরনের। ওখানকার তিনজন প্রতিনিধির মধ্যে দুজনই বর্তমান গণপরিষদে অংশগ্রহণ করছেন। কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থান এবং অন্যান্য বিষয়ের বিবেচনায় এই প্রদেশ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে পুরোপুরি পাঞ্জাব প্রদেশ বা তার কোনো অংশ যদি বর্তমান গণপরিষদে অংশগ্রহণ না করে তাহলে এই প্রদেশকে তার পূর্ব অভিমত পুনর্বিবেচনা করবার সুযোগ দেওয়া হবে। এবং এই অনুসারে বর্তমান আইন-সভার প্রতিনিধি নির্বাচনে যাঁরা ভোট দিয়েছিলেন পুনরায় তাঁদের ভোট নিয়ে ৪নং ধারার বিকল্প ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁদের অভিমত (অর্থাৎ ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছার কথা) গ্রহণ করা হবে। প্রাদেশিক গভর্নরের সঙ্গে পরামর্শ করে গভর্নর-জেনারেল এই গণভোটের ব্যবস্থা করবেন।

১২। ব্রিটিশ বেলুচিস্তান একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করলেও তিনি বর্তমান গণপরিষদে যোগদান করেননি। ভৌগোলিক অবস্থা বিবেচনা করে এই প্রদেশকেও ৪নং ধারার বিকল্প ব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিমত জ্ঞাপন করবার সুযোগ দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে কি করা হবে তা মহামান্য গভর্নর জেনারেল বিবেচনা করে স্থির করবেন।

১৩। আসাম প্রদেশটি যদিও অমুসলমানপ্রধান, তবুও বাংলার পার্শ্ববর্তী সিলেট জেলাটিতে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই জেলা সম্পর্কে দাবি তোলা হয়েছে বাংলা বিভক্ত হলে এই জেলাটিকে বাংলার মুসলমানপ্রধান অঞ্চলের

সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। বাংলা বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে গভর্নর জেনারেল সিলেটে একটি গণভোটের ব্যবস্থা করবেন এবং আসাম সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন, অর্থাৎ সিলেট জেলাটি আসামের অংশ হিসেবে আসামের সঙ্গেই যুক্ত থাকবে, না, নবগঠিত পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হবে তা তিনি উপরোক্ত উপায়ে স্থির করবেন। এখানেও বাংলা ও পাঞ্জাবের মতো একটি সীমানা কমিশন নিযুক্ত করা হবে। এই কমিশন সিলেট জেলার মুসলমানপ্রধান অঞ্চলের সীমানা এবং তৎসংলগ্ন অমুসলমানপ্রধান অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ করবেন। এরপর সিলেট জেলার মুসলমানপ্রধান অঞ্চল পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং বাকি অংশ আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত থেকে বর্তমান গণপরিষদের আওতায় থাকবে।

১৪। বাংলা এবং পাঞ্জাব বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে উভয় অংশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নতুন করে নির্বাচনের প্রয়োজন হবে। এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে মন্ত্রিমিশনের ১৯৪৬-এর ১৬ই মের পরিকল্পনা অনুসারে, অর্থাৎ প্রতি দশ হাজার লোকের জন্য একজন করে প্রতিনিধি নেবার জন্য।

সিলেট জেলাকে যদি পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহলে ওখানেও নতুন করে নির্বাচন হবে। নির্বাচনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলো এবং অঞ্চলগুলোতে প্রতিনিধিদের আনুপাতিক সংখ্যা নিচের তালিকা অনুসারে হবে।—

প্রদেশ (বা অঞ্চল)		ধারণ	মুসলমান	শিখ	মো
সিলেট জেলা	...	১	২	নাই	৩
পশ্চিমবঙ্গ	...	১৫	৪	নাই	১৯
পূর্ববঙ্গ	...	১২	২৯	নাই	৪১
পশ্চিম পাঞ্জাব	...	৩	১২	২	১৭
পূর্ব পাঞ্জাব	...	৬	৪	২	১২

১৫। নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পরে নব-নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বর্তমান গণপরিষদে অথবা নবগঠিত গণপরিষদে যোগ দিতে বলা হবে।

১৬। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে বিভক্ত অঞ্চলসমূহের শাসনব্যবস্থার জন্য আলোচনা শুরু করতে হবে :

(ক) সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ এবং দেশীয় রাজ্যের বর্তমান উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিরক্ষা, অর্থ এবং যোগাযোগসহ বিভিন্ন বিষয় যা

বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন রয়েছে সে সম্বন্ধে নতুন করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(খ) বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের যেসব সন্ধি বিদ্যমান আছে, ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ওইসব সন্ধির শর্ত কি হবে তা বিভিন্ন রাজ্যের বর্তমান উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করা হবে।

(গ) বিভক্ত প্রদেশগুলোর শাসনব্যবস্থা, অর্থাৎ ধনসম্পত্তি এবং দায়, পুলিস এবং অন্যান্য সরকারী বিভাগ, হাইকোর্ট এবং প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান-গুলো সম্বন্ধে নতুন করে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

১৭। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতীয় সর্দারদের সঙ্গে যেসব চুক্তি রয়েছে সেসব সম্বন্ধে সর্দারদের বর্তমান উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

১৮। মহামান্য ইংল্যাণ্ডেশ্বরের গভর্নমেন্ট এই প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে, তাদের এই সিদ্ধান্ত শুধু ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষ সম্পর্কেই প্রযোজ্য হবে; দেশীয় রাজ্যসমূহ সম্পর্কে মন্ত্রিমিশনের ১৯৪৬-এর ১২ই মের স্মারক-পত্রে যে নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছিলো সেই নীতি অপরিবর্তিত থাকবে।

১৯। শাসনক্ষমতার উত্তরাধিকারী কর্তৃপক্ষ যাতে ক্ষমতা গ্রহণের জন্য যথেষ্ট সময় পান সেই উদ্দেশ্যে উপরিউক্ত ব্যবস্থাসমূহ যতশীঘ্র সম্ভব গ্রহণ করে সেগুলোকে কার্যকর করতে হবে। বিলম্ব পরিহার করার জন্য বিভিন্ন প্রদেশ অথবা প্রদেশের অংশসমূহ এই পরিকল্পনা অনুসারে স্বাধীনভাবে এবং যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এগিয়ে যাবে। বর্তমান গণপরিষদ এবং নতুন গণপরিষদ (যদি তা গঠিত হয়) তাদের নিজ নিজ এলাকার জন্য শাসনতন্ত্র রচনার কাজে এগিয়ে যাবে। এখানে আরো একটি কথা উল্লেখযোগ্য, এরা স্বাধীনভাবেই নিজ নিজ এলাকার শাসনতন্ত্র রচনা করবে।

২০। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো বার বার জোরের সঙ্গে ব্যক্ত করেছে, ভারতের শাসনভার যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি হস্তান্তর করতে হবে। মহামান্য ইংল্যাণ্ডেশ্বরের গভর্নমেন্টের এ ব্যাপারে পূর্ণ সহানুভূতি আছে। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাই ঘোষণা করছে, ১৯৪৮ সনের জুন মাসের মধ্যেই ভারতের শাসনভার ভারতীয়দের হাতে ন্যস্ত করা হবে। অর্থাৎ উক্ত তারিখের মধ্যেই ভারতে একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করে সেই সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হবে। এবং ঘোষণাকে কার্যকর করবার জন্য কমন্স সভার

বর্তমান অধিবেশনেই ভারতের শাসনভার এক বা একাধিক ভারতীয় ডোমি-নিয়নের হাতে ছেড়ে দেবার জন্য প্রয়োজনীয় আইন বিধিবদ্ধ করতে চায়। তবে এই আইন দ্বারা ভারতের গণপরিষদের ক্ষমতা কোনোক্রমেই খর্ব করা হবে না অথবা ব্রিটিশ কমনওয়েলথে থাকা বা না থাকা সম্বন্ধে তাদের ওপরে কোনোরকম বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হবে না।

সর্বশেষে উল্লেখ্য যে এই সম্পর্কে ভবিষ্যতে আর কোনোরকম ঘোষণার প্রয়োজন হলে ভারতের গভর্নর-জেনারেল প্রয়োজনীয় ঘোষণা জারী করবেন।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারি অনুসারে পাঞ্জাব এবং বাংলার মুসলমান-প্রধান জেলাসমূহ :

১। পাঞ্জাব

লাহোর বিভাগ—গুজরানওয়ালা, গুরুদাসপুর, লাহোর, শেখপুরা, শিয়ালকোট।

রাওয়ালপিণ্ডি বিভাগ—আটক, গুজরাট, ঝিলম, মিএাওয়ালি, রাওয়াল-পিণ্ডি, শাহ্‌পুর।

মুলতান বিভাগ—ডেরা গাজী খান, জঙ, লায়ালপুর, মণ্টগোমারি, মুলতান, মুজাফ্‌ফরগড়।

২। বাংলা

চট্টগ্রাম বিভাগ—চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা।

ঢাকা বিভাগ—বাখরগঞ্জ, ঢাকা, ফরিদপুর, মৈমনসিং।

প্রেসিডেন্সী বিভাগ—যশোহর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া।

রাজসাহী বিভাগ—বগুড়া, দিনাজপুর, মালদহ, পাবনা, রাজসাহী, রংপুর।

—:*:—